সমাজকর্ম

দ্বিতীয় পত্র

কোর্স কোড : HSC-2862

হায়ার সেকেন্ডারি সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম
(এইচএসসি প্রোগ্রাম)

ওপেন স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

সমাজকর্ম

দ্বিতীয় পত্র

কোর্স কোড : HSC-2862

হায়ার সেকেন্ডারি সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম
(এইচএসসি প্রোগ্রাম)

লেখকবৃন্দ

শিল্পী রাণী দে
মোঃ মামুনুর রশীদ শেখ
পার্থ সারথী মোহন্ত
মোহাম্মদ মাকসুদুর রহমান
মোছাঃ শামীমা নাছরীন
মুহাঃ শহীদুল হক

সম্পাদনা

ড. মোঃ আনোয়ার হোসেন

সমন্বয়কারী

আবু জিহাদ

ওপেন স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
BANGLADESH OPEN UNIVERSITY

সমাজকর্ম
দ্বিতীয় পত্র
কোর্স কোড : HSC-2862
এইচএসসি প্রোগ্রাম

প্রকাশ কাল : আগস্ট, ২০১৭
পুনঃমুদ্রণ : জুলাই, ২০১৮
পুনঃমুদ্রণ : জুন, ২০১৯
পুনঃমুদ্রণ : ফেব্রুয়ারি, ২০২০
অনলাইন ভার্সন : জানুয়ারি, ২০২২

প্রকাশনায়
প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর-১৭০৫।

প্রচ্ছদ
কাজী সাইফুদ্দীন আব্বাস

প্রচ্ছদ গ্রাফিকস
আবদুল মালেক

কম্পিউটার কম্পোজ
মোঃ টিপু সুলতান

ISBN 978-984-34-3158-5

মুদ্রণ
মানিয়া আর্ট প্রেস
৫৩/১, নর্থ ব্রুক হল রোড
ঢাকা-১১০০।

সূচিপত্র

ইউনিট-০১ : বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা ১-২৮
পাঠ-১.১ : মৌলিক মানবিক চাহিদার ধারণা ১
পাঠ-১.২ : মৌলিক মানবিক চাহিদার ধরন ও বৈশিষ্ট্য ৫
পাঠ-১.৩ : বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদার বর্তমান পরিস্থিতি ১০
পাঠ-১.৪ : বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদার অপূরণজনিত সমস্যা ১৫
পাঠ-১.৫ : বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের অন্তরায় ১৯
পাঠ-১.৬ : বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের গৃহীত পদক্ষেপ ২২

ইউনিট-০২ : সমাজকর্মের শাখা ২৯-৬২
পাঠ-২.১ : সমাজকর্মের বিভিন্ন শাখার পরিচিতি ৩০
পাঠ-২.২ : মানবিক সমস্যার ধারণা এবং এর সাথে সমাজকর্মের বিভিন্ন শাখার সম্পর্ক ৩২
পাঠ-২.৩ : চিকিৎসা সমাজকর্মের ধারণা ও ইতিহাস ৩৪
পাঠ-২.৪ : চিকিৎসা সমাজকর্মের গুরুত্ব ও চিকিৎসা সমাজকর্মীর ভূমিকা ৩৬
পাঠ-২.৫ : ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের ধারণা ও ইতিহাস ৩৯
পাঠ-২.৬ : ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের গুরুত্ব ও ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মীর ভূমিকা ৪১
পাঠ-২.৭ : সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের ধারণা ও ইতিহাস ৪২
পাঠ-২.৮ : সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের গুরুত্ব ও সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মীর ভূমিকা ৪৩
পাঠ-২.৯ : বিদ্যালয় সমাজকর্মের ধারণা ও ইতিহাস ৪৫
পাঠ-২.১০ : বিদ্যালয় সমাজকর্মের গুরুত্ব ও বিদ্যালয় সমাজকর্মীর ভূমিকা ৪৭
পাঠ-২.১১ : শিল্প সমাজকর্মের ধারণা ও ইতিহাস ৫১
পাঠ-২.১২ : শিল্প সমাজকর্মের গুরুত্ব ও শিল্প সমাজকর্মীর ভূমিকা ৫৩
পাঠ-২.১৩ : জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মের ধারণা ও ইতিহাস ৫৬
পাঠ-২.১৪ : জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মের গুরুত্ব ও জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মীর ভূমিকা ৫৮

ইউনিট-০৩ : সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের অনুশীলন ৬৩-১০৮
পাঠ-৩.১ : সামাজিক সমস্যার ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও কারণ ৬৪
পাঠ-৩.২ : সামাজিক সমস্যার আন্তসম্পর্ক ৬৭
পাঠ-৩.৩ : জনসংখ্যা সমস্যার ধারণা, কারণ ও পরিস্থিতি ৬৮
পাঠ-৩.৪ : জনসংখ্যা সমস্যার প্রভাব ও জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা ৭১
পাঠ-৩.৫ : বেকারত্বের ধারণা, কারণ ও পরিস্থিতি ৭৩
পাঠ-৩.৬ : বেকারত্বের প্রভাব ও বেকারত্ব সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা ৭৬
পাঠ-৩.৭ : অপুষ্টির ধারণা, কারণ ও পরিস্থিতি ৭৮
পাঠ-৩.৮ : অপুষ্টির প্রভাব ও অপুষ্টি সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা ৮১
পাঠ-৩.৯ : যৌতুকের ধারণা, কারণ ও পরিস্থিতি ৮৩
পাঠ-৩.১০ : যৌতুকের প্রভাব ও যৌতুক সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা ৮৫
পাঠ-৩.১১ : বাল্যবিবাহের ধারণা, কারণ ও পরিস্থিতি ৮৭
পাঠ-৩.১২ : বাল্যবিবাহের প্রভাব ও বাল্যবিবাহ সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা ৮৯
পাঠ-৩.১৩ : মাদকাসক্তির ধারণা, কারণ ও পরিস্থিতি ৯১
পাঠ-৩.১৪ : মাদকাসক্তির প্রভাব ও মাদকাসিক্ত সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা ৯৩
পাঠ-৩.১৫ : অটিজমের ধারণা ও পরিস্থিতি ৯৫

পাঠ-৩.১৬ : অটিজমের প্রভাব ও অটিজম সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা ৯৭
পাঠ-৩.১৭ : জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণা ও কারণ ৯৯
পাঠ-৩.১৮ : বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা ১০১
পাঠ-৩.১৯ : এইচআইভি/এইডসের ধারণা, কারণ ও সংক্রমনের বাহন ১০৩
পাঠ-৩.২০ : এইচআইভি এইডসের প্রভাব ও এইচআইভি/এইডস সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা........... ১০৫

ইউনিট-০৪ : সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা এবং সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধ ১০৯-১৩৯
পাঠ-৪.১ : সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার ধারণা ও বৈশিষ্ট্য.. ১০৯
পাঠ-৪.২ : সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবাহ ও পরিবারের ধারণা ও কার্যাবলী..১১২
পাঠ-৪.৩ : সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা ১১৬
পাঠ-৪.৪ : পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ..১১৯
পাঠ-৪.৫ : ধর্মের ধারণা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে ধর্মের ভূমিকা..১২১
পাঠ-৪.৬ : ধর্মীয় মূল্যবোধ গঠনে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ..১২৪
পাঠ-৪.৭ : গণমাধ্যমের ধারণা, ধরন ও সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে গণমাধ্যমের ভূমিকা..১২৬
পাঠ-৪.৮ : গণমাধ্যমের ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ.. ১৩০
পাঠ-৪.৯ : আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ধারণা, ধরন ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকা . ১৩২
পাঠ-৪.১০ : আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তাদানে সমাজকর্মীর ভূমিকা.. ১৩৬

ইউনিট-০৫ : সামাজিক আইন ও সমাজকর্ম.. ১৪০-১৬৬
পাঠ-৫.১ : সামাজিক আইনের ধারণা, উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব ১৪১
পাঠ-৫.২ : সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় সামাজিক আইন ১৪৪
পাঠ-৫.৩ : মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ .... ১৪৬
পাঠ-৫.৪ : শিশু আইন, ১৯৭৪ .... ১৪৮
পাঠ-৫.৫ : যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০..১৫১
পাঠ-৫.৬ : নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ১৯৮৩ .... ১৫৩
পাঠ-৫.৭ : মাদক নিরোধ অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ .... ১৫৫
পাঠ-৫.৮ : নারী ও শিশু নির্যাতনরোধ আইন, ২০১০ .... ১৫৮
পাঠ-৫.৯ : হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন, ২০১২ .... ১৬০
পাঠ-৫.১০ : সামাজিক আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে সমাজকর্মীর ভূমিকা..১৬২

ইউনিট-০৬ : বাংলাদেশে সরকারি সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম.. ১৬৭-২০৩
পাঠ–৬.১ : বাংলাদেশে সরকারি সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রমের ঐতিহাসিক বিবর্তন ১৬৮
পাঠ–৬.২ : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পরিচিতি, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং বাস্তবায়ন কৌশল ১৭০
পাঠ–৬.৩ : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন দফতর ও সংস্থা ১৭২
পাঠ-৬.৪ : বাংলাদেশে সরকারি সমাজউন্নয়ন কার্যক্রমের পরিচিতি.. ১৭৫
পাঠ-৬.৫ : গ্রামীণ সমাজসেবার ধারণা ও উদ্দেশ্য ১৭৯
পাঠ-৬.৬ : গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ..১৮১
পাঠ-৬.৭ : শহর সমাজসেবা ধারণা ও উদ্দেশ্য.. ১৮৪
পাঠ-৬.৮ : শহর সমাজসেবা কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ ১৮৬
পাঠ-৬.৯ : কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম ১৮৮
পাঠ-৬.১০ : কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ.. ১৯০
পাঠ-৬.১১ : বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভিশন ও কার্যক্রম.. ১৯৩

পাঠ-৬.১২ : সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি হ্রাস, প্রস্তুতি ও সাড়াদান ব্যবস্থা কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ ... ১৯৭
পাঠ-৬.১৩ : জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম ১৯৯
পাঠ-৬.১৪ : জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ.. ২০১

ইউনিট-০৭ : বাংলাদেশে বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম.. ২০৪-২২৬
পাঠ-৭.১ : বাংলাদেশে বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রমের ইতিহাস ২০৪
পাঠ-৭.২ : ব্র্যাক'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম ২০৭
পাঠ-৭.৩ : ব্র্যাক'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির অনুশীলন ২১১
পাঠ-৭.৪ : গ্রামীণ ব্যাংক'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম.. ২১৩
পাঠ-৭.৫ : গ্রামীণ ব্যাংক'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ..২১৬
পাঠ-৭.৬ : প্রবীণহিতৈষী সংঘ'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম.. ২১৭
পাঠ-৭.৭ : প্রবীণহিতৈষী সংঘ'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ.. ২২০
পাঠ-৭.৮ : ইউসেফ বাংলাদেশ'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম..২২১
পাঠ-৭.৯ : ইউসেফ বাংলাদেশ'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ.. ২২৪

ইউনিট-০৮ : বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সংস্থার সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম ২২৭-২৪৯
পাঠ-৮.১ : আন্তর্জাতিক সংস্থার ধারণা ২২৮
পাঠ-৮.২ : সেভ দ্য চিলড্রেন'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম ২৩০
পাঠ-৮.৩ : সেভ দ্য চিলড্রেন'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ ২৩২
পাঠ-৮.৪ : ওয়ার্ল্ড ভিশন'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম.. ২৩৪
পাঠ-৮.৫ : ওয়ার্ল্ড ভিশন'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ.. ২৩৬
পাঠ-৮.৬ : রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম ২৩৭
পাঠ-৮.৭ : রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ ২৪০
পাঠ-৮.৮ : ইউনিসেফ'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম..২৪১
পাঠ-৮.৯ : ইউনিসেফ'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ ২৪৪
পাঠ-৮.১০ : ইউএনডিপি'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম ২৪৫
পাঠ-৮.১১ : ইউএনডিপি'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ.. ২৪৭

ইউনিট-০৯ : সমাজকর্ম শিক্ষায় মাঠকর্ম অনুশীলন ২৫০-২৬৫
পাঠ-৯.১ : সমাজকর্ম শিক্ষায় ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ'র ধারণা ও উদ্দেশ্য ২৫০
পাঠ-৯.২ : ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের নীতিমালা.. ২৫৩
পাঠ-৯.৩ : ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ২৫৫
পাঠ-৯.৪ : কেস ম্যানেজমেন্টের ধারণা ও প্রক্রিয়া ২৫৭
পাঠ-৯.৫ : গ্রুপ ম্যানেজমেন্টের ধারণা ও প্রক্রিয়া ২৫৯
পাঠ-৯.৬ : ব্যবহারিক প্রশিক্ষণে সমাজকর্ম কৌশল..২৬১
পাঠ-৯.৭ : ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন তৈরির ধারণা ২৬২
মানবণ্টন ও নমুনা প্রশ্ন.. ২৬৬-২৭৪

কোর্সবই অনুসরণ করার নির্দেশনা

কোর্স পরিচিতি (Course Overview)

কোর্সের নাম : সমাজকর্ম দ্বিতীয় পত্র **কোর্স কোড : (HSC-2862)**

এইচএসসি প্রোগ্রামের সমাজকর্ম দ্বিতীয় পত্র বইটি এক বছরের জন্য পাঠ্য। বইটি দূরশিক্ষণ পদ্ধতির শিক্ষার্থীদের জন্য রচিত হয়েছে। দূরশিক্ষণ পদ্ধতির মূল কথাই হলো স্বনির্ভর পাঠ ব্যবস্থাপনা। এ পদ্ধতির মাধ্যমে শিক্ষার্থী নিজ দায়িত্বে নিজের সুবিধামতো সময়ে শেখার কাজে নিয়োজিত হতে পারেন। পাঠসামগ্রী উপস্থাপনার এ পদ্ধতি মড্যুলার পদ্ধতি নামে পরিচিত। এটি একই সাথে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে। এতে শিক্ষার্থীরা শিক্ষকের সরাসরি সহায়তা ছাড়া নিজেই পড়াশোনা করতে পারেন। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর আলোকে এনসিটিবি'র নতুন কারিকুলামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই বইটি স্ব-শিখন পদ্ধতিতে প্রণয়ন করা হয়েছে এবং বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের বইটিকে অনুসরণ করা হয়েছে। প্রতি ইউনিটের শুরুতে ভূমিকা দেয়া হয়েছে। স্বতন্ত্র এ ইউনিটগুলো পড়লে বিশিষ্ট কোন দিকগুলো জানা যাবে তা ইউনিটের উদ্দেশ্যে বলা আছে। আবার, প্রতিটি পাঠের শুরুতে ঐ পাঠের উদ্দেশ্য যুক্ত করা হয়েছে, যাতে শিক্ষার্থী উদ্দেশ অনুযায়ী জ্ঞান অর্জিত হলো কি না তা যাচাই করতে পারেন। শিক্ষার্থীকে প্রতিটি ভূমিকা অবশ্যই বুঝে পড়তে হবে। প্রতিটি পাঠের শেষে সারসংক্ষেপ দেয়া আছে। এ ছাড়া শিক্ষার্থীর স্ব-মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে প্রতিটি পাঠের শেষে পাঠোত্তর মূল্যায়নে বহু নির্বাচনি প্রশ্ন এবং ইউনিটের শেষে সৃজনশীল প্রশ্ন দেয়া হয়েছে।

সমাজকর্ম হচ্ছে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে একটি গতিশীল পেশাগত কর্মকান্ড, যা একাধারে বিজ্ঞান ও কলা। সমাজকর্ম পেশা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান লাভে এই পাঠ্যবইটি সাহায্য করবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সমাজকর্ম পেশা অনুশীলনের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে। ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে জ্ঞান ও মূল্যবোধ প্রয়োগের পাশাপাশি সহমর্মিতা, আত্মবিযুক্ত ভালবাসা, উষ্ণতা, আন্তরিকতা, সৃজনশীলতা, বিচারবোধ কল্পনাশক্তি, অনুসন্ধিৎসা, মানবীয় গুণাবলি ইত্যাদি শৈল্পিক দক্ষতা বিকশিত করার সুযোগ পাবে। দেশ গড়তে শিক্ষার্থীদের যোগ্য করে গড়ে তোলা এই পর্যায়ের শিক্ষার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। পাঠ্যবইটির বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। স্ব-শিখন পাঠসামগ্রী হিসেবে এটি দূরশিক্ষণ শিক্ষার্থীদের আনন্দদায়ক পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

শিক্ষার্থীরা যাতে বইটি পড়ে অধিকতর সুফল লাভ করতে পারে সেজন্য নিচে কিছু নির্দেশনা তুলে ধরা হলো :

- ইউনিটের শিরোনাম ও ভূমিকা পড়ে সম্ভাব্য বিষয়বস্তু কী হতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা করুন।
- পাঠভিত্তিক উদ্দেশ্যগুলো পড়ে এই পাঠ থেকে কী শিখতে পারবেন তা জেনে নিন।
- এরপর মূলপাঠ ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন। অধ্যয়নের পর শিখনফলগুলো অর্জিত হলো কি না তা ভালোভাবে যাচাই করুন। যদি শিখনফল অর্জিত না হয় তাহলে বিষয়বস্তু পুনরায় অধ্যয়ন করুন।
- টিউটোরিয়াল সার্ভিসকে কার্যপোযোগী করতে আপনার পাঠ্যপুস্তকটির সকল অধ্যায়কে ততটি অংশে ভাগ করে নিন। প্রথম টিউটোরিয়াল ক্লাসে যাওয়ার আগে আপনার ভাগকৃত অংশটি ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন। কোনো অধ্যায়ের বিষয়বস্তু অধ্যয়নের সময় যে বিষয়গুলো অপেক্ষাকৃত কঠিন/দুর্বোধ্য মনে হয়েছে তা চিহ্নিত করে আপনার নোট খাতায় লিপিবদ্ধ করুন এবং কঠিন বিষয়গুলো সমাধানের জন্য প্রয়োজনে টিউটরের সাহায্য নিন। একই পদ্ধতি অনুসরণ করে সবগুলো পাঠ অধ্যয়ন শেষ করুন।
- পাঠশেষে পাঠোত্তর মূল্যায়নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করুন। ইউনিটের শেষে দেওয়া উত্তরমালার সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন। সবগুলো প্রশ্নের উত্তর সঠিক না হলে এই পাঠটি আবারও ভালো করে পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিতে চেষ্টা করুন। এরপর অনুশীলন অংশের সৃজনশীল প্রশ্নগুলোর উত্তর জানা আছে কি না দেখুন। জানা না থাকলে সংশ্লিষ্ট অংশ আবার পড়ুন।
- ওপেন স্কুলের এই বইটি ছাড়াও স্থানীয় স্টাডি সেন্টারে আপনার জন্য টিউটোরিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা রয়েছে। আপনি প্রথমেই আপনার বিষয়ে কতটি টিউটোরিয়াল ক্লাস পাবেন তা আপনার স্টাডি সেন্টার থেকে জেনে নিন এবং আপনার স্টাডি সেন্টারের প্রতিটি টিউটোরিয়াল ক্লাসে অংশগ্রহণ করুন।

মার্জিন আইকন (Margin Icons)

কোর্সটি অধ্যয়ন করার পূর্বে কোর্সটিতে পর্যায়ক্রমে যে সমস্ত আইকন/প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে সে সম্পর্কে আপনাকে প্রথমেই পরিচিত হতে হবে। এতে পুরো কোর্স মড্যুলের কোনটি বিষয়বস্তু/মূলপাঠ, কোনটি পাঠোত্তর মূল্যায়ন ইত্যাদি সম্পর্কে সহজেই অবহিত হতে পারবেন। নিম্নে ব্যবহৃত বিভিন্ন আইকন বা প্রতীকগুলো দেখানো হলো।

উদ্দেশ্য	মূলপাঠ	সারসংক্ষেপ	পাঠোত্তর মূল্যায়ন	চূড়ান্ত মূল্যায়ন	উত্তরমালা	কোর্স /ইউনিট সমাপ্তির সময়	অডিও বা শোনা	সাহায্য/প্রয়োজনে

অডিও/ভিডিও	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এইচএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থী বন্ধুদের জন্য সমাজকর্ম বিষয়ের অনেকগুলো অডিও/ভিডিও প্রোগ্রাম বর্তমানে বিটিভি/বংলাদেশ বেতার কর্তৃক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত হয়ে আসছে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা স্টাডি সেন্টার থেকে প্রোগ্রাম সিডিউল সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত প্রোগ্রামটি দেখলে উপকৃত হবেন বলে আশা করছি। এসময় বোঝার সুবিধার্থে বইটি সামনে নিয়ে বসুন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নোট করার জন্য কাগজ ও কলম সাথে রাখুন। কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সহায়তা নিন।

সাহায্য বা সহায়তার জন্য আপনার স্টাডি সেন্টারের কোর্স টিউটরের পরামর্শ নিন।

মৌলিক মানবিক চাহিদা ও বাংলাদেশ
(Basic Human Needs and Bangladesh)

ইউনিট ১

ভূমিকা

মানুষ সামজিক জীব। জীবন রক্ষার জন্য মানুষের নির্দিষ্ট কিছু চাহিদা রয়েছে। আবার সামাজিকভাবে বসবাস করায় তার রয়েছে কিছু সামাজিক চাহিদা। সমাজ ও রাষ্ট্রে সুস্থ ও সুনাগরিক হিসেবে বসবাস করার জন্য উভয় ধরনের চাহিদার পূরণ একান্তই প্রয়োজন। তা না হলে ব্যক্তির মধ্যে এবং দলে ও সমাজে দেখা দেয় নানা সমস্যা আর সংকট। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার কারণে মানুষের সকল মৌলিক মানবিক চাহিদা কখনও সঠিকভাবে পূরণ হয়নি বরং সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের নাগালের বাইরেই রয়ে গেছে দীর্ঘদিন ধরে। আর এ অবস্থার উত্তরণে গৃহীত হয়েছে বিভিন্ন পদক্ষেপ।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ–১.১: মৌলিক মানবিক চাহিদার ধারণা
পাঠ–১.২: মৌলিক মানবিক চাহিদার ধরন ও বৈশিষ্ট্য
পাঠ–১.৩: বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদার বর্তমান পরিস্থিতি
পাঠ–১.৪: বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদার অপূরণজনিত সমস্যা
পাঠ–১.৫: বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের অন্তরায়
পাঠ–১.৬: বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে গৃহীত পদক্ষেপ

পাঠ-১.১ মৌলিক মানবিক চাহিদার ধারণা (Concept of Basic Human Needs)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

১.১ মৌলিক মানবিক চাহিদার ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১.১ মৌলিক মানবিক চাহিদার ধারণা

মানুষের চাহিদার কোনো শেষ নেই। মানুষ দৈনন্দিন জীবনে অনেক কিছুরই চাহিদা অনুভব করে। কিন্তু সকল প্রকার চাহিদা মৌলিক মানবিক চাহিদার অন্তর্ভুক্ত নয়। প্রধানত দৈহিক বৃদ্ধি ও বিকাশ এবং সামাজিক জীবনের উৎকর্ষ সাধনের জন্য যে সকল চাহিদা পূরণ করা অপরিহার্য, সেগুলোই মৌলিক মানবিক চাহিদার পর্যায়ভুক্ত। মৌলিক মানবিক চাহিদা মূলত দু'ধরনের চাহিদার সমন্বয়। যেমন– (ক) মৌলিক চাহিদা (Basic Needs), (খ) মানবিক চাহিদা (Human Needs)

(ক) মৌলিক চাহিদা: মানুষসহ যেকোনো জীবন্ত প্রাণীর অস্তিত্ব রক্ষা, দৈহিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য যেসব চাহিদা পূরণ করা অপরিহার্য তাকে মৌলিক চাহিদা বলে। একে জৈবিক বা দৈহিক চাহিদাও বলা হয়। এ চাহিদার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, মানুষসহ সকল জীবন্ত প্রাণীর বেঁচে থাকা এবং দৈহিক বৃদ্ধি ও বিকাশের জন্য এটি পূরণ করা অত্যাবশ্যক। মৌলিক চাহিদার আওতায় আসে খাদ্য (food), ঘুম (sleep) ইত্যাদি।

(খ) মানবিক চাহিদাঃ সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে সমাজবদ্ধ জীবনযাপনের জন্য যে সকল চাহিদা পূরণ একান্ত অপরিহার্য, সেগুলোকে মানবিক চাহিদা বলে। মানবিক চাহিদা অনেক সময় সামাজিক চাহিদা হিসবে আখ্যায়িত হয়। এটা শুধু মানুষের ক্ষেত্রে বিশেষ করে সমাজবদ্ধ সুস্থ ও স্বাভাবিক মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মানবিক চাহিদা পূরণ করা সামাজিক জীবনের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ চাহিদাগুলো মানুষকে সমাজের অন্য প্রাণীর চেয়ে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে আসীন করে 'আশরাফুল মাখলুকাত' বা সৃষ্টির সেরা জীবের মর্যাদা দিয়েছে। মানবিক চাহিদা হলো– বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা ইত্যাদি।

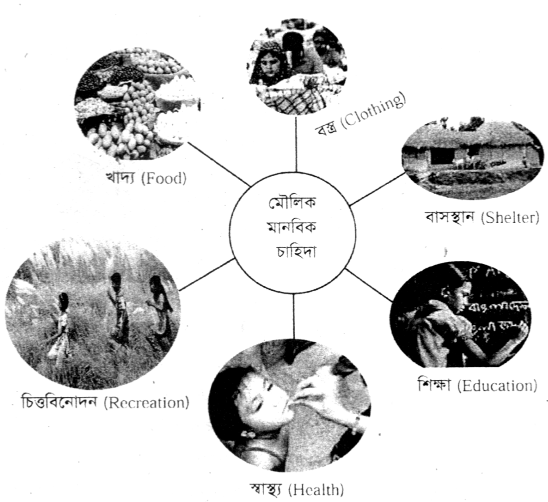
মানুষের বেঁচে থাকা, জীবনের বিকাশ এবং সভ্য-সামাজিক জীবনযাপনের জন্য যে সকল উপকরণ একান্তই অপরিহার্য, যার কোনো বিকল্প নেই, তাদের সমষ্টিকে মৌলিক মানবিক চাহিদা বলে।

ডেভিড জেরি এবং জুলিয়া জেরি (২০১৫) প্রণীত "*কলিন্স সমাজবিজ্ঞান অভিধান*" -এর সংজ্ঞানুযায়ী, "মৌলিক মানবিক চাহিদা এমন একটি ধারণা, যাতে সকল মানুষ তাদের মানবিক গুণাবলির কারণে মৌলিক চাহিদা হিসেবে এগুলো পূরণে অংশগ্রহণ করে। সমাজজীবনে পরিপূর্ণভাবে অংশগ্রহণের অত্যাবশ্যক পূর্বশর্ত হিসেবে মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ বিবেচিত (Basic human needs is the conception that all human being share fundamental needs by virtue of their humanity. The fulfillment of these basic needs is seen as an essential precondition for full participation in social life.)।"

চাহিদার ধারণায় রবার্ট এল বার্কার (১৯৯৫) "*সমাজকর্ম অভিধান*" -এ বলেন, "চাহিদা হলো সেসব দৈহিক, মানসিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক প্রয়োজন, যেগুলো মানুষের বেঁচে থাকা, কল্যাণ এবং বিকাশ ও পরিতৃপ্তির জন্য অপরিহার্য (Needs, physical, psychological, economical, cultural and social requirements for survival, well-being and fulfillment.) ।"

মৌলিক মানবিক চাহিদার ধারণায় আবদুল হালিম মিয়া (২০০৬) বলেন, "মানুষ হিসেবে সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপনের জন্য যে সকল গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা পূরণ করা অপরিহার্য সেসব চাহিদাকেই মৌলিক চাহিদা বলে (Basic human needs may be defined as those important needs which are inevitable for healthy and normal social life as human being.)।"

পরিশেষে বলা যায়, মানুষের জীবনধারণ, শারীরিক প্রবৃদ্ধি, মানসিক বিকাশ ও পরিতৃপ্তি এবং সভ্য ও সামাজিক জীবনযাপন ও তার উৎকর্ষ সাধনের জন্য যে চাহিদাগুলো পূরণ অত্যাবশ্যক, সেগুলোর সমষ্টিকে মৌলিক মানবিক চাহিদা বলা হয়। মার্কিন সমাজকর্ম গবেষক Charlotte Towle (১৯৬৫) তাঁর "*Common Human Needs*" গ্রন্থে ছয়টি চাহিদাকে মৌলিক মানবিক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। চাহিদাগুলো হচ্ছে-



চিত্র ১.১: মৌলিক মানবিক চাহিদার প্রকারভেদ

১। **খাদ্য (Food)**: মৌলিক মানবিক চাহিদার মধ্যে প্রথম এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ হলো খাদ্য। যে জৈব উপাদান গ্রহণের মধ্যেমে জীবদেহের গঠন, ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধি সাধন, অভ্যন্তরীণ ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ, তাপ ও শক্তি উৎপাদন,

পেশি পরিচালনা, রোগ প্রতিরোধ করে দেহকে সুস্থ ও সবল রাখে তাকে খাদ্য বলে। মৌলিক চাহিদা হিসেবে খাদ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো, মানুষ স্বাভাবিক উপায়ে খাদ্যের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হলে অস্বাভাবিক উপায়ে তা পূরণের চেষ্টা করে। খাদ্যের উপাদান ছয়টি। যথা: আমিষ, শর্করা, স্নেহ, ভিটামিন, লবণ ও পানি।

২। **বস্ত্র (Clothing):** বস্ত্র মানবজীবনের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক চাহিদা। মানবসভ্যতার ধারক ও বাহক হিসেবে বস্ত্রের প্রয়োজন শুধু অপরিহার্য নয় বরং মানুষের ব্যক্তিত্ব এবং চরিত্র বিকাশেও বস্ত্রের গুরুত্ব সমধিক। মানবসভ্যতার প্রধান নির্দেশক ও নিদর্শন হলো বস্ত্র। দৈহিক, নৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় সকল দিক থেকেই বস্ত্রের আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। মূলত বস্ত্র পরিধানের ব্যবস্থা তথা মানব সংস্কৃতির বিকাশ ও উৎকর্ষই মানুষকে অন্যান্য প্রাণী থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছে।

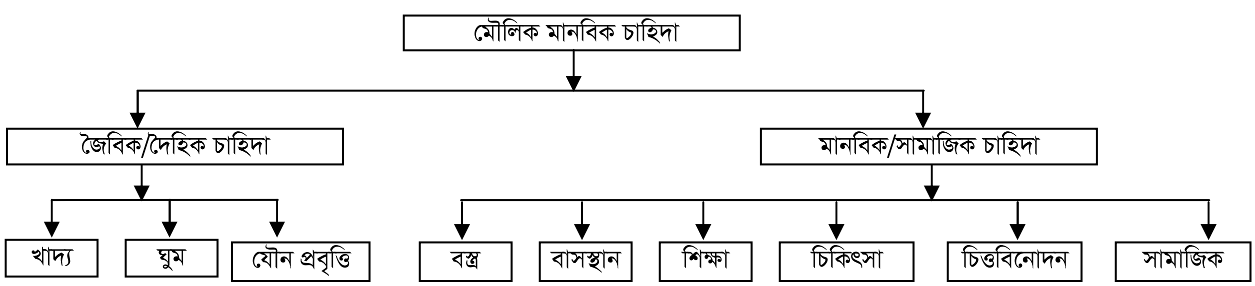
৩। **বাসস্থান (Housing):** মানুষের বসবাসের স্থান বা ঘর-বাড়িকে বাসস্থান বলে। মানুষের আদি ও সহজাত মৌলিক প্রয়োজন হলো বাসস্থান বা নিরাপদ আশ্রয়। সমাজ ও সভ্যতাকে স্থায়ী ও স্থিতিশীল রূপ দেওয়ার ক্ষেত্রে বাসস্থানের অবদান অনেক বেশি। শান্তিতে ঘুমানোর জন্য, ঝড়-বৃষ্টি-শীত-তাপ থেকে রক্ষার লক্ষ্যে, বন্য জীব-জন্তু ও চোর-ডাকাতের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য, সুস্থ পরিবার গঠন ও পরিচালনায় নিরাপদ ও মানসম্মত বাসস্থানের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৪। **শিক্ষা (Education):** শিক্ষা মানুষের অন্যতম মৌলিক মানবিক চাহিদা। শিক্ষাকে বলা হয় জাতির মেরুদন্ড। শিক্ষাই মানব সংস্কৃতির বিকাশ এবং সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English-এর সংজ্ঞানুসারে, "জ্ঞানের প্রসার এবং দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে, বিশেষ করে স্কুল-কলেজের মাধ্যমে পাঠদান, প্রশিক্ষণ এবং কোনো বিষয় জানার প্রক্রিয়া হলো শিক্ষা।" বিখ্যাত সাহিত্যিক John Milton-এর ভাষায়,"Education is the harmonious development of body, mindy and soul" অর্থাৎ দেহ ও মনের যথাযথ বিকাশ শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার মাধ্যমে মানবীয় জ্ঞান ও দক্ষতা এক প্রজন্ম থেকে পরবর্তী প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয় এভাবে সমাজ টিকে থাকে। শিক্ষা সভ্যতার প্রধান উপকরণ, মানুষের ব্যক্তিগত ও সামাজিক উন্নতির হাতিয়ার। মনুষ্যত্ব ও মানুষের বহুমুখী প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে মানুষকে মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য শিক্ষা একান্ত অপরিহার্য।

৫। **স্বাস্থ্য (Health):** স্বাস্থ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক মানবিক চাহিদা। স্বাস্থ্য মানুষের অমূল্য সম্পদ। WHO (১৯৪৮) এর মতে, "স্বাস্থ্য বলতে শুধু রোগ বা দুর্বলতার অনুপস্থিতি বোঝায় না বরং দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক সার্বিক সুস্থ্য অবস্থাকে বোঝানো হয়ে থাকে। কর্মক্ষমতা, উৎসাহ-উদ্দীপনা, প্রতিভা ও সৃজনশীলতা প্রভৃতি বিকাশে স্বাস্থ্য অপরিহার্য।" বারডেমের প্রতিষ্ঠাতা ডা. মোহাম্মদ ইব্রাহিম বলেছেন, অর্থাৎ æHealth is physical, mental and spiritual well being of a person." ব্যক্তির দৈহিক, মানসিক, আত্মিক মঙ্গলজনক অবস্থাই হচ্ছে স্বাস্থ্য।

৬। **চিত্তবিনোদন (Recreation):** নির্মল আনন্দ ও আমোদ-প্রমোদ লাভের কার্যক্রম হলো বিনোদন। হ্যারল্ড বি. মেয়ার এবং চার্লস কে. ব্রাইট বিল এর মতে, "চিত্তবিনোদন বলতে এমন এক কার্যক্রম বোঝায় যা আনন্দ লাভ ও তৃপ্তিদায়ক অভিজ্ঞতা অর্জন এবং সৃজনশীল অনুভূতি প্রকাশের সুযোগ করে দেয়।" সুস্থতা, সজীবতা ও কর্মক্ষমতা জাগ্রতকরণ, ক্লান্তি ও হতাশা দূরীকরণ, সামাজিকীকরণ, শিক্ষা ও সৃজনশীলতা এবং গঠনমূলক চিন্তার জন্য বিনোদন অপরিহার্য। অবসর সময়কে অর্থবহ করে তোলার অন্যতম মাধ্যম চিত্তবিনোদন।

নিচে একটি চিত্রের সাহায্যে মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলো দেখানো হলো :



চিত্র ১.২ : মৌলিক মানবিক চাহিদা

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ (ক, গ ও ঘ) ধারা অনুযায়ী অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন এবং সামাজিক নিরাপত্তাকে মৌলিক মানবিক চাহিদা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

মানুষের বেঁচে থাকা, দৈহিক ও মানবিক বিকাশ সাধন এবং সুস্থ ও সভ্য নাগরিক জীবন যাপনের জন্যে যা একান্তভাবে প্রয়োজন এবং যার কোন বিকল্প নেই তা'ই হলো মৌলিক মানবিক চাহিদা। জন্মের পর থেকে জীবন ধারণের জন্য এবং পরবর্তীতে সামাজিক সদস্য হিসেবে চলার জন্য মানুষের জৈবিক ও সামাজিক চাহিদার পরিপূরণ আবশ্যক। সংবিধানের মাধ্যমে নাগরিকদের মৌলিক চাহিদার স্বীকৃতি যেমন দেয়া হয়েছে তেমনি ঐ চাহিদা পূরণের সাধারণ প্রতিশ্রুতিও এখানে উল্লেখ করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। মৌলিক মানবিক চাহিদা নয় কোনটি?

ক) খাদ্য
খ) বস্ত্র
গ) ঘুম
ঘ) বিনোদন

২। মৌলিক মানবিক চাহিদার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে–

i) পরিবর্তনশীলতা
ii) অভাব থেকে উদ্ভূত
iii) অপরিহার্যতা

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১.২ মৌলিক মানবিক চাহিদার বৈশিষ্ট্য ও ধরন (Charateristics and Types of Basic Human Needs)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

১.২.১ মৌলিক মানবিক চাহিদার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানতে পারবেন।

১.২.২ মৌলিক মানবিক চাহিদার ধরন সম্পর্কে লিখতে পারবেন ।

১.২.১ মৌলিক মানবিক চাহিদার বৈশিষ্ট্য

মৌলিক মানবিক চাহিদার ধারণা ও সংজ্ঞা পর্যালোচনা করলে এর মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। মৌলিক মানবিক চাহিদার বৈশিষ্ট্যগুলো নিচে আলোচনা করা হলো–

প্রথমত: স্বভাবজাত প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি হতে মৌলিক মানবিক চাহিদার উদ্ভব। মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা, আত্মপ্রতিষ্ঠা, দৈহিক বিকাশ ও সামাজিকতা বজায় রাখার জন্য মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের কোনো বিকল্প নেই। এমনকি স্বাভাবিক পন্থায় এসব চাহিদা পূরণে অসমর্থ হলে অবৈধভাবে মানুষ এসব প্রয়োজনগুলো পূরণ করতে বাধ্য হয়। যেমন–মানুষ ভিক্ষাবৃত্তি, পতিতাবৃত্তি, চৌর্যবৃত্তি প্রভৃতি উপায় অবলম্বন করে অথবা অখাদ্য গ্রহণে ক্ষুধা নিবৃত্তি করে এবং গাছের চাল-বাকল, লতা-পাতা এমনকি পশুর চামড়া দ্বারা বস্ত্রের অভাব দূর করে থাকে।

দ্বিতীয়ত: মৌলিক চাহিদা পূরণের প্রকৃতি কিছুটা ভিন্ন ধরনের হলেও সকল স্থানে, সকল সময়ে, সকল মানুষের জন্য মৌলিক চাহিদা পূরণ সর্বজনীন ও চিরন্তন। অর্থাৎ এসব চাহিদা পূরণ অভিন্ন এবং জাতি, বর্ণ, শ্রেণি নির্বিশেষে সবার জন্য প্রযোজ্য। কেবল অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নত, শিক্ষিত, অশিক্ষিত ও অজ্ঞ সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পার্থক্য থাকার কারণে চাহিদা মেটানোর প্রক্রিয়াতে কিছুটা তারতম্য ঘটে থাকে।

তৃতীয়ত: যুগপৎভাবে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ বাঞ্ছনীয়। যেমন– খাদ্য, বস্ত্র এবং বাসস্থানের প্রয়োজন পূরণের সাথে সাথে অন্যান্য সামাজিক প্রয়োজনগুলো পূরণ জরুরি। কারণ কোনো মানুষই স্বয়ংস্পূর্ণ জীবনযাপন করতে পারে না, যতক্ষণ না তার মৌলিক ও মানবিক প্রয়োজন গুলো একত্রে পূরণ করা হয়।

চতুর্থত: মানবীয় চাহিদা অনন্য। কেননা মানবীয় চাহিদাগুলো মানুষ ছাড়া অন্য কোনো প্রাণীর ক্ষেত্রে তেমন দেখা যায় না। প্রকৃতপক্ষে মানবীয় চাহিদাগুলো মানুষকে প্রাণীজগতে এক আলাদা অস্তিত্ব দান করেছে।

পঞ্চমত: সমাজ ও সভ্যতা বিকাশে মৌলিক মানবিক চাহিদা অপরিহার্য। কেননা শিক্ষা, বস্ত্র, আবাসন ইত্যাদি ব্যতীত সভ্যতা কল্পনা করা যায় না।

ষষ্ঠত: মৌলিক মানবিক চাহিদার পরিপূরণের সুযোগ সমাজে শান্তি, স্থিতিশীলতা ও শৃঙ্খলা আনয়ন করে। অন্যদিকে, এর অপূরণজনিত কারণে সমাজে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়।

সপ্তমত: আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্র দেশের সকল মানুষের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কেননা প্রতিটি দেশে সাংবিধানিকভাবেই মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলো পর্যালোচনা করলে বলা যায়, মানবজীবনে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের গুরুত্ব অপরিসীম।

১.২.২ মৌলিক মানবিক চাহিদার ধরন

মার্কিন সমাজবিজ্ঞানী Charlotte Towle (১৯৬৫) তাঁর *œCommon Human Needs"* গ্রন্থে মানুষের ছয়টি অপরিহার্য মৌলিক মানবিক চাহিদার উল্লেখ করছেন– ১। খাদ্য (food); ২। বস্ত্র (cloth); ৩। আশ্রয় বা আবাসন (shelter); ৪। শিক্ষা (education); ৫। স্বাস্থ্য (health); ও ৬। চিত্তবিনোদন (recreation)।

বর্তমানে সমাজ বিজ্ঞানিগণ 'নিরাপত্তা' (security) কেও অপরিহার্য প্রয়োজনের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এখন বিশ্বব্যাপী খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিত্তবিনোদন, ও নিরাপত্তা - এ সাতটিকে মৌলিক মানবিক চাহিদা হিসেবে প্রাধান্য দেয়া হয়। এছাড়া কিছু গৌণ চাহিদা রয়েছে যেগুলো সমাজভেদে অনেক মানুষের পক্ষে পূরণ করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। যেমন– ধর্ম, স্বাধীনতা প্রভৃতি। যদিও সমাজভেদে যৌনচাহিদা, স্নেহ ও প্রেম-ভালোবাসা ইত্যাদি চাহিদা পূরণের ধরনে তারতম্য দেখা দিতে পারে, এগুলো সকল মানুষের চিরন্তন মনোদৈহিক চাহিদা। তবে সময় পরিবর্তনের সাথে সাথে

মৌলিক মানবিক প্রয়োজনসমূহের পরিসর ভবিষ্যতে আরো বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ১৫ (ক, খ ও ঘ) ধারা অনুযায়ী- অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসা, চিত্তবিনোদন এবং সামাজিক নিরাপত্তাকে মৌলিক মানবিক চাহিদা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। নিচে মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলো বর্ণনা করা হলো–

১। **খাদ্য:** মৌলিক মানবিক চাহিদার মধ্যে প্রথম এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা হলো খাদ্য। মৌলিক মানবিক চাহিদা হিসেবে খাদ্য বলতে মানবোপযোগী অর্থাৎ মানুষের খাওয়ার উপযোগী খাদ্যদ্রব্যকে বুঝানো হয়। মানবদেহের গঠন, ক্ষয়পূরণ এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য খাদ্য অপরিহার্য। মৌলিক চাহিদা হিসেবে খাদ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো প্রাক-জন্মাবস্থা হতে মৃত্যু পর্যন্ত খাদ্যের প্রয়োজন হয়। মানুষ স্বাভাবিক উপায়ে (সামাজিক রীতি ও বিধি-নিষেধ অনুযায়ী) খাদ্যের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হলে অস্বাভাবিক উপায়ে (সামাজিকভাবে অগ্রহণযোগ্য বা সামাজিক রীতি-নীতি পরিপন্থি উপায়ে) তা পূরণের চেষ্টা করে। মানুষের অস্তিত্ব রক্ষা এবং মানবিক ও দৈহিক বিকাশের জন্য খাদ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। খাদ্য বলতে সুষম খাদ্যকে বোঝানো হয়। অন্যদিকে মানবোপযোগী খাদ্য বলতে মানুষের ধর্ম, বর্ণ, সমাজ, সংস্কৃতি, সামাজিক রীতিনীতি অনুমোদিত সুষম খাদ্যকে (balance diet) বুঝানো হয়ে থাকে। কারণ এক সমাজের, ধর্মের বা বর্ণের লোকদের জন্য যা মানবোপযোগী খাদ্য হিসেবে স্বীকৃত, অন্যকোনো সমাজে, ধর্মে বা বর্ণে তা নিষিদ্ধ খাদ্য হিসেবে গণ্য হতে পারে।



চিত্র ১.২.১: মৌলিক মানবিক চাহিদা : খাদ্য

খাদ্যের উপাদান অনুসারে সমগ্র খাদ্যকে ছয় ভাগে ভাগ করা যায়– আমিষ, শর্করা, স্নেহ, ভিটামিন লবণ ও পানি। মানব দেহের রাসায়নিক গঠনের মধ্যেও এ উপাদানগুলো রয়েছে। নানাবিধ খাদ্য হতে দেহ এসব উপাদান পেয়ে থাকে। যে খাদ্যে শরীরের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধি, বিকাশ ও পুষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় সব উপাদান উপযুক্ত পরিমাণে থাকে এবং প্রয়োজনীয় পরিমাণ ক্যালরি দেয় তাকে সুষম খাদ্য বলা হয়। সুষম খাদ্যের অভাবে পুষ্টিহীনতা ও স্বাস্থ্যহীনতা দেখা দেয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে খাদ্যকে আবার তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়– (ক) শরীর বৃদ্ধিকারক ও ক্ষয়পূরক খাবার যেমন– দুধ, ডিম ইত্যাদি; (খ) শক্তিদায়ক খাবার যেমন– ভাত, রুটি, আলু ইত্যাদি এবং (গ) রোগ প্রতিরোধক খাবার যেমন– শাক-সবজি, ফলমূল ইত্যাদি । এছাড়া খাদ্যের উপাদান এবং খাদ্যের কার্যকারিতার উপর ভিত্তি করে খাদ্যসমূহকে চারটি মৌলিক শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন– ১। স্নেহজাতীয় খাবার, ২। প্রোটিন বা আমিষজাতীয় খাবার, ৩। শস্যজাতীয় খাবার, ৪। শাক-সবজি ও ফলজাতীয় খাবার।

২। **বস্ত্র:** মানব সভ্যতার ধারক ও বাহক হিসেবে বস্ত্র হলো দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক মানবিক চাহিদা। তাছাড়া প্রাকৃতিক প্রতিকূল অবস্থা হতে নিজেদের রক্ষা করার জন্য মানবজীবনে বস্ত্রের প্রয়োজন। এজন্য খাদ্যের সঙ্গে সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের সামাজিকতা রক্ষার জন্য বস্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাচীন মানুষের লজ্জা নিবারণে ব্যবহৃত পাতার আবরণের আধুনিক রূপান্তর হলো বস্ত্র। অনেক ক্ষেত্রে মানুষ অনাহারে থাকতে পারে, কিন্তু বস্ত্রহীন অবস্থায় সমাজে একমুহূর্ত বসবাস করতে পারে না। বস্ত্রের ব্যবহারই মানুষকে অন্যান্য প্রাণী হতে সভ্যতার মর্যাদা দান করেছে। মানুষের সামাজিক সম্পর্ক বজায় রেখে স্বাভাবিক ও সভ্য জীবনযাত্রা অব্যাহত রাখতে বস্ত্রের গুরুত্ব অপরিসীম। বস্ত্রের চাহিদা অপূরিত থাকলে মানুষ সামাজিকতা রক্ষা করতে পারে না। অন্যদিকে, বস্ত্র ব্যতীত মানুষ প্রাকৃতিক প্রতিকূল অবস্থা যেমন– বর্ষা ইত্যাদি হতে নিজেকে রক্ষা করতে পারে না। ফলে বস্ত্রের অভাবে যেমন মানুষের সামাজিকতা রক্ষা তথা স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়, তেমনি জনস্বাস্থ্যের প্রতিও হুমকির সৃষ্টি হয়। প্রাণিজগতে একমাত্র মানুষের বেলায়ই বস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। দৈহিক ও সামাজিক প্রয়োজন ছাড়াও বস্ত্রের ধর্মীয় ও নৈতিক প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তাই বস্ত্র কেবল



চিত্র ১.২.২: মৌলিক মানবিক চাহিদা : বস্ত্র

শারিরীক কষ্টই লাঘব করে না বরং ধর্মীয় ও সামাজিক নৈতিকতাও বজায় রাখে। শুধু জীবিত অবস্থাতেই নয়, মৃত্যুর পরও পৃথিবীর প্রায় সব সমাজে মানুষ বস্ত্র দিয়ে মৃতদেহকে আচ্ছাদনের পর তার সৎকার করে থাকে।

৩। **বাসস্থান:** বাসস্থান বলতে মানুষের বসবাসের জন্য ঘর-বাড়িসহ কোনো স্থানকে বুঝানো হয়। মানুষের আদি ও অকৃত্রিম মৌলক প্রয়োজন হলো বাসস্থান। শুধু মানুষের জন্যই নয়, পশু-পাখিরও আশ্রয় প্রয়োজন। তাই মৌলিক চাহিদা হিসেবে বাসস্থানের গুরুত্ব ব্যাপক ও বহুমুখী। প্রথমত, রোদ, বৃষ্টি, ঝড়, শীত-তাপ প্রভৃতি প্রাকৃতিক পীড়ন ও জীব-জানোয়ারের উৎপাত থেকে বাঁচার জন্য বাসস্থানের প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, নিরাপদে বিশ্রাম, নিদ্রা ও পারিবারিক জীবন যাপনের জন্য উপযুক্ত স্থায়ী ও নির্দিষ্ট বাসস্থান আবশ্যক। তৃতীয়ত, মানুষ সামাজিক জীব, নির্দিষ্ট বাসস্থান ব্যতীত সমাজ গড়ে উঠতে পারে না। সেজন্য বাসস্থানকে সমাজের বুনিয়াদ বলা হয়। অনুরূপভাবে নির্দিষ্ট স্থায়ী বাসস্থান মানুষকে স্থিতিশীল করে মানব সভ্যতার ভিত্তি রচনা করেছে।



চিত্র ১.২.৩ : মৌলিক মানবিক চাহিদা : বাসস্থান

চতুর্থত, সামাজিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ এবং দায়িত্ব পালনের জন্য নির্দিষ্ট বাসস্থানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। পঞ্চমত, স্থায়ী বাসস্থান সামাজিক সংহতি ও সামাজিক নিয়ন্ত্রণের ধারক ও বাহক। বাসস্থানহীন ভাসমান মানুষ সামাজিক বন্ধন ও নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকে বলে তারা নানা অপরাধ ও অনাচারের কারণ হয়ে দাঁড়ায় । ষষ্ঠত, স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বাসস্থানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। উপযুক্ত ও নিরাপদ বাসস্থানের অভাবে পুষ্টিকর খাবার খেয়েও মানুষ নানা রোগে আক্রান্ত হতে পারে। সপ্তমত, ভবিষ্যৎ বংশধরদের সামাজিকীকরণ ও চরিত্র গঠনের জন্যও উপযুক্ত বাসস্থানের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। সর্বোপরি, সমাজের মৌল প্রতিষ্ঠান পরিবার, বাসস্থানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। সুতরাং বলা যায়, স্থায়ী আবাস সমাজ গঠনের মূল ভিত্তি।

৪। **শিক্ষা:** সুশিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। তাই খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের পরে শিক্ষাকে সারাবিশ্বে অন্যতম মৌলিক মানবিক চাহিদা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়া হয়। শিক্ষাই মানুষকে মেধা ও যোগ্যতায় শ্রেষ্ঠত্ব দান করে। বস্তুত, স্কুল-কলেজের মাধ্যমে তথা আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কোনো বিষয় সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠভাবে জানা বা জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়াকে শিক্ষা বলে। সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক উন্নতির সাথে জাগতিক সমস্যা সমাধানে যে কলাকৌশল মানুষকে সাহায্য করে তাই শিক্ষা। মনীষী ফ্রেডারিক হাবার্টের মতে, শিক্ষা হচ্ছে মানুষের বহুমুখী প্রতিভা এবং অনুরাগের সুষম প্রকাশ। জাতিসংঘের মানবাধিকার ঘোষণায় শিক্ষাকে মৌলিক চাহিদার মর্যাদা দিয়ে বলা হয়েছে, "শিক্ষা মানুষকে পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করে- যা তাকে আধুনিক ও উৎপাদনক্ষম করে তুলে এবং আত্মনির্ভরশীল হওয়ার মাধ্যমে অন্ন, বস্ত্র, পুষ্টি ও আশ্রয়ের মতো অপরিহার্য মৌলিক চাহিদাগুলো অর্জনে পারঙ্গম হতে এবং সক্রিয় ভূমিকা পালনে সহায়তা করে।" পরিবর্তিত আর্থ-সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধানে মানুষকে সক্ষম করার প্রধান উপায় হলো শিক্ষা। শিক্ষা অন্যান্য মৌলিক চাহিদা হতে ব্যতিক্রম। কেননা অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণের মূল চাবিকাঠি হচ্ছে শিক্ষা। শিক্ষা আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং মানব সভ্যতার বিকাশের প্রধান উপকরণ। মানবসম্পদ উন্নয়নের সর্বোত্তম বিনিয়োগ খাত হলো শিক্ষা। শিক্ষার্জনের মাধ্যমে মানুষ নিজের প্রতিভা ও ক্ষমতা বিকাশের সুযোগ লাভ করে। শিক্ষা মানুষকে নিজের ও সমাজের উন্নয়নে অর্থবহ ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তুলে। শিক্ষার অভাবে অজ্ঞতা, কুসংস্কার প্রভৃতি মানুষকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, যার প্রভাবে মানুষ নিজের অধিকার এবং কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন হতে পারে না। তাই বলা যায়, মানুষের সহজাত মানবীয় প্রতিভা ও অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বিকাশের মাধ্যম হলো শিক্ষা।



চিত্র ১.২.৪ : মৌলিক মানবিক চাহিদা : শিক্ষা



চিত্র ১.২.৫ : মৌলিক মানবিক চাহিদা : স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা

৫। **স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা:** স্বাস্থ্যই সকল সুখের মুল। মানব সমাজ গঠনে শিক্ষার পাশাপাশি সুস্বাস্থ্য গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (১৯৪৮) এর সংজ্ঞানুযায়ী, "স্বাস্থ্য হলো দৈহিক, মানসিক ও সামাজিক দিক হতে পরিপূর্ণ কল্যাণকর অবস্থা। শুধু রোগমুক্ত অবস্থাকে স্বাস্থ্য বলা যায় না।" তাই স্বাস্থ্য রক্ষা মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম। মানুষের ব্যক্তিগত ও সামজিক উন্নয়নের প্রধান সহায়ক হচ্ছে স্বাস্থ্য। স্বাস্থ্যহীনতার প্রভাবে যেমন মানুষের কর্মক্ষমতা লোপ পায়, তেমনি মাথাপিছু আয় ও জাতীয় উৎপাদন হ্রাস পায়। এজন্য স্বাস্থ্যকে ব্যক্তিগত ও জাতীয় সম্পদ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। স্বাস্থ্য রক্ষা অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণের অপরিহার্য পূর্বশর্ত। দেশের আর্থ-সামাজিক তথা সার্বিক উন্নয়নের প্রধান সহায়ক হচ্ছে সুস্থ, সবল ও কর্ম-নৈপুণ্যসম্পন্ন দক্ষ জনশক্তি। স্বাস্থ্যহীনতার দরুন জনগণের গুণগত মান ও কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। স্বাস্থ্যহীনতার ফলে পরনির্ভরশীলতা, ভিক্ষাবৃত্তি, অপরাধ প্রবণতা, শ্রমিকের উৎপাদন ক্ষমতা হাস, আয়ুষ্কাল হ্রাস, দরিদ্রতার প্রসার, শ্রম বিমুখতা ইত্যাদি সমস্যার সৃষ্টি হয়।

৬। **চিত্তবিনোদন:** নির্মল আনন্দ ও আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা হলো চিত্তবিনোদন। চিত্তবিনোদন আধুনিক শিল্পসমাজের অন্যতম হাতিয়ার, যা মানুষের কর্মস্পৃহাকে পুনঃউজ্জীবিত করে। বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫ (গ) উপধারায় যুক্তিসঙ্গত বিশ্রাম, বিনোদন ও অবকাশের অধিকারের কথা বলা হয়েছে। সৃজনশীল জীবনধারা, গঠনমূলক চিন্তা ও মনের খোরাক জোগায় নির্মল আনন্দ ও চিত্তবিনোদন। মনীষী Harold B. Mayer এবং Charles K. Bright Bill (১৯৫৬) চিত্তবিনোদনের সংজ্ঞায় "Community Recreation" গ্রন্থে বলেছেন, "চিত্তবিনোদন মানে শুধু সময়ের শূন্যতা পূরণ নয়, সময় কাটানোও নয়, বরং এর লক্ষ্য হচ্ছে সময়কে অর্থবহ ও জীবন্ত করে তোলা। এজন্য জাতীয় শিক্ষানীতি, ২০১০ এ 'ব্রতচারী' শিক্ষাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। নির্মল চিত্তবিনোদনের মাধ্যমে সুষ্ঠু সামাজিকীকরণ, পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিধান, সুপ্ত প্রতিভা ও নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশ, সুস্থ্য দেহ এবং মনের বিকাশ সম্ভব। সর্বোপরি, সুপ্ত প্রতিভা এবং সৃজনশীল ক্ষমতা বিকাশে মানবজীবনে চিত্তবিনোদনের গুরুত্ব অপরিসীম।

৭। **নিরাপত্তা:** 'নিরপত্তা' প্রত্যয়টির আভিধানিক অর্থ নিরাপদ অবস্থা বা বিপদশূন্যতা। নিরাপদ অবস্থা দু'ধরনের যথা– সামাজিক নিরাপত্তা ও শারীরিক নিরাপত্তা। ব্যক্তির উভয় ধরনের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সমাজ ও রাষ্ট্রের দায়িত্ব। সামাজিক নিরাপত্তা বিশেষভাবে অর্থনৈতিক সুরক্ষা কার্যক্রম। বিপন্ন মানুষের মৌল চাহিদা পূরণের সহায়তাকল্পে সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫ (ঘ) উপধারায় এর উল্লেখ রয়েছে। এটি সর্বজনীন নয়। কেননা শুধু বিপর্যয়মূলক পরিস্থিতিতে প্রবীণ, বিধবা, এতিম, বেকার, প্রতিবন্ধী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা পেশাগত দুর্ঘটনায় নিপতিত অসহায় ও অবলম্বনহীন মানুষকে সামাজিক নিরাপত্তা দেয়া হয়। অপরদিকে শারীরিক নিরাপত্তা সর্বজনীন প্রয়োজন। জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সকল বয়সের সব মানুষের শারীরিক আঘাত তথা ক্ষতি থেকে বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে। আমাদের সংবিধান এবং আইনেও আপামর সকল নাগরিকের নিরাপত্তা বিধানের স্বীকৃতি রয়েছে। শারীরিক আঘাত বা শারীরের জন্য অন্য কোনো প্রকার ক্ষতিকর কারণে মানুষ পঙ্গু, অক্ষম এমনকি মৃত্যুবরণ করতে পারে। তাই সুস্থ, স্বাভাবিক জীবন যাপনের জন্য নিরাপত্তা একটি মৌলিক চাহিদারূপে স্বীকৃত।

সারসংক্ষেপ

সামাজিক জীব হিসেবে জীবন চলার পথে মানুষের চাহিদা অগণিত। কিন্তু কিছু কিছু চাহিদা বিশ্বের সব মানুষের সবসময়ের। এগুলোকে মৌলিক মানবিক চাহিদা হিসেবে গণ্য করা হয়। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিত্তবিনোদন ও সামাজিক নিরাপত্তা মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলোর মধ্যে অগ্রগণ্য। সত্যিকার অর্থে, মানুষ এগুলো পূরণের কাজেই জীবনভর ব্যতিব্যস্ত থাকে। আহার, আশ্রয় আর চিকিৎসা সকল প্রাণীর মৌলিক চাহিদা হলেও এগুলোর সাথে শিক্ষা, বস্ত্র ও সামাজিক নিরাপত্তা মানুষের অগ্রাধিকারভিত্তিক মানবীয় চাহিদা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। সামাজিক নিরাপত্তা মানুষের জন্যে একটি-

ক) জৈবিক চাহিদা
খ) সামাজিক চাহিদা
গ) উভয়ই
ঘ) কোনটাই নয়

২। বাংলাদেশের সংবিধানের কততম অনুচ্ছেদে মৌলিক মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে?

ক) ১০ তম
খ) ১৫ তম
গ) ১৮ তম
ঘ) ২০ তম

পাঠ-১.৩ বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদার বর্তমান পরিস্থিতি (Present Situation of Basic Human Needs in Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

১.৩.১ বাংলাদেশ মৌলিক মানবিক চাহিদার বর্তমান পরিস্থিতির বিবরণ লিখতে পারবেন।

১.৩.১ বাংলাদেশ মৌলিক মানবিক চাহিদার বর্তমান পরিস্থিতি

একটি দেশের মৌলিক মানবিক চাহিদাপূরণ নির্ভর করে সে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও রাষ্ট্রের রাজনৈতিক কাঠামোগত অবস্থানের উপর। বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম জনবহুল দেশ। বাংলাদেশের খানা ব্যয় জরিপ-HIES, ২০১০ অনুযায়ী, এদেশের শতকরা ৩১.৫ ভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করছে। দেশের অর্থনীতি কৃষিনির্ভর হওয়া সত্ত্বেও কৃষি উৎপাদন পর্যাপ্ত নয়। জাতীয় আয়ের মাত্র ১৫.৯৬ শতাংশ আসে কৃষিখাত থেকে। শিল্পখাতও তেমন উন্নত নয়। কৃষি ও শিল্প অর্থনীতির উভয় ক্ষেত্রেই অনগ্রসরতার দরুন এ দেশের সম্পদ ও মাথাপিছু আয় কম। যদিও দেশের মানুষের আয় আগের তুলনায় বেশ বেড়েছে। বর্তমানে মাথাপিছু আয় ১,৭৫২ মার্কিন ডলার। ফলে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ পরিস্থিতিরও উন্নতি হওয়া কথা। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এর থেকে ভিন্ন। সমাজের উপরের স্তরের মানুষের আয় বৃদ্ধি পেলেও মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত এবং খেটে খাওয়া মানুষের আয়ের তেমন পরিবর্তন হয়নি।

অন্যদিকে, অধিকাংশ জনগণের বিভিন্ন ধরনের সামাজিক সমস্যা যেমন– জনসংখ্যাস্ফীতি, দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, অজ্ঞতা, বেকারত্ব, নিম্ন জীবনমান, স্বাস্থ্যহীনতা, কুসংস্কার, অপরাধ প্রবণতা, নির্ভরশীলতা ইত্যাদি সামগ্রিক পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে। প্রতিকূল আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রভাবে এ দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ন্যূনতম মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে সক্ষম হচ্ছে না। নিচে বাংলাদেশের মৌলিক মানবিক চাহিদার বর্তমান পরিস্থিতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

১। খাদ্য (Food): খাদ্য মানুষের অন্যতম মৌলিক চাহিদা। জীবনধারণ, দৈহিক ও মানসিক বিকাশের অপরিহার্য উপাদান হলো খাদ্য। অধিক জনসংখ্যা, অনুন্নত কৃষিব্যবস্থা, আবাদি জমি হ্রাস, ভূমির অনুর্বরতা ও খণ্ড-বিখণ্ডতা, ধারাবাহিক প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খাদ্যদ্রব্যের অসম বণ্টন ইত্যাদি বাংলাদেশের খাদ্য সমস্যার প্রধান কারণ। বাংলাদেশে খাদ্যঘাটতির প্রভাবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী ন্যূনতম খাদ্যমান অর্জনে সক্ষম হচ্ছে না। বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে বাংলাদেশে খাদ্যের ন্যায় মৌলিক চাহিদা পূরণ প্রতিকূল অবস্থা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের লোকসংখ্যা ১৬ কোটি ৩৬ লাখ ৫০ হাজার জন, জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭ শতাংশ। মাথাপিছু আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ মাত্র ০.১৫ একর অথচ একজন মানুষের খাদ্য চাহিদা পূরণের জন্য ন্যূনতম ১.৬৮ একর আবাদযোগ্য জমির প্রয়োজন। বর্তমান জনসংখ্যার সাথে প্রতিবছর যুক্ত হচ্ছে প্রায় ২৫ লাখ নতুন মুখ, যারা আবাদি জমির পরিমাণ কমাচ্ছে, বিপরীতে খাদ্য চাহিদা বাড়াচ্ছে। ফলে খাদ্য গ্রহণের পরিমান পর্যায়ক্রমে কমে যাচ্ছে।

আমাদের দেশে ৩১.৫ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। বাজারে খাদ্যসামগ্রী থাকা সত্ত্বেও এদেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী সুষম ও প্রয়োজনীয় খাদ্য ক্রয়ের সামর্থ্য রাখে না। ফলে অনেকেই খাদ্যাভাবে অনাহার-অর্ধাহারে দিন কাটায়, নয়তো অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে ক্ষুধার তাড়না মেটানোর চেষ্টা করে।

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও পরিবেশগত কারণে প্রায় প্রতিবছরই মৌসুমি অনাবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, বন্যা, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙ্গন প্রভৃতি দুর্যোগ ফসলের ও অন্যান্য সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে। যেখানে উৎপাদন প্রক্রিয়াই অনুন্নত সেখানে এ সকল প্রাকৃতিক বিপর্যয় খাদ্য উৎপাদন সমস্যাকে আরও প্রকট করে তুলে।

পুষ্টিবিজ্ঞানীদের মতে, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি রক্ষার জন্য একজন মানুষের প্রতিদিন ২৫ আউন্স খাদ্যের প্রয়োজন অথচ বাংলাদেশে একজন লোকের গড় খাদ্য গ্রহণের পরিমান মাত্র ১৫ আউন্স। বাংলাদেশ পরিসখ্যান ব্যুরোর চূড়ান্ত হিসাব অনুযায়ী ২০১৩-২০১৪ অর্থবছরে খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন হয়েছিল ৩৮১.৭৪ লাখ মেট্রিক টন, আমদানি করা হয়েছিল ৩১.২৪ লাখ মেট্রিক টন। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত) সার্বিকভাবে দেশে খাদ্যশস্য আমদানির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৮.৪৩ লাখ মেট্রিক টন।

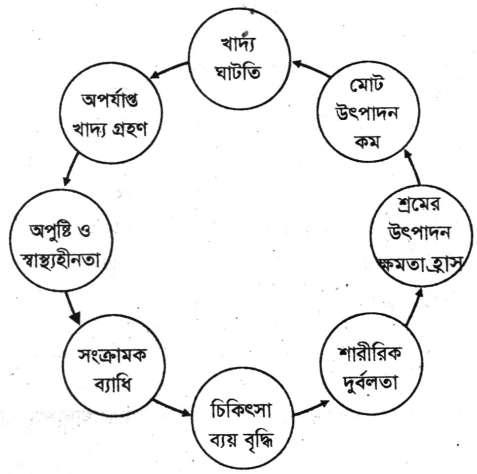
নিচের সারণিতে ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে ২০১৪-১৫ অর্থবছর পর্যন্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনের পরিসখ্যান দেখানো হলো–

সারণি ১.৩.১: খাদ্যশস্য উৎপাদন

খাদ্যশস্য	২০০৮-০৯	২০০৯-১০	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫ (লক্ষমাত্রা)
আউশ	১৮.৯৫	১৭.০৯	২১.৩৩	২৩.৩২	২১.৫৮	২৩.২৬	২৩.২৮ (প্রকৃত)
আমন	১১৬.১৩	১২২.০৭	১২৭.৯১	১২৭.৯৮	১২৮.৯৭	১৩০.২৩	১৩১.৯০ (প্রকৃত)
বোরো	১৭৮.০৯	১৮৩.৪১	১৮৬.১৭	১৮৭.৫৯	১৮৭.৭৮	১৯০.০৭	১৮৯.৭৭
মোট চাল	**৩১৩.১৭**	**৩২২.৫৭**	**৩৩৫.৪১**	**৩৩৮.৮৯**	**৩৩৮.১৪**	**৩৪৩.৫৬**	**৩৪৪.৯৫**
গম	৮.৪৯	৯.৬৯	৯.৭২	৯.৯৫	১২.৫৫	১৩.০২	১৩.৩৩
ভুট্টা	৭.৩০	৮.৮৭	১৫.৫২	১২.৯৮	২১.৭৮	২৫.১৬	২৫.২১
মোট	**৩২৮.৯৬**	**৩৪১.১৩**	**৩৬০.৬৫**	**৩৬১.৮২**	**৩৭২.৬৬**	**৩৮১.৭৪**	**৩৮৩.৪৯**

(উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, কৃষি মন্ত্রণালয়, জানুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত)

বাংলাদেশে খাদ্য সমস্যা শুধু পরিমাণগতই নয়, গৃহীত খাদ্যের গুণগতমানও অত্যন্ত নিম্ন পর্যায়ের। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে তিন হাজার কিলোক্যালরি খাদ্যশক্তিকে ন্যূনতম দৈনিক মাথাপিছু প্রয়োজন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত ২০০৫ সালের পারিবারিক আয়-ব্যয় জরিপের তথ্যানুযায়ী পল্লীর জনগোষ্ঠীর ৩৯.৫ শতাংশ এবং শহরের ৪৩.২ শতাংশ লোক দৈনিক মাথাপিছু ২,১২২ কিলোক্যালরি গ্রহণ করে। অন্যদিকে মাথাপিছু দৈনিক ১,৮০৫ কিলোক্যালরি গ্রহণ করে গ্রামের ১৭.৯ শতাংশ এবং শহরে ২৪.৪ শতাংশ লোক। দেশের জাতীয় উৎপাদনে খাদ্যঘাটতির চক্রাকার প্রভাব নিচের চিত্রের মাধ্যমে দেখানো হলো–



চিত্র ১.৩.১: খাদ্যঘাটতির প্রভাব

খাদ্যের মতো মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থতা থেকে পুষ্টিহীনতা, স্বাস্থ্যহীনতা, উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস, শিল্পায়নের মন্থরগতি ইত্যাদি সমস্যার সৃষ্টি হয়। খাদ্যঘাটতি পূরণ করতে গিয়ে সামগ্রিক উন্নয়ন পরিকল্পনা ব্যাহত হয়। ফলে অন্যান্য মৌলিক চাহিদা পূরণ সম্ভব হয় না।

২। বস্ত্র (Clothing): মৌলিক মানবিক চাহিদার মধ্যে খাদ্যের পরই বস্ত্রের স্থান। বস্ত্র সভ্যতার সর্বপ্রধান নির্দেশক ও নিদর্শন। বাংলাদেশে বস্ত্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক মানবিক চাহিদা আর্থিক কারণে সব শ্রেণির জনগণের পক্ষে যথাযথভাবে পূরণ সম্ভব হচ্ছে না। ত্রুটিপূর্ণ বস্ত্রনীতি, বস্ত্রশিল্পের জাতীয়করণের ফলে সৃষ্ট অনিয়ম, দুর্নীতি, অদক্ষ ব্যবস্থাপনা, প্রতিকূল পরিবেশ, দুর্ঘটনা, উৎপাদন হ্রাস ইত্যাদি বাংলাদেশের বস্ত্র সমস্যাকে তীব্র করে তুলেছে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব মতে মাথাপিছু বস্ত্রের চাহিদা হলো বছরে ১০ মিটার। এ হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে বার্ষিক বস্ত্রের চাহিদার পরিমাণ প্রায় ১৫১ কোটি মিটার। তৈরি পোশাক শিল্পের জন্য প্রয়োজন প্রায় ২৫০ কোটি মিটার। অর্থাৎ মোট চাহিদা হচ্ছে ৪০১ কোটি মিটার। অথচ বস্ত্রখাতে মোট উৎপাদন প্রায় ৩০০ কোটি মিটার। ফলে বর্তমানে দেশে বস্ত্রঘাটতির পরিমাণ হলো প্রায় ১০১ কোটি মিটার। অন্য এক হিসাবে জানা যায়, বর্তমানে বাংলাদেশে মাথাপিছু পুরাতন কাপড়ের ব্যবহার ০.১ মিটার এব নতুন কাপড় ১২.৩ মিটার।

উপর্যুক্ত তথ্য থেকে বাংলাদেশে বস্ত্রের সরবরাহ চাহিদার তুলনায় নিতান্তই কম হওয়ার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যদি ব্যষ্টিক পর্যায়ে বস্ত্রের বাস্তব অবস্থা ব্যাখ্যা করা যায়, তাহলে আরও হতাশাজনক চিত্র পাওয়া যাবে। বস্ত্রের চাহিদা পূরণে প্রতিবছর প্রচুর পরিমাণ পুরাতন কাপড় বিদেশ থেকে আমদানি করা হচ্ছে। বস্ত্রের অভাবে একদিকে অসংখ্য দরিদ্র ও দুস্থ মানুষ শীত ও গ্রীষ্মকালে প্রতিকূল পরিবেশে মানবেতর জীবনযাপন করছে, অন্যদিকে বস্ত্রের চাহিদা পূরণের জন্য বিদেশি পুরাতন কাপড় আমদানি জনস্বাস্থ্যের প্রতি হুমকি সৃষ্টি করতে পারে।

৩. বাসস্থান (Housing): সমাজ ও সভ্যতাকে স্থিতিশীল রূপদানের ক্ষেত্রে বাসস্থানের অবদান সবচেয়ে বেশি। অথচ বর্তমানে বাংলাদেশে শহর ও গ্রাম উভয় এলাকায়ই বাসস্থান সমস্যা প্রকট। জাতিসংঘের তথ্যানুসারে এদেশের প্রায় ১০ লাখ লোক গৃহহীন। এরা অন্যের বাড়িতে, অফিস, দোকানপাটের বারান্দায়, পার্কে রাত কাটায়। পরিকল্পনা কমিশনের হিসাব মতে, গ্রামীণ জনগণের ৭% অন্যের বাড়িতে, ২২.৬% জরাজীর্ণ বাসগৃহে এবং শহরের ৮% লোক বস্তিতে

মানবতের জীবনযাপন করছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে বসতভিটাহীন পরিবারের সংখ্যা ১৪ লাখ ৯১ হাজার ৮৫৫টি। নিম্নে জনসংখ্যা ও গৃহগণনা রিপোর্ট−২০১১ অনুযায়ী এদেশে গৃহনির্মাণ কাঠামোর ধরন তুলে ধরা হলো−

সারণি ১.৩.২: গৃহনির্মাণ কাঠামোর ধরন

এলাকা	ঝুপড়ি	কাঁচা	আধাপাকা	পাকা
শহর	২.৬%	৩২.৮%	৩২.১%	৩২.৫%
গ্রাম	৩.০%	৭৫.৭%	১৬.০%	৫.৩%

(উৎস: ভূমিমন্ত্রীর জাতীয় সংসদে প্রদত্ত প্রশ্নোত্তর, ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০১০)

উপর্যুক্ত বাস্তব তথ্যসমূহ থেকে বাংলাদেশে বাসস্থানের মতো মৌলিক মানবিক চাহিদার করুণ চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তবে প্রতি বছর ১.৩৭%। বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য প্রায় ৪ লাখ ৩৫ হাজার নতুন বাসগৃহের প্রয়োজন। কিন্তু বাস্তবে তা সম্ভব হচ্ছে না বলে আবাসন সমস্যা দিন দিন আরও প্রকট হচ্ছে। যদিও আবাসনের চাহিদা মোকাবিলার জন্য নতুন বাসগৃহ তৈরি হয় এর বৃদ্ধির হার খুবই কম, যা নিচের সারণি থেকে সহজেই বোঝা যায়।

সারণি ১.৩.৩ : ১৯৭৩-২০১১ সাল পর্যন্ত খানা (Household) বৃদ্ধির হার

এলাকা	১৯৭৩-৮১	১৯৮১-৯১	১৯৯১-২০০১	২০০১-২০১১
শহর	৮.৯	৫.৭	৫.৪	৫.৫
গ্রাম	১.৩	২.০	২.৫	২.৬

উপর্যুক্ত বাস্তব তথ্যসমূহ থেকে বাংলাদেশে বাসস্থানের মতো মৌলিক মানবিক চাহিদার করুণ চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রতিবছর ঝড়-বন্যা-জলোচ্ছ্বাস, নদীভাঙন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে বাংলাদেশে বাসস্থান সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করছে।

৪. শিক্ষা (Education): অন্যান্য মৌলিক মানবিক চাহিদার মতো শিক্ষাক্ষেত্রেও আমাদের দেশের অবস্থা সন্তোষজনক নয়। শিক্ষিতের হার বাড়ছে, তবে তা খুবই ধীরগতিতে। অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৫ অনুযায়ী বর্তমান সাক্ষরতার হার মাত্র শতকরা ৬২.৩ ভাগ। যার মধ্যে পুরুষ শতকরা ৬৫.০ ভাগ এবং মহিলা ৫৯.৭ ভাগ। বর্তমানে স্কুলে শিশুদের নিবন্ধের হার বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু তাদের শতকরা ৭৫ জন প্রাথমিক শিক্ষা শেষ না করে স্কুল ছেড়ে দেয়। স্কুলত্যাগী শিশুর হার শতকরা ৩৪ ভাগ। বাংলাদেশে বর্তমানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। নিম্নে ১.৩.৪ নং সারনিতে শিক্ষা সক্রান্ত মৌলিক তথ্য উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ১.৩.৪: বাংলাদেশে শিক্ষাক্ষেত্রের বর্তমান মৌলিক তথ্য

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ধরন	বছর	সংখ্যা	শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা	ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা
প্রাথমিক বিদ্যালয়	২০১৪	১০৮৫৩৭	৩১৯২৯৪	১৯৫৫২৯৭৯
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২০১৪	১৭২৭	২১৪৩৭৫	৮৭৯২৮৫৫
সরকারি কলেজ	২০১৪	২৬০	১২৫১১	১৩১৬৮৬৬
বেসরকারি কলেজ	২০১৪	১৪৭১	৫৫৮৮৫	১৫৯৮৫৬৯
সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় (সরকারি)	২০১৪	১৫	৫২৮৬	৩৪৫৬২৪
সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় (বেসরকারি)	২০১৪	৭৬	৮৪৮৫	২৯৮২০২

(উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৫)

বর্তমানে শিক্ষাখাতকে ব্যাপক অগ্রাধিকার প্রদান করে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্রছাত্রী ভর্তির সংখ্যা ও হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিচে ২০১০ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত সময়ে প্রাথমিক স্তরে ছাত্রছাত্রী ভর্তির হার সারণিতে দেখানো হলো−

সারণি ১.৩.৫: প্রাথমিক স্তরে ছাত্রছাত্রী ভর্তির হার

সাল	মোট (লাখ)	ছাত্র (%)	ছাত্রী (%)
২০১০	১৬৯.৫৮	৪৯.৫০	৫০.৫০
২০১১	১৮৪.৩২	৪৯.৬০	৫০.৪০
২০১২	১৯০.০৩	৪৯.৮০	৫০.২০
২০১৩	১৯৫.৮৫	৪৯.৯৪	৫০.০৬
২০১৪	১৯৫.৫৩	৪৯.৩০	৫০.৭০

(উৎস: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়)

১৯৯৪ সালে সরকার প্রবর্তিত মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য উপবৃত্তি কর্মসূচি এদেশে নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটিয়েছে। অর্থনৈতিক সমীক্ষা–২০০৮ অনুযায়ি প্রতি ১০০ ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ছাত্রী সংখ্যা ৫২ । নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে এই ইতিবাচক পরিবর্তন বাল্যবিবাহ রোধ, প্রজনন হার হ্রাস, নারীর ক্ষমতায়ন এবং আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিচ্ছে। বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা অনেকটাই নগরকেন্দ্রিক এবং সমাজের উচ্চবিত্তের লোকদের সন্তানরাই এর অধিক সুবিধাভোগী। পল্লি এলাকায় শিক্ষার সুযোগ এবং হার অপেক্ষাকৃত কম। গ্রামীণ এলাকায় শিক্ষিতের হার শহরের তুলনায় কম। শহরের শিক্ষিতের হার ৬৫.৮৩ শতাংশ, গ্রামে ৫১.৮১ শতাংশ। বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, ২০১৫ সালের মধ্যে সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করার অঙ্গীকার, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে বিনা মূল্যে বই সরবরাহ, কারিগরি শিক্ষার প্রসার, শিক্ষাক্ষেত্রে আইসিটি কার্যক্রম চালু, মেয়েদের মাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদান, বেতন মওকুফ সুবিধা প্রদান, নতুন কারিক্যুলাম প্রণয়ন, পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তনসহ নানাবিধ উন্নয়ন ও সংস্কারধর্মী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। যার প্রভাবে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৫. স্বাস্থ্য (Health): বাংলাদেশে স্বাস্থ্য চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ হয় না। স্বাস্থ্যহীনতা এদেশের একটি অতি পরিচিত চিত্র। প্রতিবছর এ দেশের বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠী বিভিন্ন রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে প্রায় বিনা চিকিৎসায় প্রাণ হারায়। অনেকে স্বাস্থ্যহীনতা ও অপুষ্টিতে আক্রান্ত হয়ে কোনো রকমে জীবনের ঘানি টেনে চলে। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশের শতকরা ৬০ ভাগ লোক প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার ন্যূনতম সুযোগ থেকে বঞ্চিত। অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৫-এর তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে চিকিৎসাক্ষেত্রে ২,১২৯ জনের জন্য মাত্র ১ জন ডাক্তার এবং ১,৬৫২ জন রোগীর জন্য সরকারি হাসপাতালে মাত্র ১টি শয্যার ব্যবস্থা রয়েছে। স্বাস্থ্যসেবার জন্য সরকারি হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা ও সেবক-সেবিকার সংখ্যাও হতাশাব্যঞ্জক। দেশের প্রায় ১৫ কোটি মানুষের স্বাস্থ্য চাহিদা কোনো মতেই পূরণ হচ্ছে না। তারই একটি সংখ্যাচিত্র নিচে সারণির মাধ্যমে তুলে ধরা হলো:

সারণি ১.৩.৬ : স্বাস্থ্যসেবার সংখ্যাচিত্র

বছর	ডিসপেনসারি	শয্যাসংখ্যা	রেজিস্টার্ড ডাক্তার	রেজিস্টার্ড নার্স	রেজিস্টার্ড ধাত্রী
২০১০-১১	১,৩৬২	৩৯,০৬৩	৫৩,০৬৩	২৫,০১৮	২৩,৪৭২
২০১১-১২	১,৩৬২	৫৮,৯৭৭	৫৮,৯৭৭	২৮,৭৯৩	২৭,০০০
২০১২-১৩	১,৩৬২	৪৫,৬২১	৬৪,৪৩৪	৩০,৫১৬	
২০১৩-১৪	১,১৮৪	৯৪,৩১৮	৭১,৯১৮	৩৩,১৮৩	

(উৎস: স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়, উদ্ধৃত: অর্থনৈতিক সমীক্ষা, ২০১৫)

আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ বলতে গেলে শহরের এবং উপজেলা সদরে সীমাবদ্ধ। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে আধুনিক চিকিৎসা একটা দুরাশামাত্র। দেশের প্রতিটি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ৪ জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকসহ ৯ জন চিকিৎসক দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এ সকল হাসপাতালে সকল প্রকার রোগের প্রধানত প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়। বিশেষায়িত চিকিৎসার সুযোগ অতি সীমিত। বিশেষায়িত চিকিৎসার জন্য জেলা বা বিভাগীয় শহরের আসতে হয়। জনগণকে চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে জুন-২০১৩ পর্যন্ত দেশে ৩,৮৮১টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণকেন্দ্র, ৪২১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ৫৯টি জেলা হাসপাতাল ৭৫টি মেডিকেল কলেজ ও ৮২টি সেবিকা প্রশিক্ষণকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। Maternal Mortality and Health Care Survey, 2011-এর রিপোর্টে দেখা গেছে, বাংলাদেশে মাতৃ মৃত্যুহার ২০০১ সালে ৩.২ শতাংশ থেকে ২০১৪ সালে ১.৯৪ শতাংশে নেমে এসেছে। প্রজনন হার ও মৃত্যুহার হ্রাস, গড় আয়ু বৃদ্ধিসহ নবজাতক শিশু মৃত্যুহার হ্রাসে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বর্তমানে দেশের প্রায় ৭০% শিশু রক্তস্বল্পতায় ভুগছে। ভিটামিন 'এ'র অভাবে বছরে প্রায় ৩০ হাজার শিশু অন্ধ হয়ে যাচ্ছে। তবে ডায়রিয়া, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া ও গলগণ্ড রোগ নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে। বর্তমানে সুপেয় পানি গ্রহণকারী হার ৯৮.৩% এবং স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহারকারীর হার ৬৩.৮% । সবার জন্য স্বাস্থ্যসম্মত টয়লেট ব্যবহার ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে জনগণের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খাদ্যঘাটতি, ভেজাল খাদ্যদ্রব্য, খাদ্য গ্রহণের নিম্নমান ও স্বল্পতা, চিকিৎসা সুবিধা ও স্বাস্থ্যসেবার স্বল্পতা, নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা ইত্যাদি কারণে স্বাস্থ্যহীনতা সমস্যা বিরাজ করছে।

৬. চিত্তবিনোদন (Recreation): বাংলাদেশে অন্যান্য মৌলিক চাহিদার মতো চিত্তবিনোদনের চাহিদাও ঠিকমতো পূরণ হয় না। কারণ নির্মল আনন্দ লাভের ব্যবস্থা বর্তমানে সীমিত হয়ে এসেছে। একসময় গ্রামগুলোতে জারিগান, সারিগান, বাউল

গান, পুঁথিপাঠ, যাত্রানুষ্ঠান, পালাগান, সড়কপথে ভাওয়াইয়া, নদ-নদীতে ভাটিয়ালী এবং মাঠ-ঘাট পল্লিগীতিতে মুখরিত ছিল। কাবাডি, গোল্লাছুট, দাড়িয়াবান্দা, কানামাছি ইত্যাদি খেলাধুলার মাধ্যমে আমোদ-প্রমোদের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল। এখন দারিদ্র্য ও শহরায়ণের প্রভাবে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা প্রায় লোপ পেয়ে গেছে। খাদ্যের চাহিদা পূরণের জন্য মাঠের খালি জায়গা সব আবাদ করে ফেলায় খেলাধুলার জায়গা আর অবশিষ্ট নেই, তেমনি জীবিকার তাড়নায় সদাব্যস্ত মানুষের কাছে চিত্তবিনোদন অনেকটা বিলাসিতার মতো।

শহরে এক শ্রেণির প্রভাবশালী লোভী মানুষ খালি জায়গা দখল করে বড় বড় দালান ও বহুতল শপিং কমপ্লেক্স তৈরি করছে। ফলে শহরে পার্ক, মাঠ, লেক, ঝিল আর থাকছে না। বাংলাদেশের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ চিত্তবিনোদনের সুযোগ অনেকটা সীমিত। গঠনমূলক চিত্তবিনোদনের সুযোগ-সুবিধার অভাবে দেশের যুবসমাজের আচরণের বিচ্যুতি ঘটছে। স্যাটেলাইট প্রযুক্তি ও পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুপ্রবেশের কারণে সুস্থ বিনোদন ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। রেডিও, টেলিভিশন, সিনেমা প্রভৃতি এবং ভি.সি.পি., ভি.সি.আর. ক্যাসেট প্লেয়ার, এফ.এম. রেডিওসহ বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা গৃহের অভ্যন্তরেই চিত্তবিনোদনের সুযোগ প্রদান করছে। এছাড়া বিভিন্ন প্রযুক্তির মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট ব্যবস্থা, সোশ্যাল মিডিয়া যেমন ফেসবুক চিত্তবিনোদনের সুযোগকে অবারিত করেছে। তবে ঐতিহ্যবাহী ঈদ উৎসব, শারদীয় দুর্গোৎসব, গ্রামীণ মেলা এখনো আছে। বাংলা নববর্ষের মেলার সাথে যুক্ত হয়েছে বিজয় মেলা, স্বাধীনতা উৎসব, বাণিজ্যমেলা, বইমেলা ইত্যাদি। বর্তমানে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, সংগীত, শিল্পকলা, নাটক, চলচ্চিত্রসহ শিল্পের সকল শাখার উৎকর্ষ সাধনে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করছে। উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি বইপড়া, খেলাধুলা, ব্যায়াম, ছবি আঁকা, ছবি তোলা, ভ্রমণ, বাগান করা ইত্যাদির মাধ্যমে মানসিক প্রশান্তি লাভ করে। কিন্তু নিম্নবিত্ত ও দরিদ্র শ্রেণি বলতে গেলে চিত্তবিনোদনের সুযোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত। সুতরাং বলা যায়, বাংলাদেশে চিত্তবিনোদনের বর্তমান অবস্থা সন্তোষজনক নয়।

সবশেষে বলা যায়, বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের পরিস্থিতি সন্তোষজনক নয়। মুষ্টিমেয় সম্পদশালী গোষ্ঠী তাদের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে সক্ষম হলেও বিপুল দরিদ্র জনসাধারণ মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়ে মানবেতর জীবন নির্বাহ করছে।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের মানুষের মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ হচ্ছে না দীর্ঘকাল ধরেই। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিত্তবিনোদন, সামাজিক নিরাপত্তাসহ অন্যান্য চাহিদা অধিকাংশ মানুষের অপূরিত থাকছে। ফলে এরা মানবেতর জীবন যাপন করছে। যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির কারণে আজ হয়তো কেউ না খেয়ে বা না পরে থাকে না কিন্তু সার্বিক মানবিক প্রয়োজন মিটছে না। ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, রাজনৈতিক অস্থিরতা, দুর্নীতি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অনুন্নত কৃষি ও শিল্পব্যবস্থা ইত্যাদি এর অন্যতম কারণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। খাদ্যের পর কোনটি মৌলিক মানবিক চাহিদার দাবিদার?

ক) বস্ত্র খ) শিক্ষা

গ) বাসস্থান ঘ) চিত্তবিনোদন

২। শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতাকে কি বলে?

ক) পুষ্টিহীনতা খ) স্বাস্থ্যহীনতা

গ) ম্যারাসমাস ঘ) কোয়াশিয়রকর

পাঠ-১.৪ বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদার অপূরণজনিত সমস্যা (Problems Arising from Unfulfilment of Basic Human Needs in Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

১.৪ বাংলাদেশের মৌলিক মানবিক চাহিদার অপূরণজনিত সমস্যাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১.৪ বাংলাদেশের মৌলিক মানবিক চাহিদার অপূরণজনিত সমস্যা

যে কোনো দেশের সামাজিক সমস্যা উদ্ভবের অন্যতম কারণ হলো মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা। মৌলিক মানবিক চাহিদার যথাযথ পরিপূরণ না হলে যেমন সমস্যার সৃষ্টি হয়, তেমনি স্বাভাবিক উপায়ে মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়ে অস্বাভাবিক বা অবৈধ উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে এগুলো পূরণের প্রচেষ্টা থেকেও বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হয়। এজন্য সমাজবিজ্ঞানীরা মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতাকে সামাজিক সমস্যার প্রধান উৎস হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। মৌলিক মানবিক চাহিদা অপূরণজনিত কারণে বাংলাদেশে সৃষ্ট সমস্যাবলি সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো:

১. পুষ্টিহীনতা (Malnutrition): মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা থেকে সৃষ্ট সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সমস্যা হলো পুষ্টিহীনতা। সাধারণত খাদ্যে পুষ্টি উপাদানের অভাব, পরিমাণগত স্বল্পতা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কারণে সৃষ্ট অবস্থাই হচ্ছে পুষ্টিহীনতা। খাবারের ছয়টি উপাদানের যে কোনো একটি খাদ্যতালিকায় পর্যাপ্ত পরিমাণে না থাকলে বা অনুপস্থিত থাকলে পুষ্টি-প্রক্রিয়া ব্যাহত হয়। ফলে দেহে সে উপাদানের ঘাটতিজনিত রোগের লক্ষণ প্রকাশ পায়। এরূপ অবস্থাকে পুষ্টিহীনতা বলে। পুষ্টিহীনতা বলতে কেবল দুর্বল স্বাস্থ্যকেই বোঝায় না। এটি একটি দৈহিক আপেক্ষিক অবস্থা। পুষ্টিহীনতা বলতে নিম্নলিখিত অবস্থাকে বোঝায়:

ক. কাজ করার সামর্থ্যে ব্যাঘাত ঘটা;
খ. দৈহিক গাঠনিক সম্পূর্ণতার অভাব এবং
গ. দেহে প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সরবরাহের মাঝে গরমিল।

বাংলাদেশে পুষ্টিহীনতার বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ। BBS পরিচালিত জরিপ ও জাতীয় পুষ্টি জরিপ অনুসারে এদেশের শতকরা ৫০ জন শিশু পুষ্টিহীন। প্রতিবছর এ কারণে প্রায় ২ লাখ শিশু মারা যায়। শতকরা ১৫ জন শিশু ভিটামিন এ-এর অভাবে অন্ধত্ব ও রাতকানা রোগে আক্রান্ত হয়। পুষ্টিহীনতার জন্য ৬০ ভাগ মহিলো রক্তস্বল্পতায় ভোগে এবং অন্য বহু লোক রিকেট, স্কার্ভি, গলগন্ড, বিকলাঙ্গতা, চর্মরোগ, কম বুদ্ধি, খাটো হওয়া প্রভৃতিতে ভোগে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত বিভিন্ন শিশু পুষ্টি জরিপের তথ্য থেকে পুষ্টিহীনতার চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নিচের সারনিতে বাংলাদেশে পুষ্টিহীনতার ব্যাপকতা দেখানো হলো:

সারণি ১.৪.১: বছরের কম বয়সী শিশুদের পুষ্টিমান (কম উচ্চতা)

	শহর		গ্রাম		জাতীয়	
পুষ্টিমান	ছেলে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে
চরম (৩য় ডিগ্রি)	১৪.৫	১৪.৪	১৭.৬	১৭.৮	১৬.৭	১৬.৮
মাঝারি (২য় ডিগ্রি)	২২.২	২১.৮	২৪	২৪.২	২৩.৫	২৩.৪
ক্ষীণ (১ম ডিগ্রি)	১.৪	১.৫	১.৬	১.৬	১.৫	১.৫
স্বাভাবিক	৬৩.৩	৬৩.৮	৫৮.৪	৫৮.১	৫৯.৮	৫৯.৮

(উৎস: Nutrition, Health and Demographic Survey in Bangladesh-2011)

সারণি ১.৪.২: ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের পুষ্টিমান (কম ওজন)

	শহর		গ্রাম		জাতীয়	
পুষ্টিমান	ছেলে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে	ছেলে	মেয়ে
চরম অপুষ্টি (৩য় ডিগ্রি)	১৫.৮	১৫	১৫.১	১৮.৪	১৫.৩	১৭.৩
মাঝারি অপুষ্টি (২য় ডিগ্রি)	২৭	২৭.৬	২৯.৯	২৭.৪	২৯.১	২৭.৫
ক্ষীণ অপুষ্টি (১ম ডিগ্রি)	১.৬	১.৭	১.৬	১.৮	১.৬	১.৭
স্বাভাবিক	৫৭.১	৫৭.৪	৫৫	৫৪.২	৫৫.৬	৫৫.২

(উৎসঃ Nutrition, Health and Demographic Survey in Bangladesh-2011)

পুষ্টিহীনতার এই ভয়াবহ অবস্থার মূলে অন্যান্য কারণ থাকলেও অপূরিত মৌলিক মানবিক চাহিদার প্রভাবই সবচেয়ে বেশি দায়ী। খাদ্যঘাটতিই পুষ্টিহীনতার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দায়ী। বাসস্থানের সংকটের কারণে নোংরা, অস্বাস্থ্যকর গৃহ ও বস্তিতে বসবাসের ফলে পুষ্টিহীনতা দেখা দেয়। চিকিৎসার অভাবে এবং নিরক্ষরতার কারণে অজ্ঞতা, কুসংস্কার, অসচেতনতা প্রভৃতি অপুষ্টিতে প্রভাব ফেলে। স্বাস্থ্যসম্মত বস্ত্র ও নির্মল চিত্তবিনোদনের অভাবেও পুষ্টিহীনতা দেখা দেয়।

২. স্বাস্থ্যহীনতা (Ill-health): শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার ঘাটতি বা অভাবজনিত অবস্থাকে স্বাস্থ্যহীনতা বলে। বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা থেকে সৃষ্ট অন্যতম সমস্যা হলো স্বাস্থ্যহীনতা। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিত্তবিনোদন ইত্যাদি মৌলিক মানবিক চাহিদা এক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে থাকে। স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন। খাদ্যের অভাবে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। এসব কারণে এ দেশের অনেক মানুষ নানা রোগব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। ফলে স্বাস্থ্যহীনতার শিকার হয়। প্রয়োজনীয় ও স্বাস্থ্যসম্মত বস্ত্রের সংকটের কারণে বহু লোকের স্বাস্থ্যহানি ঘটে। শিক্ষার অভাবও স্বাস্থ্যহীনতার জন্য বহুলাংশে দায়ী। শিক্ষার অভাবে মানুষ কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অজ্ঞ হয়। রোগব্যাধির কারণ, প্রতিকার ও প্রতিরোধের ব্যাপারে তারা অজ্ঞ থাকে। ফলে তারা স্বাস্থ্যহীনতায় ভোগে। পর্যাপ্ত আলো-বাতাস, খোলামেলা ও স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য অপরিহার্য। কিন্তু পর্যাপ্ত ও স্বাস্থ্যসম্মত বাসস্থান সংকটের কারণে স্বাস্থ্যহানি ঘটে। নির্মল ও গঠনমূলক চিত্তবিনোদনের অভাবে বাংলাদেশের মানুষের পক্ষে শারীরিক ও মানসিক অবসাদ, হতাশা, চাপ প্রভৃতি দূর করা সম্ভব হয় না। এজন্য তারা সহজেই বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্যহীনতায় ভোগে। সুতরাং দেখা যায়, বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলো প্রত্যাশিত মান অনুযায়ী পূরণ না হওয়ায় স্বাস্থ্য সমস্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩. গৃহ ও বস্তি সমস্যা (Housing and Slum Problem): গৃহ হচ্ছে মানুষের আশ্রয়স্থল। জনসংখ্যার তুলনায় গৃহের সংখ্যা কম। ফলে শহর এলাকায় অনেকেই বস্তিতে আশ্রয় গ্রহণ করে। বস্তি বলতে এমন এক অবহেলিত জনবসতি এলাকাকে বোঝায়, যেখানে জীবনধারণের ন্যূনতম সুযোগটুকুও থাকে না। অত্যন্ত নিম্ন জীবনমান, পয়ঃনিষ্কাশনের অভাব, পানীয় জল ও আলো-বাতাসের অভাব, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, অপরাধ প্রভৃতি বস্তি এলাকার নিত্য সঙ্গী যা সমাজকে করে কলুষিত। এ কারণেই বস্তিকে সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। জাতিসংঘের তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশের ১০ লাখ লোক গৃহহীন। এরা শহর, নগর, বন্দর এবং গ্রাম এলাকায় অস্থায়ী বাসস্থান স্থাপন করে মানবেতর জীবনযাপন করছে। শিল্প ও শহরাঞ্চলের পাশে নিম্ন আয়ের লোকেরা গড়ে তোলে ছোট খুপরি ঘর যা বস্তি নামে পরিচিত। বাংলাদেশের শহরগুলোতে বস্তিসমস্যা অত্যন্ত প্রকট। শুধু ঢাকা শহরে ৩৫ শতাংশ লোক বস্তিতে বাস করে। ২০১১ সালের সরকারি তথ্য অনুযায়ী এদেশে বস্তির সংখ্যা ছয় হাজার এবং বস্তির লোকসংখ্যা প্রায় ৭৫ লাখ। বস্তির নোংরা ঘিঞ্জি পরিবেশ স্বাস্থ্যহীনতা, সামাজিক সমস্যা ও অনাচারের সূতিকাগার। গৃহের স্বল্পতা ও বস্তির বিস্তারের ফলে স্বাস্থ্যহীনতা, অপুষ্টি, নিরক্ষরতা, অপরাধ, মাদকাসক্তি, সন্ত্রাস, পতিতাবৃত্তিসহ নানা জটিল সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। গৃহ ও বস্তি সমস্যা দেশের অন্ন-বস্ত্রের সমস্যার সাথে জড়িত। বাংলাদেশে বিদ্যমান অর্থনৈতিক অবস্থায় অন্ন-বস্ত্রের চাহিদা মোকাবিলা করার পর বাসস্থানের চাহিদা পূরণের সংগতি অনেকের থাকে না। গৃহ ও বস্তি সমস্যার অপর দিক স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের অভাব। এজন্য জনগণের শিক্ষার অভাব অনেকাংশে দায়ী। নিরক্ষর ও অজ্ঞ জনগণ ঝোপঝাড়ে ঘেরা, আলো-বাতাসহীন ঘর যে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর তা জানে না বলে ঘরকে ঝুপড়িতে পরিণত করে রাখে।

৪. নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা (Illiteracy and Ignorance): নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা মৌলিক মানবিক চাহিদা অপূরণজনিত একটি মারাত্মক সমস্যা। নিরক্ষরতা বলতে অক্ষরজ্ঞানহীন অবস্থা এবং অজ্ঞতা বলতে জ্ঞানের অভাবকে বোঝায়। দৈনন্দিন

জীবনের ক্ষুদ্র ও সাধারণ বক্তব্যকে উপলব্ধি সহকারে লিখতে এবং পড়তে অক্ষম ব্যক্তির অবস্থাকে নিরক্ষরতা বলে। বাংলাদেশের শতকরা ৩৮ জন লোক নিরক্ষর। নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার মূলে অন্যান্য উপাদান থাকলেও অপূরিত মৌলিক মানবিক চাহিদার প্রভাব অত্যন্ত শক্তিশালী। কারণ, শিক্ষার অভাব থেকেই সমাজে নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতা দেখা দেয়। একমাত্র শিক্ষাই মানুষকে নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে পারে। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ খাদ্যের চাহিদা পূরণ করতে পারছে না বলে তারা শিক্ষার প্রতি নজর দিতে পারে না। ফলে তারা নিরক্ষর ও অজ্ঞ থাকে। স্বল্প আয়ের লোকেরা বস্ত্র, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, চিত্তবিনোদন প্রভৃতি পূরণ করতে পারছে না বলে স্বভাবতই শিক্ষার প্রতি তাদের আগ্রহ থাকে না। ফলে তারা নিরক্ষর ও অজ্ঞ থেকে যায়।

৫. অপরাধপ্রবণতা (Criminality): সমাজের প্রচলিত আইনকানুন, রীতিনীতি, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিপন্থী কার্যকলাপকে অপরাধ বলে। অপূরিত মৌলিক মানবিক চাহিদার একটি অপরিহার্য পরিণতি হচ্ছে অপরাধপ্রবণতা। সমাজে বৈধ উপায়ে মানুষ যখন মৌলিক মানবিক চাহিদার একটি অপরিহার্য পরিণতি হচ্ছে অপরাধপ্রবণতা। সমাজে বৈধ উপায়ে মানুষ যখন মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়, তখন অবৈধ বা অসামাজিক উপায়ে এগুলো পূরণের চেষ্টা করে। ফলে মানুষের মাঝে স্বভাবতই অপরাধপ্রবণতা দেখা দেয়। অপরাধপ্রবণতার পেছনে বহু কারণ থাকতে পারে। তবে অপূরিত মৌলিক মানবিক চাহিদা সমাজে অপরাধ প্রবণতা সৃষ্টির একটি শক্তিশালী কারণ।

বাংলাদেশে বেশির ভাগ অপরাধই খাদ্যের চাহিদা পূরণ করার জন্য সংঘটিত হয়। বৈধ উপায়ে খাদ্যের চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হলে ক্ষুধার্ত মানুষ চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, লুটতরাজ ইত্যাদি অপরাধের মাধ্যমে খাদ্য জোগাড়ের চেষ্টা করে। আবার শিক্ষার চাহিদা অপূরিত থাকলে মানুষের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা দেখা দিতে পারে। অপরাধীদের মধ্যে নিরক্ষরের সংখ্যাই বেশি। নিরক্ষর মানুষ ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, দায়িত্বজ্ঞানের অভাব এবং কুসংস্কারের বশে নানারকম সমাজবিরোধী কাজ করে। এতে সমাজে অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি পায়। বাসস্থানের অভাব এবং বস্তি সমস্যা বিভিন্নভাবে ব্যক্তিকে অপরাধের দিকে ঠেলে দেয়। চিত্তবিনোদনের অভাবে জীবন একঘেয়ে ও বিস্বাদ হয়ে ওঠে, সৃষ্টি হয় নিরাশা, হতাশা আর বঞ্চনার যা মানুষকে অনেক সময় অপরাধের দিকে ধাবিত করে।

৬. বেকারত্ব (Unemployment): বেকারত্ব হলো এমন কর্মহীন অবস্থা, যে অবস্থায় কর্মহীনতার প্রভাবে কর্মক্ষম ব্যক্তি নিজের প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক চাহিদা স্বাধীনভাবে পূরণে অক্ষম হয়। বেকারত্বের ক্ষেত্রে খাদ্য, বাসস্থান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা প্রভৃতি চাহিদা প্রভাবিত করে। যেমন– কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজন কর্মক্ষমতা, সুস্থতা ও সবল দেহ। কিন্তু বাংলাদেশের অনেক লোক প্রয়োজনীয় ও পরিমিত পুষ্টিকর খাদ্য পায় না। ফলে পুষ্টিহীনতা ও স্বাস্থ্যহীনতায় ভোগে, অকালে কর্মক্ষমতা হারায় এবং বেকার হয়ে পড়ে। অন্যদিকে, বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগে কর্মসংস্থানের একটি অন্যতম প্রধান শর্ত হচ্ছে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ। কিন্তু এদেশের অনেক লোক অশিক্ষিত ও অদক্ষ থাকায় তারা ঠিকমতো কাজ পায় না। ফলে তারা কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে বেকার থাকতে বাধ্য হচ্ছে। নিচের সারণিতে বাংলাদেশে বেকারত্বের হার বৃদ্ধির প্রবণতা দেখানো হলো:

সারণি ১.৪.৩: বেকারত্বের হার

জরিপের সন	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৯-২০০০	২০০২-০৩	২০০৫-০৬	২০১০
উভয়লিঙ্গ	৩.৫	৪.৩	৪.৩	৪.৩	৪.৫
পুরুষ	২.৮	৩.৪	৪.২	৩.৪	৪.১
মহিলোা	৭.৮	৭.৮	৪.৯	৭.০	৫.৮

(উৎস: পরিসংখ্যান পকেট বুক ২০০৪ এবং ২০০৮, পৃ-১৪৮ ও ১৪৩ এবং শ্রমশক্তি জরিপ-২০১০)

৭. পারিবারিক ভাঙন, বিচ্ছেদ ও নিরাপত্তাহীনতা (Family Breakdown, Separation and Insecurity): মৌলিক মানবিক চাহিদার অপূরণজনিত কারণে সৃষ্ট অনিবার্য সমস্যা হচ্ছে পারিবারিক ভাঙন, বিচ্ছেদ ও নিরাপত্তাহীনতা। এতে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কের মারাত্মক অবনতিসহ সম্পর্ক দুর্বল ও ছিন্ন হয়, পরিবার ভেঙে যায় এবং তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। পরিবারে মৌলিক মানবিক চাহিদা অপূর্ণ থাকলে তা বিভিন্ন সমস্যার জন্ম দেয়। যেমন– দাম্পত্য কলহ, বিচ্ছেদ, বিবাহ বিচ্ছেদ, নিরাপত্তাহীনতা, ঝগড়া, মারামারি, নিরুদ্দেশ যাত্রা, আত্মহত্যা, হত্যা, নারী নির্যাতন, যৌতুক সমস্যা ইত্যাদি। এছাড়া মৌলিক মানবিক চাহিদার অপূরণজনিত কারণে পরিবারের কার্যাবলী ও ভূমিকা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়, সদস্যরা নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে।

উপর্যুক্ত সমস্যাগুলো ছাড়াও বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদার অপূরণজনিত কারণে ভিক্ষাবৃত্তি, নৈতিক অধঃপতন, দারিদ্র্য, প্রতিবন্ধিত্ব, সামাজিক বিশৃঙ্খলা, হতাশা, ব্যর্থতা, শিশুশ্রম ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়। উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের অভাবে সমাজে পরস্পর সম্পর্কিত বহুমুখী আর্থ-সামাজিক ও মানবিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। এসব সমস্যা চক্রাকারে ক্রিয়াশীল থেকে সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।

সারসংক্ষেপ

মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ হওয়া মানব জীবনে অত্যন্ত অপরিহার্য। এই অপরিহার্য প্রয়োজন পূরণ না হলে আর্থ-সামাজিক ও মনো-দৈহিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাছাড়া স্বাভাবিক ও সমাজস্বীকৃত উপায়ে এই সমস্ত প্রয়োজন পূরণ না হলে অস্বাভাবিক ও অবৈধ উপায় অবলম্বনে মানুষ বাধ্য হয়; যা বহুমুখী জটিল সমস্যা সৃষ্টি করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের অন্যতম অন্তরায় হলো–

ক) অজ্ঞতা খ) অতিরিক্ত জনসংখ্যা
গ) উৎপাদন স্বল্পতা ঘ) দুর্নীতি

২। বাংলাদেশের সংবিধানে কয়টি মৌলিক মানবিক চাহিদার উল্লেখ করা হয়েছে?

ক) ছয়টি খ) সাতটি
গ) পাঁচটি ঘ) আটটি

পাঠ-১.৫ বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের অন্তরায় (Obstacles to Meet Basic Human Needs in Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

১.৫ বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের অন্তরায়সমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১.৫ বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের অন্তরায়সমূহ

কোনো দেশের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ নির্ভর করে সে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উপর। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের অনুকূল নয়। বাংলাদেশ পৃথিবীর জনবহুল দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম। খানা ব্যয় জরিপ HIES-২০১০ এর তথ্যানুযায়ী, দেশের শতকরা ৩১.৫ ভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। ফলে বাংলাদেশের অধিকাংশ জনগণের পক্ষে মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলো পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ না হওয়ার ক্ষেত্রে কোনো একটি মাত্র বিশেষ কারণ দায়ী নয়। এর পেছনে একাধিক কারণ রয়েছে।

বাংলাদেশের মানুষের মৌলিক মানবিকচাহিদা পূরণ না হওয়ার পথে প্রদান অন্তরায় হলো দারিদ্র্য। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা–২০১৫ এর তথ্যানুযায়ী, এ দেশের শতকরা ৩১.৫ ভাগ লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে এবং জনগণের মাথাপিছু আয় মাত্র ১,৭৫২ মার্কিন ডলার। অন্যদিকে, MDG Progress রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে ২৪.৮০%লোক দারিদ্র্যসীমার নিচে বাস করে। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ক্রিয়াশীল থেকে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের অন্তরায় সৃষ্টি করছে। বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা ১৬.৩৭ কোটি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭%, জনসংখ্যার ঘনত্ব ১০৩৫ জন। ফলে প্রতিবছর ২৪ লাখ জনসংখ্যা বাড়ছে। কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সামঞ্জস্য রেখে জীবনধারণের অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি না পাওয়ায় মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে অন্তরায় সৃষ্টি করেছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। কারণ মোট জাতীয় উৎপাদনের প্রায় ৪০ ভাগ আসে কৃষিখাত থেকে। পরিসংখ্যান ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী ২০১৪-১৫ অর্থবছরে এ খাতের অবদান ছিল ১৫.৯৬ শতাংশ। বাংলাদেশে কৃষি উৎপাদনের উপর মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ বিশেষভাবে নির্ভরশীল। কিন্তু আমাদের কৃষিব্যবস্থা এখনো অনেকটা প্রাচীন ও অবৈজ্ঞানিক। অনুন্নত কৃষিব্যবস্থার কারণে উৎপাদন সামান্য। ফলে কৃষির উপর নির্ভরশীল এ দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানসহ মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলো ঠিকমতো পূরণ হয় না।

বাংলাদেশে মৌলিক চাহিদা পূরণের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে খরা, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, বৃষ্টি, নদীরভাঙন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে প্রতিবছর প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপুল পরিমাণ সম্পদ ধ্বংস এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়; যা বাংলাদেশের সামগ্রিক মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণকে বিশেষভাবে ব্যাহত করছে। অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তন এবং বৈশ্বিক উষ্ণতার প্রভাবে পরিবেশের বিপর্যয় অব্যাহত রয়েছে। প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার প্রভাবে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের উপকরণাদির অভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

কর্মসংস্থানের অভাবে বাংলাদেশে বেকারত্বের হার ক্রমেই বেড়ে চলেছে। বর্তমানে মোট জনশক্তির ৩০% বেকার, যার মধ্যে ৪০% শিক্তিত বেকার। বর্তমান বাংলাদেশে সর্বমোট বেকারের সংখ্যা প্রায় ৪ কোটি। বেকারত্বের এই পরিস্থিতি মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের পথে বিরাট অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশে জনসংখ্যার ক্রুটিপূর্ণ গঠন কাঠামোর ফলে নির্ভরশীল জনসংখ্যার হার অধিক। আন্তর্জাতিক শ্রমসংস্থার ২০১০ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, প্রতিবছর ২৭ লক্ষ মানুষ শ্রমবাজারে প্রবেশ করছে, অথচ কাজ পাচ্ছে মাত্র ১ লক্ষ ৮৯ হাজার মানুষ।

সম্পদের অসম বণ্টনও মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের পথে বিরাট অন্তরায়। দেশে মোট সম্পদের ৯০% রয়েছে মাত্র ১০% লোকের হাতে। এই ১০ ভাগ লোক ভোগ-বিলাসের জীবন অতিবাহিত করলেও বাকি ৯০ ভাগ লোক ন্যূনতম

জীবনমান অর্জনে সক্ষম হচ্ছে না। বাংলাদেশের শিল্পক্ষেত্রে বিভিন্ন সমস্যা বিরাজমান। অনগ্রসর শিল্প এ দেশের মানুষের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে অন্যতম অন্তরায়।

বাংলাদেশ প্রায় সব ব্যাপারেই বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা তাকে স্বাবলম্বী হতে বিভিন্নভাবে বাধা প্রদান করছে, যা মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অপরিহার্য। বাংলাদেশে সরকারের অস্থিতিশীলতা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে দীর্ঘমেয়াদি কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা যায় না। এ পরিস্থিতি মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের পথে অন্যতম অন্তরায়। স্বাধীনতার পর থেকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর মূল্য অস্বাভাবিক হারে বেড়ে চলছে। কিন্তু সে হারে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বাড়ছে না। তাছাড়া দেশে বর্তমানে মুদ্রাস্ফীতি চলছে। মুদ্রাস্ফীতির কারণে দ্রব্যমূল্য জনগণের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে। সে কারণে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে। চোরাচালান, মজুদদারি প্রভৃতির প্রভাবেও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। দ্রব্যমূল্য ও জীবনাযাত্রার ব্যয়ের উর্ধ্বগতি জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণে অন্তরায় সৃষ্টি করছে।

বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য তেমন কোনো ব্যাপক পরিকল্পনা এখনো গৃহীত হয়নি। যৎসামান্য যেসব প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে তাও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সততার অভাবে ফলপ্রসূ হয়নি। সুষ্ঠু নীতি ও পরিকল্পনার অভাবে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নতি ব্যাহত হচ্ছে। ফলে জনসাধারণের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ নিশ্চিত হচ্ছে না।

বাংলাদেশে নির্ভরশীল নাগরিকদের জন্য ব্যাপক সামাজিক নিরাপত্তাব্যবস্থা নেই। শিশু, বৃদ্ধ, নারী ও প্রতিবন্ধী হলো সমাজের নির্ভরশীল জনগোষ্ঠী। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অভাব ও সীমাবদ্ধতার ফলে বিভিন্ন দুর্যোগে-দুর্দিনে জনগণের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের নিশ্চয়তা থাকে না। এছাড়া স্বাভাবিক অবস্থায় সমাজের নিম্ন, দুস্থ ও অসহায় শ্রেণি সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে মৌলিক চাহিদা পূরণের যথাযথ মান অর্জনের সক্ষম হয় না। বর্তমানে সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপের ফলে সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন সাধিত হয়েছে।

এদেশের মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণের উল্লেখযোগ্য বাধা হচ্ছে অনুন্নত যোগাযোগব্যবস্থা। রাস্তাঘাট এবং উন্নত যোগাযোগব্যবস্থার অভাবে দেশের ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্য, বস্ত্র ইত্যাদি সামগ্রী দ্রুত পৌঁছানো যায় না। এ কারণে অনেকে শিক্ষা এবং চিকিৎসা সুবিধা লাভেও বঞ্চিত হয়।

যে কোনো দেশের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের অপরিহার্য পূর্বশর্ত হচ্ছে প্রবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি। অথচ বাংলাদেশে বিভিন্ন কারণে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রবৃদ্ধির হার কম। ফলে মৌলিক চাহিদা পূরণে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছে না। বাংলাদেশে অপরিকল্পিতভাবে নগরের সম্প্রসারণ হচ্ছে। পাশাপাশি নগরজীবনের চাকচিক্য মানুষকে শহরের দিকে আকৃষ্ট করছে। বাড়ছে শহুরে জনসংখ্যা, পরিবর্তিত হচ্ছে মানুষের চাহিদা। কিন্তু সেই সাথে বাড়ছে না আয়, যার প্রভাব মৌলিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থতা।

উপর্যুক্ত প্রতিবন্ধকতা ছাড়াও নৈতিক অবক্ষয়, পারিবারিক কাঠামো ও ভূমিকার পরিবর্তন, অনুৎপাদনশীল খাতে জাতীয় বিনিয়োগ, সামাজিক ও ধর্মীয় কুসংস্কার, বাণিজ্য ঘাটতি, দক্ষ জনশক্তির অভাব, সম্পদের স্বল্পতা প্রভৃতি অবস্থা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এ দেশের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করছে।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ বিশ্বের একটি উন্নয়নশীল দেশ। এদেশের জনগণের মাথাপিছু গড় আয় সন্তোষজনক না। দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থাও উন্নয়ন উপযোগী নয়। কৃষি এবং শিল্প উন্নয়নও প্রত্যাশিত নয়। আর্থ-সামাজিক বঞ্চনা এবং কর্মসংস্থানের অভাব মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের অন্তরায় হিসেবে কাজ করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। সমাজের এক বিরাট অংশ খাদ্য চাহিদা পূরণে অক্ষম হবার কারণ হলো–

i. খাদ্যশস্য ঘাটতি

ii. সুষ্ঠু বণ্টন ব্যবস্থা না থাকা

iii. দরিদ্র শ্রেণির ক্রয় ক্ষমতা না থাকা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii

খ) i ও iii

গ) ii ও iii

ঘ) i, ii ও iii

২। মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ অত্যাবশ্যক–

ক) মানুষের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য

খ) মানুষের উন্নয়নের জন্য

গ) মানুষের কর্মস্পৃহা বৃদ্ধির জন্য

ঘ) মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য

পাঠ-১.৬ বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে গৃহীত পদক্ষেপ (Measures Undertaken to Meet Basic Human Needs in Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

১.৬ বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

১.৬ বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে গৃহীত পদক্ষেপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত ১৫ ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হলো পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতি সাধন; যাতে নাগরিকদের অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং যুক্তিসংগত বিনোদন ও অবকাশের অধিকার নিশ্চিত হয়। সাংবিধানিক অধিকার হিসেবে সকল নাগরিকের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে সরকারি এবং বেসরকারি পর্যায়ে কতগুলো সুদূরপ্রসারী ও বাস্তবসম্মত প্রদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

১. খাদ্য (Food): বাংলাদেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে সার্বিক কৃষি ও পল্লি উন্নয়ন খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৬-২০), জাতীয় কৃষিনীতি ও সহস্রাব্দ উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে কৃষিখাতের উন্নয়নের সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে কৃষি উপকরণে ভর্তূকি বৃদ্ধি, কৃষি উপকরণ সহজলভ্য করা, কৃষিঋণের আওতা বৃদ্ধি এবং প্রাপ্তি সহজীকরণ করা হয়েছে। মাটির গুণাগুণ বজায় রাখা ও অধিক ফলন বৃদ্ধির লক্ষ্যে সুষম সার ও জৈব সারের ব্যবহার কৃষকদের মাঝে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন বাংলাদেশ সরকারের লক্ষ্য। এ লক্ষ্যে দেশের বিপুল জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা মেটাতে দেশজ খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নকে সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করেছে। কৃষিখাতের সার্বিক উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্রসেচ সম্প্রসারণ, জলাবদ্ধতা নিরসন, নিবিড় চাষ, উন্নতমানের ও উচ্চফলনশীল বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ, জমির ব্যবহার বহুধাকরণ, পতিত জমি পুনরুদ্ধার, লবণাক্ত সহিষ্ণু ও স্বল্প সময়ের শস্যের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং মাঠপর্যায়ে সম্প্রসারণ প্রভৃতি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

কৃষকের চাহিদা ও বাজার চাহিদাভিত্তিক সিস্টেম বেইজড এবং সমন্বিত ব্যবস্থাপনায় কীটপতঙ্গ/রোগবালাইমুক্ত, খরা/লবণাক্ততা সহিষ্ণু, আবহাওয়া ও পরিবেশ উপযোগী এবং স্বল্প সময়ে ফসল পাওয়া যায় এরূপ শস্যের জাত ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণসহ সার্বিক কৃষি ব্যবস্থাপনাকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। লবণাক্ততা সহিষ্ণু ফসলের জাত উদ্ভাবনের মাধ্যমে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের বিশাল উপকূলীয় এলাকা ধান চাষের আওতায় আনার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

দেশের খাদ্য চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে ২০১৪-১৫ অর্থবছরের (ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত) ৮.৬৯ লাখ মেট্রিক টন চাল এবং ১৯.৭৪ লাখ মেট্রিক টন গম আমদানি করা হয়েছে। খাদ্য চাহিদা পূরণে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে অধিক হারে মানসম্মত বীজ উৎপাদন ও কৃষকদের নিকট সরবরাহের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন সারাদেশে ২৩টি দানা শস্যবীজ উৎপাদন খামার, ২টি আলু উৎপাদন খামার, ৩টি ডাল ও তৈলবীজ উৎপাদন খামার, ২টি সবজিবীজ উৎপাদন খামার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দেশের জনসাধারণের দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি মন্ত্রণালয় বিভিন্ন খাত ও উপখাত, যেমন– কৃষি গবেষণা ও শিক্ষা কার্যক্রম, কৃষি সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ, খাদ্যদ্রব্যের বিপণন, কৃষি সহায়তা ও পুনর্বাসন, কৃষি উপকরণ ও যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন, বীজ উৎপাদন, সেচ কার্যক্রম, শস্য সংরক্ষণসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বহুমুখী উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা এ পর্যন্ত ৪টি হাইব্রিডসহ মোট ৬১টি উচ্চফলনশীল ধানের জাত উদ্ভাবন করেছেন। এর মধ্যে লবণাক্ততা সহিষ্ণু, জলমগ্নতা সহিষ্ণু, খরাসহিষ্ণু উচ্চফলনশীল ধান রয়েছে। বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট গম, আলু, সরিষা, শাকসবজি, ফল, মসলাসহ বিভিন্ন ফসলের ৬০টি উচ্চফলনশীল জাত এবং ৭৫টি উন্নত ফসল ব্যবস্থাপনা কৌশল উদ্ভাবন করেছে।

চরম দারিদ্র্যে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে অনাহার থেকে বাঁচানোর জন্য কাজের বিনিময়ে খাদ্য (কাবিখা), বিনা মূল্যে প্রদত্ত খাদ্য (GR), টেস্ট রিলিফ, ভিজিএফ (Vulnerable Group Feeding), ভিজিডিসহ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি (Social Safety Net Program) বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

এ ছাড়াও দুস্থ দরিদ্রদের খাদ্য সুবিধা দানের লক্ষ্যে বয়স্ক ভাতা কর্মসূচি, অসচ্ছল প্রতিবন্ধীদের জন্য ভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্ত দুস্থ মহিলা ভাতা কার্যক্রম এবং বেকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। খাদ্যখাতে সরকার ঘোষিত ভিশনগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো ২০২১ সালের মধ্যে দেশের ৮৫ শতাংশ মানুষের মানসম্পন্ন পুষ্টি চাহিদা পূরণ এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জন্য প্রতিদিন ন্যূনতম ২,১২২ কিলো ক্যালরির ঊর্ধ্বে খাদ্যশক্তি নিশ্চিত করা। নিচে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সাহায্য কর্মসূচির আওতায় চলমান বিভিন্ন কর্মসূচির সংক্ষিপ্ত তথ্য তুলে ধরা হলো:

সারণি ১.৬.১ : বাংলাদেশ সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

কর্মসূচির নাম	মোট বরাদ্দ
বয়স্ক ভাতা	১৩০৬.৮০ কোটি টাকা
অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা	২৪০ কোটি টাকা
বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা ভাতা	৪৮৫.৭৬ কোটি টাকা
দরিদ্র মায়ের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা	১৩২ লাখ টাকা
কাজের বিনিময়ে খাদ্য	১,৩১৭.৭৪ কোটি টাকা
ভিজিডি	৮৮৬.৯২ কোটি টাকা
ভিজিএফ এবং গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ (টেস্ট রিলিফ-টিআর)	২৮৩.৮৪ কোটি টাকা

এছাড়া অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান, ন্যাশনাল সার্ভিস, শিশু বিকাশ কেন্দ্র, প্রতিবন্ধী সেবা ও সাহায্য কেন্দ্র, ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

২. বস্ত্র (Clothing): বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৩ সালের মধ্যে বস্ত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং বস্ত্র রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দেশের প্রথম বস্ত্রনীতি ঘোষণা করে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) বস্ত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের লক্ষ্যে ২০০৫ সালের মধ্যে বার্ষিক মাথাপিছু ১৭ মিটার বস্ত্র প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়। বাংলাদেশের রপ্তানিমুখী পোশাক শিল্পের শতকরা ৮০-৮৫ ভাগ বস্ত্রের চাহিদা দেশীয় শিল্প থেকে আসে। বস্ত্র ও তৈরি পোশাক শিল্পে বর্তমানে ৫০ লক্ষাধিক জনবল নিয়োজিত রয়েছে। বর্তমানে বন্ধ মিলগুলো পর্যায়ক্রমে চালু করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। বস্ত্রখাতের উন্নয়নে বস্ত্র প্রযুক্তিবিদ ও বস্ত্রবিষয়ক দক্ষ জনশক্তির চাহিদা পূরণে বস্ত্র দপ্তর ৫টি টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ৬টি টেক্সটাইল ইনস্টিটিউট এবং ৪০টি ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট পরিচালনা করছে। বাংলাদেশ রেশম বোর্ড, বাংলাদেশ তাঁত বোর্ড, বাংলাদেশ সিল্ক ফাউন্ডেশন, পাট অধিদফতর প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বস্ত্রখাতের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সমাজের দুস্থ ও দরিদ্র শ্রেণির বস্ত্রের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সরকার পুরাতন কাপড় আমদানিসহ বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

বস্ত্রখাতের উন্নয়নের জন্য বাংলাদেশ টেক্সটাইল মিলস কর্পোরেশনের অধীন ৫টি মিলকে প্রাইভেটাইজেশন কমিশনে বিক্রয়ের জন্য ন্যস্ত করা হয়েছে। বস্ত্রশিল্পের ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে সংগতি রেখে প্রয়োজনীয় কারিগরি জনবল সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বস্ত্র দপ্তর প্রযুক্তিগত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা করছে। রেশমচাষিদের রেশম চাষের বিভিন্ন কলাকৌশলের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রয়োজনীয় অর্থ সাহায্য করা হচ্ছে। পাটজাত পণ্যকে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হিসেবে চিহ্নিত করে পাটনীতি-২০১১ গ্রহণ করা হয়েছে। দেশি ও তোষা পাটের জীবনরহস্য উন্মোচনের মাধ্যমে পাটবস্ত্রের নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমানে মোট ৮টি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় (ইপিজেড) অন্যান্য পণ্যের পাশাপাশি বস্ত্র উৎপাদিত হচ্ছে।

দেশের একমাত্র টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজকে টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং ৪টি টেক্সটাইল ডিপ্লোমা ইনস্টিটিউটকে আপগ্রেড করে টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উন্নীত করা হয়েছে এবং ৪০টি টেক্সটাইল ভোকেশনাল ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছে।

৩. **বাসস্থান (Housing):** দরিদ্র জনগোষ্ঠীর গৃহায়ণের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ১৯৯৭-৯৮ সালে গৃহায়ণ তহবিল গঠন করা হয়। এ তহবিল দ্বারা এ পর্যন্ত ৩.৫৫ লক্ষ জন উপকৃত হয়েছে। গৃহনির্মাণ কর্মসূচির আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০১৫ পর্যন্ত ৬১,০৯২টি গৃহনির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। সারা দেশে মোট ৫১৩টি এনজিও ৬৪টি জেলার ৪৫০টি উপজেলায় গৃহায়ন ঋণ

কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। শহরাঞ্চলের ভাসমান জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনের লক্ষ্যে কয়েকটি পুনর্বাসন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল পরিবারের পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে গ্রহণ করা হয় আশ্রয়ণ প্রকল্প। ১৯৯৭-২০০২ পর্যন্ত সময়ে ৩০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫০ হাজার পরিবারকে এ প্রকল্পের আওতায় পুনর্বাসন করা হয়।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় জুলাই ২০০২-ডিসেম্বর ২০১০ মেয়াদে আশ্রয়ণ প্রকল্প (ফেজ-২) গ্রহণ করা হয় এবং ডিসেম্বর ২০১০ প্রকল্পটি সমাপ্ত হয়। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৫৮,৭০৩টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। ৫০ হাজার ভূমিহীন, গৃহহীনও ছিন্নমূল দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে জুলাই, ২০১০ থেকে জুন, ২০১৭ মেয়াদে ১,১৬৯.১৭ কোটি টাকা ব্যয়সাপেক্ষ আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

ঢাকায় বস্তিতে মানবেতর জীবনযাপনকারী ছিন্নমূল অসহায় মানুষদের নিজ এলাকায় স্বস্তিকর পরিবেশে বাসগৃহে প্রত্যাবাসন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের মাধ্যমে ঘরে ফেরা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এর আওতায় ৬৫৬টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করা হয়। ২০১৩-১৪ অর্থবছর ঘরে ফেরা কর্মসূচির আওতায় ৩০০টি বস্তিবাসী পরিবারের মধ্যে ১.৫০ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়।

'সকলের জন্য আবাসন' কর্মসূচির আওতায় স্বল্প ও মধ্যম আয়ের লোকদের জন্য রাজধানী ঢাকাসহ অন্যান্য বিভাগীয় শহর এবং বিভিন্ন জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় ৪১,৫৮১টি প্লট উন্নয়ন ও ৩১,৫৩৩টি ফ্ল্যাট নির্মাণের জন্য ৪৯টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। গুচ্ছগ্রাম পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় ৪৯টি জেলার ১০২টি উপজেলায় ১৬৩টি গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠা করে ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমিহীন ৭,১৭২টি পরিবারকে পুনর্বাসিত করেছে।

৪. **শিক্ষা (Education):** সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার প্রতিপালনে 'সকলের জন্য শিক্ষা' নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার একটি নির্ধারিত স্তর পর্যন্ত সকল বালক-বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষাদান এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিরক্ষরতা দূর করার কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। সরকার যুগোপযোগী ও কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তনের লক্ষ্যে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণয়ন করেছে। শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, নতুন কারিকুলাম প্রণয়ন, পরীক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তনহ নানাবিধ উন্নয়ন ও সংস্কারধর্মী কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে।

বর্তমানে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১,০৮,৫৩৭টি। প্রাথমিক শিক্ষায় ছাত্রছাত্রী ভর্তির সংখ্যা ও হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি এবং বিদ্যালয়বিহীন এলাকায় ১,৫০০টি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০১৩ সালের জানুয়ারি মাসে দেশের ২৬,১৯৩টি রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ এবং কর্মরত শিক্ষকদের চাকরি সরকারিকরণ করা হয়েছে।

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে মার্চ ২০১৩ পর্যন্ত সময়ে ৫৫৫টি সরকারি এবং ৭৭টি রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয় সংস্কার করা হয়েছে। সরকার বছরের শুরুতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ করছে।

দরিদ্র পরিবারের সন্তানদের স্নাতক (পাস) ও সমমান পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রম শুরু হয়েছে। পশ্চাৎপদ স্কুলসমূহকে তথ্য প্রযুক্তির সাথে পরিচয় করার লক্ষ্যে আইটি বেইজড মোবাইল ভ্যান চালু করা হয়েছে। এছাড়া ২০,৫০০টি বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ কম্পিউটার বিতরণ করা হয়েছে।

দেশের যুবশক্তিকে উৎপাদনশীল ও দক্ষ নাগরিকে পরিণত করার লক্ষ্যে দেশে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি শিক্ষার প্রসারের জন্য মাদ্রাসাসহ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে ভোকেশনাল কোর্স চালু করা হয়েছে। দেশের বিপুলসংখ্যক জনগোষ্ঠীকে জনসম্পদে পরিণত করার লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১ অনুমোদন করা হয়েছে।

উচ্চশিক্ষা প্রসারের জন্য সরকারি অর্থায়নে ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনাল, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ আরও অনেক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়াও বেসরকারি অর্থায়নে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমোদন দেয়া হয়েছে। নারীর ক্ষমতায়ন ও আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদান, বেতন মওকুফ সুবিধা প্রদান, বই ক্রয়ের জন্য আর্থিক সুবিধা প্রদান ও পাবলিক পরীক্ষায় অংশগহণের জন্য পরীক্ষার ফি প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

২০১৪-১৫ অর্থবছরের বাজেটে অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে সরকার শিক্ষাখাতকে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। বাজেটে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ১৩,৫০৪.৮৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে। নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং শিক্ষার প্রসারে বেসরকারি সংস্থাগুলো বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রম এনজিওর মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এবং ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর জন্য পিতা-মাতাদের উৎসাহিত করা হচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায়, শিক্ষার চাহিদা পরিপূরণে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, ই-বুক ব্যবহারে পাঠদান, কারিক্যুলাম সংস্কার, সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা চালু, মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন, শিক্ষাখাতে তথ্যপ্রযুক্তির প্রসার প্রভৃতি যুগান্তকারী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

দেশকে নিরক্ষরতামুক্ত করার লক্ষ্যে উপবৃত্তি প্রকল্প, দারিদ্র্যপীড়িত এলাকায় স্কুল ফিডিং কর্মসূচি, শহরের কর্মজীবী শিশুদের মৌলিক শিক্ষা প্রকল্প, রিচিং আউট অব স্কুল চিলড্রেন প্রকল্পসহ আরও বেশকিছু প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অবকাঠামোগত মান উন্নয়ন, বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, কারিগরি শিক্ষা সম্প্রসারণ, শিক্ষাক্ষেত্রে আইসিটি কার্যক্রমের ব্যবহার এবং সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে ব্যাপক সহায়তা প্রদানের ফলে দেশে শিক্ষার হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্রমবর্ধমান চাহিদা মোকাবিলায় ৩৭টি সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি ৬৯টি বেসরকার বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে (অর্থনৈতিক সমীক্ষা ২০১৩)।

৫. **স্বাস্থ্য (Health):** সরকারের সাংবিধানিক দায়বদ্ধতা হলো সকল নাগরিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষা। স্বাস্থ্যখাতের উন্নয়নের প্রধান পদক্ষেপ হিসেবে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা (Primary Health Care)-র উপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যায় শিশুদের মারাত্মক ছয়টি রোগ:ডিপথেরিয়া, টিটেনাস, পোলিও, হুপিং কফ, যক্ষ্মা ও হাম প্রতিরোধের জন্য ১৯৭৯ সাল থেকে টিকাদান কর্মসূচি চালু রয়েছে। দেশকে পোলিওমুক্ত করার লক্ষ্যে দেশব্যাপী জাতীয় টিকাদান দিবস পালিত হচ্ছে। ইতিমধ্যে জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি-২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। মাঠকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীর মাধ্যমে ডায়রিয়া, ম্যালেরিয়া, ফাইলেরিয়া, যক্ষ্মাও কুষ্ঠ নিয়ন্ত্রণ এবং ভিটামিন 'এ'র অভাবজনিত অন্ধত্ব দূরীকরণ, কৃমিনাশক ঔষুধ বিতরণ ও টিকাদান ইত্যাদি কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

সুস্বাস্থ্য নিশ্চিতকরণ, পরিবারকল্যাণ, প্রজনন স্বাস্থ্য এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্য কর্মসূচিকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয় ২০১১-১৬ মেয়াদে ৫৬,৯৩৩.৫৪ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেছে। ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা সম্প্রসারণের জন্য এ পর্যন্ত ৩,৮৮১টি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র, ১২৮১৫টি কমিউনিটি ক্লিনিক এবং ৪২১টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স নির্মিত হয়েছে।

প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবাকে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে কমিউনিটি ক্লিনিকসমূহকে সচল রেখে স্বাস্থ্য, পরিবারকল্যাণ ও পুষ্টি সেবা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া তিন স্তরবিশিষ্ট উপজেলা স্বাস্থ্যব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে কমিউনিটি পর্যায়ে কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ কেন্দ্র এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সসমূহকে শক্তিশালী করা হয়েছে।

১৩২টি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে জরুরি প্রসূতি সেবা চালু করা হয়েছে। মাতৃ ও শিশুমৃত্যু হার কমানোর লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায়ে কর্মরত পরিবারকল্যাণ সহকারী ও মহিলা স্বাস্থ্য সহকারীদের ধাত্রীবিদ্যায় ৬ মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। স্বাস্থ্যখাতকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করে সবার জন্য স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিচের পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করা হয়েছে:

জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি ও জাতীয় জনসংখ্যা নীতির অনুমোদন;

সামর্থ্যহীনদের জরুরি চিকিৎসাসেবা বিনামূল্যে প্রদান;

শহরাঞ্চলে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার ব্যবস্থা করা;

দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল, দ্বীপ, সমুদ্র উপকূলীয় অঞ্চলে বেসরকারি সংস্থার সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান;

ক্রমান্বয়ে সকল জেলা ও বিশেষায়িত হাসপাতালে ICU/CCU চালু করা;

কমিউনিটি ক্লিনিকসহ সকল স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানে E-health সার্ভিস চালু করা;

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের নিয়মিত কার্যক্রমের মাধ্যমে সারাদেশে পুষ্টি কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা;

৫টি নতুন সরকারি মেডিকেল কলেজ চালু এবং আরো ৩টি স্থাপন করা;

স্থানীয় সরকার বিভাগ ও বিভিন্ন এনজিওর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে নগরে স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা সম্প্রসারিত ও জোরদার করা;

১২,২০৩টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু এবং এগুলো থেকে প্রায় ১২ কোটি গ্রহীতাকে সেবা প্রদান; এবং

৪৮২টি হাসপাতালে মোবাইল ফোনে স্বাস্থ্যসেবা এবং ৮টি হাসপাতালে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে টেলিমেডিসিন সেবা প্রদান।

সরকার স্বাস্থ্যখাতকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার জন্য স্বাস্থ্য তথ্য ব্যবস্থা ও E-health কর্মসূচি, পুষ্টিসেবা, চিকিৎসা শিক্ষা, পরিবার পরিকল্পনা সেবা, নার্সিং সেবা ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এছাড়া সামর্থ্যহীনদের বিনামূল্যে জরুরি চিকিৎসাসেবা প্রদান, ২০১১ সালের মধ্যে সবার জন্য নিরাপদ পানি এবং ২০১৩ সালের মধ্যে প্রতি বাড়িতে স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশনের ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। স্বাস্থ্য খাতের উন্নয়নের জন্য ২০১১-১৬ মেয়াদে সমন্বিত স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টি উন্নয়ন সেক্টর (HPNSDP) কর্মসূচি বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এসব ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে স্বাস্থ্যখাতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হয়েছে।

৬. চিত্তবিনোদন (Recreation): বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, সংস্কার, প্রসার ও সম্প্রসারণেল লক্ষ্যে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীন ১৭টি দপ্তর/সংস্থা বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে এবং এর মাধ্যমে সাহিত্য, সংগীত, শিল্পকলা, নাটক, চলচ্চিত্র ও সুকুমার শিল্পের উৎকর্ষ সাধনে প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করছে।

বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি চারুকলা, নাট্যকলা, সংগীত ইত্যাদির মাধ্যমে চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করছে। জনগণের চিত্তবিনোদনে বাংলা একাডেমি, জাতীয় জাদুঘর, শিশুপার্ক, উদ্যান, লেক, পার্ক, গার্ডেন, ইকোপার্ক, চিড়িয়াখানা ইত্যাদি পরিচালিত হচ্ছে। দেশজ সংস্কৃতি বিকাশের লক্ষ্যে ২০১১-১২ অর্থবছরে ২২টি কর্মসূচির অনুকূলে ২৬.৮ কোটি টাকা প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশে সরকারি ও বেসরকারিভাবে পরিচালিত বিভিন্ন টিভি চ্যানেল এবং রেডিও স্টেশন জনগণের চিত্তবিনোদনের জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান, যেমন– গান, নাটক, সিমেনা, সংবাদ, খেলাধুলা বিষয়ক অনুষ্ঠান ইত্যাদি সম্প্রচার করছে। বিগত ১৯৯৩ সাল থেকে আকাশ সংস্কৃতি উন্মুক্ত করায় স্যাটেলাইট সংযোগের (ডিশ অ্যান্টেনা) বদৌলতে সারা বিশ্বের টিভি অনুষ্ঠান দেখার সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় চিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে।

ধর্মীয়, পেশাগত এবং রাষ্ট্রীয় কারণে এদেশে নানারকম সামাজিক উৎসবের আয়োজন করা হয়। যেমন– হালখাতা, বৈশাখী মেলা, পৌষ মেলা, নবান্ন উৎসব, বিয়ে, পৌষ-পার্বন, জন্মদিন, মনীষীদের স্মরণ উৎসব, বইমেলা, শহীদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, ঈদ উৎসব, জাতীয় ঋতুভিত্তিক উৎসব, শারদীয় দুর্গোৎসব, বাণিজ্যমেলা ইত্যাদি। এসব সামাজিক উৎসব আমাদের চিত্তবিনোদনের অনন্য মাধ্যম।

বাংলাদেশ পর্যটন কর্পোরেশন মানুষের বিনোদনের জন্য পর্যটন শিল্পকে ব্যাপক ও আকর্ষণীয় করে তোলার জন্য ইতিমধ্যে নানাবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করছে। ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরসহ সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা খেলাধুলা, ক্রীড়া প্রতিযোগিতা ও নানাবিধ অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে জনগণের আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা করছে; ক্রীড়া পরিদপ্তর কর্তৃক বার্ষিক ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ভলিবল, হ্যান্ডবল, দাবা, সাঁতার, ব্যাডমিন্টন, অ্যাথলেটিক্স এবং গ্রামীণ খেলাধুলার মাধ্যমে ক্রীড়া উৎসব আয়োজন করা হচ্ছে। এছাড়া জেলা পাবলিক লাইব্রেরির উন্নয়ন, জাতীয় চিত্রশালা নির্মাণ, হাছনরাজা একাডেমি নির্মাণ, পল্লিকবি জসীমউদ্দীন সংগ্রহশালা নির্মাণ, লালবাগ কেল্লা, সাউন্ড অ্যান্ড লাইট শো, বাংলা একাডেমির নতুন ভবন নির্মাণ, জাতীয় আর্কাইভে মূল্যবান নথিপত্র বৈজ্ঞানিক উপায়ে সংরক্ষণ ইত্যাদির মাধ্যমে আমাদের চিত্তবিনোদনের সুযোগ ও ক্ষেত্র আরও সম্প্রসারিত হচ্ছে।

মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের উপর্যুক্ত কার্যক্রমের বাইরে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে সেগুলোর মধ্যে স্বনির্ভর বাংলাদেশ, পল্লি উন্নয়ন বোর্ড, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদফতর, পল্লী কর্মসহায়ক ফাউন্ডেশন, গ্রামীণ ব্যাংক,

বাণিজ্যিক ব্যাংকের ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি, দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম, গ্রামীণ সমাজসেবা প্রকল্প, প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় সতর্কীকরণ ব্যবস্থা জোরদার, উপকূলীয় অঞ্চলে আপৎকালীন আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রভৃতি পদক্ষেপ অন্যতম।

সারসংক্ষেপ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে বর্ণিত ১৫ ধারা অনুযায়ী রাষ্ট্রের অন্যতম মৌলিক দায়িত্ব হলো পরিকল্পিত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে উৎপাদন শক্তির ক্রমবৃদ্ধি সাধন এবং জনগণের জীবনযাত্রার বস্তুগত ও সংস্কৃতিগত মানের দৃঢ় উন্নতি সাধন, যাতে নাগরিকদের অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয়, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং যুক্তিসংগত অবকাশের অধিকার অর্জন নিশ্চিত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে সরকার কতগুলো বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। গৃহীত পদক্ষেপগুলোর লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হলে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। বিশ্বে বেকারত্ব বাড়ছে এমন ২০টি দেশের তালিকায় বাংলাদেশের স্থান কততম?

ক) ১০ তম খ) ১২ তম
গ) ১৫ তম ঘ) ১৭ তম

২। ভিজিডি কর্মসূচির জন্য ২০১৪-১৫ অর্থবছরে সরকার কত কোটি টাকা বরাদ্ধ করে?

ক) ৮৮৯.২০ কোটি খ) ৮৮৬.৯২ কোটি
গ) ৮৯০.২০ কোটি ঘ) ৮৯০.৩০ কোটি

অনুশীলনী (ইউনিট–০১)

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। ‘Common Human Needs’ গ্রন্থটি কে রচনা করেন?

ক) Walter A. Friedlander খ) Charlotte Towle
গ) Lawrence K. Frank ঘ) Robert L. Barker

২. সামাজিকতা রক্ষা ও সভ্য জীবনযাপনের সাথে নিচের কোন চাহিদাটি সম্পৃক্ত?

ক) খাদ্য খ) চিত্তবিনোদন
গ) স্বাস্থ্য ঘ) বস্ত্র

৩. বাংলাদেশে খাদ্যশস্য উৎপাদন দিন দিনহ্রাস পাচ্ছে। এর যথার্থ কারণ–

ক) কৃষিভূমিহ্রাস খ) জনসংখ্যা বৃদ্ধি
গ) কৃষকের সংখ্যাহ্রাস ঘ) শিল্পপ্রতিষ্ঠান বৃদ্ধি

৪. বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের প্রধান অন্তরায়–

i. দারিদ্র্য ii. জনসংখ্যাস্ফীতি iii. বেকারত্ব

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫. বাংলাদেশে বাসস্থান সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করেছে যে কারণে–

i. নদী ভাঙনে ii. ঝড়-বন্যার কারণে iii. রাজনৈতিক আদর্শহীনতায়

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i,ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

'ক' একটি উন্নয়নশীল দেশ। দেশটি জনগণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কিছু চাহিদা পূরণে ব্যর্থ। ফলে দেশিটিতে স্বাস্থ্যহীনতা ও পুষ্টিহীনতা দিন দিন প্রকট আকার ধারণ করেছে।

৬. উদ্দীপকে বর্ণিত 'ক' দেশটি নিচের কোন চাহিদা পূরণে ব্যর্থ?

ক) অর্থনৈতিক চাহিদা খ) সামাজিক চাহিদা

গ) মৌলিক মানবিক চাহিদা ঘ) মানবিক চাহিদা

৭. উক্ত চাহিদার অপূরণজনিত কারণে সৃষ্ট উল্লেখিত সমস্যার ফলে 'ক' দেশে–

i. উন্নয়ন ব্যবহত হবে ii. অকাল মৃত্যুহার বৃদ্ধি পাবে iii. অন্ধত্বের হার হ্রাস পাবে

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১। অধ্যাপক শায়লা বেগম সমাজকর্ম ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের মানুষের অত্যাবশ্যকীয় প্রয়োজন সম্পর্কে পাঠদান করতে গিয়ে বলেন, 'প্রাণী মাত্রই একটি চাহিদা প্রয়োজন অনুভব করে। এটি শরীর গঠন করে, বৃদ্ধি ও বিকাশ ঘটায়।' অপর একটি প্রয়োজন সম্পর্কে বলেন, এটি মানুষকে সভ্য সামাজিক মানুষে পরিণত করে। তিনি মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের কয়েকটি অন্তরায় ও চিহ্নিত করেন। যেমন– জনসংখ্যাস্ফীতি, বেকারত্ব, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ইত্যাদি।

ক) সমাজবিজ্ঞানী সি টোলের মতে মৌলিক মানবিক চাহিদা কয়টি? ১

খ) মানসিক বিকাশের জন্য মৌল চাহিদা পূরণ প্রয়োজন কেন? ২

গ) উদ্দীপকে বর্ণিত মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলো ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ) উদ্দীপকে বর্ণিত অন্তরায়গুলো ছাড়াও বাংলাদেশে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের আরও অন্তরায় রয়েছে– বিশ্লেষণ করুন। ৪

২। সমাজকর্মী তৌহিদ সামাজিক সমস্যার উপর পিএইচডি করে সম্প্রতি দেশে ফিরেছেন। রাতের ঢাকার স্বাভাবিক চিত্র দেখে তিনি অবাক হন। রাস্তার পাশে, রেলস্টেশন ও বাস টার্মিনালে শুয়ে রাত কাটাচ্ছে নানা ধরনের মানুষ। এসব দৃশ্য একদিকে তাকে মর্মাহত করে, অন্যদিকে তিনি তার প্রশ্নের জবাবটি খুঁজে পান। তার ধারণা, মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণের ব্যর্থতা থেকেই সৃষ্টি হয় সামাজিক সমস্যা।

ক) মানুষের আশ্রয়স্থল কী? ১

খ) মৌলিক মানবিক চাহিদা বলতে কী বোঝায়? ২

গ) উদ্দীপকটিতে কোন মৌলিক মানবিক চাহিদাটির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে? ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ) উদ্দীপকের সর্বশেষ উক্তিটি কতটুকু যুক্তিসংগত বলে আপনার মনে হয়? মতামত দিন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- **১.১** : ১। গ ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- **১.২** : ১। খ ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- **১.৩** : ১। ক ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- **১.৪** : ১। খ ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- **১.৫** : ১। খ ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- **১.৬** : ১। খ ২। খ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন- **১** : ১। খ ২। ঘ ৩। ক ৪। ঘ ৫। ঘ ৬। গ ৭। খ

সমাজকর্মের শাখা
(Branches of Social Work)

ইউনিট ২

ভূমিকা

সমাজকর্ম মানবিক সমস্যা মোকাবিলায় একটি বহুমুখী মানোবচিত (humanitarian) সাহায্যকারী পেশা। সমাজকর্ম সমাজস্থ ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির বহুমুখী সমস্যা সমাধানে জ্ঞান ও মূল্যবোধকে ভিত্তি করে কার্যকর সমাধানে প্রয়াস চালায়। বহুমুখী পেশা হিসেবে সমাজকর্ম অনুশীলনের কতগুলো বিশেষায়িত শাখা রয়েছে যা সমাজজীবনের জটিলতা বৃদ্ধির সাথে সাথে বিকাশ লাভ করেছে। যেমন– চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমস্যাগ্রস্তদের মনো-সামজিক সমস্যা মোকাবিলায় চিকিৎসা সমাজকর্ম গড়ে উঠেছে। এছাড়া সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম, বিদ্যালয় সমাজকর্ম, শিল্প সমাজকর্ম ইত্যাদি বিশেষায়িত শাখা রয়েছে। প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল এ সমাজে সামাজিক সমস্যার প্রকৃতি জটিল হওয়ার সাথে সাথে সমাজকর্মের বিশেষায়িত শাখাও সম্প্রসারিত হচ্ছে।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-২.১ : সমাজকর্মের বিভিন্ন শাখার পরিচিতি
পাঠ-২.২ : মানবিক সমস্যার ধারণা এবং এর সাথে সমাজকর্মের বিভিন্ন শাখার সম্পর্ক
পাঠ-২.৩ : চিকিৎসা সমাজকর্মের ধারণা ও ইতিহাস
পাঠ-২.৪ : চিকিৎসা সমাজকর্মের গুরুত্ব ও চিকিৎসা সমাজকর্মীর ভূমিকা
পাঠ-২.৫ : ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের ধারণা ও ইতিহাস
পাঠ-২.৬ : ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের গুরুত্ব ও ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মীর ভূমিকা
পাঠ-২.৭ : সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের ধারণা ও ইতিহাস
পাঠ-২.৮ : সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের গুরুত্ব ও সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মীর ভূমিকা
পাঠ-২.৯ : বিদ্যালয় সমাজকর্মের ধারণা ও ইতিহাস
পাঠ-২.১০ : বিদ্যালয় সমাজকর্মের গুরুত্ব ও বিদ্যালয় সমাজকর্মীর ভূমিকা
পাঠ-২.১১ : শিল্প সমাজকর্মের ধারণা ও ইতিহাস
পাঠ-২.১২ : শিল্প সমাজকর্মের গুরুত্ব ও শিল্প সমাজকর্মীর ভূমিকা
পাঠ-২.১৩ : জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মের ধারণা ও ইতিহাস
পাঠ-২.১৪ : জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মের গুরুত্ব ও প্রবীণকল্যাণে জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মীর ভূমিকা

পাঠ-২.১ সমাজকর্ম শাখার পরিচিতি (Introduction to Branches of Social Work)

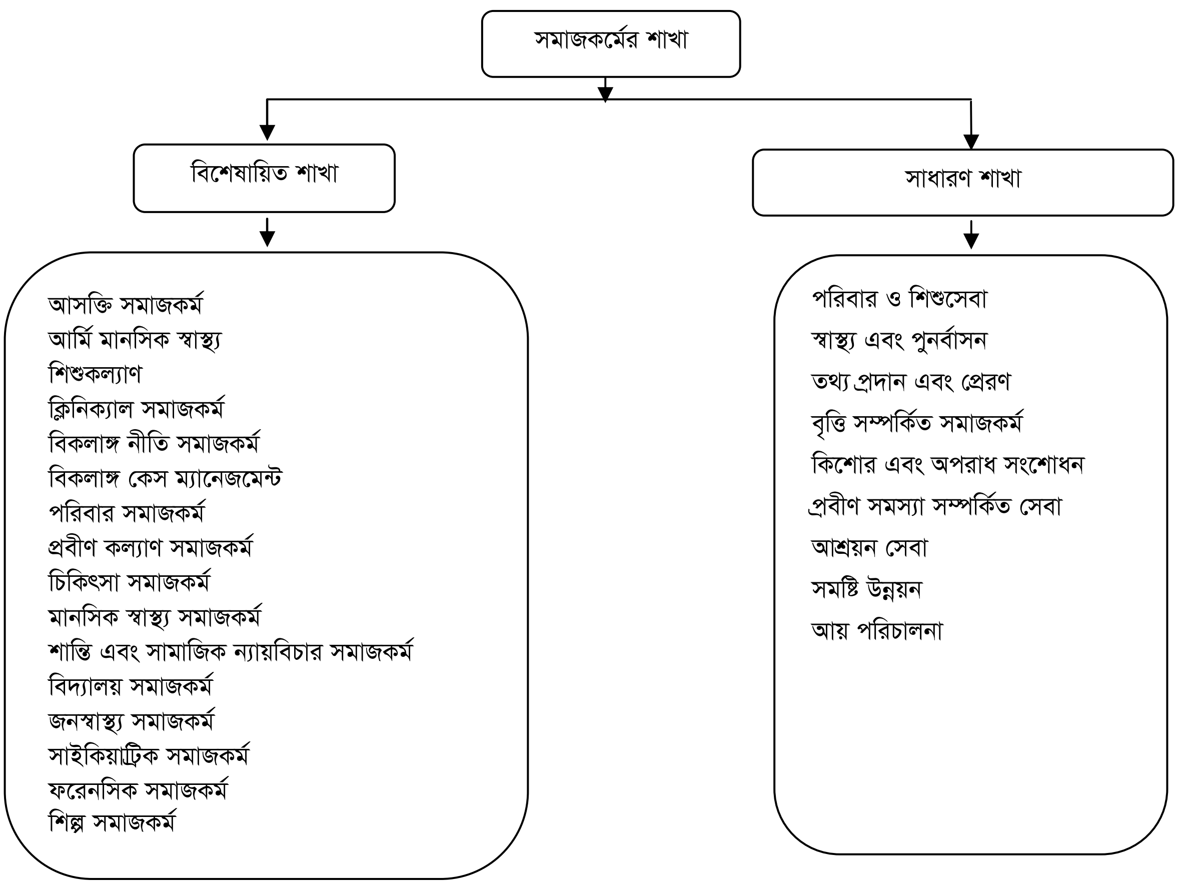
উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

২.১.১ সমাজকর্মরে বিভিন্ন শাখার পরিচিতি সম্পর্কে বলতে পারবেন।

২.১.১ সমাজকর্মের বিভিন্ন শাখার পরিচিতি

মানবজীবনের বহুমুখী সমস্যার সর্বোত্তম পন্থায় মোকাবিলায় সমস্যাগ্রস্তদের সক্ষম করতে সমাজকর্মীরা বিভিন্নরকম পেশাগত দায়িত্ব পালন করেন। বিভিন্ন ধরনের অনুশীলনক্ষেত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজকর্মের কতগুলো ক্ষেত্রকেন্দ্রিক সেবা কার্যক্রম বিকাশ লাভ করেছে। সমাজকর্মের বিশেষ বিশেষ সরাসরি সেবাপ্রদানের ক্ষেত্রকেন্দ্রিক সেবাকার্যক্রমকে সমাজকর্মের শাখা বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, পেশাদার সমাজকর্মের যেসব শাখায় সেবাদানকারী বা সমাজকর্মীরা পেশাগত দায়িত্ব পালন করেন তাই সমাজকর্মের শাখা। যেমন– চিকিৎসা সমাজকর্ম, ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম, সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম, শিল্প সমাজকর্ম, বিদ্যালয় সমাজকর্ম, প্রবীণকল্যাণ সমাজকর্ম, গ্রামীণ সমাজকর্ম নামে শাখা রয়েছে। সমাজকর্মের শাখাকে দুই দিক থেকে বিবেচনা করা যেতে পারে। যেমন– ক) বিশেষায়িত শাখা যেমন– আসক্তি সমাজকর্ম (Addiction Social Work), বিদ্যালয় সমাজকর্ম (School Social Work) ইত্যাদি এবং খ) সাধারণ শাখা যেমন– মানসিক স্বাস্থ্য (Mental Health), পরিবার ও শিশুসেবা (Family and Child Care) ইত্যাদি। Elvira Craig De Silva *et. al.* (২০০৫) তাঁদের *"Practice in Health Care Setting"* গ্রন্থে নিম্নোক্তভাবে সমাজকর্মের শাখাসমূহ উপস্থাপন করেছেন–



চিত্র ২.১.১: সমাজকর্ম শাখা

সমাজকর্ম একটি বহুমুখী পেশা হিসেবে এর পরিধি ব্যাপক ও বিস্তৃত। ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সমস্যার সম্পর্কযুক্ত শাখায় সামজকর্মীর জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশলের মাধ্যমে সামস্যা সমাধানে গতিশীল ভূমিকা পালন করেন।

সারসংক্ষেপ

ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের বিশেষ ক্ষেত্রকেন্দ্রিক সেবাকার্যক্রমকে সমাজকর্মের শাখা বলা হয়। যেমন- চিকিৎসা সমাজকর্ম, ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম, সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম, মিলিটারী সমাজকর্ম ইত্যাদি। সমাজকর্মের পরিচিতি ব্যাপক ও বিস্তৃত হওয়ার ফলে সমাজকমের্র শাখাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। সমাজকর্মের বিশেষায়িত শাখা নয় কোনটি?

ক) সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম খ) বিদ্যালয় সমাজকর্ম
গ) মিলিটারী সমাজকর্ম ঘ) রোগীকল্যাণ সমাজকর্ম

২। সমাজকর্মের শাখাকে কয়টি দিকে ভাগ করা হয়?

ক) এক খ) দুই
গ) তিন ঘ) চার

পাঠ-২.২ মানবিক সমস্যার ধারণা এবং এর সাথে সমাজকর্মের সম্পর্ক (Concept of Human Problem and Relationship between Human Problems and Social Work)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

২.২.১ মানবিক সমস্যা ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২.২.২ মানবিক সমস্যার সাথে সমাজকর্মের বিভিন্ন শাখার সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।

২.২.১ মানবিক সমস্যা ধারণা

মানুষ ও সমস্যা অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। মানুষ থাকলে সমস্যাও থাকবে। তবে সব সমস্যাকে মানবিক সমস্যা বলা যায় না। মানবিক সমস্যা হলো এমন সমস্যা যা সমাজজীবন থেকে উদ্ভূত হয়ে সমাজস্থ মানুষের উপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে থাকে। যেমন– পিতা-মাতার স্নেহ-ভালোবাসার অভাবে শিশুর হীনমন্যতা, হতাশা ও একাকিত্ব থেকে মুক্তি পাবার জন্য বাড়ি থেকে পালায়ন ও রাস্তায় দিনযাপন শুরু এবং একসময় শিশুটি মাদক সেবন ও মাদক পাচারের সাথে যুক্ত হয়ে গেল। এক্ষেত্রে পারিবারিক বিশৃঙ্খলা, শিশুর আচরণিক সমস্যা, সমাজজীবনের সমস্যা, মাদকাসক্ত ও কিশোর অপরাধ সৃষ্টি হয়েছে যার ফলে সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। এই সমস্যা হচ্ছে মানবিক সমস্যা।

২.২.২ মানবিক সমস্যার সাথে সমাজকর্মের বিভিন্ন শাখার সম্পর্ক

সমস্যাগ্রস্ত মানুষের মানবিক সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মের বিভিন্ন শাখা গড়ে উঠেছে। সমাজকর্মের প্রতিটি শাখাই নির্দিষ্ট মানবিক সমস্যা মোকাবিলার লক্ষে প্রয়াস চালায়। সমজকর্ম হচ্ছে একটি মানবোচিত (humanitarian) সাহায্যকারী পেশা যা মানবিক সমস্যার পরিকল্পিত ও দীর্ঘস্থায়ী সমস্যা সমাধানে প্রচেষ্টা চালায়। সমাজস্থ মানুষের মানবিক সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের বিভিন্ন শাখার সহায়তা প্রয়োজন রয়েছে। মানবিক সমস্যার সাথে সমাজকর্মে বহুমুখী ও বিচিত্র শাখা সৃষ্টির সম্পর্ক গভীর। উদাহরণ দিলে বিষয়টি সহজে অনুধাবন করা যাবে। শিল্প কারখানার একজন শ্রমিকের দাম্পত্য কলহের দরুণ হতাশা, কর্মবিমুখতা ও বিরুপ মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে। যার ফলে তার মনে একসময় হীনমন্যতা ও জীবন সম্পর্কে অনীহার সৃষ্টি হতে পারে। এই হীনমন্যতার ও অনীহার দরুণ সে মাদকাসক্ত হতে পারে, অপরাধ প্রবণ হতে পারে অথবা কর্মস্থলে কম উৎপাদনশীল হতে পারে। অর্থাৎ পারিবারিক দারিদ্র্য, পারিবারিক সমস্যা, মানবিক আচরণিক সমস্যা এবং শ্রমিকের মানসিক সমস্যা থেকে বহুমুখী সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। এসব সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের বিভিন্ন শাখার জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করেত হবে। এখানে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম, শিল্প সমাজকর্ম, মানসিক স্বাস্থ্য সমাজকর্মের পাশাপাশি সরাসরি সেবা প্রদান শাখার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানে প্রয়াস চালাতে হবে। আরো একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে উপস্থাপন করা যায়। যেমন– যক্ষা রোগে আক্রান্ত একজন ব্যক্তি কিছু দিন যাবৎ হাসপাতালে ভর্তি আছেন। রোগীর শারীরিক অবস্থার চাইতে তার মানসিক অবস্থা খুবই নাজুক। তিনি পেশাগত জীবনে একজন কারখানার শ্রমিক। তার কারখানার কর্মপরিবেশ এবং আবাসস্থল অস্বাস্থ্যকর ফলে তিনি যক্ষা দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন। বর্তমানে তিনি হাসপাতালে সামঞ্জস্যবিধানে সক্ষম হচ্ছেন না বিধায় তাকে চিকিৎসা সমাজকর্মের আওতায় সেবা প্রদান করা হচ্ছে। তবে তার সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য তাকে শিল্প সমাজকর্মের আওতায় এবং সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের আওতায় সেবা প্রদান করতে হবে। কেননা চিকিৎসা সমাজকর্ম হাসপাতালের পরিবেশে সামঞ্জস্য বিধান করে রোগীর সমস্যা সমাধানে কাজ করে। অন্যদিকে মানসিক জটিল সমস্যার মূল কারণ নির্ণয় করে সমাজসেবা প্রদান করে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম। মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নয়নের কাজ করা সাইকিয়াট্রিক সামজকর্ম এবং শিল্পপরিবেশে শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব, শ্রমিকদের কল্যাণ ও শিল্প পরিবেশের উন্নয়ন এবং সমস্যা সমাধানে কাজ করে শিল্প সমাজকর্ম। মানবিক সমস্যার সাথে সমাজকর্মের বিভিন্ন শাখার বিস্তৃতি ও প্রসারের সম্পর্ক যেমন রয়েছে তেমনি মানবিক সমস্যার কার্যকর সমাধানে বিভিন্ন শাখার সমন্বিত প্রয়োগেরও সম্পর্ক রয়েছে।

সারসংক্ষেপ

মানবিক সমস্যার সমাধানে সমাজকর্মের বিভিন্ন শাখার মধ্যকার সম্পর্ক বিদ্যমান। মানবিক সমস্যার সমাধান সমাজকর্মের একক কোন শাখার জ্ঞান ও দক্ষতার সাথে সম্পর্কিত হয়। সমাজজীবনে সমস্যার বিস্তৃতির সাথে সাথে সমাজকর্ম শাখারও প্রসার ঘটছে। সুতরাং বলা যায় মানবিক সমস্যার সাথে সমাজকর্মের বহুমুখী ও বিচিত্র শাখা সৃষ্টির সম্পর্ক গভীর।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। নিচের কোনটি মানবিক সমস্যা?

ক) রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা
খ) রাজনৈতিক সহিংসতা
গ) বৈশ্বিক উষ্ণতা
গ) পারিবারিক কলহ

পাঠ-২.৩ চিকিৎসা সমাজকর্মের ধারণা ও ইতিহাস (Concept and History of Medical Social Work)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

২.৩.১ চিকিৎসা সমাজকর্মের ধারণাটি বর্ণনা করতে পারবেন।
২.৩.২ চিকিৎসা সমাজকর্মের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসমূহ লিখতে পারবেন।
২.৩.৩ চিকিৎসা সমাজকর্মের ঐতিহাসিক বিবর্তন আলোচনা করতে পারবেন।

২.৩.১ চিকিৎসা সমাজকর্মের ধারণা

চিকিৎসা সমাজকর্ম হলো আধুনিক সমাজকর্মের অন্যতম প্রায়োগিক শাখা, যে শাখায় সমাজকর্মীরা চিকিৎসা গ্রহণকারী সমস্যাগ্রস্ত রোগীদের মনো-সামাজিক সামঞ্জস্যহীনতা অসমতা বা আংশিক অক্ষমতা এবং আবেগীয় ও মানসিক সামঞ্জস্যহীনতা প্রতিকার ও প্রতিরোধে সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মুল্যবোধ ও পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকে। চিকিৎসা সমাজকর্মের সংজ্ঞায় R.A. Skidmore and M.G. Thakery (১৯৬৪:৭২) তাঁদের æIntroduction to Social Work” গ্রন্থে বলেছেন,“স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভঙ্গি, মূল্যবোধ এবং পদ্ধতি প্রয়োগ করাকেই চিকিৎসা সমাজকর্ম বলা হয়”। আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্ম সমিতির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, “চিকিৎসা সমাজকর্ম হলো সমাজকর্মের তত্ত্ব ও পদ্ধতির পেশাগত অনুশীলন যা মনো-সামাজিক সামঞ্জস্যহীনতা, অসমতা বা আংশিক অক্ষমতা অথবা আবেগীয় ও মানসিক ভারসাম্যহীনতার প্রতিকার ও প্রতিরোধ কল্পে প্রয়োগ করা হয়।”

সুতরাং বলা যায়, চিকিৎসা সমাজকর্ম সমাজকর্মের এমন একটি বিশেষ শাখা, যার মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান, কৌশল এবং পদ্ধতি প্রয়োগ করে রোগীকে তার আওতাধীন চিকিৎসা সুযোগ-সুবিধার পূর্ণতম ব্যবহারের মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপনে সহায়তা করা হয়।

২.৩.২ চিকিৎসা সমাজকর্মের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে

চিকিৎসা সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে চিকিৎসাধীন রোগীর সমাজ, পরিবার ও ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে হাসপাতাল, চিকিৎসক, নার্সসহ সংশ্লিষ্টদের কাজের সমন্বয় সাধন করে দলীয় কর্মের (team work) মাধ্যমে চিকিৎসায় সহায়তা করা। এ প্রসঙ্গে আমেরিকার চিকিৎসা সমাজকর্মী সমিতি উল্লেখ করেছে, “চিকিৎসা সমাজকর্ম রোগীর সার্বিক সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চালায় না। এটি শুধু সেসব সামাজিক উপাদান বিশ্লেষণ করে, যেগুলো প্রত্যক্ষভাবে রোগীর অসুস্থতা এবং চিকিৎসার বাধা হিসেবে দেখা দেয়। এগুলোকে "Social Component of Illness” বা “রোগের সামাজিক উপাদান” হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

২.৩.৩ চিকিৎসা সমাজকর্মের ঐতিহাসিক বিবর্তন

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে চিকিৎসা সমাজকর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটে। ১৮৮৩ সালে ইংল্যান্ডে একটি মানসিক হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসা পরবর্তী দেখাশোনা করার মাধ্যমেই এ কার্যক্রমের সূত্রপাত ঘটে। চার্লস এস. লক (Charls S. Loch) এর নেতৃত্বে ১৮৯০ সালে Lady Almonors in England Hospital-এ ফ্রি চিকিৎসা নেয়ার জন্য আবেদনকারী রোগীদের মানসিক অবস্থা তদন্ত করার মাধ্যমে চিকিৎসা সমাজকর্মের অগ্রযাত্রায় আরেকটি মাত্রা সংযোজিত হয়। লন্ডনের রয়্যাল ফ্রি হাসপাতালে ১৮৯৫ সালে প্রথম লেডি আলমোনারস (Lady Almomers) নিয়োগ করা হয়। যাদেরকে চিকিৎসা সমাজসেবিকা হিসেবে অবিহিত করা হতো। ১৯০২ সালে জন হপকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. চালর্স পি. ইমারসন (Dr. Charles P. Emerson) মেডিক্যাল শিক্ষার্থীদের সামাজিক প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ দানের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ফলে চিকিৎসা শিক্ষার অংশ হিসেবে সামাজিক ও আবেগীয় সমস্যা অন্তর্ভুক্ত হয়। এর মাধ্যমে মেডিক্যাল শিক্ষার্থীরা রোগের সাথে রোগীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে বাস্তব জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হয়। পরবর্তীতে ১৯০৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বোষ্টন শহরে Massachusetts General Hospital এর ড. রিচার্ড ক্লার্ক ক্যাবট (Dr. Richard

Clarke Cabot) এর উদ্যোগে প্রথম চিকিৎসা সমাজকর্মের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। যার ফলে ইংল্যান্ড এবং আমেরিকার বিভিন্ন হাসপাতালে সুষ্ঠু চিকিৎসার স্বার্থে চিকিৎসা সমাজকর্মীদের নিয়োগ বৃদ্ধি পায়। ১৯১৮ সালে আমেরিকায় চিকিৎসা সমাজকর্ম সমিতি গঠনের মাধ্যমে এটি পূর্ণাঙ্গ রূপ লাভ করে। ১৯৪৫ সালে বৃটেনে ইনস্টিটিউট অব আলমনারস (Institute Almoners) নামে চিকিৎসা সমাজকর্মীদের একটি সংগঠন গঠিত হয়। পরবর্তিতে ১৯৬৪ সালে এর নাম পরিবর্তন করে ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সোশ্যাল ওয়ার্কারস (Institute of Medical Social Workers) করা হয়। উল্লেখ্য এ সংগঠনটি ১৯৭০ সালে গঠিত ব্রিটিশ সমাজকর্মী সংস্থার (British Social Workers) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সংগঠন। উন্নত বিশ্বের ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে উন্নয়নশীল দেশে চিকিৎসা সমাজকর্ম ধারণার সূত্রপাত ঘটে। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ১৯৫৮ সালে চিকিৎসা সমাজকর্মের যাত্রা শুরু হয়। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর চিকিৎসা সহায়তার জন্য হাসপাতাল সামাজসেবা কার্যক্রমের লক্ষ্যে ৪১৯ টি উপজেলায় হেলোথ কমপ্লেক্সে এই কার্যক্রমের আওতায় রোগীকল্যাণ সমিতি কাজ করছে। বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলায় ৯৫টি হাসপাতালে চিকিৎসা সমাজকর্ম ‘হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম’ নামে পরিচালিত হচ্ছে।

সারসংক্ষেপ

চিকিৎসা সমাজকর্ম হচ্ছে আধুনিক সমাজকর্মের অন্যতম একটি প্রায়োগিক শাখা যা দলীয় কর্মের (team work) মাধ্যমে রোগীর অসুস্থতা ও চিকিৎসার বাধা হিসেবে আবির্ভূত সামাজিক উপাদানসমূহ দূর করে থাকে। ১৯০৫ সালে Dr. Richard Clarke Cabot এর উদ্যোগে সর্বপ্রথম চিকিৎসা সমাজকর্মের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯১৮ সালে আমেরিকায় চিকিৎসা সমাজকর্মী সমিতি গঠনের মাধ্যমে এটি পূর্ণাঙ্গ পেশাগত রূপ লাভ করে। বাংলাদেশে চিকিৎসা কমাজকর্ম হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম নামে পরিচালিত হচ্ছে যার যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৫৮ সালে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। চিকিৎসা সমাজকর্মের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয় কবে?

ক) ১৯০৪ সালে খ) ১৯০৫ সালে
গ) ১৯০৬ সালে ঘ) ১৯০৭ সালে

২। চিকিৎসা সমাজকর্মীর সর্বপ্রথম পেশাগত সংগঠন কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?

ক) ইংল্যান্ড খ) আমেরিকা
গ) অস্ট্রেলিয়া ঘ) বাংলাদেশ

পাঠ-২.৪ চিকিৎসা সমাজকর্মের গুরুত্ব ও চিকিৎসা সমাজকর্মীর ভূমিকা (Importance of Medical Social Work and the Role of Medical Social Worker)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

২.৪.১ চিকিৎসা সমাজকর্মের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

২.৪.২ চিকিৎসা সমাজকর্মীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২.৪.১ চিকিৎসা সমাজকর্মের গুরুত্ব

চিকিৎসা সমাজকর্ম আধুনিক সমাজকর্মের অন্যতম সংযোজন। এ শাখায় সমাজকর্মীরা প্রত্যক্ষভাবে চিকিৎসা ক্ষেত্রে রোগ নিরাময় এবং পুনর্বাসন কার্যক্রমের মাধ্যমে সেবাদান করে থাকে। চিকিৎসা ক্ষেত্রে সমাজকর্মী রোগীর পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যবিধানে মানসিক সমর্থন প্রদান এবং প্রয়োজনীয় বস্তুগত ও অবস্তুগত সেবার মাধ্যমে সক্ষম করে তোলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ কারণে চিকিৎসা সমাজকর্মের গুরুত্ব দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। চিকিৎসা সমাজকর্মীর বা দলীয় কর্ম-প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে রোগের আর্থ-সামাজিক কারণ উদ্‌ঘাটন ও যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। রোগীর রোগ নিরাময়ে চিকিৎসাসেবাকে অর্থবহ ও ফলপ্রসূ করতে চিকিৎসককে সর্বোতভাবে সহায়তা করতে চিকিৎসা সমাজকর্মের গুরুত্ব অত্যাধিক। চিকিৎসা সমাজকর্ম অনুশীলনে চিকিৎসকের চিকিৎসাদান প্রক্রিয়া গতিশীল হয়। যার ফলে রোগী দ্রুত নিরাময় লাভ করে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে যেতে পারে।



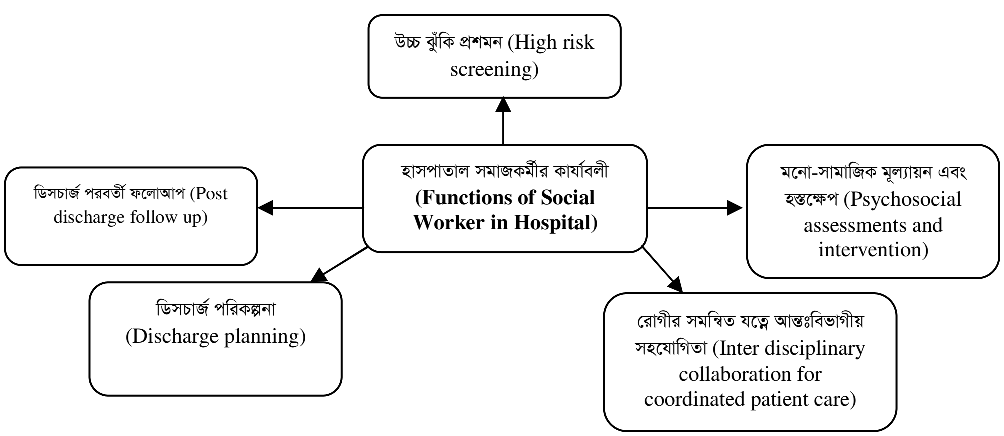
চিত্র ২.৪.১ : চিকিৎসা সমাজকর্মের গুরুত্ব

Elizabeth A. Segal et al. (2007:224) তাঁদের *''An Introduction to the Profession of Social Work : Becoming a Change Agent''* গ্রন্থে চিকিৎসা সমাজকর্মীর ভূমিকাকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যথা– গভীর যত্ন (acute care), চলিষ্ণু যত্ন (ambulatory care) এবং দীর্ঘকালীন যত্ন (long term care)। এক্ষেত্রে দুটি ভূমিকার কথা উল্লেখ করেছেন–

এক. জটিলতর তত্ত্বাবধান ব্যবস্থা হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সাহায্যার্থী এবং তাদের পরিবারকে অধিকতর সাহায্য করা যাতে করে তারা অতি দ্রুত সমস্যা সমাধান করতে পারে (Helping clients and their families more through an effectivity deal with a complex system of care so that they can return home as soon as possible.)।

দুই. স্বাস্থ্য সেবা প্রদানে সর্বজনীন প্রাপ্যতা ও জবাবদিহিতার এবং পরিবর্ধিত কার্যকারিতায় পরামর্শ দান। (Advocating for universal availability and accunibility and increased effectiveness in delivery of health care services.)।

S. S. Dhooper (1998) তাঁর "*Social Work in Health Care in the 21st Century*" -তে হাসপাতাল সমাজকর্মীর কার্যাবলী সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছেন তা নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো :



চিত্র ২.৪.১ : হাসপাতাল সমাজকর্মীর কার্যাবলী

আধুনিক শিল্পযুগে মানবিক ও সামাজিক বিষয়াদি রোগীর রোগ সৃষ্টি, রোগের কারণ ও প্রভাব বিস্তারের সাথে ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কযুক্ত। চিকিৎসাধীন রোগীর মানবিক, সামাজিক ও অন্যান্য দিকের উপর গুরুত্ব দিয়ে চিকিৎসা সমাজকর্মীরা রোগীর কার্যকর সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে, আব্দুল মিঞা যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি আছেন। চিকিৎসক যক্ষা রোগ নিরাময়ে ঔষধ দিচ্ছেন। কিন্তু তার রোগ নিরাময় বিলম্বিত হচ্ছে। আব্দুল মিঞার যক্ষার চিকিৎসা অনুসন্ধান করে জানা গেল তিনি হাসপাতালের পরিবেশে খাপ খাওয়াতে পারছেন না। তাছাড়া তিনি এই ধারণা পোষণ করেছেন যে, তিনি খুব শীঘ্রই মারা যাবেন। তিনি মানসিকভাবেও দুর্বল হয়ে পড়েছেন। এক্ষেত্রে চিকিৎসা সমাজকর্মী তার সমস্যা সামাধানে সমর্থনমূলক চিকিৎসা প্রদান করে রোগীর রোগ নিরাময়ে ভূমিকা পালন করতে পারেন।

২.৪.২ চিকিৎসা সমাজকর্মীর ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বে চিকিৎসক বিজ্ঞানের প্রয়োগের ক্ষেত্রে চিকিৎসা কমাজকর্ম একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। চিকিৎসা সমাজকর্মী হাসপাতালে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার সম্ভাব্য সর্বোত্তম ব্যবহারে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমে রোগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সামাজিক উপাদান দূরীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। Russel H. Kurtz (১৯৬৯:৩৭৮) নিম্নোক্তভাবে *''The Social Work Year Book-1960''*-এ চিকিৎসা সমাজকর্মীর ভূমিকা তুলে ধরেছেন:

১. রোগীর সামাজিক অবস্থাকে কৃতিত্বপূর্ণভাবে সংজ্ঞায়িতকরণ;
২. রোগীর রোগের উৎপত্তি ও চিকিৎসার উপর প্রভাব বিস্তারকারী সামাজিক শক্তি ও উপাদানসমূহ চিহ্নিতকরণ;
৩. রোগীর রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব বিস্তারকারী উপাদানসমূহ পরিবর্তনের জন্য হস্তক্ষেপের উপযুক্ত পদক্ষেপ নির্বাচন;
৪. যৌথ চিকিৎসা পরিচালনা ও চিকিৎসার ফলাফল মূল্যায়নে অংশগ্রহণ; এবং
৫. যৌথ চিকিৎসা পরিকল্পনার লক্ষ্য ও কাঠামোর সাথেই সামাজিক চিকিৎসার বাস্তবায়ন।

চিকিৎসা সমাজকর্মের গুরুত্ব ও কার্যাবলী প্রসঙ্গে Dova Goldstine (১৯৫২:১১৮) তাঁর গ্রন্থ "*Reading in the Theory and Practice of Medical Social Work*" -এ ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমাজকর্ম অনুশীলন করা একজন চিকিৎসা সমাজকর্মীর প্রাথমিক কাজ উল্লেখ করেছেন। চিকিৎসা সমাজকর্মীরা প্রধানত পাঁচ ধরনের কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকেন তা হলো:

১. ব্যক্তি সমাজকর্ম অনুশীলন (Practicing social casework);
২. চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানে কর্মসূচি-পরিকল্পনা এবং নীতি নির্ধারণে অংশগ্রহণ (Participation in program-planning and policy formulation within the medical institution);
৩. সমষ্টিতে সামাজিক ও স্বাস্থ্য কর্মসূচি উন্নয়নে অংশগ্রহণ (Participation in the development of social and health programme in the community);
৪. পেশাগত কর্মকর্তাদের শিক্ষামূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ (Participation in the educational program for professional personnel); এবং
৫. সামাজিক গবেষণা পরিচালনা (Carrying out Social research)।

চিকিৎসা সমাজকর্মীরা রোগীর অসুস্থতা, শারীরিক অসুবিধা এবং চিকিৎসার সাথে সম্পৃক্ত সামাজিক প্রয়োজন ও সমস্যা নিয়ে কাজ করে থাকেন। চিকিৎসার সাথে সম্পর্কিত অন্যান্য পেশাদারদের সাথে বহুমুখী সেবার অপরিহার্য অংশ হিসেবে তারা কাজ করেন। সমাজে বিদ্যমান চিকিৎসা ও সামজসেবার মধ্যে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে তারা সংযোগকারী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। Dr. D. Paul Chowdhry (১৯৮১:১৭৬-১৭৭) তাঁর *''A Handbook of Social Welfare''* গ্রন্থে চিকিৎসা কমাজকর্মীর ১৬টি ভূমিকা উল্লেখ করেছেন তা হলো :

১. রোগীকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সেবা দান;
২. স্বাস্থ্যসেবার যৌথ পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে সেবার সাথে সংশ্লিষ্ট সামাজিক ও আবেগীয় বিষয়াবলী ডাক্তারের নিকট ব্যাখ্যা করা;
৩. রোগের ইতিহাসসহ রোগীর ব্যক্তিগত তথ্যাবলী রক্ষণাবেক্ষণ করা;
৪. মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা, চিত্তবিনোদনমূলক কর্মকাণ্ড, লাইব্রেরির সুযোগ, সখ এবং কিছু কিছু হস্তশিল্পের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি প্রদান করা;

৫. হাসপাতালের নিয়মকানুন এবং বিভিন্ন বিভাগের সাথে যোগাযোগ ও আবেদনের প্রক্রিয়া সম্পর্কে রোগীকে অবগত করতে সহায়তা করা যাতে সেবা লাভে কোনো অসুবিধা না হয়;
৬. যেসব রোগী ছাড়পত্র পাচ্ছে তাদের জন্য আফটার কেয়ার সার্ভিস ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। বিভিন্ন বিষয়ে রোগীকে প্রশিক্ষণ প্রদান এবং সমাজে বিদ্যমান সেবার মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;
৭. সমাজকর্মী কর্তৃক গৃহ পরিদর্শনের মাধ্যমে রোগীর সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে অবগত হয়ে ডাক্তারের কাছে ব্যাখ্যা করা এবং রোগের কারণে সৃষ্ট নতুন পরিস্থিতির সাথে খাপ খাওয়াতে পরিবারকে সহায়তা করা;
৮. রোগী ও তার পরিবারের চাহিদামত আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য যেমন– যন্ত্রপাতি ও পোশাক প্রদান করা এবং সমাজস্থ কল্যাণমূলক এজেন্সীর মাধ্যমে রোগীর পরিবারের অন্যান্য প্রয়োজন পূরণ করা;
৯. হাসপাতালের স্টাফ, নার্স, ডাক্তার, থেরাপিস্টসহ অন্যান্যদের ওরিয়েন্টশন, চাকুরীকালীন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা এবং চিকিৎসা সেবায় প্রভাব বিস্তারকারী সামাজিক এবং আবেগীয় উপাদান সম্পর্কে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা;
১০. স্বেচ্ছাসেবকদের সেবার মান সদ্ব্যবহারের ব্যবস্থা করা;
১১. বহিঃবিভাগ ও রোগী ভর্তির ক্ষেত্রে ডাক্তারকে সহায়তা করা;
১২. ডাক্তারদের সাথে আলোচনা ও যৌথ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এবং হাসপাতালের নীতি নির্ধারণে অংশগ্রহণ করা;
১৩. চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের তথ্য কেন্দ্র সমূহের পরিচালনা ও সদ্ব্যবহার করা;
১৪. যথাযথভাবে সামঞ্জস্য ও পুনঃসামঞ্জস্যবিধানে রোগীর পরিবারের সাথে কাজ করা;
১৫. স্বাস্থ্যশিক্ষা কর্মসূচিতে ভূমিকা পালন করা; এবং
১৬. চিকিৎসা ক্ষেত্রে সামাজিক গবেষণা পরিচালনা করা।

সুতরাং বলা যায়, চিকিৎসা সমাজকর্মী চিকিৎসা ক্ষেত্রে বহুমুখী ভূমিকা পালন করেন। চিকিৎসা পূর্বকালীন, চিকিৎসা চলাকালীন এবং চিকিৎসা পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ সার্বিক চিকিৎসাদান প্রক্রিয়াকে গতিশীল করার ক্ষেত্রে চিকিৎসা সমাজকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

সারসংক্ষেপ

চিকিৎসা সমাজকর্ম সমাজকর্মের একটি অপরিহার্য অঙ্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত। চিকিৎসা ক্ষেত্রে রোগীকে সামঞ্জস্যবিধান, মানসিক সমর্থন প্রদান, প্রয়োজনীয় বস্তুগত এবং অবস্তুগত সম্পদের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করে কাঙ্খিত সামাজিক ভূমিকা পালন সক্ষম করতে চিকিৎসা সমাজকর্মী গতিশীল ভূমিকা পালন করে থাকেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। নিচের কোনটি চিকিৎসা সমাজকর্মের আওতাভুক্ত?

ক) রোগীর প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা নিরীক্ষা করা
খ) রোগীকে ঔষধ নির্দেশ করা
গ) রোগীকে হাসাপাতাল পরিবেশে সামঞ্জস্যবিধানে সক্ষম করা
ঘ) রোগীর মনোচিকিৎসা করা

পাঠ-২.৫ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের ধারণা ও ইতিহাস (Concept and History of Clinical Social Work)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

২.৫.১ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম ধারণাটি লিখতে পারবেন।

২.৫.২ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।

২.৫.১ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের ধারণা

'ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম' হচ্ছে সমাজকর্ম পেশার একটি বিশেষায়িত শাখা। প্রকৃতপক্ষে 'Clinical' বা ক্লিনিক্যাল শব্দটি গ্রীক Kline শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে যার অর্থ হচ্ছে কোনো কিছুর পাশে (at the beside)। অনেকে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম পরিভাষাটি ব্যক্তি সমাজকর্ম অথবা মনোচিকিৎসা সমাজকর্ম অর্থে ব্যবহার করলেও প্রকৃত অর্থে এগুলোর সঙ্গে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের কর্মপরিধিগত বেশ পার্থক্য রয়েছে। ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের প্রাথমিক ফোকাস হচ্ছে মানসিক, আবেগীয়, মনো-সামাজিক ও আচরণগত কল্যাণ নিশ্চিত করা।

সাধারণ ভাষায়, ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম হচ্ছে সমাজকর্মের প্রত্যক্ষ অনুশীলনের এক বিশেষায়িত রূপ যার মাধ্যমে ব্যক্তি, দল, পরিবার ও সমষ্টির মানসিক, আবেগীয় ও মনো-সামাজিক সামঞ্জস্যহীনতা দূর করে সার্বিক কল্যাণ নিশ্চিত করা হয়। Robert L. Barker (২০০৩) প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী, "ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম হলো মানসিক ও সামাজিক সামঞ্জস্যহীনতা, বিকলঙ্গতা অথবা আবেগীয় ও মানসিক ভারসাম্যহীনতার মতো অক্ষমতার প্রতিকার এবং প্রতিরোধে সমাজকর্মের তত্ত্ব ও পদ্ধতির পেশাগত অনুশীলন (Clinical Social Work is the professional application of social work theory and methods to the treatment and prevention of psychosocial dysfunction, disability or impairment, including emotional and mental disorders.)।"

সুতরাং বলা যায়, ক্লিনিক্যাল সামজকর্ম হচ্ছে সমাজকর্মের সেই শাখা যা সমস্যাগ্রস্তদের শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিবৃত্তিক, আবেগীয় ও মনো-সামাজিক সমস্যাদি সমাধানের লক্ষে সেবা প্রদান করে থাকে। এই সেবা কার্যক্রম সমস্যা মূল্যায়ন (assessment), সমস্যা নির্ণয় (diagnosis) এবং সমস্যা সমাধান– সাইকো থেরাপি, কাউন্সিলিং (treatment-psychotherapy, counseling) নিয়ে আবর্তিত হয়ে থাকে।

২.৫.২ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের ইতিহাস

প্রকৃতপক্ষে সমাজকর্মের পেশাগত বিকাশের সাথে সাথে এর বিভিন্ন বিশেষায়িত শাখাসমূহেরও বিকাশ হতে থাকে। ১৯৬১ সালে NASW ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মকে প্রাইভেট প্র্যাকটিসের জন্য অনুমোদন দেয় এবং ১৯৬৭ সালে 'হ্যান্ডবুক অন দি প্রাইভেট প্র্যাকটিস অব সোশ্যাল ওয়ার্ক'-এ এই সংক্রান্ত দিকনির্দেশনা প্রদান করে। পরবর্তীতে ১৯৭৮ সালে NASW ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মকে আনুষ্ঠানিকভাবে সমাজকর্মের বিশেষায়িত শাখা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং এ বিষয়ে একটি টাস্কফোর্স গঠন করে। যার ফলাফল স্বরুপ ১৯৮২ সালে 'প্রোভিশনাল কাউন্সিল অন ক্লিনিক্যাল সোশ্যাল ওয়ার্ক' গঠিত হয়, যা ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। পরবর্তীতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে "ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম" সমাজকর্মের একটি বিশেষায়িত শাখা হিসেবে প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি লাভ করে।

সারসংক্ষেপ

ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম হচ্ছে সমাজকর্মের একটি বিশেষ শাখা যা মানসিক ও সামাজিক সামঞ্জস্যহীনতা, বিকলাঙ্গতা অথবা আবেগীয় ভারসাম্যহীনতার মতো অক্ষমতার প্রতিকার ও প্রতিরোধে সমাজকর্মের তত্ত্ব ও পদ্ধতি প্রয়োগ করে। সর্বপ্রথম ১৯৬১ সালে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম ধারণাটির সূত্রপাত ঘটে। পরবর্তীতে ১৯৭৮ সালে NASW ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মকে আনুষ্ঠানিকভাবে সমাজকর্মের বিশেষায়িত শাখা হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। 'Clinical' ক্লিনিক্যাল শব্দটি কোন শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে?

ক) Kline খ) Cline

গ) Klinic ঘ) Clinic

২। 'Kline' শব্দটি কোন ধরনের শব্দ?

ক) গ্রীক খ) ল্যাটিন

গ) স্প্যানিশ ঘ) জার্মানি

পাঠ-২.৬ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের গুরুত্ব ও ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মীর ভূমিকা (Importance of Clinical Social Work and The Role of Clinical Social Worker)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

২.৬.১ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

২.৬.২ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২.৬.১ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের গুরুত্ব

সমাজকর্ম অনুশীলনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম অনুশীলন করা হয়ে থাকে। ব্যক্তি, পরিবার এবং ছোট দলের মানসিক ও সামাজিক ভূমিকা শক্তিশালী ও সংরক্ষণে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের তাৎপর্য অত্যাধিক। ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম আন্তঃব্যক্তিক মিথস্ক্রিয়া, মানসিক গতিশীলতা, জীবনমুখী সমর্থন এবং ব্যবস্থাপনা বিষয়াদি পরিচালনার মাধ্যমে সমাস্যার সমাধানে সামাজিক হস্তক্ষেপের প্রচেষ্টা চালায়। উল্লিখিত ক্ষেত্রে সমস্যা নির্ণয় এবং সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মে সেবা প্রদান করা হয় - যা গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের অন্তভুর্ক্ত সেবাসমূহ হলো মানসিক চিকিৎসা, পরামর্শসেবা, সেবা গ্রহীতা কেন্দ্রিক উপদেশ, উপদেষ্টা সেবা এবং মূল্যায়ন। সামাজিক হস্তক্ষেপ হচ্ছে সমাজকর্মের অন্যতম কৌশল। সমাজকর্মের প্রত্যক্ষ ও সরাসরি হস্তক্ষেপের বিশেষ কৌশল হলো ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম। দাম্পত্য কলহ ও পারিবারিক দ্বন্দ্ব নিরসন, মাদকাসক্তি নিরাময় ও অপরাধপ্রবণ আচরণ সংশোধন ইত্যাদি ক্ষেত্রে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম অনুশীলিত হয়। সমাজের বহুমুখী মানবীয় সমস্যা সমাধানে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের প্রয়োগ লক্ষণীয়। ফলে স্বাস্থ্য ও মানসিকসেবা এজেন্সি, স্কুল, পরিবার ও শিশুকল্যাণ এজেন্সি, প্রবীণসেবা এজেন্সি, অপরাধ সংশোধনী এজেন্সিসহ বিভিন্ন সেবামুখী এজেন্সিতে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম অনুশীলন বৃদ্ধি পাচ্ছে।



চিত্র ২.৬.১ : ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম

২.৬.২ ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মীর ভূমিকা

মানবীয় সমস্যা ও দুর্দশার অনেক দিক ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের পরিধিভুক্ত। বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে সমস্যাগ্রস্তদের সমস্যা সমাধানে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মী কার্যকর ভূমিকা পালন করে। ক্লিনিক্যাল সমাজককর্মী দৈহিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ, পরিত্যক্ত, বঞ্চিত এবং সহিংসতায় শিকার মানবগোষ্ঠী, উদ্বাস্তু, বেকার, দুর্বল এবং অসহায় প্রবীণ জনগোষ্ঠী এবং গৃহহীনদের নিয়ে কাজ করে থাকে। বর্তমান সমাজের বহুমুখী মানবীয় সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মীরা ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের জ্ঞান প্রয়োগ করছে।

সারসংক্ষেপ

বর্তমান সমাজে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মের পরিধি ও প্রয়োগক্ষেত্র ব্যাপক ও বিস্তৃত। মানবীয় সমস্যা ও দুর্দশা নিরসনে ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। কোনটি সমাজকর্মের প্রত্যক্ষ ও সরাসরি হস্তক্ষেপের বিশেষ কৌশল?

ক) ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম খ) চিকিৎসা সমাজকর্ম

গ) সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম ঘ) স্কুল সমাজকর্ম

পাঠ-২.৭ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের ধারণা ও ইতিহাস (Concept and History of Psychiatric Social Work)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

২.৭.১ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
২.৭.২ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের ইতিহাস বর্ণনা করতে পারবেন।

২.৭.১ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের ধারণা

সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম সমাজকর্মের একটি বিশেষ শাখা যা মানসিক স্বাস্থ্যসেবায় আনুশীলন করা হয়। সর্বপ্রথম ১৯০৭ সালে আমেরিকার নিউইয়র্কে সাইকিয়াট্রিক সমাজকমের্র যাত্রা শুরু হয়। মানসিক হাসপাতাল পরিবেশে মানসিক স্বাস্থ্য সেবাদানের ক্ষেত্রে সমাজকর্মের যে শাখা কাজ করে সে শাখাকে সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম বলা হয়।

সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) সংজ্ঞানুযায়ী, "সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম হলো মানসিক স্বাস্থ্যসেবাকেন্দ্রে সমাজকর্মের প্রয়োগ।" সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মী মনোচিকিৎসক এবং মানসিক স্বাস্থ্যসেবা কর্মীদলের অন্যান্য সদস্যদের সহযোগে মনোচিকিৎসা ও অন্যান্য সমাজসেবার ব্যবস্থা করে থাকেন। তিনি একই উদ্দশ্যে রোগীর পরিবারের সদস্যদের সাথে কাজ করে থাকেন। সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মীরা সাধারণত সমাজকর্মের স্নাতকোত্তর ডিগ্রি বা উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন এবং মনস্তাত্ত্বিক সমস্যার সেবার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হয়ে থাকেন। সুতরাং বলা যায়, সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম হলো মানসিক স্বাস্থ্যসেবায় সমাজকর্মের জ্ঞান, তত্ত্ব ও দক্ষতা প্রয়োগের একটি শাখা।

২.৭.২ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের ইতিহাস

আমেরিকার নিউইয়র্ক সিটি হাসপাতালে ১৯০৭ সালে সর্বপ্রথম সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মী নিয়োগ করা হয়। পরবর্তীতে ১৯২৬ সালে সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মীদের পেশাগত সংগঠন আমেরিকান এসোসিয়েশন অব সাইকিয়াট্রিক সোশ্যাল ওয়ার্কাস গঠিত হয়। এরপর ১৯৫৫ সালে উক্ত সংগঠনটিকে আমেরিকার ন্যাশনাল এসোসিয়েশন অব সোশ্যাল ওয়ার্কাস (NASW) এর সাথে সমন্বিত করা হয়। পরিশেষে বলা যায়, বর্তমান শিল্পসমাজে ব্যক্তি এবং পরিবেশের মিথস্ক্রিয়া থেকে সৃষ্ট মানসিক অসুস্থতা মোকাবিলায় সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের প্রয়োগ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সারসংক্ষেপ

সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম সমাজকর্মের একটি বিশেষ শাখা যা মানসিক স্বাস্থ্যসেবায় আনুশীলন করা হয়। আমেরিকার নিউইয়র্ক সিটি হাসপাতালে ১৯০৭ সালে সর্বপ্রথম সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের পেশাগত যাত্রা শুরু হয়। পরবর্তীতে ১৯২৬ সালে সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মীদের পেশাগত সংগঠন আমেরিকান এসোসিয়েশন অব সাইকিয়াট্রিক সোশ্যাল ওয়ার্কাস গঠিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। কত সালে সর্বপ্রথম সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের পেশাগত যাত্রা শুরু হয়?

ক) ১৯০৬ সালে খ) ১৯০৭ সালে
গ) ১৯০৮ সালে ঘ) ১৯০৯ সালে

পাঠ-২.৮ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের গুরুত্ব ও সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মীর ভূমিকা (Importance of Psychiatric Social Work and the Role of Psychiatric Social Worker)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

২.৮.২ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের গুরুত্ব সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
২.৮.২ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মীর ভূমিকা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

২.৮.১ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের গুরুত্ব

বর্তমানে মানবীয় সমস্যার অন্যতম দিক হচ্ছে মানসিক সমস্যা বা মানসিক ব্যাধি। চিকিৎসক এবং মনোচিকিৎসক অসুস্থতার চিকিৎসা করে থাকেন। তাঁরা এর সাথে সম্পর্কিত মানবিক সম্পর্কের সমস্যা সমাধান করেন না। মানবিক সম্পর্ক থেকে সৃষ্ট সমস্যা মোকাবিলা ও মানসিক সুস্থতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের গুরুত্ব অপরিসীম। মানসিক রোগীদের আচরণ সংশোধনে পরিবেশগত এবং সামাজিক সম্পদ ব্যবহারে সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মানসিক রোগ চিকিৎসায় সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়ন, বস্তুগত এবং অবস্তুগত সম্পদের সদ্ব্যবহারে সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের জ্ঞানের প্রয়োগ ফলপ্রসূ হয়। সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম মানসিক রোগীর রোগের কারণ নির্ণয় করে পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে সেবা সহায়তা প্রদান এবং সামজে পুনর্বাসিত করার প্রয়াস চালায় যা একজন সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিল্পবিপ্লবোত্তর আধুনিক সমাজে জটিল ও বহুমুখী সামাজিক সমস্যা, নিরাপত্তাহীনতা, পারিবারিক ও সামাজিক বিশৃঙ্খলা এবং মনো-সামাজিক দ্বন্দ্ব ও টানাপোড়নের ফলে মানসিক রোগীর সংখ্যা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। এছাড়া বংশগতি, শারীরিক জটিলতা, পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা, জীবনধারণ প্রক্রিয়ার পরিবর্তন, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনে দ্বন্দ্ব ও বিভেদ, মাদকাসক্তি প্রভৃতি কারণে প্রতিনিয়ত মানসিক স্বাস্থ্যহানি ঘটছে। আর এক্ষেত্রে সাইকিয়াট্রিক সমাজকমের্র জ্ঞান অপরিহার্য। মানসিক রোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সামাজিক ভূমিকা উন্নয়নে সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের গুরুত্ব অপরিসীম। সুতরাং বলা যায়, বর্তমান শিল্পসমাজে ব্যক্তি এবং পরিবেশের মিথস্ক্রিয়া থেকে সৃষ্ট মানসিক অসুস্থতা মোকাবিলায় সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

২.৮.২ সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মীর ভূমিকা

সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মীরা মানসিক রোগীদের আচরণ সংশোধনে পরিবেশগত এবং সামাজিক সম্পদ ব্যবহারে সাহায্য করেন। মানসিক রোগ চিকিৎসায় সামাজিক সম্পর্ক উন্নয়ন, বস্তুগত এবং অবস্তুগত সম্পদের সদ্ব্যবহারে সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মীরা ভূমিকা পালন করেন। সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমে সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মীরা সমস্যার কার্যকর ও বাস্তবসম্মতভাবে মোকাবিলা করে থাকেন। সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মী রোগীর রোগের কারণ নির্ণয় করে পরামর্শ প্রদানের মাধ্যমে সেবা সহায়তা প্রদান এবং সামজে পুনর্বাসিত করার প্রয়াস চালায় যা গুরুত্বপূর্ণ। মানসিক রোগীর চিকিৎসায় চিকিৎসক এবং মনোচিকিৎসকগণ হাসপাতালকেন্দ্রীক চিকিৎসার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। মনোচিকিৎসগণ রোগীকে একক ব্যক্তি হিসেবে চিকিৎসা প্রদান করে থাকেন। এক্ষেত্রে তিনি প্রধানত অবচেতন (unconscious), পারস্পরিক মানসিক উপাদান (inter-psychic factor) এবং রোগীর ব্যক্তিত্বের (individual personality) সামঞ্জস্যহীনতার চিকিৎসা করেন। অন্যদিকে, সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মী মানসিকভাবে অসুস্থ ব্যক্তিকে কোনো একক ব্যক্তি হিসেবে নয়, সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করেন। সমস্যাগ্রস্ত মানসিক রোগীকে তার পরিবারসহ সামাজিক পরিবেশের আলোকে মূল্যায়ন করেন। ফলে মানসিক রোগীর চিকিৎসা কার্যকরী এবং ফলপ্রসূ হয়।

পরিশেষে বলা যায়, বর্তমান শিল্পসমাজে ব্যক্তি এবং পরিবেশের মিথস্ক্রিয়া থেকে সৃষ্ট মানসিক অসুস্থতা মোকাবিলায় সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সারসংক্ষেপ

মানসিক রোগীর চিকিৎসায় রোগীকে একক হিসেবে বিবেচনা করা যায়। সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মীরা মানসিক রোগীকে সামগ্রিকভাবে তার পরিবারসহ পরিবেশের আলোকে মূল্যায়ন করে রোগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সামাজিক ভূমিকা উন্নয়নে প্রয়াস চালায়। তাই সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের গুরুত্ব ও তাৎপর্য দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মে মানসিক রোগীকে কিভাবে বিবেচনা করা হয়?

ক) এককভাবে খ) সামগ্রিকভাবে

গ) দলীয়ভাবে ঘ) পারিবারিকভাবে

পাঠ-২.৯ বিদ্যালয় সমাজকর্মের ধারণা ও ইতিহাস (Concept and History of School Social Work)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

২.৯.১ বিদ্যালয় সমাজকর্ম ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২.৯.২ বিদ্যালয় সমাজকর্মের ইতিহাস সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

২.৯.১ বিদ্যালয় সমাজকর্ম

পেশাদার সমাজকর্মের একটি প্রায়োগিক শাখা হচ্ছে বিদ্যালয় সমাজকর্ম। শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণের সাথে সম্পর্কিত সমস্যাবলীকে কেন্দ্র করে বিদ্যালয় সমাজকর্ম পরিচালিত হয়। সমাজকর্মের জ্ঞান ও কলাকৌশল প্রয়োগ করে সমস্যাগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় পরিবেশের সাথে কাঙ্খিত সমন্বয় সাধনে সাহায্য করা এবং সমাজকর্মী কর্তৃক শিক্ষক ও কর্তৃপক্ষ এবং পরিবার ও সমাজের প্রচেষ্টাকে প্রভাবিত ও সমন্বয় করার প্রচেষ্টাকে বিদ্যালয় সমাজকর্ম বলা হয়। সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) সংজ্ঞা অনুযায়ী, ''বিদ্যালয় সমাজকর্ম সমাজকর্মের এক বিশেষায়িত শাখা যা শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ের সাথে সন্তোষজনক সামঞ্জস্যবিধানে সহায়তা করে এবং এই উদ্দেশ্য অর্জনে বিদ্যালয়, পরিবার ও সমষ্টির প্রচেষ্টার সমন্বয় সাধন এবং প্রভাবিত করে (School social work is the specialty in social work oriented toward helping students make satisfactory school adjustment and coordinating and influencing the efforts of the school, the family and the community to help achieve this goal.)।''



চিত্র ২.৯.১ : বিদ্যালয় সমাজকর্ম

বিদ্যালয় সমাজকর্ম বিদ্যালয় পরিবেশে খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ ও বিদ্যালয় কর্তৃক প্রদত্ত সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত শিক্ষার্থীদের সামঞ্জস্যবিধানের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। বিদ্যালয় সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীদের স্কুল পালানো, অমনোযোগিতা, উচ্ছৃংখল ও আক্রমনাত্মক আচরণ, বিদ্যালয় পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যহীনতা, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা ইত্যাদি সমস্যা মোকাবিলায় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সুতরাং বলা যায়, বিদ্যালয় সমাজকর্ম হলো সমাজকর্মের সেই বিশেষ শাখা যা সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, কৌশল ও পদ্ধতি প্রয়োগ করে বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক বিকাশ ও উন্নয়নে সহায়তা করে থাকে।

২.৯.২ বিদ্যালয় সমাজকর্মের ইতিহাস

বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে সর্বপ্রথম আমেরিকায় বিদ্যালয় সমাজকর্মের যাত্রা শুরু হয়। ১৯০৬ ও ১৯০৭ সালে আমেরিকায় বোস্টন, হার্ডফোর্ড (কানেক্টিকাট) এবং নিউইয়র্ক শহরের কমিউনিটি এজেন্সিগুলোর সহায়তায় প্রথম বিদ্যালয় সমাজকর্মের প্রয়োগ শুরু হয়। শিক্ষার্থী, তার পরিবার ও বিদ্যালয়ের মাঝে কার্যকর যোগসূত্র স্থাপনের লক্ষ্যে বোস্টনে ১৯০৬ সালে West End Neighbourhood Association and Women's Education Association নামে দুটি সংস্থার উদ্যোগে হোম এবং স্কুল ভিজিটর (Home and School Visitor) নিয়োগ দেয়া হয়। পরবর্তীতে সংস্থা দুটিকে অনুকরণ করে আরো অনেক সংগঠন এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। আমেরিকায় বিদ্যালয় সমাজকর্মের বিকাশে প্রথম উৎস হিসেবে সেটেলমেন্ট হাউজ এবং Henry Barnard School গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষে বোস্টন, নিউইয়র্ক সিটি, শিকাগো এবং হার্ডফোর্ড এর বিদ্যালয়গুলোতে এ কার্যক্রম শুরু হয়। নিউইয়র্ক শিক্ষাবোর্ড ১৯১৪ সালে প্রথমবারের মত সরকারি স্কুল ব্যবস্থাপনায় নিয়মিত বাজেট হতে এই খাতে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ শুরু করে। বিদ্যালয় সমাজকর্ম বিকাশে প্রণোদনা দ্বিতীয় উৎস হিসেবে Marry Richmond -এর নাম অগ্রগণ্য। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উন্নয়ন ও বিকাশে বিদ্যালয় সমাজকর্মের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করতে সক্ষম হয় প্রশাসন। এই ধারাবাহিকতায় ১৯৪৫ সালে আমেরিকায় National Association of School Social Work গঠিত হয় যা পরবর্তীতে

১৯৫৫ সালে National Association of Social Workers (NASW) এর সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়। American National Association of School Social Work বিদ্যালয় সমাজকর্মের উন্নয়নের লক্ষ্যে স্কুল সোশ্যাল ওয়ার্ক কাউন্সিল গঠন করে। ১৯৭০-১৯৮০ সালে আমেরিকায় বিদ্যালয় সমাজকর্ম কার্যক্রমে বিশেষ সেবা সহায়তার অংশ হিসেবে প্রতিবন্ধী, অটিস্টিক ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করে। আমেরিকায় প্রণীত Education of All Handicapped Children's Act, 1975 এবং Individuals with Disability Education Act, 1990 অনুযায়ী বিদ্যালয় সমাজকর্মকে সরকারিভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বিদ্যালয় সমাজকর্মে সনদ পরীক্ষা শুরু হয় ১৯৯২ সালে। অবশেষে ২০০৯ সালে দ্বিতীয় জাতীয় সংস্থারূপে 'The American Council for School Social Work' গঠিত হয়। বাংলাদেশে ১৯৬৬ সালের দিকে বিদ্যালয় সমাজকর্মের যাত্রা শুরু হয়েছিল। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সমাজকল্যাণ বিভাগ পরীক্ষামূলকভাবে ১৯৬৯ সালে শিল্পনগরী ঢাকা ও চট্টগ্রামের দুটি বিদ্যালয়ে স্কুল সমাজকর্ম প্রকল্প গ্রহণ করে। ১৯৭১ সালে আরো ৮টি বিদ্যালয়কে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৮৪ সালে তৎকালীন সামরিক সরকারের আমলে প্রশাসনিক পুনর্গঠনের মাধ্যমে সমাজসেবা অধিদপ্তরের অধীনে পরিচালিত বিদ্যালয় সমাজকর্ম কার্যক্রমটি বন্ধ করে দেয়া হয়।

সারসংক্ষেপ

পেশাদার সমাজকর্মের একটি প্রায়োগিক শাখা হচ্ছে বিদ্যালয় সমাজকর্ম যা সমাজকর্মের জ্ঞান ও কলাকৌশল প্রয়োগ করে সমস্যাগ্রস্ত শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয় পরিবেশের সাথে কাঙ্খিত সমন্বয় সাধনে সাহায্য করে। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে সর্বপ্রথম আমেরিকায় বিদ্যালয় সমাজকর্ম ধারণাটির সূত্রপাত ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। বিদ্যালয় সমাজকর্ম সর্বপ্রথম কোন দেশে চালু হয়েছিল?
- ক) আমেরিকায়
- খ) ইংল্যান্ডে
- গ) কানাডায়
- ঘ) বাংলাদেশে

২। বিদ্যালয় সমাজকর্ম বিকাশে কার অবদান গ্রহণযোগ্য?
- ক) ম্যারী রিচমন্ড
- খ) এম.জি থ্যাকারী
- গ) উইলিয়াম বিভারিজ
- ঘ) জেইন অ্যাডামস

পাঠ-২.১০ বিদ্যালয় সমাজকর্মের গুরুত্ব ও বিদ্যালয় সমাজকর্মীর ভূমিকা (Importance of School Social Work and the Role of School Social Worker)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

২.১০.১ বিদ্যালয় সমাজকর্মের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

২.১০.২ বিদ্যালয় সমাজকর্মীর ভূমিকা সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

২.১০.১ বিদ্যালয় সমাজকর্মের গুরুত্ব

শিশুর প্রতিভা বিকাশ ও শিক্ষা লাভে বিদ্যালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিদ্যালয় পরিবেশকে শিশুর জন্য শিক্ষাবান্ধব ও সৃজনশীল করে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিবাভকদের মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিদ্যালয় সমাজকর্ম গুরুত্ব ভূমিকা পালন করে। বিদ্যালয় সমাজকর্মের মূল দর্শন হচ্ছে শিক্ষার্থীর প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশে বাধা সৃষ্টিকারী উপাদানগুলোর মূলোৎপাটন। শিক্ষার্থীদের জৈব-মনো-সামাজিক অবস্থা নির্ণয় (bio-psycho-social assessment), কেস ব্যবস্থাপনা, আচরণ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, মানসিক স্বাস্থ্য নীতি ও কর্মসূচি পরিকল্পনা, সম্পদ উন্নয়ন, স্কুল ও বিশেষ শিক্ষা সম্পর্কিত সেবা এবং থেরাপিউটিক হস্তক্ষেপ (therapeutic intervention) হচ্ছে বিদ্যালয় সমাজকমের্র ক্ষেত্র। এসব ক্ষেত্রে বিদ্যালয় সমাজকর্মীরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সেবা প্রদান করে থাকেন।

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন শ্রেণি ও পরিবেশ থেকে আগত। ফলে অনেকেই বিদ্যালয় পরিবেশে খাপখাওয়াতে সক্ষম হয় না যা ঝুঁকির কারণ হিসেবে দেখা দেয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পক্ষে পাঠদানের পাশাপাশি অন্যান্য সমস্যা মোকাবিলা করা সম্ভবপর হয় না। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষার্থীদের সামাঞ্জস্যবিধান, স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় সাধন, পবিবার ও সমষ্টির কার্যাবলীকে প্রভাবিত করে শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্জনে বিদ্যালয় সমাজকর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের পিছিয়ে পড়া, পরীক্ষায় অকৃতকার্য হওয়া তথা শিক্ষা বিমুখতার পেছনে বিদ্যমান পারিবারিক, শারীরিক, মনোস্তাত্ত্বিক ও মেধাগত কারণ নির্ণয় করে যথাপোযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণে বিদ্যালয় সমাজকমের্র বিকল্প নেই বললেই চলে। বিদ্যালয়ের সকল বিত্ত, শ্রেণি ও পেশাভুক্ত পরিবেশের সন্তানেরা অধ্যায়ন করে। এক্ষেত্রে বিভিন্ন পেশা ও আয়ভুক্ত পরিবারের শিক্ষার্থীর মধ্যকার হীনমন্যতা ও প্রতিহিংসা দূর করে বিদ্যালয়ে স্বাভাবিক ও বাঞ্ছিত শিক্ষা-আচরণ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বিদ্যালয় সমাজকমের্র প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

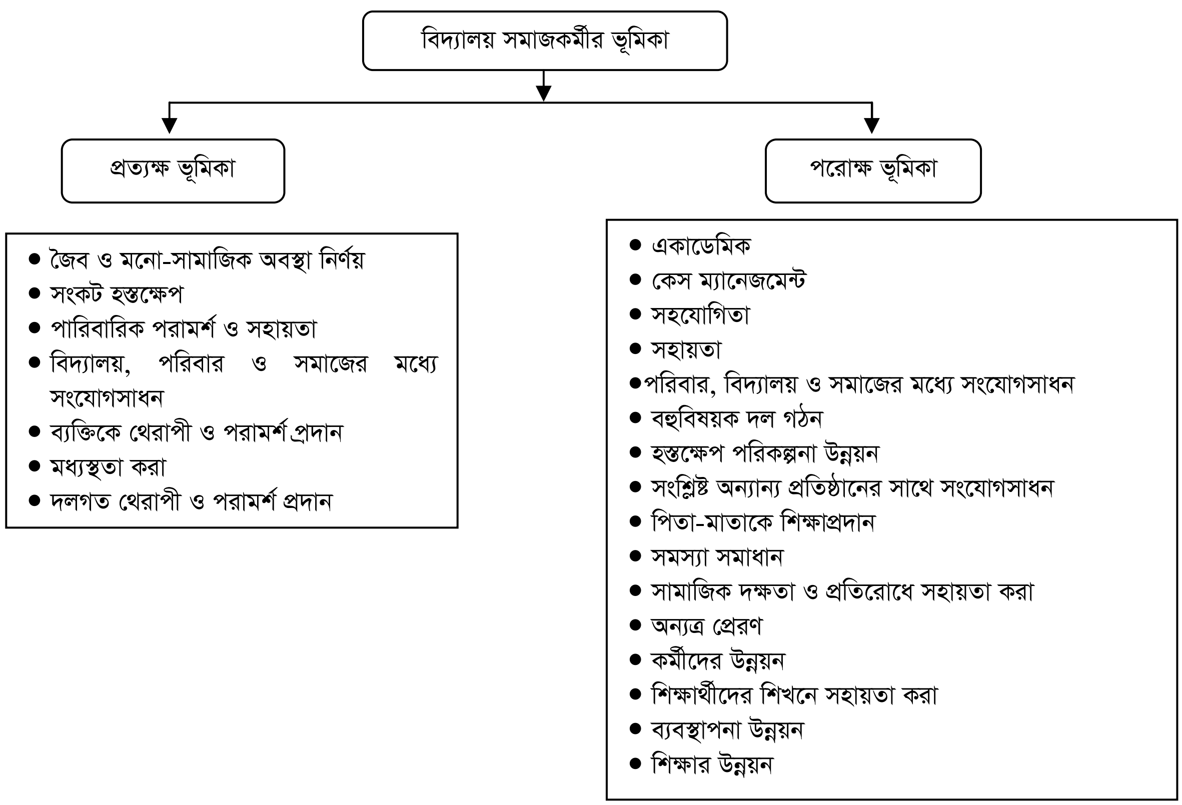
বিদ্যালয় পরিবেশে শিক্ষার্থীদের নেতিবাচক আচরণ যেমন– স্কুল পালানো, বখাটে ও অপরাধপ্রবণ হয়ে উঠা, বিদ্যালয়ভীতি, বিদ্যালয়বিমুখতা, আক্রমণাত্মক আচরণ, ধূমপান বা মাদকে আসক্ত হওয়া, যৌন হয়রানিমূলক কর্মকান্ডে লিপ্ত হওয়া ইত্যাদির পেছনে বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক ও মনো-সামাজিক কারণ চিহ্নিত করে সমস্যা সমাধানে শিক্ষার্থীকে সক্ষম করে তোলার ক্ষেত্রে বিদ্যালয় সমাজকমের্র গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

শিল্পসমাজে শিশু-কিশোররা বিভিন্ন ধরনের মনো-সামাজিক সমস্যার কারণে সমস্যাগ্রস্ত হয়ে পড়ে যা বিদ্যালয় জীবনেও নেতিবাচক প্রভাব সৃষ্টি করে থাকে। পিতা-মাতার স্নেহবঞ্চনা, বৈরি পারিবারিক পরিবেশ, আর্থিক ও মানসিক দৈন্য, শিক্ষক কর্তৃক বঞ্চনা, পারিবারিক ভাঙ্গন বা বিচ্ছিন্নতা, অসুস্থতা, প্রতিবন্ধিতা প্রভৃতি কারণ শিক্ষার্থীকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সমস্যাগ্রস্ত করে থাকে। শিক্ষার্থীর সাথে সংশ্লিষ্ট এসব বিয়য়ের উপর তথ্য অনুসন্ধান, বিশ্লেষণ, সমস্যার কারণ নির্ণয় এবং সমাধান পরিকল্পনা প্রণয়নে বিদ্যালয় সমাজকর্মী তার পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতার প্রয়োগ করে থাকেন। বর্তমান সময়ে শিক্ষার্থীদের বিপথগামিতা, স্কুল ও বাড়ি থেকে পলায়ন, অপরাধ ও সন্ত্রাসমূলক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হওয়াসহ জঙ্গিবাদে সম্পৃক্ত হওয়ার ঝুঁকি থেকে সুরক্ষা করার ক্ষেত্রে পাঠমুখী করে তোলা একান্ত আবশ্যক। এক্ষেত্রে পিতা-মাতা ও শিক্ষকের পাশাপাশি বিদ্যালয় সমাজকর্মী, শিক্ষক, প্রশিক্ষক, প্রচারক, গবেষক ও বিশ্লেষক হিসেবে বিভিন্ন ধরনের শিক্ষামূলক কার্যাবলী পালন করে থাকেন। সমাজকমের্র একটি স্পন্দনশীল শাখা হিসেবে বিদ্যালয় সমাজকর্ম একশ বছরের বেশি সময় ধরে শিক্ষার্থীর বহুমুখী সমস্যার প্রতিরোধ ও প্রতিকার করে আগামী দিনের সৃজনশীল নাগরিক ও জাতীয় উপযুক্ত কর্ণধার হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস চালাচ্ছে। ফলে বর্তমানে সারাবিশ্বেই বিদ্যালয় সমাজকমের্র গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি

পাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানে বিদ্যালয় সমাজকর্মীরা চারটি মডেল অনুশীলন করেন যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলো হলো– ঐতিহ্যগত ক্লিনিক্যাল মডেল, বিদ্যালয় পরিবর্তন মডেল, কমিউনিটি স্কুল মডেল এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়া মডেল।

২.১০.২ বিদ্যালয় সমাজকর্মীর ভূমিকা

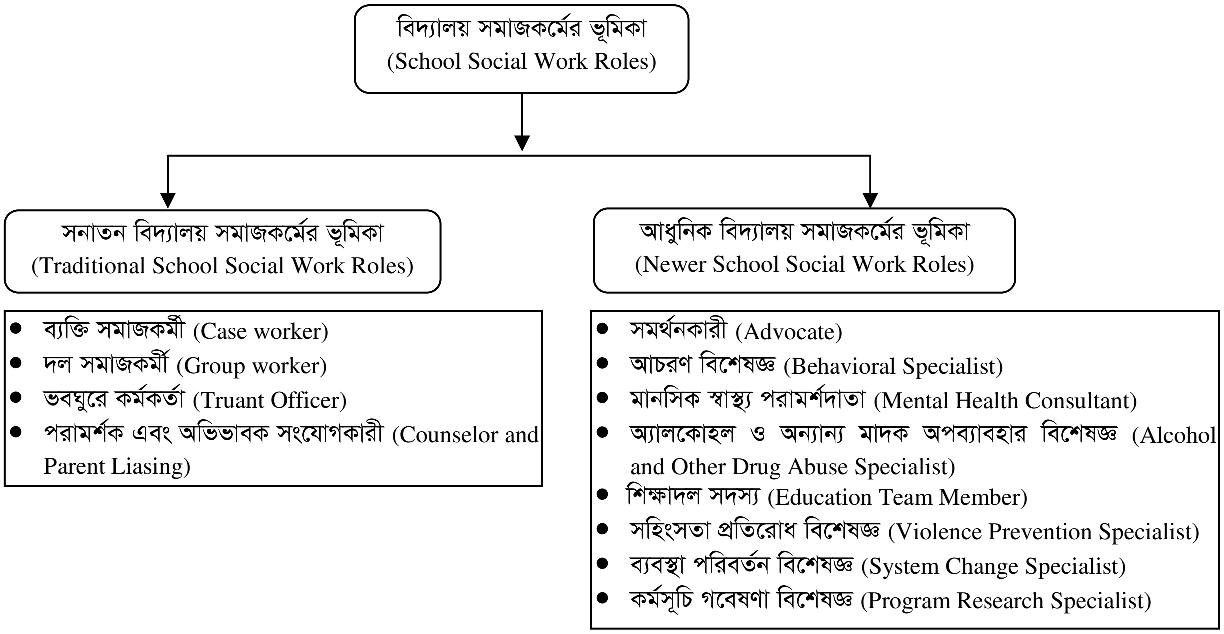
বিদ্যালয় সমাজকমের্র মূল দর্শন হচ্ছে শিক্ষার্থীর সামগ্রিক উন্নয়ন আনয়ন করা। তাই বিদ্যালয়ে শিক্ষকের পরিপূরক হিসেবে শিক্ষার্থীদের উন্নয়নে বিদ্যালয় সমাজকর্মীর ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। বিদ্যালয় সমাজকর্মীরা বিদ্যালয় পরিবেশে সমাঞ্জস্যবিধানে ব্যর্থ, ঝরে পড়া, অমনযোগী, স্কুল পালানো, অপরাধপ্রবণ, মাদকাসক্তিসহ ঝুঁকিপূর্ণ শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানে শিক্ষকদের পাশাপাশি গতিশীল ও বহুমুখী ভূমিকা পালন করে থাকেন। বিদ্যালয় সমাজকর্মীদের শিক্ষার্থীদের হতাশা, নৈরাশ্য, মানসিক চাপ, যন্ত্রনা ও অসহায়ত্বের বেড়াজাল থেকে মুক্ত করতে পরিবর্তন প্রতিনিধি হিসেবে অন্যতম ভূমিকা পালন করে। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক শিক্ষণ পরিবেশ বজায় রাখা এবং অগ্রগতি, সমুন্নত ও গতিশীল রাখার ক্ষেত্রে পরামর্শক, উদ্বুদ্ধকারী, তথ্য সরবারহকারী, তথ্য উদ্‌ঘাটনকারী ও সাহায্যকারী হিসেবে বিদ্যালয়ে সমাজকর্মীরা বহুমুখী ভূমিকা পালন করে থাকেন। শিক্ষার্থীদের সামাজিক ও আবেগীক সমস্যা সমাধানে বিদ্যালয় সমাজকর্মী শিক্ষার্থীকে প্রত্যক্ষ সেবা প্রদান করে থাকেন। বিদ্যালয় সংক্রান্ত নীতি, পরিবেশ ও অনুশীলন যা শিক্ষার্থীদের কর্মবিমুখতা বা ত্রুটিপূর্ণ বিকাশের জন্য দায়ী তা পরিবর্তন আনয়নে পরিবর্তনকারী হিসেবেও ভূমিকা পালন করে থাকেন। এছাড়া সমষ্টিকে স্কুলের প্রস্তাবনা ও কর্মসূচির সম্পর্কে সংগঠিত করার ক্ষেত্রে বিদ্যালয় সমাজকর্মী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। এছাড়া শিক্ষার্থীকে দলীয় ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে পারস্পারিক মিথস্ক্রিয়ার জন্য উপযোগী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও ভূমিকা পালন করে থাকেন। বিদ্যালয়ের সর্বজনীন সমস্যা সমাধানের জন্য ঐক্য গড়ার ক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী (mediator) এবং সহায়তাকারী (facilitator) হিসেবে বিদ্যালয় সমাজকর্মীর ভূমিকা অনস্বীকার্য। বিদ্যালয় সমাজকর্মী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সেবাপ্রদান করে শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক উন্নয়নে যে ভূমিকা পালন করে থাকেন তা নিম্নের ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো–



চিত্র ২.১০.১ : বিদ্যালয় সমাজকর্মীর ভূমিকা

বিদ্যালয় সমাজকর্মীর ভূমিকা প্রসঙ্গে Charles Zastrow (২০০৮:৩৪৫) তাঁর*æIntroduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People”* গ্রন্থ বলেন, æ School work is a relatively new role of the social

worker।” তিনি আরো বলেন, æ It is practical necessary for any school social worker to understand the dynamics of behaviour because social workers have been and will continue to be closely involved with problematic behaviour in children।” বিদ্যালয় সমাজকর্মীর আধুনিক ও সনাতন ভূমিকার মধ্যে কিছু পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় যা ভূমিকা নিম্নের ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো–



চিত্র ২.১০.২: বিদ্যালয় সমাজকর্মীর কার্যাবলী ও ভূমিকা

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী রোমানা দীর্ঘদিন যাবৎ বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত। স্কুলের শিক্ষকেরা রোমানার সাথে যোগাযোগ করা সত্ত্বেও তারা রোমানাকে স্কুলে পাঠাচ্ছে না। রোমানার মতো আরো অনেক শিক্ষার্থী পঞ্চম শ্রেণি পাশ করার আগেই ঝরে পড়ছে। এছাড়া এই শ্রেণির অধিকাংশ নারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে পড়ালেখায় অমনযোগী, একাকিত্ব, হতাশা ও চাপ লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শ্রেণিশিক্ষক এ সমস্যা সমাধানের জন্য বিদ্যালয় সমাজকর্মী নিয়োগের উদ্যোগ নিলেন। বিদ্যালয় সমাজকর্মী উক্ত শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য সামাজিক গবেষণা করলেন। এক্ষেত্রে তিনি সামাজিক জরিপ, কেস স্ট্যাডি ও গৃহ পরিদর্শন করলেন। এর মাধ্যমে বিদ্যালয় সমাজকর্মী জানতে পারলেন যে, উক্ত এলাকার অধিকাংশ জনগণ নিরক্ষর ও দারিদ্র্য কবলিত। তারা নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে অবগত নয়। এছাড়া ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনা দেখিয়ে দেয়ার জন্য গৃহশিক্ষক রাখার সামার্থ্য তাদের নেই। বিদ্যালয় শিক্ষকরাও ততটা ভাল করে পড়া বুঝিয়ে দিতে পারছেন না। এছাড়া এই গ্রামে বয়ঃসন্ধি পরপরই মেয়ে শিক্ষার্থীদের চলাফেরায় বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়। স্কুলে যাওয়ার পথে যৌনহয়রানির শিকার হতে হয়। তাই ‘উপযুক্ত পাত্র’ পেলেই বাল্য বিবাহ দিয়ে দেয়া হয়। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় সমাজকর্মী মধ্যস্থতাকারী হিসেবে বিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ উন্নয়ন এবং গ্রামের সামাজিক পরিবেশ উন্নয়নে বিদ্যালয়, পরিবার ও সমাজে ভূমিকা পালন করে থাকেন। এছাড়া সমাজকর্মী গতিশীলতা আনয়নকারী, সমন্বয় ও সংযোগ সাধনকারী, সচেতনতা সৃষ্টিকারী, শিক্ষক ও গবেষক হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকেন। পরিবর্তন প্রতিনিধি হিসেবে বিদ্যালয়ের পরিবেশগত উন্নয়ন এবং সমাজ ও পরিবেশের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক ও কাঙ্খিত পরিবর্তনে ভূমিকা পালন করেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের পিতা-মাতার মধ্যে সংযোগ সাধনের জন্য অনুঘটকের ভূমিকাও পালন করে থাকেন।

সারসংক্ষেপ

শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক উন্নয়ন দর্শন থেকেই বিদ্যালয় সমাজকর্মের জন্ম। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের প্রতিভা বিকাশ ও শিক্ষা লাভের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে বিদ্যালয় সমাজকর্মের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষার্থীদের ঝরে পাড়া, পিছিয়ে পড়া, স্কুল পালানো, বিদ্বেষমূলক ও অপরাধমূলক আচরণ নিয়ন্ত্রণে বিদ্যালয় সমাজকর্মীরা বহুমুখী ভূমিকা পালন করেন থাকে যা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাই আধুনিক শিল্পসমাজ শিক্ষার্থীদের সামগ্রিক কল্যাণে বিদ্যালয় সমাজকর্মের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। বিদ্যালয় সমাজকর্মের মূল দর্শন কোনটি?

ক) শিক্ষার্থীদের সমাগ্রিক উন্নয়ন
খ) পিতা-মাতার দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন
গ) শিক্ষক ও অভিভাবকদের কল্যাণ ও উন্নয়ন
ঘ) সমাজের সকল শ্রেণির কল্যাণ ও উন্নয়ন

পাঠ-২.১১ শিল্প সমাজকর্মের ধারণা ও ইতিহাস (Concept and History of Industrial Social Work)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

২.১১.১ শিল্প সমাজকর্ম ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন ।

২.১১.২ শিল্প সমাজকর্মের ঐতিহাসিক বিবর্তন সম্পর্কে বিবরণ দিতে পারবেন।

২.১১.১ শিল্প সমাজকর্ম

শিল্প সমাজকর্ম হচ্ছে আধুনিক সমাজকর্মের একটি বিশেষায়িত শাখা যা শিল্পকারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের সামাগ্রিক জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজকর্মের জ্ঞান, নীতি ও দক্ষতা অনুশীলন করে থাকে। সাধারণভাবে বলা যায়, শিল্পকারখানার পরিবেশে খাপখাওয়ানো এবং শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতার অনুশীলনকে শিল্প সমাজকর্ম বলা হয়। সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) সংজ্ঞানুযায়ী, "শিল্প সমাজকর্ম হলো শ্রমিকদের উন্নয়ন বা নিয়োগ কর্তৃপক্ষ অথবা উভয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রমিকদের কর্মস্থল এবং কর্মস্থলের বাইরে সামাগ্রিক জীবনমান উন্নয়নে পেশাগত সমাজকর্মের অনুশীলন।" Saini (১৯৭৫) শিল্প সমাজকর্মের সংজ্ঞায় বলেন, "শিল্প সমাজকর্ম হলো কর্মস্থলে উত্তমরূপে সামঞ্জস্যবিধানের লক্ষ্যে ব্যক্তি ও দলকে সহায়তা করার সুব্যবস্থিত পন্থা (Industrial social work has come to be defined as a systematic way of helping individual and groups toward a better adaptation to work situation)।" *Encyclopaedia of Social Work* (২০০৮:৩৩১) vol. 3 এর সংজ্ঞানুযায়ী, "শিল্প সমাজকর্মকে শ্রমিক বা ব্যবস্থাপনার পৃষ্ঠপোষক কর্মসূচি বা সেবা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয় যা আইনসঙ্গতভাবে শ্রমিক বা শিল্পপ্রতিষ্ঠানের সমাজকল্যাণ প্রয়োজনসমূহ পূরণের নিমিত্তে পেশাদার সমাজকর্মীদের সদ্ব্যবহার করে (Industrial work is generally defined as programmes and services under the auspices of labour or management that utilize professional social workers to serve members or employees and the legitimate social welfare needs of the labour or industrial organization.)।" শিল্প সমাজকর্মকে অনেক সময় বৃত্তিমূলক সমাজকর্ম (Occupation Social Work) হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। সুতরাং বলা যায়, শিল্প সমাজকর্ম হচ্ছে সমাজকর্মের সেই শাখা যা সমাজকর্মেও জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগ করে শিল্প কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিক ও ব্যবস্থাপকদের বিচিত্র ধরনের সমস্যা মোকাবিলা করে থাকে।

২.১১ শিল্প সমাজকর্মের ইতিহাস

আধুনিক শিল্পায়িত সমাজে শিল্পকারখানার মালিক-শ্রমিক দ্বন্দ্ব, শ্রমিক অসন্তোষ, শ্রমিক বিশৃঙ্খলা এবং শ্রমিকদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সমষ্টিগত সমস্যা মোকাবিলা ও শ্রমিককল্যাণ সাধনে সমাজকর্মের বিশেষায়িত শাখা হিসেবে শিল্প সমাজকর্মের সূত্রপাত ঘটে। মানবতাবাদী চিন্তাধারা এবং ফলপ্রসূ উৎপাদনের স্বার্থে শিল্পকারখানায় শিল্প সমাজকর্মের আবির্ভাব ঘটেছে। শিল্প সমাজকর্মের মূল প্রোথিত রয়েছে উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে আমেরিকায় কল্যাণমূলক পুঁজিবাদ (welfare capitalism) ধারণার সাথে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে শিল্পকারখানায় বিভিন্ন সেবাকর্মসূচি যেমন– স্যানিটেশন, বাসস্থান, নিরাপত্তা ইত্যাদি তদারকি করার জন্য Welfare Secretaries নিয়োগ দেয়া হয়। Welfare Secretaries -এর কোনো আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ না থাকায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯২০ সাল থেকে ১৯৩৫ সালের মধ্যে তা ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যায়। পরবর্তীতে National Civic Federation ও American Institute of Social service নামে দুটি সংগঠন যেগুলো Occupation Social Welfare Services নিয়ে কাজ করে তারা welfare secretary ধারণার উপর গুরুত্ব দেন যা জনগণের মধ্যেও উদ্দীপনা তৈরি করেছিল। এ প্রেক্ষিতে ১৯২০ সালের মধ্যে New York School for Social Work এর অধিকাংশ গ্র্যাজুয়েটেরা অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় শিল্পক্ষেত্রকে বেছে নিল। সমাজকর্মীরা তখন Social Welfare Secretaries ভূমিকায় কাজ শুরু করে যা ১৯৩৫ সালের মধ্যে ক্রমে অদৃশ্য হতে থাকে। শিল্পভিত্তিক সমাজকর্মের পুনরুত্থান ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে যখন নতুন শ্রমিক দল বিশেষ করে নারী ও সংখ্যালঘুরা শিল্প ক্ষেত্রে চলে আসে। পূর্ণকালীন চাকুরিতে শ্রমিক এবং single parent শ্রমিকদের ভূমিকা-জটিলতার সামঞ্জস্যবিধানের জন্য প্রথম দিকে Occupation Social Worker-এর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। Aroplane and Munitions Industries গুলোতে Occupation Social

Worker-দের ব্যাপক হারে নিয়োগ করা হয়। Bertha Reynolds একজন অন্যতম সমাজকর্ম তাত্ত্বিক ও পেশাদার প্রতিনিধি যিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে National Maritime Union-এ কর্মরত অবস্থায় সংগঠিত কর্মী ও সমাজকর্ম পেশার মধ্যকার সম্পর্ক আরো জোরদারকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৬ সালে সেনাবাহিনীদের সেবা প্রদানের জন্য একটি স্থায়ী Commissioned Officer Crops of Social Workers গঠন করা হয়। এক্ষেত্রে ১৯৭০ সালে Columbia University of School of Social Work এর Industrial Social Welfare Center প্রতিষ্ঠা তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। এরপর Boston College, Hunter College এবং Utah University তে Occupation Social Work Program গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীতে CSW এর সহযোগিতায় Columbia College এবং Hunter College প্রথম শ্রম ও শিল্পক্ষেত্রে সমাজকর্ম অনুশীলন বিষয়ক সম্মেলনের আয়োজন করে। বর্তমানে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশেগুলোতে শিল্প সমাজকর্মের প্রয়োজনীয়তা ও তাৎপর্য বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সারসংক্ষেপ

শিল্প কারখানায় নিয়োজিত শ্রমিকদের সামগ্রিক জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতার অনুশীলনকে শিল্প সমাজকর্ম বলা হয়। শিল্প সমাজকর্মকে বৃত্তিমূলক সমাজকর্ম হিসেবেও আখ্যায়িত করা হয়। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে আমেরিকায় কল্যাণমূলক পুঁজিবাদ (welfare capitalism) ধারণার সাথে শিল্প সমাজকর্মের মূল প্রোথিত রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। শিল্প সমাজকর্মের সাথে কোন ধারণার সম্পর্ক রয়েছে?

ক) Welfare economic খ) Welfare capitalism

গ) Capitalism ঘ) Socialism

২। শিল্প সমাজকর্মকে কী নামে অভিহিত করা হয়?

ক) Work related social work খ) Job sector social work

গ) Occupational social work ঘ) Professional social work

পাঠ-২.১২ শিল্প সমাজকর্মের গুরুত্ব ও শিল্প সমাজকর্মীর ভূমিকা (Importance of Industrial Social Work and the Role of Industrial Social Worker)

উদ্দেশ্য

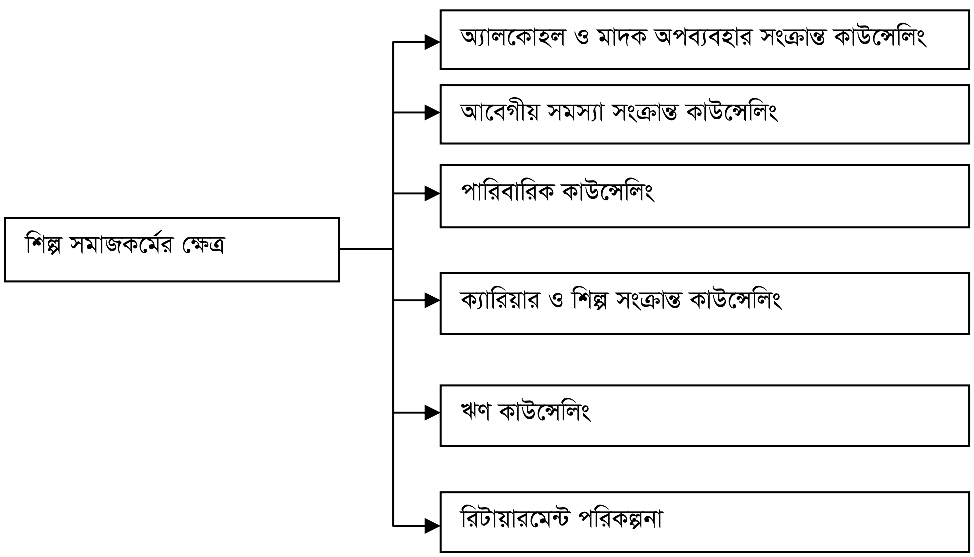
এই পাঠ শেষে আপনি–

২.১২.১ শিল্প সমাজকর্মের গুরুত্ব সম্পর্কে লিখতে পারবেন ।

২.১২.২ শিল্প সমাজকর্মীর ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

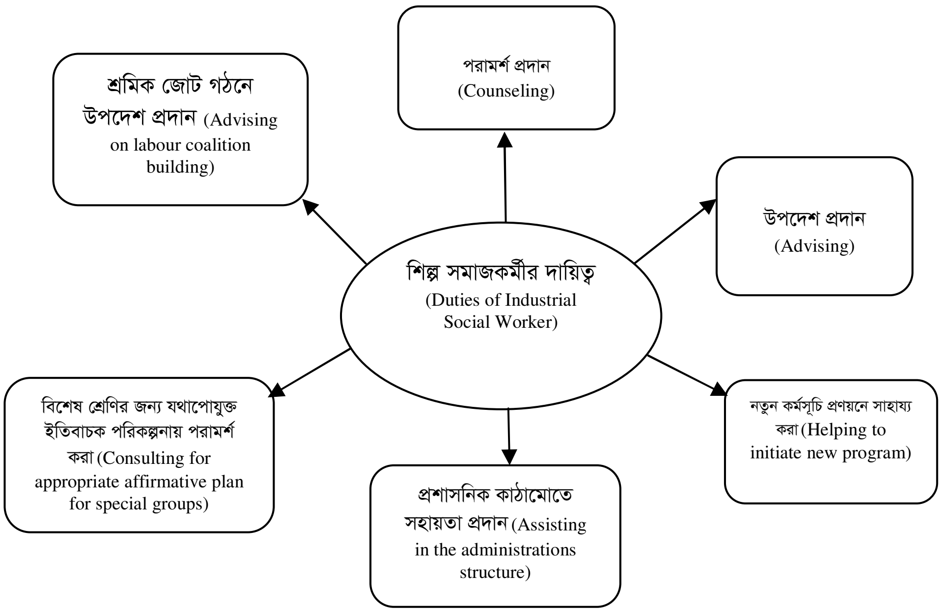
২.১২.১ শিল্প সমাজকর্মের গুরুত্ব

শিল্পক্ষেত্রে সমস্যাগ্রস্ত শ্রমিকদের সমস্যা সমাধানে শিল্প সমাজকর্মের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিল্প সমাজকর্ম শিল্পকারখানায় শ্রমিকদের পারিবারিক, আবেগীয়, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, ঋণ প্রদান, অবসর গ্রহণ; অ্যালকোহল ও মাদক অপব্যবহার প্রতিরোধের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। নিম্নে একটি চিত্রের মাধ্যমে শিল্প সমাজকর্মের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরা হলো:



চিত্র ২.১২.১ : শিল্প সমাজকর্মের ক্ষেত্র

শিল্পক্ষেত্রে পরামর্শ, উপদেশ, প্রশিক্ষণ কর্মসূচি প্রণয়ন, প্রশাসনকে সহায়তাসহ শ্রমিক জোট তৈরি করার ক্ষেত্রে শিল্প সমাজকর্মের গুরুত্ব ও তাৎপর্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিককল্যাণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে শিল্প সমাজকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা করেন। নিম্নে একটি ছকের মাধ্যমে শিল্প সমাজকর্মীর দায়িত্ব তুলে ধরা হলো:



চিত্র ২.১২.৩: শিল্প সমাজকর্মীর দায়িত্ব

২.১১.২ শিল্প সমাজকর্মীর ভূমিকা

শিল্প সমাজকর্মী প্রকৃতপক্ষে একজন পরিবর্তন প্রতিনিধি (change agent) হিসেবে মালিক, শ্রমিক ও সরকারের পক্ষে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। শিল্পকারখানার শ্রমিকদের ব্যক্তিগত সমস্যা যেমন– মাদকাসক্তি, হতাশা, হীনমন্যতা বোধ, বৈবাহিক এবং শিশুশ্রমিকদের অপব্যবহার ইত্যাদি সমস্যা মোকাবিলায় শিল্প সমাজকর্মীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এছাড়াও শিল্প ক্ষেত্রে শ্রমিদের স্বার্থ সংরক্ষণে ও দাবিদাওয়া পূরণে গড়ে ওঠা সংগঠন ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃবৃন্দকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিয়ে শিল্পসমাজকর্মীরা শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব নিরসন ও শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে শিল্প সমাজকর্মীর ভূমিকা নিম্নরূপে তুলে ধরা হলো :

১) সমস্যাগ্রস্ত শিল্পশ্রমিকদের ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধানে পারামর্শ প্রদান করা যাতে তারা উন্নত জীবনমান অর্জনে সক্ষম হয়;
২) সমস্যাগ্রস্ত শিল্পশ্রমিকদের প্রয়োজন পূরণে সমষ্টি সম্পদ এবং বিদ্যমান কর্মসূচির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনে উপদেশ প্রদান করা হয়;
৩) কর্মরত এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মীদের জন্য নতুন কল্যাণ সমষ্টি, স্বাস্থ্য, চিত্তবিনোদন এবং শিক্ষাসংক্রান্ত কর্মসূচি চালু করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করা;
৪) শিল্পপ্রতিষ্ঠানের প্রশাসনের কল্যাণে স্বাস্থ্যসেবা কাঠামোতে সহযোগিতা করা এবং নতুন উদ্যোগ ও পরিকল্পনায় সাহায্য করা;
৫) নারী, প্রবাসী/অভিবাসী, সংখ্যালঘু এবং প্রতিবন্ধী কর্মীদের উন্নয়নে যথোপযুক্ত ইতিবাচক পরিকল্পনা গ্রহণে প্রশাসনকে পরামর্শ প্রদান করা;
৬) শ্রম ঐক্য প্রতিষ্ঠা করা এবং শ্রমিকদের কল্যাণে প্রয়োজনীয় মূলতবি আইন প্রণয়নে উপদেশ প্রদান করা।

বর্তমান পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে শিল্পসমাজের প্রসার ও বিকাশ ঘটছে। শিল্পকারখানার শ্রমিক-মালিক দ্বন্দ্ব, শ্রম অসন্তোষ ও বিশৃঙ্খলা , শ্রমিকদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সমষ্টিগত সমস্যা মোকাবিলায় শিল্প সমাজকর্মীরা মালিক ও শ্রমিক পক্ষের মধ্যে পরিবর্তন প্রতিনিধি ও মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকেন।

সারসংক্ষেপ

শিল্প শ্রমিকদের চাহিদা, শ্রমিক ইউনিয়ন এবং বৃহৎ সংগঠনের লক্ষ্যার্জনে শিল্প সমাজকর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শিল্প সমাজকর্মী একজন পরিবর্তন প্রতিনিধি হিসেবে মালিক শ্রমিক এবং সরকার পক্ষের মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ভূমিকা পালন করে থাকেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। শিল্প সমাজকর্মীর ভূমিকা কোনটি?

ক) শ্রমিক নিয়োগ দেয়া
খ) শ্রমিকদের বেতন-ভাতাদি প্রদান করা
গ) মালিকের স্বার্থ সংরক্ষণ করা
ঘ) শ্রমিক-মালিক স্বার্থ সংরক্ষণ করা

পাঠ-২.১৩ জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মের ধারণা ও ইতিহাস (Concept and History of Gerontological Social Work)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

২.১৩.১ জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্ম ধারণাটির ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২.১৩.২ জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মের ইতিহাস সম্পর্কে বিবরণ লিখতে পারবেন।

২.১৩.১ জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্ম

সমাজকর্ম হলো সমাজকর্মের একটি বিশেষায়িত শাখা যা প্রবীণ জনগোষ্ঠীর কল্যাণে সমাজকর্মের জ্ঞান, নীতি, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগ করে থাকে। জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মের লক্ষ্য হচ্ছে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং জীবনযাপনের নেতিবাচক উপাদানগুলো মোকাবিলার মাধ্যমে প্রবীণদের সুখী, আনন্দময় এবং অর্থবহ জীবনযাপনে সাহায্য করা। সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) ব্যাখ্যানুযায়ী, ''জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্ম হলো সমাজকর্মের বিশেষ অনুশীলন ক্ষেত্র যাতে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর মনো-সামাজিক চিকিৎসা, প্রবীণদের প্রয়োজনীয় সমাজসেবা কার্যক্রমের উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা এবং প্রবীণ ব্যক্তিদের জন্য কর্মসূচি প্রণয়নের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয় (Gerontological social work is an orientation and specialization in social work concerned with the psychological treatment of older people the development and management of needed social services and programes for older individuals)।" জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্ম প্রধানত প্রবীণদের চাহিদা ও প্রয়োজন নির্ণয়, সমস্যা মোকাবিলা এবং প্রবীণসেবা সংশ্লিষ্ট নীতি, পরিকল্পনা ও সাংগঠনিক কাঠামো গঠনের লক্ষ্যে পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রবীণ এবং তাদের পরিবারের জীবনমান উন্নয়ন ও পরিচালনার সাথে সম্পর্কিত বিষয়াদি নিয়ে এই শাখা পরিচালিত হয়। সুতরাং বলা যায়, জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্ম হলো সে শাখা যে শাখা প্রবীণ ব্যক্তিদের অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবনযাপনের, শারীরিক, মনো-সামাজিক, পারিবারিক, সাংস্কৃতিক, নৃ-তাত্ত্বিক ও সম্প্রদায়ভিত্তিক, সাংগঠনিক এবং সামাজিক বিভিন্ন উপাদান সংশ্লিষ্ট বিষয় যা বার্ধ্যক্য জীবনের শারীরিক ও আবেগীয় দিককে বাধাগ্রস্ত করে তা নিয়ে আলোচনা করে।

২.১৩.২ জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মের ইতিহাস

সমাজকর্মের পেশাগত বিকাশ ১০০ বছরের অধিক সময় ধরে হলেও এখনো অনেকে স্বাস্থ্য, কল্যাণ এবং সমাস্যাগ্রস্তদের জীবনমান উন্নয়নে সমাজকর্মীদের ভূমিকার কথা পুরোপুরিভাবে স্বীকৃতি দিতে চায় না। এক্ষেত্রে জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মী যারা প্রবীণদের নিয়ে কাজ করে তারাও ততটা স্বীকৃতি পায় না বললেই চলে। তবে বর্তমানে জনমিতিক ধারা পরিবর্তনের ফলে প্রবীণদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মের উপর গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্তমানে আমেরিকায় ৮৫ বছর উর্ধ্বে প্রবীণদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং তারা জরাগ্রস্ত হওয়ায় তাদেরকে সক্রিয় এবং স্বনির্ভর করার প্রয়োজনে জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। প্রবীণদের স্বাস্থ্যসেবা চাহিদা ও আর্থিক সমস্যা জটিল হওয়ায় তারা ক্রমবর্ধমান চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যবিধানে ততটা সক্ষম নয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা প্রবীণদের স্বাস্থ্য ও কল্যাণের সাথে সম্পৃক্ত শারীরিক, সামাজিক এবং আর্থ-সামাজিক সমস্যা মোকাবিলার জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করে থাকেন। জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মের বিকাশে John A. Hartford Foundation -এর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সর্বপ্রথম ১৯১৯ সালে Hartford Foundation এই খাতে অর্থ বরাদ্দ করে। Geriatric Social Work Initiative (GSWI) যা মূলত প্রবীণদের এবং তাদের পরিবারের যত্ন ও কল্যাণ তথা উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য দক্ষ সমাজকর্মী সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রয়াস চালায়। এছাড়া উদ্ভাবনীমূলক কৌশল গ্রহণ করে প্রবীণ বিষয়ক জ্ঞান ও বিশেষায়িত জ্ঞান বিকাশে শিক্ষা ও গবেষণার প্রয়াস চালায়। আর এক্ষেত্রে John A. Hartford Foundation-এর সহায়তাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মের দুই ধরনের উদ্যোক্তার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে CSWE Geroed Centre Competency Goal যা প্রবীণ ও তার পরিবার নিয়ে সমাজকর্ম অনুশীলনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান করে থাকে। অন্যটি হচ্ছে Hartfor Partnership Program in Aging Education (FPPAE) Geriatric Social Work Competency Scale যা উন্নত অনুশীলনের পর্যায় তৈরির জন্য কর্মকান্ড পরিচালনা

করছে। ১৯৯৮ সাল থেকে GSWI প্রবীণ বিষয়ক সমাজকর্ম শিক্ষার উন্নয়ন ও প্রসারে প্রয়াস চালাচ্ছে। জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মের সূত্রপাত ও বিকাশ প্রথমে আমেরিকায় ঘটে। পরবর্তীতে উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে ধীরে ধীরে এই শাখার বিস্তার ঘটে। আমেরিকায় উনবিংশ শতাব্দী থেকে সমাজকর্মীগণ প্রবীণ ব্যক্তিদের সেবায় সেটেলমেন্ট হাউস, প্রবীণসেবা প্রতিষ্ঠান এবং পরিবারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে।

সারসংক্ষেপ

বর্তমান বিশ্বে প্রবীণ সমস্যা একটি সর্বজনীন সমস্যা। সমাজকর্ম অনুশীলনের গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্ম যা প্রবীণ জনগোষ্ঠীর কল্যাণে সমাজকর্মের জ্ঞান, নীতি, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগ করে থাকে। সর্বপ্রথম আমেরিকায় জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মের গোড়াপত্তন ঘটে। এই শাখার বিকাশে John A. Hartford Foundation গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। GSWI ১৯৯৮ সাল থেকে প্রবীণ বিষয়ক সমাজকর্ম উন্নয়ন ও প্রসারে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। আধুনিক শিল্পসমাজে প্রবীণ সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করায় উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশে এই শাখার গুরুত্ব ও চাহিদা ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বিকাশ ঘটছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। GSWI এর পূর্ণরূপ কী?

ক) Gerontology Social Work Institution খ) Geriatric Social Work Initiative
গ) Gerontology Social Welfare Institution ঘ) Geriatric Social Welfare Institution

পাঠ-২.১৪ জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মের গুরুত্ব ও জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মীর ভূমিকা (Importance of Gerontological Social Work and the Role of Gerontological Social Worker Geriatric Welfare)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

২.১৪.১ জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

২.১৪.২ জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মীর ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

২.১৪.১ জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মের গুরুত্ব

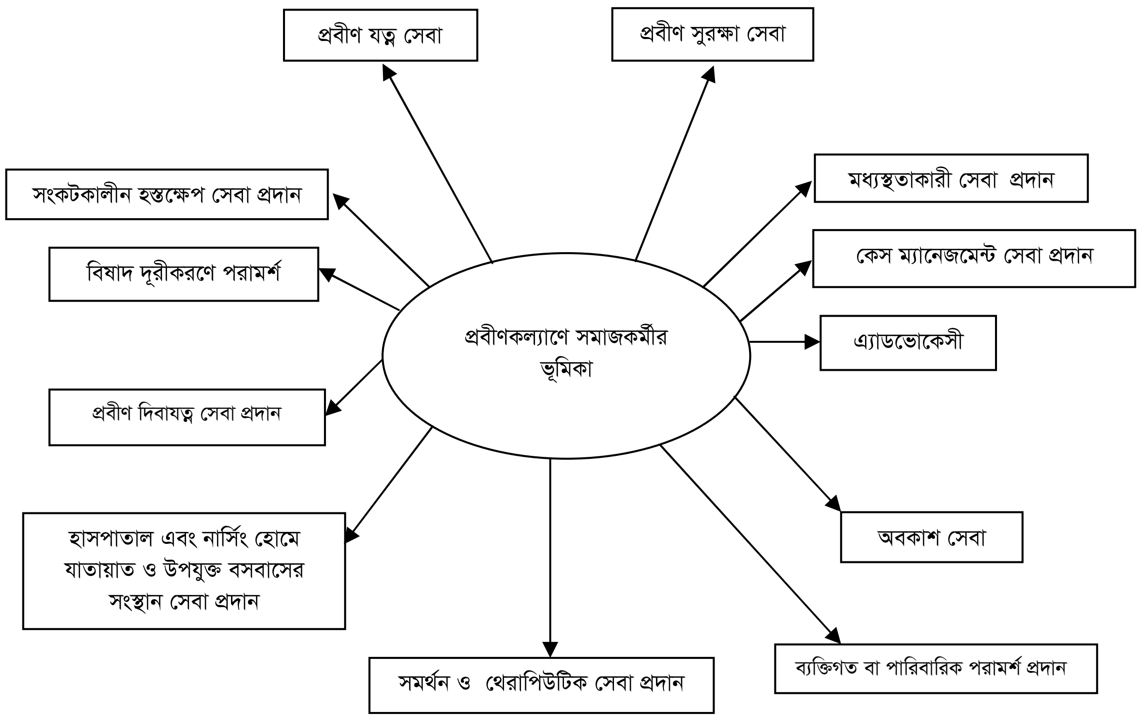
মানবজীবনের একটি স্বাভাবিক পরিনতি হচ্ছে বার্ধক্য। বার্ধক্যজনিত কারণে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং জীবনমানের নেতিবাচক উপাদান মোকাবিলার মাধ্যমে সুখী, আনন্দময় এবং অধিক অর্থবহ জীবনযাপনে সাহায্য করার ক্ষেত্রে জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মের গুরুত্ব অত্যাধিক। বর্তমানে আধুনিক শিল্পসমাজে প্রবীণ সমস্যা ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। মানুষের আয়ুষ্কাল তথা গড় আয়ু বৃদ্ধির ফলে প্রবীণ জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বেড়েই চলছে। ফলে প্রবীণরা অর্থনৈতিক, সামাজিক, মানসিক, শারীরিকসহ বিভিন্ন কারণে সমস্যায় জর্জরিত হয়ে জীবনের কাঙ্খিত ভূমিকা পালনে সক্ষম হচ্ছে না। ফলে তারা নিষ্ক্রিয় ও পরনির্ভরশীল হয়ে নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত হচ্ছে। এক্ষেত্রে প্রবীণদের মর্যাদার উন্নয়ন, আত্মনিয়ন্ত্রণ, অধিকার প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তিগত চাহিদা পরিপূরণ, জীবনমান উন্নয়ন, আত্মবিশ্বাসী, আস্থাশীল ও আত্যপ্রত্যয়ী করে তোলে। সমস্যা সমাধানে সক্ষমতা অর্জন করতে জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্ম প্রয়াস চালায়। এ প্রসঙ্গে Charles Zastrow (২০০৮:৪৭২) তাঁর *æIntroduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People"* গ্রন্থে উল্লেখ করেন, ''সমাজকর্ম শিক্ষা প্রশিক্ষণ পাঠ্যক্রমে বিশেষায়িত প্রবীণ কল্যাণের বিকাশে ও প্রবীণদের সমস্যাসমূহ নিরূপনে অনবদ্য ভূমিকা রয়েছে (Social work education in training a leading role in identifying the problems of older adults and is developing gerontological specializations within the curriculum.)।''

জাতিসংঘের মতে, ৬০ বছরের উর্ধ্বে যারা তারাই প্রবীণ। আধুনিক বিশ্বে চিকিৎসাবিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রসারের ফলে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পাওয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির চেয়ে প্রবীণ জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার তুলনামূলকভাবে বেশি। জাতিসংঘের তথ্যানুযায়ী ১৯৭৫ সাল হতে ২০০০ সাল এই পঁচিশ বছরে প্রবীণ জনসংখ্যা ৩৬ কোটি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৬০ কোটিতে উন্নীত হয়েছে এবং বার্ষিক বৃদ্ধির হার ২.৬৮%। বাংলাদেশে ১৯৯১ সালে প্রবীণ জনসংখ্যা ছিল ৬০ লক্ষ যা ২০১১ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ১ কোটি ১৩ লক্ষ হয়েছে। শিল্পায়ন ও নগররায়নের ফলে যৌথপরিবার ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে যা প্রবীণ সমস্যাকে আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। অসুস্থতা, দুর্বলতা, বার্ধক্যজনিত নিস্তেজতা, জরাগ্রস্ততা, একাকীত্ব, হীনমন্যতা ও নির্ভরশীলতাসহ বহুমুখী সমস্যায় প্রবীণরা জর্জরিত। এছাড়া শারীরিক ও মানসিক রোগ, সামাজিক মর্যাদা ও সামাজিক ভূমিকার অবনতি, অতীতের ব্যর্থতা ও সফলতার অনুভূতি এবং আন্তঃব্যক্তিক সম্পর্কের অবনতিসহ নানামুখী সমস্যায় প্রবীণ জনগোষ্ঠীরা সমস্যাগ্রস্ত হয়ে থাকেন। প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং জীবনমানের নেতিবাচক উপাদানগুলো মোকাবিলার মাধ্যমে সুখী, আনন্দময় এবং অধিক অর্থবহ জীবনযাপনে সক্ষম করার ক্ষেত্রে জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মের গুরুত্ব অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ফলপ্রসূ। সরাকারিভাবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়য়ের অধীনস্ত সমাজসেবা অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে ৬টি শান্তি নিবাস চালু রয়েছে যেখানে প্রবীণ জনগোষ্ঠীকে আবাসিক সেবা প্রদান করা হয়। এছাড়া বেসরকারি উদ্যোগে কিছু বৃদ্ধ নিবাস চালু রয়েছে। প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জন্য দেশে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক আবাসিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক সেবা কর্মসূচি যথাযথ বাস্তবায়নে জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

২.১৪.২ জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মীর ভূমিকা

প্রবীণদের শারীরিক, মানসিক, আবেগিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক তথা জৈব-মনো-সামাজিক (bio-psycho-social) সমস্যা মোকাবিলায় জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মী গতিশীল পেশাগত ভূমিকা রাখতে পারেন। সমস্যাগ্রস্ত প্রবীণ জনগোষ্ঠী এবং তাদের পারিবারিক সমস্যা সমাধানে এবং সামর্থ্য বৃদ্ধিতে জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মী সাহায্য করে

থাকেন। প্রবীণদের আত্মমর্যাদা, আত্মনিয়ন্ত্রণ, ব্যক্তিগত পরিপূর্ণতা জোরদার, জীবনমান উন্নয়ন, সর্বোচ্চ পর্যায়ের কর্মক্ষমতা, প্রবীণবান্ধব পরিবেশে জীবনযাত্রা এবং সমস্যা মোকাবিলা ও সমস্যা সমাধান সামর্থ্য শক্তিশালীকরণে প্রবীণকাল্যাণ সমাজকর্মীরা প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ করে থাকেন। প্রবীণদের সামাজিক ভূমিকা পালন জোরদার করার লক্ষ্যে প্রবীণদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ থেকে সমস্যা সমাধান পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে সমাজকর্মীরা বিশেষত মধ্যস্থতাকারী, পরামর্শক তথা পরিবর্তন প্রতিনিধি হিসেবে গতিশীল ভূমিকা পালন করে থাকেন। জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মীর ভূমিকা নিম্নে চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলোঃ



চিত্র ২.১৪.১ : প্রবীণকল্যাণে সমাজকর্মীর ভূমিকা

Charles Zastrow (২০০৮:৪৭২-৪৭৩) তাঁর *æIntroduction to Social Work and Social Welfare: Empowering People"* গ্রন্থে উল্লেখ করেন, প্রবীণদের মধ্যস্থতা সেবা (brokering services), কেস ব্যবস্থাপনা বা সেবা ব্যবস্থাপনা সেবা (case management or care management services), পরামর্শ প্রদান (advocacy), ব্যক্তি ও পারিবারিক কাউন্সেলিং (individual and family counseling), আর্তদের কাউন্সেলিং (grief counseling), বয়স্কদের দিবা যত্ন (adult day-care), সংকট হস্তক্ষেপ (crisis intervention), বয়স্কদের পরিসেবা (adult foster care), বয়স্কদের নিরাপত্তামূলক সেবা (adult protective services), সহায়তা ও চিকিৎসা দল (support and therapeutic groups), অবকাশ সুবিধা (respite care), যোগাযোগ ও বাসস্থানগত সহায়তা (transportation and housing assistance social), হাসপাতাল ও নার্সিং হোমসেবা (services in hospitals and nursing homes) ইত্যাদি দেওয়ার ক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা বিশেষভাবে দক্ষ।

প্রবীণদের সমস্যা নির্ণয়, পরিচর্যা ব্যবস্থাপনা, পরামর্শ প্রদান, যোগাযোগ স্থাপন, এ্যাডভোকেসী এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণে জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মীর নানামুখী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে থাকেন। প্রবীণদের মর্যাদা সমুন্নত রাখা, স্বনির্ভরতা বজায় রাখা, ব্যক্তিগত চাহিদা পূরণে সক্ষম করা, জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, নিজস্ব সম্পদ ও সামর্থের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা এবং জীবনযাত্রা পদ্ধতিতে যথাসম্ভব কম নিয়ন্ত্রণ আরোপ করার ক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। এছাড়া প্রবীণদের পরামর্শ সেবা, দিবা-যত্নসেবা, দত্তক সেবা, সংরক্ষণসেবা, হাসপাতাল ও নার্সিং সেবা এবং নীতি প্রণয়নে জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মী ভূমিকা পালন করে থাকেন। নিম্নে একটি প্রবীণ কল্যাণ সমাজকর্মীর পেশাগত দায়িত্ব সংক্ষেপে তুলে ধরা হলোঃ

১) প্রবীণ জনগোষ্ঠী এবং তাদের পরিবারের সমস্যা সমাধান এবং সামর্থ্য বৃদ্ধিতে সাহায্য করা;
২) প্রবীণ জনগোষ্ঠী এবং তাদের পরিবারের কল্যাণে সম্পদ ও সেবাদানকারী ব্যবস্থা অধিক কার্যকর এবং মানবিক দৃষ্টিকোন হতে পারিবারিক সমস্যা সমাধান করতে সাহায্য করা;
৩) যেসব সামাজিক ব্যবস্থা প্রবীণদের সম্পদ, সেবা এবং সুযোগ সুবিধা প্রদানে নিয়োজিত সেসব ব্যবস্থার সঙ্গে প্রবীণদের সংযোগ বা যোগাযোগ স্থাপনে সাহায্য করা;
৪) জীবনব্যাপী প্রবীণ সহায়ক উন্নয়ন, নীতি ও পরিকল্পণা প্রণয়নে অংশগ্রহণ করা;
৫) প্রবীণ জনগোষ্ঠী এবং তাদের পরিবারের জীবনমান উন্নয়ন ও সংরক্ষণে সাহায্য করা; এবং
৬) প্রবীণদের দৈহিক ও আবেগীয় কল্যাণে প্রতিবন্ধক হিসেবে যেসব দৈহিক, মানসিক, সামাজিক, পারিবারিক, সাংস্কৃতিক, নৃ-তাত্ত্বিক, বর্ণগত, সাংগঠনিক এবং সামাজিক উপাদান নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে সেগুলো দূরীকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।



চিত্র ২.১৪.১ : জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মীর ভূমিকা

পরিশেষে বলা যায়, বিশ্বের সবদেশেই প্রবীণ জনসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রবীণ জনগোষ্ঠীর যথাযথ সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম করা ও তাদের সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিতকরণে সমাজকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। উন্নত বিশ্বের অনুকরণে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশে জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সারসংক্ষেপ

সমাজকর্মের একটি বিশেষায়িত শাখা হিসেবে জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্ম প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন এবং নেতিবাচক উপাদানগুলো মোকাবিলার মাধ্যমে তাদের সুখী, আনন্দময় এবং অর্থবহ জীবনমানে সাহায্য করে থাকে। প্রবীণ জনগোষ্ঠীর চাহিদা ও প্রয়োজন নির্ণয়, সমস্যা মোকাবিলা এবং প্রবীণসেবা সংশ্লিষ্ট নীতি, পরিকল্পনা ও সাংগঠনিক কাঠামো গঠনে জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। প্রবীণদের সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীরা গতিশীল ও কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-২.১৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১) বাংলাদেশে প্রবীণকল্যাণে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক আবাসিক সেবা কর্মসূচির নাম কী?
ক) বৃদ্ধাশ্রম খ) প্রবীণকেন্দ্র
গ) শান্তি নিবাস ঘ) বৃদ্ধনিবাস

২) জেরনটোলজিক্যাল সমাজকর্মীরা প্রবীণদের কোন ধরনের ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলেন?
ক) মানসিক খ) সামাজিক
গ) শারীরিক ঘ) অর্থনৈতিক

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক) বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। চিকিৎসা সমাজকর্মের অপর নাম কী?
ক) হাসপাতাল সমাজসেবা খ) মেডিক্যাল সমাজসেবা
গ) হাসপাতাল সমাজকর্ম ঘ) ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম

২। বাংলাদেশে সর্বপ্রথম চিকিৎসা সমাজকর্ম চালুর ক্ষেত্রে কোন সংস্থার অবদান ছিল?
ক) ইউনেস্কো খ) ইউনিসেফ
গ) আন্তর্জাতিক রেডক্রস ঘ) সমাজসেবা অধিদপ্তর

৩। জাতিসংঘের মতে প্রবীণদের বয়স সীমা কত বছর?
ক) ৫৫ বছরের উর্ধ্বে খ) ৬০ বছরের উর্ধ্বে
গ) ৬৫ বছরের উর্ধ্বে ঘ) ৭০ বছরের উর্ধ্বে

৪। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে সমাজকর্মের কোন শাখা কাজ করে?
ক) চিকিৎসা সমাজকর্ম খ) বিদ্যালয় সমাজকর্ম
গ) শিল্প সমাজকর্ম ঘ) ক্লিনিক্যাল সমাজকর্ম

৫। সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য কী?
ক) মানসিকভাবে সমস্যাগ্রস্তদের সেবা প্রদান খ) অস্ত্র পাচারের পূর্বে মানসিক সান্ত্বনা প্রদান
গ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সামঞ্জস্য বিধানে সহায়তা করা ঘ) মহামারীতে ক্ষতিগ্রস্তদের সহায়তা প্রদান করা

৬। বিদ্যালয় সমাজকর্মীর ভূমিকা হচ্ছে–
i. Behavoural specialist
ii. Truant officer
iii. Counselor and parent liasion
নিচের কোনটি সঠিক?
ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৭। আবুবকর সিদ্দীকি সমস্যাগ্রস্তদের মানসিক ও সামাজিক সামঞ্জস্যহীনতা, বিকলঙ্গতা অথবা আবেগীয় ও মানসিক ভারসাম্যহীনতার মতো অক্ষমতার প্রতিকার এবং প্রতিরোধে সমাজকর্মের তত্ত্ব ও পদ্ধতি অনুশীলন করেন। আবু বকর সিদ্দীকি কোন ধরনের সমাজকর্মী?
ক) চিকিৎসা সমাজকর্মী খ) স্কুল সমাজকর্মী
গ) শিল্প সমাজকর্মী ঘ) ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মী

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৮ ও ৯ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

রাহাত আহমেদ একজন পেশাদার সমাজকর্মী হিসেবে সমাজকর্মের একটি বিশেষ শাখায় কর্মরত আছেন। উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে আমেরিকায় এ শাখাটির মূল প্রথিত হয়েছিল। Bertha Reynolds শাখাটির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন।

৮। উদ্দীপকের রাহাত সাহেব সমাজকর্মের কোন শাখায় কর্মরত আছেন?
ক) বিদ্যালয় সমাজকর্ম খ) চিকিৎসা সমাজকর্ম
গ) শিল্প সমাজকর্ম ঘ) সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম

৯। উদ্দীপকে ইঙ্গিত করা শাখাটির বিকাশে ১৯৭০ সালে কোন প্রতিষ্ঠানটি গড়ে ওঠে?
ক) Columbian School of Social Work খ) Industrial Social Welfare Centre
গ) Association of School of Social Work ঘ) American Association of Psychiatric Social Work

খ) সৃজনশীল

১. নিরক্ষরতা বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের একটি অন্যতম সামাজিক সমস্যা। শিশু-কিশোরদের শিক্ষাজীবন থেকে ঝরে পড়া নিরক্ষরতার অন্যতম কারণ গুলোর মধ্যে একটি। এ সমস্যা নিরসনে বর্তমান সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সমাজকর্মের একটি বিশেষ শাখার জ্ঞান প্রয়োগের উদ্যোগ নিয়েছে। ফলে শিশু-কিশোরদের পরামর্শ প্রদান, মানসিক সহায়তা প্রদানসহ কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম করে তোলা হচ্ছে।

ক. কত সালে আমেরিকায় চিকিৎসা সমাজকর্মী সমিতি গঠিত হয়? ১

খ. সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের লক্ষ্যসমূহ বর্ণনা করুন। ২

গ. শিশু-কিশোরদের শিক্ষাজীবন থেকে ঝরে পড়া নিরসনে সমাজকর্মের যে শাখার জ্ঞান প্রয়োগ করা হয়েছে তার গুরুত্ব উদ্দীপকের আলোকে উপস্থাপন করুন। ৩

ঘ. 'বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে শাখাটির গুরুত্ব অত্যাধিক" – কথাটির তাৎপর্য উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১ : ১। ঘ ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২ : ১। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৩ : ১। খ ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৪ : ১। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৫ : ১। ক ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৬ : ১। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৭ : ১। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৮ : ১। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৯ : ১। খ ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১০ : ১। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১১ : ১। খ ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১২ : ১। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১৩ : ১। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১৪ : ১। গ ২। খ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ২ : ১। গ ২। গ ৩। খ ৪। খ ৫। ক ৬। ঘ ৭। ঘ ৮। গ ৯। খ

সামাজিক সমস্যা সমাধানে সমাজকর্ম অনুশীলন
(Social Work Practice in Solving Social Problems)

ইউনিট ৩

ভূমিকা

অবাঞ্চিত, অনাকাঙ্খিত ও অস্বস্তিকর কিছু অবস্থা যা সমাজ ও সমাজের মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও মঙ্গলের পথে বাধাস্বরূপ তাই হলো সামাজিক সমস্যা। সামাজিক সমস্যা সমাজস্থ মানুষের সার্থক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলা যখন শিথিল হয়ে আসে এবং সামাজিক মূল্যবোধগুলো ভেঙে পড়ে তখনই সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ঘটতে থাকে। সমাজের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত সামাজিক সমস্যা। দারিদ্র্য, বেকারত্ব, অপুষ্টি, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, মাদকাসক্তি, যৌতুক, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি হলো সামাজিক সমস্যার কিছু উদাহরণ। সামাজিক সমস্যাগুলোর আন্তসম্পর্ক বিদ্যমান অর্থাৎ একটি সমস্যা অপর একাধিক সমস্যার জন্ম দিয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, অধিক জনসংখ্যা বেকারত্ব সৃষ্টি করতে পারে এবং বেকারত্ব জনিত হতাশা থেকে মাদকাসক্তি হতে পারে। আবার দারিদ্র্য ও অপুষ্টির পেছনেও অধিক জনসংখ্যার প্রভাব থাকতে পারে। সামাজিক সমস্যা সমাজের এক অবাঞ্চিত অবস্থা যদিও সমাজ থেকেই এর উদ্ভব ঘটে এবং সমাজেই এর আশু সমাধান নিহিত থাকে। সামাজিক সমস্যাগুলো মোকাবিলায় এবং সমাজ থেকে তা দূর করতে একজন সমাজকর্মী অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা পালন করে থাকেন। মূলত সামাজিক সমস্যাসমূহ দূরীকরণ এবং সমাজের মানুষের ইতিবাচক কল্যাণ সাধনের মাঝেই একজন সমাজকর্মীর পেশাদারিত্ব নিহিত।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৩.১ : সামাজিক সমস্যার ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও কারণ
পাঠ-৩.২ : সামাজিক সমস্যার আন্তসম্পর্ক
পাঠ-৩.৩ : জনসংখ্যা সমস্যার ধারণা, কারণ ও পরিস্থিতি
পাঠ-৩.৪ : জনসংখ্যা সমস্যার প্রভাব ও সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা
পাঠ-৩.৫ : বেকারত্বের ধারণা, কারণ ও পরিস্থিতি
পাঠ-৩.৬ : বেকারত্বের প্রভাব ও বেকারত্ব মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা
পাঠ-৩.৭ : অপুষ্টির ধারণা, কারণ ও পরিস্থিতি
পাঠ-৩.৮ : অপুষ্টির প্রভাব ও অপুষ্টি মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা
পাঠ-৩.৯ : যৌতুকের ধারণা, কারণ ও পরিস্থিতি
পাঠ-৩.১০ : যৌতুকের প্রভাব ও যৌতুক মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা
পাঠ-৩.১১ : বাল্যবিবাহের ধারণা, কারণ ও পরিস্থিতি
পাঠ-৩.১২ : বাল্যবিবাহের প্রভাব ও বাল্যবিবাহ মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা
পাঠ-৩.১৩ : মাদকাসক্তির ধারণা, কারণ ও পরিস্থিতি
পাঠ-৩.১৪ : মাদকাসক্তির প্রভাব ও মাদকাসক্তি মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা
পাঠ-৩.১৫ : অটিজমের ধারণা ও পরিস্থিতি
পাঠ-৩.১৬ : অটিজমের প্রভাব ও অটিজম সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা
পাঠ-৩.১৭ : জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণা ও কারণ
পাঠ-৩.১৮ : বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকায় জলবায়ু পরিবর্তনের ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা
পাঠ-৩.১৯ : এইচআইভি/এইডসের ধারণা, কারণ ও সংক্রমনের বাহন
পাঠ-৩.২০ : এইচআইভি/এইডসের প্রভাব ও এইচআইভি/এইডস মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

পাঠ-৩.১ সামাজিক সমস্যার ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও কারণ (Concept, Chatecteristics and Causes of Social Problem)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৩.১.১ সামাজিক সমস্যার সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
৩.১.২ সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখতে পারবেন।
৩.১.৩ সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্য ও কারণসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.১.১ সামাজিক সমস্যা

সমাজের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত সামাজিক সমস্যা। সমাজের অপরিহার্য বৈশিষ্ট্যের অপূর্ণতা এবং মানুষের অপূরণজনিত চাহিদা এবং দ্বন্দ্বময় সামাজিক জীবনের ক্রিয়াকলাপ হতেই মূলত সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ঘটে। সামাজিক সমস্যা সমাজ থেকে উদ্ভব হয় এবং সমাজের মানুষদের স্বাভাবিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে এবং অনেক সময় সমাজের অস্তিত্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। সমাজ সচেতন মানুষের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে সামাজিক সমস্যা নির্ধারণ ও বিশ্লেষণ করা হয়। সামাজিক সমস্যা পরিবর্তনশীল। আজ যা সামাজিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত, অতীতে তা সমস্যা হিসেবে পরিগনিত নাও হতে পারে আবার ভবিষ্যতে তা সমস্যা হিসেবে সূচিত নাও হতে পারে। জটিল আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে নতুন নতুন সমস্যার উদ্ভব হতে পারে। সমাজকর্মের যথার্থতা মূলত সমস্যা সমাধানমূলক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে।

সামাজিক সমস্যা মূলত একধরনের অবাঞ্ছিত, অনাকাঙ্খিত ও অস্বস্তিকর অবস্থা যা সমাজ ও সমাজস্থ মানুষের সার্বিক কল্যাণ ও মঙ্গলের পথে বাধাস্বরূপ এবং সার্থক জীবনযাপনের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সমাজের মূল্যবোধগুলো যখন ভেঙ্গে পড়ে, সামাজিক নিয়ম ও শৃঙ্খলা দূর্বল হয়ে আসে তখনই সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ঘটতে থাকে।

সমাজবিজ্ঞানী P.B. Horton and Ges J.R. Leslie তাঁদের "*Sociology of Social Problems*" গ্রন্থে বলেছেন, "সামাজিক সমস্যা সমাজ জীবনের এমন একটি অস্বাভাবিক অবস্থা, যা সমাজের উল্লেখযোগ্য অংশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে এবং যার সম্পর্কে যৌথ সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে কিছু করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয় (Social Problem is a condition affecting a significant number of people in ways considered undesirable and about which it is felt something can be done through collective social action.)।"

David Dressler (১৯৬৯: ৪৬৪) তাঁর "*Sociology: The Study of Human Interaction*" গ্রন্থে সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে বলেছেন, "সমাজিক সমস্যা মানুষের পারস্পারিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে সৃষ্ট এমন একটি অবস্থা, যাকে সমাজের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক অস্বাভাবিক বা অবাঞ্ছিত বলে বিবেচনা করে এবং প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে দূরীকরণে তারা বিশ্বাসী হয় (A social Problem is a condition growing out of human interaction that is considered undesirable by a significant number of people who believe it can and must be resolved through preventive or remiedial action.)।"

সামাজিক মূল্যবোধগুলো দুর্বল হয়ে এলে সামাজ কাঠামোতে যে শিথিলতা আসে এবং সমাজে অবাঞ্ছিত, অনাকাঙ্খিত, অস্বস্তিকর অবস্থার সূত্রপাত ঘটে। ফলে এর নেতিবাচক প্রভাব সমাজের অধিকাংশ মানুষের উপর পড়ে এবং সমাজস্থ মানুষের কল্যাণের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হয় মূলত সেই অনভিপ্রেত অবস্থাই হলো সামাজিক সমস্যা।

৩.১.২ সামাজিক সমস্যার বৈশিষ্ট্য

সামাজিক সমস্যা জটিল সমাজের অস্বাভাবিক অবস্থার বিমূর্ত ধারণা। সামাজিক সমস্যার প্রকৃতি এর বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরে। সাধারণভাবে সামাজিক সমস্যার যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় তা হলো:

১. সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে সমাজস্থ মানুষের মতৈক্য থাকে। অর্থাৎ কোনটি সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিবেচিত হবে তা নিয়ে সাধারণ জনগণের মতৈক্য থাকবে;

২. সামাজিক সমস্যাসমূহ প্রাকৃতিক বা সামাজিক এবং অবশ্যম্ভাবী;
৩. সামাজিক সমস্যা অস্বাভাবিক ও অনাকাঙ্খিত বিষয়;
৪. সমাজের কতিপয় খারাপ মানুষ দ্বারা সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়ে থাকে;
৫. সমাজস্থ প্রত্যেকেই সামাজিক সমস্যার সমাধান প্রত্যাশা করেন;
৬. সমাজস্থ সদস্যদের মধ্যেই সামাজিক সমস্যার সমাধান নিহিত থাকে;
৭. সামাজিক সমস্যা সমাজের বৃহত্তর অংশের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে;
৮. সামাজিক সমস্যা সামাজিক মূল্যবোধ ও আদর্শের পরিপন্থী;
৯. সামাজিক সমস্যা পরিমাপযোগ্য ও পরিবর্তনশীল;
১০. এর ক্রমাগত প্রক্রিয়া ও পারস্পারিক নির্ভরশীলতা রয়েছে;
১১. সামাজিক সমস্যার বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীন দিক বিদ্যমান;
১২. বিশেষ সামাজিক সমস্যা সর্বজনীন;
১৩. সমাজভেদে সামাজিক সমস্যার পার্থক্য রয়েছে এবং এর সমাধানে যৌথ প্রচেষ্টার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়; এবং
১৪. সামাজিক সমস্যা আপেক্ষিক ও এর কারণ বহুমুখী।

৩.১.৩ সামাজিক সমস্যার কারণ

অর্থনৈতিক, জৈবিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক, প্রাকৃতিক প্রভৃতি কারণে সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হতে পারে। সামাজিক সমস্যাসমূহ প্রকৃতিগত বিচারে বিভিন্ন হতে পারে। সমাজবিজ্ঞানীগণ সামাজিক সমস্যা সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষণা ও অনুসন্ধানে সামাজিক সমস্যার বহুমুখী কারণের কথা উল্লেখ করেছেন। সমাজবিজ্ঞানী অগবার্ণ ও নিমকফ সামাজিক সমস্যার নিম্লোক্ত কারণগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন:

ক. প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে মানুষের সাংস্কৃতিক সামঞ্জস্যহীনতা, বিশেষত কিছু অস্বাভাবিক অবস্থা। যেমন– মহামারি, বন্যা, ভূমিকম্পের সাথে মানুষ খাপ খাওয়াতে না পারা;
খ. দলীয়জীবন এবং সাংস্কৃতিক চাহিদার সাথে মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য বিধানের অভাব; এবং
গ. সংস্কৃতির বিভিন্ন পরস্পর সম্পর্কিত অংশের অসম গতিসম্পন্ন পরিবর্তনের ফলে উদ্ভূত চাপ।

সামাজিক সমস্যার কারণগুলো সম্পর্কে বিশেষভাবে বিবেচ্য হলো কারণগুলোর মধ্যকার পারস্পরিক নির্ভরশীলতা। একটি কারণকেই অনেক সময় একাধিক সমস্যার সৃষ্টি ও তাদের বিস্তারের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকতে দেখা যেতে পারে। সার্বিক দিক বিবেচনায় সামাজিক সমস্যার নিম্লোক্ত সাধারণ কারণসমূহ উল্লেখ করা যেতে পারে:

১. প্রত্যেক সমাজে সমাজস্থ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, আচার-আচরণ ও ব্যবহার সামাজিক কাঠামোর আওতায় বিকাশ লাভ করে। সামাজিক কাঠামো যদি ক্রটিপূর্ণ হয় তবে তা সমাজের সদস্যদের স্বাভাবিক সম্পর্ক ও আচরণের উপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে এবং এ থেকে সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়;
২. সমাজস্থ মানুষের সম্পদ ও সুযোগের ক্ষেত্রে অসম বণ্টন পরিলক্ষিত হলে সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে;
৩. কোনো ব্যক্তির উপর অপরিসীম মানসিক চাপ ক্রিয়ারত হলে তা ব্যক্তির মধ্যে বিচ্যুত আচরণ সৃষ্টি করতে পারে এবং পরবর্তীতে এই বিচ্যুত আচরণ সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে;
৪. সমাজ মাত্রই পরিবর্তনশীল ও গতিশীল। সামাজিক পরিবর্তন সামাজিক সমস্যার এক গুরুত্বপূর্ণ কারণ;
৫. প্রত্যেক দেশে জনসংখ্যা কাঠামো সুসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া উচিৎ। আয়তনের তুলনায় মোট জনসংখ্যা যদি বেশি বা কম হয় তবে সামগ্রিক স্থিতিশীলতা বজায় থাকে না। সামাজিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট হলে সামাজিক সমস্যা দেখা দিতে পারে;
৬. সমাজের বেঁচে থাকার জন্য মানুষের কিছু অত্যাবশ্যকীয় উপাদান আবশ্যক যেগুলোকে মৌলিক চাহিদার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কোনো সমাজের মানুষের যদি মৌলিক চাহিদা অপূর্ণ থাকে তবে সামাজিক সমস্যার উদ্ভব হতে পারে;
৭. সামাজিক পরিবর্তনের ধারায় সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোও পরিবর্তিত হয়। সাংস্কৃতিক উপাদানগুলোর মধ্যে অসম পরিবর্তন সাধিত হলে সাংস্কৃতিক শূন্যতা তৈরি হয় এবং এ থেকে তৈরি হয় সামাজিক সমস্যা;
৮. মূল্যবোধ মানুষের আচরণের চালিকা শক্তি যা মানুষের মধ্যে ভাল-মন্দ বিচারবোধ গড়ে তোলে। সাংস্কৃতিক শূন্যতার পাশাপাশি মূল্যবোধগত দ্বন্দ্ব সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি করে;

৯. শিল্পায়ন ও শহরায়নের ফলে সমাজের বস্তুগত পরিবর্তন যত দ্রুত সাধিত হয়, তার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমাজের অন্যান্য উপাদান পরিবর্তিত নাও হতে পারে। ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। শিল্পায়ন ও শহরায়নের ফলে সৃষ্ট সামাজিক বিশৃঙ্খলা সামাজিক সমস্যার তৈরি করে; এবং

১০. জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অস্থিতিশীলতা সমাজে অরাজকতা তৈরি করে এবং এর থেকে সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়।

সারসংক্ষেপ

সমাজের মূল্যবোধগুলো দুর্বল হয়ে পড়লে সমাজ কাঠামোতে যে শিথিলতা আসে এবং এর প্রভাবে সমাজে যে অনাকাঙ্খিত ও অস্বস্তিকর অবস্থার সৃষ্টি হয় যার নেতিবাচক প্রভাব অধিকাংশ মানুষের উপর পড়ে তাই সামাজিক সমস্যা। সামাজিক সমস্যা সমাজ থেকেই উদ্ভূত হয় এবং এর সমাধান সমাজেই নিহিত থাকে। সামাজিক সমস্যা সমাধানে জনসাধারণের মতৈক্য থাকা আবশ্যক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। সামাজিক সমস্যা মূলত–

ক) সমাজের অস্বস্তিকর অবস্থা
খ) সমাজের বাঞ্ছিত অবস্থা
গ) সমাজের মূল্যবোধগত অবস্থা
ঘ) সমাজের কল্যাণমূলক অবস্থা

২। কোনটি সামাজিক সমস্যার জন্য দায়ী নয়?

ক) মূল্যবোধগত দ্বন্দ্ব
খ) শিল্পায়ন ও শহরায়ন
গ) মৌলিক চাহিদার অপূরণ
ঘ) সামাজিক আদর্শ

পাঠ-৩.২ সামাজিক সমস্যার আন্তসম্পর্ক (Interrelationship of Social Problems)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৩.২.১ সামাজিক সমস্যার আন্তসম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.২.১ সামাজিক সমস্যার আন্তসম্পর্ক

সমাজের বিভিন্ন অংশ পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। সমাজের একদিকে অসংহতি বা বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে অন্যদিকেও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অনুরূপ সামাজিক সমস্যা একটির সাথে অপরটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। কোনো সমাজে একটি সামাজিক সমস্যা উদ্ভব হলে সেই সমস্যা থেকে একাধিক সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।

সমাজ একটি অখন্ড যৌগিক সত্তা (complex whole) যার অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক, পরিবেশগত প্রভৃতি দিক পরস্পর নির্ভরশীল ও অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। এজন্য কোন সামাজিক সমস্যাই একক এবং বিচ্ছন্নভাবে সমাজে বিরাজ করে না। একটি সামাজিক সমস্যা অন্যটির কারণ হিসেবে বিরাজ করে। সামাজিক সমস্যার নির্ভরশীলতা এবং ক্রমাগত প্রতিক্রিয়া (chain reaction) থেকেই সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ঘটে। উদাহরণস্বরূপ কোনো সমাজে দারিদ্র্য থাকলে এর প্রভাবে পুষ্টিহীনতা, স্বাস্থ্যহীনতা, নিরক্ষরতা, ভিক্ষাবৃত্তি প্রভৃতি সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। আবার স্বাস্থ্যহীনতার ফলে কর্মক্ষমতা হ্রাস পেয়ে উপার্জন ব্যাহত হলে মানুষ দারিদ্র্যের শিকার হতে পারে। সামাজিক সমস্যার ক্রমাগত প্রতিক্রিয়া বিদ্যমান এবং পারস্পরিক নির্ভরশীলতার প্রভাব সমাজে বহুমুখী সমস্যার সৃষ্টি হয়। কোনো সমস্যা একক বা বিচ্ছিন্নভাবে সমাজে বিরাজ করে না বরং একটি সামাজিক সমস্যা অন্যটির কারণ হিসাবে বিরাজ করে। সুতরাং সামাজিক সমস্যার মধ্যে গভীর আন্তসম্পর্ক বিদ্যমান।

সারসংক্ষেপ

সামাজিক সমস্যার মধ্যে গভীর আন্তসম্পর্ক বিদ্যমান। কোনো সমস্যা একক বা বিচ্ছিন্নভাবে সমাজে বিরাজ করে না বরং একটি সমস্যা অপর কোনো সমস্যা তৈরি করে থাকে। সামাজিক সমস্যার নির্ভরশীলতা এবং ক্রমাগত প্রতিক্রিয়া (chain reaction) থেকেই সামাজিক সমস্যার উদ্ভব ঘটে। কোনো সমস্যা একক বা বিচ্ছিন্নভাবে সমাজে বিরাজ করে না বরং একটি সামাজিক সমস্যা অন্যটির কারণ হিসাবে বিরাজ করে। সুতরাং সামাজিক সমস্যার মধ্যে গভীর আন্তসম্পর্ক বিদ্যমান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সামাজিক সমস্যা হচ্ছে–

ক) বিচ্ছিন্ন খ) অবিচ্ছিন্ন
গ) একক ঘ) পরস্পর সম্পর্কহীন

২। নিরক্ষরতা কোন ধরনের সমস্যা?

ক) সামাজিক সমস্যা খ) মূল্যবোধগত সমস্যা
গ) ব্যক্তিত্বর দ্বন্দ্বজনিত সমস্যা ঘ) আদর্শিক সমস্যা

পাঠ-৩.৩ জনসংখ্যা সমস্যার ধারণা, কারণ ও পরিস্থিতি (Concept, Causes and Situation of Population Problem)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৩.৩.১ জনসংখ্যা সমস্যা বলতে কী বোঝায় তা লিখতে পারবেন।
৩.৩.২ বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যার কারণসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৩.৩.৩ বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যা পরিস্থিতি বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.৩.১ জনসংখ্যা সমস্যার ধারণা

যে কোনো রাষ্ট্রের বা দেশের জন্য জনসংখ্যা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অপরিহার্য উপাদান মানবসম্পদ। দেশের সম্পদকে কাজে লাগানোর মাধ্যমে পণ্যসামগ্রী ও সেবাসমূহ উৎপাদনের ক্ষেত্রে মানবসম্পদই মূল চালিকাশক্তি। সাধারণভাবে জনসংখ্যা বলতে সেই সমস্ত জনগণকে বুঝায় যারা কোনো নির্দিষ্ট এলাকা, শহর বা দেশে বসবাস করে। দক্ষ ও কুশলী জনসংখ্যা হলো উৎপাদনের অপরিহার্য উপাদান কি পরিমাণ উৎপাদন করা হবে, তা নির্ভর করে কর্মক্ষম জনসংখ্যার উৎপাদনশীলতার উপর এবং উৎপাদনশীলতা নির্ভরকরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এবং দক্ষতার উপর। কিন্তু যখন কোনো দেশের জনসংখ্যা প্রাপ্ত সম্পদের তুলনায় কম বা বেশি হয় এবং তা জাতীয় কল্যাণ ও অগ্রগতিকে বাধাগ্রস্ত করে তখন তা সমস্যায় পরিণত হয়। জনসংখ্যা দেশের প্রাপ্ত সম্পদ ও সম্ভাব্য সম্পদের তুলনায় অধিক হলে তাকে জনসংখ্যাস্ফীতি বলা হয়। জনসংখ্যাস্ফীতিরই একটি সম্প্রসারিত রূপ হচ্ছে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ। অর্থনীতিবিদ ম্যালথাস বলেন, "যদি কোনো দেশের জনসংখ্যা সে দেশের মোট খাদ্য উৎপাদনের চেয়ে অধিক হয় তবে জনসংখ্যার সেই পরিস্থিতিকে জনসংখ্যা স্ফীতি বলে।" অর্থাৎ বলা যায়, কোনো দেশের জনসংখ্যা যখন আকস্মিকভাবে অতি দ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে দেশের সামাগ্রিক আর্থ-সামাজিক জীবনে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করে তখন তাকে জনবিস্ফোরণ বলা হয় এবং এরূপ অবস্থাকে জনসংখ্যা সমস্যা হিসেবে অভিহিত করা হয়।

৩.৩.২ বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যার কারণ

বাংলাদেশে জনসংখ্যা সমস্যার প্রকৃতি জনাধিক্য। স্বাধীনতার পর ১৯৭৪ সালের আদমশুমারির তথ্যানুযায়ী তৎকালীন বাংলাদেশে জনসংখ্যা ছিল ৭,৬৩,৯৮,০০০ জন। কিন্তু ২০১১ সালের আদমশুমারির তথ্য অনুযায়ী তৎকালীন বাংলাদেশে জনসংখ্যা বেড়ে দাড়ায় ১৪,২৩,১৯,০০০ জন যা বাংলাদেশের সম্পদ ও ধারণ ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি। সুতরাং বাংলাদেশের জনসংখ্যার আধিক্য একটি বড় সমস্যা। এদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির পশ্চাতে অর্থনৈতিক, সামাজিক, ভৌগোলিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিষয়ের ক্রিয়াশীলতা লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রত্যক্ষ কারণসমূহ উল্লেখ করা হলো:

১. **উচ্চ জন্মহার:** বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ উচ্চ জন্মহার। ২০১১ সালের আদমশুমারীর তথ্যানুযায়ী এদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির শতকরা হার ১.৩৭। এই উচ্চ জন্মহার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারকে অনেকাংশে বাড়িয়ে তুলেছে।

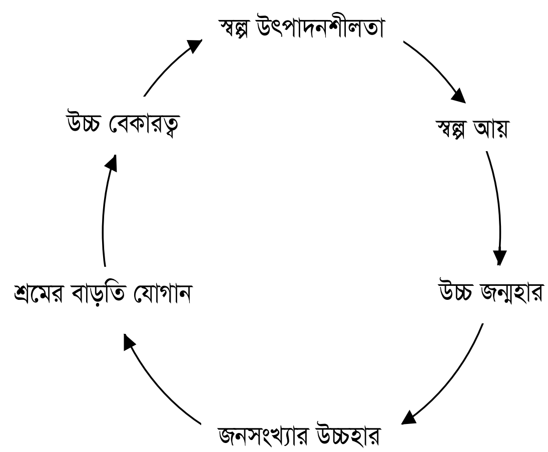
২. **তুলনামূলক নিম্ন মৃত্যুহার:** বর্তমানে জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা, সচেতনতা বৃদ্ধি প্রভৃতি কারণে মৃত্যুহার অনেকাংশে কমে এসেছে এবং জন্ম ও মৃত্যুহারের মধ্যে ব্যাপক তারতম্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। তুলনামূলক নিম্ন মৃত্যুহার জনসংখ্যার আধিক্য সৃষ্টি করছে।

৩. **অধিক শিশু মৃত্যুহার:** এদেশের শিশু মৃত্যুহার অধিক হওয়ার কারণে শিশু মৃত্যুর আশঙ্কা পিতামাতাকে অধিক সন্তান গ্রহণে আগ্রহী করে তোলে। অধিক সন্তান গ্রহণও জনসংখ্যাধিক্যের জন্য দায়ী।

৪. **বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ:** বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বহুল প্রচলন রয়েছে। বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রত্যক্ষভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে অবদান রাখে। UNFPA–এর তথ্যানুযায়ী এদেশের ৫০ ভাগেরও বেশি নারী ১৯ বছর বয়সের পূর্বেই প্রথম সন্তানের জন্ম দেয় এবং সমগ্র জীবনব্যাপী তাদের বহুবিধ সন্তান জন্মদানের সম্ভাবনা থাকে।

৫. **উচ্চ প্রজনন ক্ষমতা:** অনেকে মনে করেন ভৌগোলিক অবস্থান, খাদ্যাভ্যাস ও জীবনপ্রণালী প্রভৃতি কারণে এদেশের নারীদের প্রজনন ক্ষমতা তুলনামূলক বেশি যা অধিক সন্তান জন্মদানে ভূমিকা রাখতে পারে।

৬. **অনিয়ন্ত্রিত সন্তান জন্মদান:** বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে অনিয়ন্ত্রিত সন্তান জন্মদান। সরকারি ও বেসরকারি ব্যাপক প্রচারণা সত্ত্বেও জন্ম নিরোধক ব্যবহারের ক্ষেত্রে শতভাগ সাফল্য অর্জিত হয়নি। বাংলাদেশে দারিদ্র্যের প্রভাবে সন্তান জন্মদানের প্রবণতা অধিক। এ বিষয়ে অর্থনীতিবিদ র‍্যাগনার নার্কস দারিদ্র্যের দুষ্টচক্রের মাধ্যমে বিষয়টি তুলে ধরেছেন যা চিত্র তুলে ধরা হলো:



চিত্র ৩.২.১ : বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি ও প্রভাব

জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে প্রত্যক্ষ কারণ ছাড়াও পরোক্ষ বিভিন্ন কারণ কাজ করে। এগুলো হলো:

ক. অজ্ঞ, অসচেতন ও নিরক্ষর জনগোষ্ঠী জীবনযাপন সম্পর্কে উদাসীন। তাদের ভ্রান্ত ধারণা ও কুসংস্কার জনসংখ্যা বৃদ্ধিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে;

গ. একাধিক কন্যা সন্তানের পর পুত্র সন্তানের আকাঙ্খা জনসংখ্যা বৃদ্ধি করছে;

ঘ. ধর্মীয় কুসংস্কার যেমন, 'মুখ দেবেন যিনি আহার দেবেন তিনি' প্রভৃতি জনসংখ্যা বৃদ্ধি করছে;

ঙ. ভৌগোলিক কারণে এদেশের জনগণ অল্প সময়ে প্রজনন ক্ষমতা লাভ করে এবং তাদের উৎপাদন ক্ষমতাও তুলনামূলকভাবে অধিক; এবং

চ. রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতায় জনগণের মাঝে হতাশা ও কর্মবিমুখতা জন্ম দেয়। এরূপ অবস্থায় গৃহবন্দী জগগণের অধিক সন্তান জন্মদানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

৩.২.৩ বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি

বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম ঘনবসতিপূর্ণ দক্ষিণ এশিয়ার একটি দেশ। এদেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিঃ মিঃ হলেও আদমশুমারি ২০১১-এর তথ্য অনুযায়ী এদেশের জনসংখ্যা ১৪,২৩,১৯,০০০। প্রতি বর্গ কিলোমিটারে ৯৬৪ জন বাস করে। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত ৩০ বছরে এদেশের জনসংখ্যা দ্বিগুণের চেয়েও বেশি বেড়েছে। তাই ১৯৭৬ সালে জনসংখ্যা সমস্যাকে এদেশের এক নম্বর সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার রোধ করতে না পারলে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ ঘটবে এবং খাদ্য, বস্ত্র, ভূমিসহ বাসস্থান ও জীবনযাত্রার মানের উপর হুমকি সৃষ্টি করবে।

সারসংক্ষেপ

কোনো দেশের জনসংখ্যা আকস্মিকভাবে অতি দ্রুত বৃদ্ধি বা হ্রাসপ্রাপ্ত হয়ে আর্থ-সামাজিক জীবনে বিপর্যয়ের সৃষ্টি করলে তাকে জনসংখ্যা সমস্যা বলা হয়। বাংলাদেশের জনসংখ্যা অতিদ্রুত বৃদ্ধি পেয়ে জনসংখ্যা বিস্ফোরণ সৃষ্টি হয়েছে এবং ভবিষ্যতে তা এদেশের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ভূমিসহ জীবনযাত্রার মানের উপর চরম নেতিবাচক অবস্থার সৃষ্টি করবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। বাংলাদেশের বর্তমান জনসংখ্যা কত?

ক) ১৪, ২৩, ১৯, ০০০ খ) ১৬, ৬০, ৬০, ০০০

গ) ১১, ১৪, ১৯, ০০০ ঘ) ১২, ৩২, ১৬, ০০০

২। এদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির শতকরা হার কত শতাংশ?.

ক) ১.২২ খ) ১.৩৪

গ) ১.৪৫ ঘ) ১.৫২

পাঠ-৩.৪ জনসংখ্যা সমস্যার প্রভাব ও জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা (Impact of Population Problem and the Role of Social Worker to Combat the Population Problem)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৩.৪.১ জনসংখ্যা সমস্যার প্রভাব সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.৪.২ জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবিলায় সামজকর্মীর ভূমিকা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.৪.১ জনসংখ্যা সমস্যার প্রভাব

জনসংখ্যা বিস্ফোরণ যে কোনো দেশের জন্য একটি ভয়াবহ পরিণতি ডেকে আনতে পারে। কোনো কোনো দিক বিবেচনায় এটি যুদ্ধের চেয়েও ভয়াবহ। বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে জনসংখ্যা সমস্যা এদেশের সার্বিক উন্নয়নে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে চলছে। নিম্নে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রভাব তুলে ধরা হলো:

১. মানুষের জীবনধারণের জন্য খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতি ন্যূনতম মৌলিক চাহিদাসমূহ পূরণ করা আবশ্যক। কিন্তু এই চাহিদা পূরণে অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হিসেবে কাজ করে জনসংখ্যা স্ফীতি।

২. অধিক জনসংখ্যার কারণে মৌলিক চাহিদা পূরণে অপূর্ণতা সৃষ্টি হয় যা থেকে জন্ম নেয় হতাশা, ব্যর্থতা এবং অসন্তুষ্টি। এর ফলে পারিবারিক জীবনে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় এবং বিবাহবিচ্ছেদ এবং পারিবারিক ভাঙন ঘটে থাকে।

৩. জনসংখ্যার আধিক্য সামাজিক বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। ব্যক্তি জীবনে হতাশা, ব্যর্থতা, অশান্তি, খুন, ধর্ষণ, পতিতাবৃত্তির নেপথ্যে জনসংখ্যার আধিক্যজনিত প্রভাব রয়েছে।

৪. অধিক জনসংখ্যা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উপর নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। আবাদি জমির উপর অধিক চাপ, সঞ্চয় ও মূলধনের সংকোচন ও শিল্পোন্নয়নকে চরমভাবে বাধাগ্রস্ত করে। যার ফলে দারিদ্র্য ও বেকারত্ব সৃষ্টি হয়।

৫. অধিক জনসংখ্যা সার্বিক বাস্তুসংস্থানের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। জনসংখ্যাজনিত অধিক চাপ পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাকে কলুষিত করে, স্বাস্থ্যখাতকে বিপর্যস্ত করে এবং পরিবেশকে ভারসাম্যহীন করে।

৬. অধিক জনসংখ্যার যথাযথ ব্যবস্থাপনা সম্ভব হয় না। নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটে ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের বিস্তৃতি ঘটে। জীবকার প্রয়োজনে অনেকেই অপরাধকে বেছে নেয়।

৩.৪.২ জনসংখ্যা সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

জনসংখ্যা সমস্যার ব্যাপকতা ও বিস্তৃতি অধিক। দেশের সার্বিক অবস্থার উন্নয়নে এর আশু সমাধান আবশ্যক। এক্ষেত্রে একজন সমাজকর্মী যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন–

১. দেশের সর্বস্তরের জনগণের মধ্যে অধিক জনসংখ্যার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সচেতনতামূলক ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা। জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাকে জনপ্রিয় ও পর্যাপ্ত করে তোলা।

২. বিভিন্ন স্তরের পাঠ্যক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফল ও ভয়াবহতাকে তুলে ধরতে সরকারকে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করা ও উদ্বুদ্ধ করা।

৩. সামাজিক কার্যক্রম প্রয়োগের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও আইনানুগ ব্যবস্থাকে বাস্তবমুখী ও প্রয়োগযোগ্য করে তুলতে সরকারকে চাপ প্রয়োগ করা।

৪. পর্যাপ্ত আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মসূচিতে বেকারদের উদ্বুদ্ধ করে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ও চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করা।

৫. অজ্ঞ ও অশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মাঝে জনসংখ্যার আধিক্য বিষয়ক সচেতনতা গড়ে তোলা।

৬. পরিবার পরিকল্পনা, জন্ম নিয়ন্ত্রণ, প্রজনন স্বাস্থ্য, শিশুস্বাস্থ্য প্রভৃতি বিষয়ে পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা করা।

৭. রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় সরকার ও জনগণকে উদ্বুদ্ধ করা।

৮. জনগণের প্রথাগত মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন করে উন্নয়নমুখী চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ করা।

সারসংক্ষেপ

জনসংখ্যা সমস্যা মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে অপূর্ণতা সৃষ্টি করে এবং এ থেকে মানুষের মাঝে নেমে আসে হতাশা, ব্যর্থতা অসন্তুষ্টি। হতাশা ও ব্যর্থতা থেকে মানুষ অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পরে। জনসংখ্যা সমস্যা নিরসনে একজন সমাজকর্মী ব্যাপক সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে পারেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। জনসংখ্যা সমস্যার নেতিবাচক প্রভাব কোনটি?

ক) ব্যক্তির জীবনকে সহজতর করে
খ) জীবনযাত্রার মান উন্নত করে
গ) ব্যক্তির জীবনকে সমস্যাগ্রস্ত করে তোলে
ঘ) জীবনকে আরামপ্রদ করে

২। জনবিস্ফোরণ হলো−

ক) জনসংখ্যাস্ফীতির বৃহত্তর রূপ
খ) জনসংখ্যা বৃদ্ধি
গ) খাদ্য ঘাটতি
ঘ) জনাধিক্য

পাঠ-৩.৫ বেকারত্বের ধারণা, কারণ ও পরিস্থিতি (Concept, Causes and Situation of Unemployment)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৩.৫.১ বেকারত্বের সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।

৩.৫.২ বাংলাদেশে বেকারত্বের কারণসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৩.৫.১ বাংলাদেশে বেকারত্ব সমস্যার পরিস্থিতি বর্ণনা করতে পারবেন।।

৩.৫.১ বেকারত্বের ধারণা

বিশ্বব্যাপী এক সাধারণ সমস্যা বেকারত্ব। শিল্পোন্নত বা অনুন্নত সবদেশেই কম-বেশি বেকারত্ব বিরাজমান। বেকারত্ব বিশ্বব্যাপী এক মানবিক, আর্থিক ও সামাজিক সমস্যা যার প্রভাবে সমাজে দেখা দেয় বহুমুখী সমস্যা। বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অন্যতম প্রতিবন্ধকতা হলো বেকারত্ব। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে বেকারত্ব ক্রমান্বয়ে প্রসার লাভ করছে।

বেকারত্ব বলতে সাধারণভাবে মানুষের কর্মহীনতাকে বোঝানো হয়। কোনো ব্যক্তি যদি আয়-উপার্জনমূলক কোনো কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট না থাকে তবে ব্যক্তির ঐ অবস্থাকেই সাধারণ দৃষ্টিতে বেকারত্ব হিসেবে অভিহিত করা হয়। কিন্তু অনেক সময় ইচ্ছাকৃতভাবেও অনেকে কর্মহীন থাকতে পারে। ইচ্ছাকৃত বেকারত্বকে অর্থনীতিতে বেকারত্ব ধরা হয় না। আবার শারীরিক বা মানসিকভাবে কাজ করতে অক্ষমদের যেমন– শিশু, বৃদ্ধ, বিকলাঙ্গদের বেকার বলা যায় না। বেকার বলতে এমন একটি পরিস্থিতিকে বোঝায়, যাতে কর্মক্ষম শ্রমিক বর্তমান মজুরিতে কর্মে ইচ্ছুক থাকা সত্ত্বেও কর্মে নিয়োগ লাভে সক্ষম হয় না। কর্মক্ষম শ্রমিকের অনিচ্ছাকৃত কর্মহীনতাকে বেকারত্ব বলা হয়।



চিত্র ৩.৫.১ : বেকারত্ব সমস্যা

সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) সংজ্ঞানুযায়ী, "বেকারত্ব হলো এমন কর্মহীন অবস্থা, যে অবস্থায় কর্মক্ষম ব্যক্তি কর্মহীনতার প্রভাবে নিজের প্রয়োজনীয় অর্থনৈতিক চাহিদা স্বাধীনভাবে পূরণে অক্ষম হয়"।

প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক পিগুর (A. C. Pigu) মতে, "যখন কর্মক্ষম লোকেরা যোগ্যতা অনুসারে, প্রচলিত মজুরির ভিত্তিতে কাজ করতে চায় অথচ কাজ না পাওয়ায়, তখন যে অবস্থার উদ্ভব হয়, সে অবস্থাকে বেকারত্ব বলা হয়।"

অর্থাৎ কর্ম লাভের স্পৃহা এবং কর্ম লাভের চেষ্টা চালিয়েও কর্মের সুযোগ লাভে ব্যর্থ হওয়ার ফলে সৃষ্ট সক্ষম ব্যক্তির কর্মহীন অবস্থাই বেকারত্ব।

৩.৫.২ বেকারত্বের কারণ

বাংলাদেশের বেকার সমস্যার পেছনে আর্থ-সামাজিক বহুবিধ বিষয়ের সংশ্লিষ্টতা লক্ষ্য করা যায়। নিম্নে বাংলাদেশের বেকার সমস্যার পেছনে দায়ী বিভিন্ন কারণসমূহের উপর আলোকপাত করা হলো:

১. **অধিক জনসংখ্যা:** বাংলাদেশ পৃথিবীর অন্যতম জনবহুল দেশ। ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটারের ছোট্ট এই দেশটির বর্তমান জনসংখ্যা ১৪,২৩,১৯,০০০ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ১.৩৭ শতাংশ। এই বিপুল জনসংখ্যাই এদেশের অন্যান্য সামাজিক সমস্যার মত বেকারত্বের পেছনে দায়ী মূল কারণ। জনসংখ্যা অনুপাতে কর্মের সুযোগ সীমিত। জনসংখ্যা বৃদ্ধি হারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কর্মের সুযোগ সম্প্রসারিত হচ্ছে না।

২. **কর্মের সীমিত সুযোগ:** অধিক জনসংখ্যা এবং এর ফলে কর্মের স্বল্পতা এই দুই উপাদান বেকারত্বকে চরম পর্যায়ে উপনীত করছে। কর্মের সুযোগ সীমিত হওয়ার কারণে লক্ষ লক্ষ জনগোষ্ঠী কর্মহীন বেকার জীবন যাপন করছে।

৩. **কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি:** এদেশের অর্থনীতি কৃষিভিত্তিক। বাংলাদেশের কৃষি প্রকৃতির উপর ব্যাপকভাবে নির্ভরশীল। আবহাওয়া বা ঋতু পরিবর্তনের সাথে কৃষি কাজের বিষয়টি সম্পর্কিত। ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে কৃষকের কর্মে

নিযুক্ত হবার বিষয়টি সম্পৃক্ত থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এক জমিতে বছরে একবার ফসল হয়। সেক্ষেত্রে বাকী সময় কৃষকদের কর্মহীন থাকতে দেখা যায়।

৪. **শিল্পের বিকাশ না হওয়া:** এদেশের কৃষি ভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামোতে শিল্পের বিকাশ পরিপূর্ণভাবে লাভ করে নি। মোট শ্রমশক্তির মাঝে শিল্প শ্রমিকের সংখ্যা খুবই নগণ্য। শিল্পে অনগ্রসরতার জন্য সাধারণ মানুষের নতুন নতুন কর্মক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে না।

৫. **ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা:** এদেশের শিক্ষা ব্যবস্থাও বেকার সমস্যা তৈরির জন্য বহুলাংশে দায়ী। প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলতে পারছে না। প্রচলিত সাধারণ শিক্ষা সম্পূর্ণই শ্রেণিকক্ষভিত্তিক পাঠদান। কারিগরি, কর্মমুখী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সুযোগ স্বল্প। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রাপ্তির মাধ্যমে বড় পরিসরে স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টিও সম্ভব হচ্ছে না।

৬. **রাজনৈতিক অস্থিরতা:** এদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অস্থিতিশীলতা নিত্যসঙ্গী। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার জন্য বড় বড় বিদেশি বিনিয়োগ প্রায়ই বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ব্যাপক সংখ্যক মানুষ কর্মসংস্থানের সুযোগ হারাচ্ছে।

৭. **প্রাকৃতিক দুর্যোগ:** বাংলাদেশ প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ হিসেবে পরিচিত। বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, খরা, নদীভাঙন প্রভৃতি বাংলাদেশের সাধারণ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগে প্রতিবছরই বিপুল সংখ্যক মানুষ কর্মচ্যুত হয়ে বেকার হয়ে পড়ছে।

৮. **নিরক্ষরতা:** বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার বিপুলসংখ্যক মানুষ নিরক্ষর ও অজ্ঞ। এসব মানুষ জীবন সম্পর্কে সচেতন নয় এবং অনেক কাজের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় ন্যূনতম যোগ্যতাও তাদের নেই।

৯. **মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি:** এদেশের প্রচলিত মূল্যবোধ বেকারত্বের জন্য দায়ী। এদেশের মোট জনসংখ্যার অধিকাংশ নারী কিন্তু সামাজিক মূল্যবোধে এখনো বিশ্বাস করা হয় নারী কেবল ঘরের কাজ করবে এবং বাইরের কাজে সংশ্লিষ্ট হতে পারবে না। এতে বেকার তথা নির্ভরশীল জনসংখ্যার অনুপাত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

১০. **দারিদ্র্য:** বেকারত্ব দারিদ্র্য সৃষ্টি করে আবার দারিদ্র্যের কারণেও বেকারত্ব সৃষ্টি হয়। দারিদ্র্যের কারণে অনেকেই শিক্ষা ও বিভিন্ন সুযোগ প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয় এবং নিজেকে কার্মের উপযোগী দক্ষ ও যোগ্য করে তুলতে পারে না।

৩.৫.২ বাংলাদেশে বেকারত্ব পরিস্থিতি

বাংলাদেশে শ্রমশক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে বেকারের সংখ্যাও ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো, ২০০৯ সালের তথ্যানুযায়ী এদেশে মোট শ্রমশক্তি ৫ কোটি ৩৭ লাখ। এর মধ্যে ৫ কোটি ১০ লাখ কাজে নিয়োজিত এবং ২৭ লাখ বেকার। নিচের সারণিতে বাংলাদেশে বেকারত্বের হার তুলে ধরা হলো–

সারণি ৩.৫.১ : ১৯৯৫ সাল থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে বেকারত্বের হার

জরিপের সন	১৯৯৫-৯৬	১৯৯৯-২০০০	২০০২-২০০৩	২০০৫-০৬	২০১০
উভয়লিঙ্গ	৩.৫	৪.৩	৪.৩	৪.৩	৪.৫
পুরুষ	২.৮	৩.৪	৪.২	৩.৪	৪.১
মহিলা	৭.৮	৭.৮	৪.৯	৭.০	৫.৭

(উৎস: পরিসংখ্যান পকেট বুক ২০০৪ এবং ২০১১, শ্রমশক্তি জরিপ, ২০১০)

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান প্যাকেট বুক, ২০১০ এর তথ্যানুযায়ী শতকরা ৪.৫০ ভাগ পুরুষ এবং ৭.৭০ ভাগ মহিলা বেকার। শ্রমশক্তি জরিপ ২০১০ এর তথ্যানুযায়ী বেকারত্বের হার ৪.৫ শতাংশ; যা ২০০৫-০৬ সালে ছিল ৪.৩ শতাংশ। মোট বেকারের সংখ্যা ২০০৫-৬ সালের ২১ লাখ চার হাজার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১০ সালে ২৫ লাখ ৬৮ হাজারে পৌঁছে। ২০১০ সালে পুরুষ শ্রমশক্তির শতকরা ৪.১ ভাগ এবং নারীর ৫.৭ ভাগ বেকার ছিল।

সারসংক্ষেপ

কাজ করার সামর্থ্য ও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কাজ করার চেষ্টা চালিয়ে কর্মলাভে ব্যর্থ হওয়ার ফলে সক্ষম ব্যক্তির কর্মহীন অবস্থাই হলো বেকারত্ব। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে এদেশে কর্মের সুযোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হওয়ার ফলে বেকারত্ব ক্রমশ বেড়ে চলেছে। বেকারত্ব দারিদ্র্য সৃষ্টি করে এবং ক্রমাগতভাবে বেকার ব্যক্তিকে সুবিধা বঞ্চিত করে তোলে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। বেকারত্ব বলতে কী বোঝায়?

ক) সামর্থ্য ও ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কাজের সুযোগ না পাওয়া
খ) কাজ করতে অনীহা
গ) শারীরিক অক্ষমতা
ঘ) অলসতা

২। বর্তমানে এদেশে বেকারত্বের সংখ্যা কত?

ক) ২০ লাখ
খ) ২৭ লাখ
গ) ৩০ লাখ
ঘ) ৩৫ লাখ

পাঠ-৩.৬ বেকারত্বের প্রভাব ও বেকারত্ব মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা (Impact of Unemployment and the Role of Social Worker to Combat Unemployment)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৩.৬.১ বেকারত্ব সমস্যার প্রভাব বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.৬.২ বেকারত্ব সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা কী তা লিখতে পারবেন।

৩.৬.১ বেকারত্বের প্রভাব

বেকার সমস্যার বিরূপ প্রভাব অত্যন্ত ব্যাপক, সুদূরপ্রসারী এবং দীর্ঘস্থায়ী। বেকারত্ব বাংলাদেশের অন্যতম মৌল সমস্যা। পরিকল্পিত অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের প্রধান অন্তরায় বেকারত্ব। বেকারত্ব কর্মক্ষম জীবন ও মানবতার অবমাননা, সমাজজীবনের অভিশাপ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রধান অন্তরায়। বাংলাদেশে বেকারত্বের ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী বিরূপ প্রভাবগুলো আলোচনা করা হলো:

১. একজন বেকার ব্যক্তি বেকারত্বের ফলে সামঞ্জস্যহীনতার শিকার হয়ে আত্ম-মর্যাদাহীন এবং প্রতিনিয়ত হতাশা ও ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়।
২. বেকারত্ব ব্যক্তির পারিবারিক জীবনে বিশৃঙ্খলা বয়ে আনে। উপার্জনক্ষম সদস্য যদি বেকার হয়ে পড়ে তাহলে পরিবারের নির্ভরশীল সদস্যরা অনিশ্চিতার সম্মুখীন হয়।
৩. বেকারত্ব সামাজিক বিশৃঙ্খলার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বেকারত্বের কারণে ব্যক্তি সমাজ নির্ধারিত জীবনমান বজায় রাখতে না পেরে সমাজবিরোধী আচরণে জড়িয়ে পড়ে।
৪. বেকারত্বের প্রভাবে বাংলাদেশের উৎপাদন ক্ষমতা ও জাতীয় আয় আশানুরূপ বৃদ্ধি পাচ্ছে না।
৫. বেকারত্ব কর্মক্ষম মানুষের মধ্যে হতাশা ও ব্যর্থতার জন্ম দেয়। বেকারত্বজনিত হতাশার প্রভাবে মানুষ সমাজের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন হয়ে ওঠে, যা সামাজিক সংঘাত ও কলহ সৃষ্টি করে।
৬. বেকারত্বের শিকার বাংলাদেশের শিক্ষিত যুবসমাজ হতাশাগ্রস্ত হয়ে নিজেদের গঠনমূলক ও সৃজনশীল কাজে নিয়োজিত করতে পারছে না।
৭. বেকারত্বের ফলে কর্মক্ষম ব্যক্তি বৈধ উপায়ে মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হয়ে অবৈধ উপায় অবলম্বন করতে বাধ্য হয় যা সামাজিক সমস্যা উদ্রেক করে।
৮. দাম্পত্যকলহ, বিবাহবিচ্ছেদ, আত্মহত্যা প্রভৃতি পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সমস্যা সৃষ্টির ক্ষেত্রে বেকারত্ব অনুঘটক হিসেবে কাজ করে।
৯. বেকারত্ব নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি করছে। কর্মক্ষম নির্ভরশীল বেকার লোক সমাজের বোঝাস্বরূপ।
১০. যোগ্যতাসম্পন্ন মানবসম্পদ উন্নয়নের অপরিহার্য পূর্বশর্ত। বেকারত্ব ফলে মানব সম্পদের অপচয় হয়।

৩.৬.২ বেকারত্ব মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

বেকারত্ব একটি মৌলিক সামাজিক সমস্যা। অন্যান্য সামাজিক সমস্যার ন্যায় এ সমস্যা সমাধানের জন্য সমাজকর্মী সুষ্ঠু পরিকল্পনার মাধ্যমে সমাজ থেকে বেকারত্ব নামক অভিশাপ দূর করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। এ ক্ষেত্রে সমাজকর্মীর ভূমিকা নিম্নরূপ:

১. সমাজকর্মী গবেষণার মাধ্যমে প্রকৃত বেকারের সংখ্যা, বয়স, বেকারত্বের ধরন, কারণ, শিক্ষাগত ও কারিগরি দক্ষতা প্রভৃতি অনুসারে বেকারত্বের শ্রেণিবিভাগ করে তাদের কর্মসংস্থানের জন্য উপযুক্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন;
২. বেকারত্ব প্রতিরোধে জনসংখ্যা বৃদ্ধি রোধে সচেতনতা সৃষ্টি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখতে পারেন;
৩. বেকারত্ব নিরসনে সমাজকর্মী বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক সংস্থা হতে সহজশর্তে ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে পারেন;
৪. সমাজকর্মী শিক্ষার মাধ্যমে প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে আত্মনির্ভরশীল হতে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন;

৫. নারী, বিকলাঙ্গ ও সক্ষম ভিক্ষুকদের জন্য বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করতে পারেন;
৬. প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধ যা বেকারত্ব ও নির্ভরশীলতা বজায় রাখে তা দূরীকরণে সচেতনতা সৃষ্টি করতে পারেন;
৭. বেকারত্ব দূরীকরণের জন্য সামাজিক মূল্যবোধের আশ্রয় নিয়ে ব্যাপক প্রেষণামূলক প্রচারণা চালাতে পারেন; এবং
৮. রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন ও অস্থিতিশীলতা বন্ধে সরকারের দৃষ্টি আরোপের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

সারসংক্ষেপ

বেকারত্বের ফলে একজন ব্যক্তি আত্মমর্যাদাহীন জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়। ব্যক্তির মধ্যে হতাশা ও গ্লানিবোধ কাজ করে। হতাশা ও হীনমন্যতা থেকে বেকার ব্যক্তি নানাবিধ অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়তে পারেন যা সমাজের জন্য ভয়াবহ। একজন সমাজকর্মী উদ্দীপণামূলক স্পৃহা জাগিয়ে ও প্রেষিত করে, বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থাকরণের মাধ্যমে বেকার সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখতে পারেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। বেকারত্ব ব্যক্তির মাঝে নিচের কোনটি পরিলক্ষিত হয়?
ক) হতাশা সৃষ্টি করে
খ) প্রেষিত করে
গ) কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি করে
ঘ) উদ্দীপ্ত করে

২। বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি-
ক) স্বকর্মসংস্থান লাভ করতে পারেন
খ) বেকার হতে পারেন
গ) গ্লানিবোধে ভুগতে পারেন
ঘ) হতাশাগ্রস্ত হতে পারেন

পাঠ-৩.৭ অপুষ্টির ধারণা, কারণ ও পরিস্থিতি (Concept, Causes and Situation of Malnutrition)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৩.৭.১ অপুষ্টির সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
৩.৭.২ বাংলাদেশে অপুষ্টির কারণসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৩.৭.১ বাংলাদেশে অপুষ্টি সমস্যার পরিস্থিতি বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.৭.১ অপুষ্টির ধারণা

মানবসম্পদ উন্নয়ন ও বৃদ্ধি পুষ্টির সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে সংশ্লিষ্ট। খাদ্যের পুষ্টি উপাদানের উপর নির্ভর করে মানবীয় বৃদ্ধি ও বিকাশ। পুষ্টি কোনো খাদ্য নয়, বরং এটি একটি জৈবিক প্রক্রিয়া। যে জৈবিক প্রক্রিয়ায় গৃহীত খাদ্যদ্রব্যের পুষ্টি উপাদান পরিপাক ও পরিশোধিত হয়ে তা সমগ্র দেহের কোষে কোষে ছড়িয়ে পড়ে এবং দেহের বৃদ্ধি সাধন, ক্ষয়পূরণ, শক্তি উৎপাদন ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে তাকে পুষ্টি বলা হয়। সহজকথায়, দেহের প্রয়োজন অনুযায়ী খাদ্যে পুষ্টি উপাদানের অভাব হলে বা খাদ্যে পুষ্টি উপাদানের আধিক্য ঘটলে শরীরের যে অস্বাভাবিক লক্ষণাদি প্রকাশ পায়, তাকে অপুষ্টি বলা হয়। খাদ্যের গুণগত ও পরিমাণগত ভারসাম্যহীনতার কারণে পুষ্টিহীনতা দেখা দেয়।

আমাদের দেহের প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদানগুলোকে ৬ ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যেমন শর্করা, আমিষ, স্নেহ, ভিটামিন, খনিজ লবণ ও পানি। খাদ্যের এই পুষ্টি উপাদানগুলোর মোট পরিমাণ দেহের প্রয়োজনীয় চাহিদার তুলনায় কম হলে তাকে অপুষ্টি বা পুষ্টিহীনতা বা malnutrition বলে। মানববৃদ্ধি ও বিকাশের অন্যতম প্রতিবন্ধক হলো অপুষ্টি। দেহের প্রয়োজন অনুযায়ী অপরিমিত পুষ্টি উপাদান বিশিষ্ট্য খাদ্য ক্রমাগত গ্রহণ করার ফলে দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা ইত্যাদির অভাবে কিছু রোগের লক্ষণাদি দেখা দিলেও তাকে অপুষ্টি বা পুষ্টিহীনতা বলা হয়। বয়স ও দৈহিক চাহিদা অনুযায়ী খাদ্যে যে পরিমাণ পুষ্টি উপাদান থাকা প্রয়োজন তার অভাব ঘটলে অথবা পুষ্টি উপাদানের আধিক্যের কারণে অপুষ্টি দেখা দিতে পারে।



চিত্র ৩.৭.১ : অপুষ্টির শিকার মা ও শিশু

সমাজকর্ম অভিধানের (১৯৯৫) ব্যাখ্যানুযায়ী, "অপুষ্টি হলো এমন একটি শারীরিক অবস্থা, যা সাধারণভাবে তবে আবশ্যকীয়ভাবে নয়, শারীরিক দুর্বলতার মাধ্যমে প্রকাশ পায়। প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সমৃদ্ধ খাবার অপর্যাপ্ত পরিমানে গ্রহণের প্রভাবে অপুষ্টি দেখা দেয়।" নিচে একটি চিত্রের মাধ্যমে অপুষ্টির বৈশিষ্ট্যসমূহ তুলে ধরা হলো:

অপুষ্টি ←

- দেহের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিমানগত ও গুণগত দিক হতে কম খাদ্য গ্রহণ।
- খাদ্যের মধ্যে পুষ্টি উপাদানের অভাব।
- দেহের প্রয়োজনের চেয়ে বেশি পুষ্টি উপাদানসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ।
- প্রয়োজনের চেয়ে কম পরিমাণে পুষ্টি উপাদানসমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ।

চিত্র ৩.৭.২ : অপুষ্টির বৈশিষ্ট্য

অর্থাৎ দেহের প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে অপরিমিত খাদ্য গ্রহণ করার ফলে অথবা খাদ্যের মধ্যে পুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত কারণে দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন ও রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতার অভাবজনিত অবস্থাকেই অপুষ্টি বা পুষ্টিহীনতা বলা হয়।

৩.৭.২ অপুষ্টির কারণ

বাংলাদেশে অপুষ্টির বর্তমান অবস্থা কোনো একক কারণের ফলশ্রুতি নয় বরং এর সাথে অন্যান্য অনেক কারণ বিভিন্নভাবে পুষ্টিহীনতাকে ব্যাপকতর করে তুলেছে। অপুষ্টি আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য একটি বড় সমস্যা। অপুষ্টির কারণগুলো নিম্নে আলোচনা করা হলো:

১. **খাদ্যে আমিষ ও ক্যালরির ক্রমাগত ঘাটতি:** খাদ্যে প্রোটিন ও ক্যালরির অভাবজনিত কারণে সৃষ্ট অপুষ্টিকে প্রোটিন শক্তির ঘাটতিজনিত অপুষ্টি বলা হয়ে থাকে। প্রোটিন শক্তির অভাবজনিত কারণে রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ হ্রাস পায়, শরীরের তাপমাত্রা হ্রাস পায়, পানিস্বল্পতা ও ডায়রিয়া এবং রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়।

২. **ভিটামিন এ, ই ও ডি এর অভাব:** ভিটামিন দেহের বিপাক ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে এবং দেহের বৃদ্ধিসাধন, রক্ষণাবেক্ষণ ও শক্তি উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ভিটামিনের প্রভাবে খাদ্যের প্রোটিন, শর্করা ও স্নেহ উপাদানের পরিপাক ও বিপাক সম্পন্ন হয়। ভিটামিন এ, ই ও ডি এর অভাবজনিত কারণ পুষ্টিহীনতা নির্দেশ করে।

৩. **অর্থনৈতিক কারণ:** অর্থনৈতিক কারণে দারিদ্র্য, অনুন্নত জীবনযাত্রা ও উৎপাদনে অপ্রাচুর্যের সৃষ্টি হয়। এর ফলশ্রুতিতে দরিদ্র জনগণের পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ সব সময় সম্ভব হয়ে ওঠেনা। অর্থনৈতিক বৈষম্যও সার্বিক পুষ্টি প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে থাকে।

৪. **জমির তুলনায় জনসংখ্যার আধিক্য:** বাংলাদেশের মোট আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গকিলোমিটার আর জনসংখ্যা প্রায় সাড়ে ১৪কোটি। এদেশে মাথাপিছু আবদী জমির পরিমান .১০ হেক্টরের মত। কিন্তু এই জমি সবার সমপরিমান নেই, কোনো পরিবারের আছে অনেক বেশি আবার কোনো পরিবারের মোটেও নেই। মাথাপিছু এত অল্প পরিমাণ এবং জমির নিম্ন উৎপাদনশীলতা নিম্ন আয়ের অনেক মানুষের খাদ্যের চাহিদা পূরণ করতে পারে না। তাছাড়া এদেশের জনসংখ্যা প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই সার্বিক পরিস্থিতি আমাদের পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণে বঞ্চিত করছে।

৫. **জমির নিম্ন উৎপাদনশীলতা:** এদেশে জমির হেক্টর প্রতি ফলন কম হয়। অনেক জমিতেই সাধারণত বছরে একটি ফসল হয়। উন্নত দেশগুলোর জমিতে বছরে তিন-চারটা ফসল হয়। তাছাড়া এদেশের কৃষকরা উন্নত চাষ পদ্ধতিও জানে না। ফলে মানুষ পুষ্টিকর খাবার থেকে বঞ্চিত হয়।

৬. **সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কারণ:** বাংলাদেশে বিদ্যমান পুষ্টিহীনতার পেছনে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কতগুলো কারণ বিদ্যমান। এর মধ্যে অজ্ঞতা, কুসংস্কার, পুষ্টি জ্ঞানের অভাব ও নিরক্ষতা, ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ হতে খাদ্য বর্জন প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

৭. **পরিবেশগত কারণ:** পরিবেশগত দিক অপুষ্টির বড় কারণ। অনুন্নত, অপরিস্কার ও অপরিচ্ছন্ন জীবনযাপন অপুষ্টি সৃষ্টি করে। এটি পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার ত্রুটি, দূষিত পানি, অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ প্রভৃতি অপুষ্টির মাত্রা বৃদ্ধি করে।

৮. **প্রাকৃতিক বিপর্যয়:** আমাদের দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন– বন্যা, খরা, সাইক্লোন, ঘূর্ণিঝড় প্রভৃতি ফসল ও জনজীবনের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। এসব প্রাকৃতিক বিপর্যয় পুষ্টিহীনতাকে চরমভাবে বৃদ্ধি করে।

৯. **রাজনৈতিক কারণ:** রাজনৈতিক মতাদর্শে বিরোধীতার জন্য দেশের সার্বিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়, অস্থিতিশীলতা বিরাজ করে এবং উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি কমে। আন্তর্জাতিকভাবেও পুষ্টিকর খাদ্যের সুষম বণ্টন হয় না। প্রচ্ছন্নভাবে তা নিম্ন আয়ের মানুষদের পুষ্টিহীন করে রাখে।

৩.৭.৩ বাংলাদেশের অপুষ্টি পরিস্থিতি

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্যানুযায়ী মোট জনগোষ্ঠীর বিরাট সংখ্যক বিশেষ করে মা ও শিশু প্রোটিন শক্তির অভাবজনিত অপুষ্টিতে ভুগছে। মাথাপিছু প্রোটিন গ্রহণের গড় পরিমাণ মাত্র ৬৩ গ্রাম। শিশু জন্মের সময় ওজন যদি ২.৫ কেজির কম হয় তবে তাকে কম ওজনের শিশু বলা হয়। এদেশের ৫০ভাগ শিশু কম ওজন নিয়ে জন্মায়। এদেশে শিশুদের ১.৭৮ ভাগ ভিটামিন 'এ' এর অভাবজনিত রাতকানায় আক্রান্ত। ৩৫.৩ ভাগ প্রসূতি মা এবং ১৩-১৯ বছর বয়সী নারীদের ২৭.৮ ভাগ অপুষ্টিজনিত রক্তস্বল্পতার শিকার। এদেশের শতকরা নয় ভাগ আয়োডিনের অভাবে দৃশ্যমান গলগন্ডে আক্রান্ত।

সারসংক্ষেপ

প্রয়োজনের তুলনায় অপরিমিত খাদ্য গ্রহণের ফলে কিংবা খাদ্যের মধ্যে পুষ্টি উপাদানের অভাবজনিত কারণে দেহের ক্ষয়পূরণ, বৃদ্ধিসাধন ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার অভাবজনিত অবস্থাই হলো অপুষ্টি। এদেশে দারিদ্র্য ও অসচেতন জীবন প্রণালিগত কারণে বহুসংখ্যক মানুষ অপুষ্টির শিকার। রক্তস্বল্পতা, গলগন্ড, অল্প ওজন প্রভৃতি অপুষ্টিজনিত সমস্যা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। রক্তাল্পতা কী?

ক) সামাজিক সমস্যা খ) অপুষ্টিজনিত রোগ
গ) মানসিক সমস্যা ঘ) দৈহিক ঘাটতি জনিত সমস্যা

২। দেহের প্রয়োজনীয় খাদ্য উপাদান কয়টি?

ক) ৪টি খ) ৫টি
গ) ৬টি ঘ) ৭টি

পাঠ-৩.৮ অপুষ্টির প্রভাব ও অপুষ্টি মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা (Impact of Malnutrition and the Role of Social Worker to Combat Malnutrition)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি−

৩.৮.১ অপুষ্টির প্রভাব সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
৩.৮.২ অপুষ্টি মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.৮.১ অপুষ্টির প্রভাব

অপুষ্টি সমস্যা একটি দেশের জাতীয় অর্থনীতি ও সমাজবিকাশের পথে বিরাট বাধাস্বরূপ। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে প্রতিবছর এই পুষ্টিহীন পরিস্থিতির ক্রমশ অবনতি ঘটছে। অপুষ্টিজনিত যেসব প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তা হলো:

১. পুষ্টি উপাদানের অভাবে নানাবিধ স্বাস্থ্যগত সমস্যা সৃষ্টি হয় যেমন− ম্যারাসমাস, কোয়ারশিয়রকর, শরীরের তাপমাত্রা খুব বেশি হ্রাস পায়, রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ হ্রাস পায়, মারাত্মক পানি স্বল্পতা ও ডায়রিয়া দেখা যায়।
২. নবজাতক কম ওজন নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে ও তাদের মনস্তাত্ত্বিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ও শারীরিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়।
৩. এদেশের মোট জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ আয়োডিনের অভাবে গলগন্ড ও ভিটামিন এ এর অভাবে রাতকানা রোগে আক্রান্ত।
৪. এদেশের প্রসূতি ও বয়ঃসন্ধিক্ষণে থাকা উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী অপুষ্টিজনিত রক্তশূণ্যতার শিকার।
৫. অপুষ্টিজনিত কারণে প্রায়শই শিশু বিভিন্ন ধরনের রোগে যেমন− হাম, অন্ত্রের প্রদাহ, রিকেটস প্রভৃতিতে আক্রান্ত হয়।
৬. অপুষ্টিজনিত কারণে শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক যুবাদের স্বাস্থ্যগঠন বিঘ্নিত হয়।
৭. অপুষ্টির শিকার মা অপুষ্ট সন্তানের জন্ম দেয় এবং অধিক মেধাসম্পন্ন হিসেবে এসব সন্তান বেড়ে উঠতে পারে না।
৮. পুষ্টিহীনতা মাতৃমুত্যু ও শিশুমৃত্যুর জন্যও দায়ী থাকে।

৩.৮.২ অপুষ্টি মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

দারিদ্র্য ও অপুষ্টির সমস্যা যেহেতু পরস্পর জড়িত সেহেতু অর্থনৈতিক দিক থেকে এবং জাতীয়ভিত্তিতে পুষ্টিহীনতা সমাধানের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। বাংলাদেশে যে পর্যাপ্ত মানবিক ও বৈষয়িক সম্পদ রয়েছে তা সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগানো হলে জনগণের পুষ্টিগত সমস্যা উন্নয়ন করা সম্ভব। এক্ষেত্রে একজন সমাজকর্মী যে ভূমিকা রাখতে পারেন:

১. কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করতে, অনাবাদী বা পতিত জমিতে চাষের ব্যবস্থা করতে ও কৃষিতে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোকে উদ্বুদ্ধ করা;
২. সাধারণ জনগণের মাঝে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক সচেতনতা সৃষ্টি করা;
৩. জনসংখ্যা রোধে সরকারকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে উদ্বুদ্ধ করা;
৪. খাদ্য ও পুষ্টিবান্ধব নীতিমালা ও পরিকল্পনা প্রণয়নে সরকারকে উদ্বুদ্ধ করা;
৫. নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জন্য ভর্তুকি প্রদত্ত খাদ্য প্রদান ও সুষম খাদ্য বণ্টনের ব্যবস্থা করতে সরকারকে উদ্বুদ্ধ করা;
৬. খাদ্যে ভেজাল প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা তৈরি ও সরকারকে উদ্বুদ্ধ করা;
৭. পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত জীবনযাপনে সাধারণ জনসমষ্টিকে উদ্বুদ্ধ করা;
৮. পুষ্টিকর খাদ্যাভ্যাস গড়ে তোলা ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণে অন্তরায় সৃষ্টিকারী দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধসমূহ দূর করতে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা; এবং
৯. স্বাস্থ্যবান্ধব সচেতন জীবনযাপন করতে জনসমষ্টিকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করা।

সারসংক্ষেপ

অপুষ্টিজনিত কারণে নানাবিধ স্বাস্থ্যগত সমস্যা যেমন– ম্যারাসমাস, কোয়াশিয়র, রক্তস্বল্পতা, আয়োডিনের অভাব, অস্বাভাবিক কম ওজন প্রভৃতি হয়ে থাকে। পরিমিত ও পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে অপুষ্টি দূর করা সম্ভব। একজন সমাজকর্মী জনসাধারণের মাঝে স্বাস্থ্য সচেতনতা তৈরিকরণের মাধ্যমে অপুষ্টি মোকাবিলায় ভূমিকা রাখতে পারেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। ভিটামিন এ এর অভাবে কোন রোগ হয়?

ক) গলগন্ড রোগ হয়
খ) রাতকানা রোগ হয়
গ) কোয়ারশিয়র হয়
ঘ) মেরাসমাস হয়

২। এদেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক প্রসূতি কোন সমস্যায় আক্রান্ত হয়?

ক) রক্তস্বল্পতায় ভোগে
খ) পানিশূণ্যতায় ভোগে
গ) পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্য লাভ করে
ঘ) পর্যাপ্ত বিশ্রামের সুযোগ পায়

পাঠ-৩.৯ যৌতুকের ধারণা, কারণ ও পরিস্থিতি (Concept, Causes and Situation of Dowry)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৩.৯.১ যৌতুক ধারণাটির ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৩.৯.২ বাংলাদেশে যৌতুকের কারণসমূহ আলোচনা করতে পারবেন।
৩.৯.৩ বাংলাদেশে যৌতুক সমস্যার পরিস্থিতি বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.৯.১ যৌতুকের ধারণা

বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী কিন্তু নারীর প্রতি সামাজিক-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি, প্রথাগত মূল্যবোধ ও সংস্কার এবং কালের আবর্তে চলে আসা রীতি বর্তমান প্রেক্ষাপটেও নারীকল্যাণ ও নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলছে। প্রথাগত সামাজিক কিছু সংস্কার, রীতি-নীতি ও অনুশাসনের বেড়াজালে নারী নানামুখী সমস্যার আবর্তে জড়িত। যৌতুক হচ্ছে এদেশের নারীসমাজের জন্য এক ভয়াবহ ও নির্মম প্রথা যা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে। অতীতে একে পণপ্রথা বলা হত এবং বর্তমানে পরিবর্তিত রুপে যৌতুকপ্রথা হিসেবে পরিচিত। যৌতুকপ্রথার পটভূমি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, হিন্দুসমাজ থেকে এর উৎপত্তি। হিন্দু আইনে পৈত্রিক সম্পত্তিতে কন্যার উত্তরাধিকার স্বীকৃতি না থাকায় কন্যা পাত্রস্থ করার সময় নগদ অর্থ ও দ্রব্যসামগ্রী দেয়ার প্রথা হিন্দুসমাজে ঐতিহ্যগতভাবে চলে এসেছে। সময়ের আবর্তে তা পুরো সমাজব্যবস্থায় ছড়িয়ে পড়েছে এবং সর্বনাশা রূপ ধারণ করেছে। মূলত যৌতুক একটি সামাজিক কুপ্রথা, যাতে কণ্যা পাত্রস্থ করার সময় কনে ও বরপক্ষের মধ্যে দরকষাকষির মাধ্যমে বরপক্ষকে নগদ অর্থ, দ্রব্যসামগ্রী, অলঙ্কার বা অন্যকোনো আর্থিক সুবিধাদানে কন্যাপক্ষকে বাধ্য করা হয়। সাধারণ কথায়, বিয়ের সময় কন্যাপক্ষ বরপক্ষকে বা বরপক্ষ কন্যাপক্ষকে ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃতভাবে যে উপঢৌকন দিয়ে থাকে তাকে যৌতুক বলে। অনেকেই যৌতুককে ডিমান্ড বা দাবী বলে উল্লেখ করেন। ১৯৮০ সালের Dowry Prohibition Act অনুসারে যৌতুক বলতে "বিবাহে এক পক্ষ কর্তৃক অপর পক্ষকে অথবা বিবাহের কোনো এক পক্ষের পিতামাতা কর্তৃক বা অন্য যে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অপর পক্ষকে বা অপর কোনো ব্যক্তিকে, বিবাহকালে বা বিবাহের পূর্বে বা পরে যে কোনো কালে উক্ত পক্ষগণের বিবাহের পণ হিসেবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রদত্ত বা প্রদান করতে সম্মত যে কোনো সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানতকে বুঝায়।"

৩.৯.২ যৌতুকের কারণ

১. **পিতৃতান্ত্রিক ভাবাদর্শ:** এদেশের সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক। পুরুষশাসিত এই সমাজব্যবস্থায় পুরুষ পরিবারের প্রধান হিসেবে নারীর উপর আধিপত্য কায়েম করে। সমাজব্যবস্থায় পুরুষ অধিক মর্যাদাসম্পন্ন এবং নারী নিম্ন মর্যাদার গৌণ সত্ত্বা বিশেষ। পিতৃতান্ত্রিক ভাবাদর্শে বিয়েই নারীর জীবনের মর্যাদার উত্তরণ ও সবচেয়ে সুনিশ্চিত বিবেচিত হয় এবং কন্যার বাবা-মা সুপাত্র লাভের আশায় যৌতুক প্রদানের মনোভাব পোষণ করে এবং যৌতুক দিয়ে থাকে।

২. **ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা:** অতীতকাল হতেই সমাজে যৌতুকের প্রচলন রয়েছে, সামাজিক অনুমোদন রয়েছে এবং সামাজিক অনুশাসনের একটি অংশ হওয়ায় বিয়েতে যৌতুককে সঙ্গত মনে করা হয়। নারীর প্রতি অবজ্ঞা, অবহেলা, পৈত্রিক উত্তরাধিকার স্বীকৃত না হওয়া এবং স্বামীর উপর জীবনব্যাপী নির্ভরশীল থাকবে বিধায় নারীকে পাত্রস্ত করাতে যৌতুক প্রথার প্রচলন হয় ।

৩. **দারিদ্র্য:** দারিদ্র্য ও অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা যৌতুকের অন্যতম কারণ। অর্থনৈতিক দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থায় দরিদ্র পরিবারের ছেলেদের বিয়ে দিয়ে আর্থিক দুর্দশা লাঘবের প্রবণতা লক্ষণীয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় বেকার যুবক অর্থ প্রাপ্তির প্রত্যাশায় যৌতুকের জন্য বিয়ে করে থাকে।

৪. **আভিজাত্য ও সামাজিক মর্যাদা:** অনেক ধনী পরিবার বিয়ের ক্ষেত্রে বংশমর্যাদা ও আভিজাত্যের প্রতীক হিসেবে বিয়েতে যৌতুক দেয়া-নেয়া করে থাকে। তাদের ধারণা বিয়েতে পর্যাপ্ত উপঢৌকন দেয়া-নেয়া সম্মান ও আভিজাত্যের প্রতীক।

৫. **কন্যাদায়গ্রস্ত পিতামাতার মানসিকতা:** এদেশে একশ্রেণির কন্যা দায়গ্রস্ত পিতামাতার মধ্যে বিয়েতে পর্যাপ্ত নগদ অর্থ ও উপঢৌকন প্রদান করে বর ক্রয়ের মানসিকতা পরিলক্ষিত হয়। ভাল বর প্রাপ্তি কিংবা মেয়ে অধিক বয়সী বা অসুন্দরী হলে মেয়ের বাবা-মার মধ্যে এ ধরনের মানসিকতা লক্ষণীয়।

৬. **সামাজিক রেওয়াজ:** যৌতুক এখন সামাজিক রেওয়াজ এ পরিণত হয়েছে। যৌতুক আদান-প্রদান ব্যতীত কোনো বিয়ে হতে পারে অনেকে তা ভাবতেই পারেন না। সামাজিক কু-প্রথা হিসেবে যৌতুক সমাজের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে।

৭. **দুর্নীতি ও কালেটাকার প্রভাব:** সমাজে ভয়াবহ দুর্নীতি ও কালোটাকার প্রভাবে এক শ্রেণি অঢেল সম্পত্তির মালিক যারা যৌতুককে দুর্নীতির মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ ব্যয়ের একটি খাত মনে করে। বিয়েতে যৌতুক হিসেবে বিপুল অর্থ ব্যয় করে আভিজাত্য জাহির করে।

৮. **হিন্দুধর্মেয় প্রভাব:** হিন্দুধর্মের কিছু শাস্ত্রীয় গ্রন্থে যৌতুক প্রদানের কথা বলা আছে। হিন্দু মেয়েদের পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকার না থাকায় বিয়ের সময় তাদের নগদ অর্থ প্রদানের কথা বলা হয়েছে। হিন্দুশাস্ত্রের প্রভাব মুসলিম সমাজকে প্রভাবিত করেছে।

৯. **যৌতুক বিরোধী সামাজিক আইন বাস্তবায়নে ব্যর্থতা:** বিয়েতে যৌতুক বন্ধে ১৯৮০ সালে যৌতুক নিরোধ আইন প্রণয়ন করা হয়। এই আইন প্রণয়ন করা হলেও এর বাস্তবায়ন নেই বললেই চলে। এই আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা ও আইন মেনে চলার অভ্যাস না থাকায় যৌতুক নিরোধ সম্ভব হচ্ছে না।

৩.৯.৩ যৌতুক পরিস্থিতি

যৌতুকের দাবিকে কেন্দ্র করে বিয়ের পরে দাম্পত্য কলহ, স্ত্রী নির্যাতন, স্ত্রী হত্যা, বিবাহবিচ্ছেদ প্রভৃতি ঘটনা প্রায়শই ঘটছে। পরিবারে শান্তি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। আইন ও সালিশ কেন্দ্রের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, বিগত বছর ১৮৭৬ টি যৌতুক সংক্রান্ত নারী নির্যাতনমূলক ঘটনা ঘটেছে। কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত পিতামাতা যৌতুকের দাবি মেটাতে গিয়ে যথাসর্বস্ব বিক্রি করে দুঃস্থ ও নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। যৌতুকের লোভে গ্রামীণ সমাজে বাল্যবিবাহ সংঘটিত হচ্ছে এবং অসম্পূর্ণ মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব লাভের হার বাড়ছে।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে যৌতুক এক সামাজিক কুপ্রথা যেখানে বিয়ের সময় বিয়ের উপঢৌকন হিসেবে কন্যাপক্ষ বরপক্ষকে নগদ অর্থ, স্বর্ণালঙ্কার, আসবাবপত্র প্রভৃতি দিতে বাধ্য হয়। মূলত প্রাচীন ভারতীয় হিন্দুসমাজ থেকে এই প্রথার উৎপত্তি এবং বর্তমানে তা পুরো সমাজ জুড়ে বিস্তৃত। যৌতুককে কেন্দ্র করে নিত্য পারিবারিক কলহ, স্ত্রী নির্যাতন ও বিবাহবিচ্ছেদের ঘটনা ঘটছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। যৌতুককে কী বলা হয়?

ক) সামাজিক কু-প্রথা খ) সামাজিক মূল্যবোধ
গ) সামাজিক নিয়ম ঘ) সামাজিক আইন

২। কোথা থেকে যৌতুকের উৎপত্তি হয়েছে?

ক) পাশ্চাত্য দর্শন থেকে খ) প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু সমাজ থেকে
গ) মুসলিম বিবাহ রীতিতে ঘ) বহু যুগ পূর্বে

পাঠ-৩.১০ যৌতুকের প্রভাব ও যৌতুকপ্রথা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা (Impact of Dowry and the Role of Social Worker to Combat the Dowry Practice)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৩.১০.১ যৌতুকের প্রভাব সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.১০.২ যৌতুক সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

৩.১০.১ যৌতুকের প্রভাব

যৌতুক হৃদয়হীন, অমানবিক ও কলঙ্কিত সামাজিক অনাচার যা সর্বস্তরে বিরাজ করছে। সমাজ জীবনে যৌতুকপ্রথার মারাত্মক প্রভাব তুলে ধরা হলো:

১. বাংলাদেশে আত্মহত্যা প্রবণতা সৃষ্টির সহায়ক যৌতুকপ্রথা। আত্মহত্যাকারী অধিকাংশই নারী এবং অধিকাংশ আত্মহত্যার মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা যায় দাম্পত্যকলহ ও নারী নির্যাতনকে। যৌতুকের দাবিকে কেন্দ্র করেই এসবের সৃষ্টি।

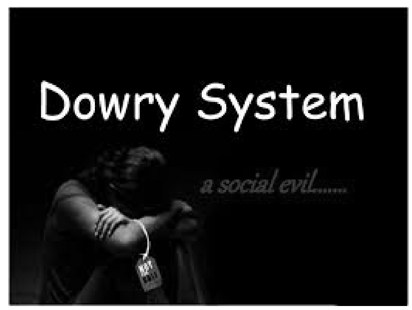
২. নারীর সামাজিক মর্যাদা ও অধিকার লাভের প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে যৌতুক। যৌতুকপ্রথা নারীকে হেয় করে।

৩. কেবল যৌতুকের লোভের বশবর্তী হয়ে অনেক ছেলে বিয়ে করে এবং বিয়ের অল্প কিছু দিন পরই দাম্পত্যকলহ শুরু হয় এবং এর পরিণামে নারীদের অহরহ নির্যাতন সইতে হয়।

৪. যৌতুকের লোভে গ্রামাঞ্চলে বাল্যবিবাহ ও বর-কনের বয়সের অসাদৃশ্যপূর্ণ বিয়ে সংঘটিত হয়। এটি জনসংখ্যা বৃদ্ধির সহায়ক ও সন্তানের সামাজিকীকরণের অন্তরায় হিসেবে কাজ করে।

৫. অনেক ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়, কন্যাদায়গ্রস্ত দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত পিতামাতা যৌতুকের দাবি মেটাতে গিয়ে যথাসর্বস্ব বিক্রি করে দুঃস্থ ও নিঃস্ব হয়ে জীবনযাপন করে।

৬. যৌতুকের দাবিকে কেন্দ্র করে পরিবারে শান্তি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। দাম্পত্যকলহ, স্ত্রী নির্যাতন, বিবাহবিচ্ছেদ এমনকি স্ত্রী হত্যা প্রায়শই ঘটে থাকে।



চিত্র ৩.১০.১ : যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধি

৩.১০.২ যৌতুকপ্রথা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

যৌতুকপ্রথা বাংলাদেশের শুধু সামাজিক সমস্যাই নয়, অনেক সমস্যা সৃষ্টির প্রধান কারণও বটে। যৌতুকপ্রথা কোনো বিচ্ছিন্ন সমস্যা নয়। অন্যান্য সামাজিক সমস্যার সাথে এটি অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কযুক্ত। মেয়েরা পণ্য নয়, বিবাহ ব্যবস্থা বাণিজ্যের মাধ্যম নয়, সমাজে নারীর সমমর্যাদা আছে, এরূপ ধারণা সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজে যৌতুক প্রথা থাকতে পারে না। এরূপ যৌতুকমুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে হলে পরিকল্পিতভাবে অগ্রসর হতে হবে। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী যে ভূমিকা পালন করতে পারেন তা হলো:

১. যৌতুকের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত গড়ে তুলতে ও সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করতে সমাজকর্মী সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে ভূমিকা পালন করতে পারেন।

২. যৌতুক নিরোধ আইন প্রণয়ন হলেও তার কোনো প্রয়োগ নেই। যৌতুক সংঘটিত হলে যৌতুক নিরোধ আইন প্রয়োগের জন্য সমাজকর্মী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

৩. যারা যৌতুক প্রদান করবে এবং গ্রহণ করবে তাদের সামাজিকভাবে বয়কট করতে সমাজকর্মী সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করবেন ও জনমত গড়ে তুলবেন।

৪. নারীর প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির জন্য সামাজকর্মী ভূমিকা পালন করবেন। নারী কোনো পণ্য নয়, বিয়ে বাণিজ্যের মাধ্যম নয়। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গি তৈরির জন্য সমাজকর্মী ভূমিকা পালন করবেন।
৫. নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী-পুরুষ বৈষম্য দূরীকরণের জন্য সমাজকর্মী কাজ করবেন।
৬. স্বচ্ছল ও ধনিক শ্রেণির যৌতুক প্রবণতা রোধে সমাজকর্মী যৌতুকপ্রথাকে হেয়তর হিসেবে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করবেন।
৭. যৌতুকের কারণে নির্যাতিত নারীদের আইনগত সহায়তা প্রাপ্তিতে সমাজকর্মী দিকনির্দেশনা ও সহায়তা প্রদান করবেন।
৮. সমাজকর্মী নৈতিক আদর্শ প্রচার করবেন এবং সমাজস্থ মানুষকে নৈতিকতার আলোয় দীক্ষিত করবেন।

সারসংক্ষেপ

যৌতুককে কেন্দ্র করে প্রতিনিয়ত পারিবারিক অশান্তি, বিশৃঙ্খলা, স্ত্রী নির্যাতন, দাম্পত্যকলহ, বিবাহবিচ্ছেদ, এমনকি স্ত্রী হত্যা পর্যন্ত ঘটে থাকে। যৌতুকের দাবী মেটাতে গিয়ে অনেক পিতা-মাতা নিঃস্ব হয়ে পড়ে এবং যৌতুকের লোভে অহরহ বাল্যবিবাহ সংঘটিত হয়। একজন সমাজকর্মী যৌতুকের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলে ও আইনের প্রয়োগ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। যৌতুক নিচের কোনটির জন্য দায়ী?
ক) পারিবারিক শান্তি
খ) শৃঙ্খলা
গ) পারিবারিক সম্প্রীতি
ঘ) স্ত্রী নির্যাতন

২। কত সালে যৌতুক নিরোধ আইন প্রণীত হয় ?
ক) ১৯৭৫ সালে
খ) ১৯৭৭ সালে
গ) ১৯৮০ সালে
ঘ) ১৯৮৩ সালে

পাঠ-৩.১১ বাল্যবিবাহের ধারণা, কারণ ও পরিস্থিতি (Concept, Causes and Situation of Early Marriage)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৩.১১.১ বাল্যবিবাহ ধারণাটি সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
৩.১১.২ বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের কারণসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৩.১১.৩ বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের পরিস্থিতি বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.১১.১ বাল্যবিবাহের ধারণা

ঐতিহাসিকভাবে পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও পুরুষশাসিত সামাজিক অনুশাসনের মাধ্যমে নারী সমাজে নিগৃহীত ও অবহেলিত হয়ে আসছে। নারীর প্রতি সমাজের হীন দৃষ্টিভঙ্গি নারী-পুরুষের সাম্য প্রতিষ্ঠা ও নারীকল্যাণের পথে অন্তরায়। সামাজিক কিছু কু-প্রথা, প্রচলন, রীতিনীতি, অভ্যাস নারী নির্যাতনের পথ প্রশস্ত করে এবং নারী উন্নয়ন ও নারী-পুরুষের সাম্য প্রতিষ্ঠায় বিঘ্নিত করে। এদেশে প্রচলিত বাল্যবিবাহ নারীর জন্য এমনই এক অভিশাপ। শারীরিক ও মানসিকভাবে বিয়ের জন্য উপযুক্ত হবার পূর্বেই জোরপূর্বক নারীকে বিয়ে দেয়া হয়। ফলশ্রুতিতে নারীর শরীরতাত্ত্বিক জটিলতা সৃষ্টি হতে থাকে এবং মানসিকভাবেও সে নতুন পরিবেশে নতুন জীবনে নিজেকে পুরোপুরি মানিয়ে নিতে পারে না। মূলত শরীরতাত্ত্বিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে উপযুক্ত হবার পূর্বেই অল্প বয়সে কোনো নারীকে বিয়ে দেওয়ার যে সামাজিক প্রচলন রয়েছে তাকেই বলা হয় বাল্যবিবাহ। আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে ১৮ বছরের নিচে কোনো নারীকে বিয়ে দেওয়া হলে তাকে বাল্যবিবাহ বলে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে নারী বয়ঃসন্ধিতে উপনীত হলেই পারিবারিকভাবে বিয়ে দেওয়ার জোর প্রচলন রয়েছে যদিও সেই সময় সে বিয়ে ও দাম্পত্যজীবনের জন্য অপ্রস্তুত থাকে।



চিত্র ৩.১১.১ : বাল্যবিবাহ

৩.১১.২ বাল্যবিবাহের কারণ

এদেশের প্রচলিত সামাজিক কিছু রীতিনীতি বাল্যবিবাহকে উসকে দেয়। বাল্যবিবাহের সাথে প্রত্যক্ষ ও প্রচ্ছন্নভাবে বেশ কিছু বিষয় জড়িত রয়েছে। বাল্যবিবাহের কারণসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো:

১. **দারিদ্র্য:** দারিদ্র্যকে বাংলাদেশের বাল্যবিবাহের অন্যতম কারণ বলা যেতে পারে। দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসরত পরিবারসমূহে জীবন নির্বাহ অত্যন্ত দুরুহ ব্যাপার। কিশোরী মেয়ে পরিবারের নির্ভরশীল সদস্য হওয়ায় তার ভরণ পোষণ পরিবারের জন্য বোঝাস্বরুপ। ফলে অতিদ্রুত বিয়ের মাধ্যমে নিষ্কৃতি লাভের চেষ্টা করা হয়।

২. **সামাজিক রেওয়াজ:** আবহমানকাল ধরে এদেশের নারীর বয়স কৈশোরে পদার্পণের সাথে সাথে বিয়ের প্রচলন চলে আসছে। সামাজিক বিশ্বাস যাতে নারী রজঃস্বীলা হওয়ার সাথে সাথে তার বিয়ে দেওয়া উত্তম। সুতরাং সামাজিক রেওয়াজের বশবর্তী হয়ে বাল্যবিবাহ দেওয়া হয়।

৩. **নিরাপত্তা:** এদেশের অপরাধপ্রবণ সামাজিক পরিবেশে নারীর নিরাপত্তার বিষয়টি পরিবারের কাছে অত্যন্ত উদ্বিগ্নের। মেয়ের বয়স বাড়ার সাথে সাথে বাবা-মার মধ্যে তার নিরাপত্তাজনিত দুঃশ্চিন্তা বাড়তে থাকে এবং এ থেকে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে তারা বাল্যবিবাহকেই বেছে নেয়।

৪. **ভাল বর পাওয়া:** এদেশের অনেক অভিভাবকরা বিয়ের জন্য উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পেলে মেয়েকে বিয়ে দিতে মরিয়া হয়ে উঠে। এক্ষেত্রে মেয়ের বয়সও তারা বিবেচনায় নেয় না। উপযুক্ত পাত্র হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয়ে বাল্যবিবাহ প্রদান করে।

৫. **সামাজিক ভ্রান্ত ধারণা:** এদেশের গ্রামাঞ্চলে তীব্রভাবে কথিত আছে মেয়েরা ‘কুড়িতেই বুড়ি’। বয়স হলে তার জন্য আর উপযুক্ত পাত্র পাওয়া যাবে না। সুতরাং উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান পেলে বাল্যকালেই বিয়ে দেওয়া শ্রেয় মনে করে।

৬. **প্রথাগত নারীত্ব ধারণা:** পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় প্রথাগতভাবে মনে করা হয় নারীর স্থান গৃহে এবং নারীর মূল কাজ সাংসারিক কর্ম সাধন করা। নারীর আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অপ্রয়োজনীয় এবং অর্থনৈতিক উৎপাদনশীল কাজে নিয়োজিত হওয়া নারীসুলভ নয়। নারীর নৈপুণ্যের ক্ষেত্র তার সংসার। সুতরাং যত দ্রুত তার বিয়ের ব্যবস্থা করে সংসারী করা যায় ততই মঙ্গল।

৭. **শিক্ষায় অনগ্রসরতা:** শিক্ষাক্ষেত্রে নারী অনগ্রসর। পরিবার থেকে ছেলেদের শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করা হয়। মেয়েদের ঘরকন্নার কাজ শিখতে বলা হয়। পরিবারের ছেলে সন্তানেরা নিজেদের লেখাপড়ায় ব্যস্ত বা আর্থিক খাতে ব্যস্ত থাকলেও মেয়েদের এরূপ সুযোগ সীমিত। তাই ভালপাত্রের সন্ধান পেলেই মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়।

৮. **বাবা-মার অজ্ঞতা:** বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে বাবা-মার অজ্ঞতা ও প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা অন্যতম কারণ। বাবা-মা বর্তমান জেন্ডার ভূমিকা বিষয়ক অজ্ঞ হলে এবং প্রচলিত ভ্রান্তধারণার বশবর্তী হয়ে থাকলে বাল্যবিবাহ প্রদান করে থাকে।

৩.১১.৩ বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ পরিস্থিতি

স্বাধীনতার পর থেকে নব্বইর দশক পর্যন্ত এদেশে বাল্যবিবাহ পরিস্থিতি অত্যন্ত নাজুক ছিল। কিন্তু সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে ব্যাপক প্রচারণা, জনমত গঠন ও পরিবর্তিত যুগের প্রেক্ষাপটে জনসাধারণের মধ্যে তুলনামূলক সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে এবং বাল্যবিবাহের হার কমে আসছে। কিন্তু এখনো প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলে ১৮ বছরের নিচে মেয়েদের বাল্যবিবাহ সংঘটিত হচ্ছে। শারীরিক ও মানসিকভাবে উপযুক্ত হবার পূর্বেই কিশোরী-তরুনী মেয়েরা বিয়ের পিড়িতে বসতে বাধ্য হচ্ছে এবং দাম্পত্য পীড়নের শিকার হচ্ছে।

সারসংক্ষেপ

১৮ বছর বয়সের নিচে শারীরিক ও মানসিকভাবে বিয়ের জন্য উপযুক্ত হবার পূর্বেই নারীকে বিয়ে দেয়া হলে তাকে বাল্যবিবাহ হিসেবে অভিহিত করা হয়। বাল্যবিবাহের ফলস্বরূপ নারীরা শারীরিকভাবে পীড়নের শিকার হয় এবং মনস্তাত্ত্বিকভাবে নতুন জীবনে সহজে খাপ-খাওয়াতে পারে না। বাল্যবিবাহের শিকার নারীর জীবন ক্রমশ দুর্বিসহ হয়ে ওঠে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। কত বছরের নিচে কোনো মেয়ের বিয়ে হলে তা বাল্যবিবাহ হিসেবে বিবেচিত হবে?

ক) ১৬ বছর
খ) ১৮ বছর
গ) ২০ বছর
ঘ) ২২ বছর

২। বাল্যবিবাহের ফলে কী ঘটতে পারে?

ক) নারী শারীরিক জটিলতা
খ) পারিবারিক সমৃদ্ধি
গ) পারলৌকিক মঙ্গল
ঘ) সামাজিক সম্মান প্রাপ্তি

পাঠ-৩.১২ বাল্যবিবাহের প্রভাব ও বাল্যবিবাহ সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা (Impact of Early Marriage and the Role of Social Worker to Combat Early Marriage)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৩.১২.১ বাল্যবিবাহের প্রভাব সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
৩.১২.২ বাল্যবিবাহ মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৩.১২.১ বাল্যবিবাহের প্রভাব

বাল্যবিবাহ এদেশের নারীদের জন্য অভিশাপস্বরূপ। বাল্যবিবাহের ফলে নারী দাম্পত্য পীড়নের শিকার হচ্ছে এবং নারীর ক্ষমতায়ন বিঘ্নিত হচ্ছে। বাল্যবিবাহের মাধ্যমে একজন নারীর ভবিষ্যত গঠনমূলক ক্যারিয়ার অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়। বাল্যবিবাহের অন্যান্য প্রভাবসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

১. বাল্যবিবাহের ক্ষেত্রে নারী শারীরিকভাবে উপযুক্ত হবার পূর্বেই তার বিয়ে দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে নারীর বিভিন্ন রকম শারীরিক জটিলতা সৃষ্টি হয়ে থাকে।
২. অল্পবয়সী নারী গর্ভধারণ করলে অপুষ্ট সন্তানের জন্ম দেয় এবং সেই সন্তানের শারীরিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়।
৩. মনস্তাত্ত্বিকভাবে উপযুক্ত হবার পূর্বেই কোনো মেয়েকে বিয়ে দেওয়া হলে সে বিয়ের পর নতুন পরিবেশে নিজেকে সহজে খাপ খাওয়াতে পারে না।
৪. বাল্যবিবাহের ফলে অসম সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে পরিবারে প্রতিনিয়ত কলহ, বিশৃঙ্খলা ও অসম সম্পর্ক বিরাজ করে।
৫. বাল্যবিবাহ নারীর জন্য অভিশাপ স্বরুপ। এতে নারীর কল্যাণ চরমভাবে ব্যাহত হয় এবং নারীর ক্ষমতায়নের পথ রুদ্ধ হয়।

৩.১২.২ বাল্যবিবাহ মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

নারীকল্যাণ ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহ চরমভাবে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে এবং নারীর জীবনে বাল্যবিবাহ অভিশাপস্বরূপ। সমাজকর্মী বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে যে ভূমিকা রাখতে পারে তা হলো:

১. বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে সমাজকর্মী ব্যাপকভাবে জনসচেতনতা সৃষ্টি করতে পারে। এর কুফল সম্পর্কে জনমত গড়ে তোলা;
২. যেসকল সামাজিক রেওয়াজ, প্রথা, রীতিনীতি বাল্যবিবাহকে ত্বরান্বিত করে তা নির্মূলে সমাজকর্মী সামাজিক কার্যক্রম প্রয়োগ করা;
৩. কোনো পরিবারে নারীকে যেন শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা না হয় এবং শিক্ষা গ্রহণে উদ্ধুদ্ধ করা হয় এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করা;
৪. নারীর অল্প বয়সে বিয়ের কথা না ভেবে তাকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তুলতে পরিবারকে উদ্ধুদ্ধ করা;
৫. নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের প্রতি দৃষ্টি আরোপ করা;
৬. কোথাও বাল্যবিবাহ সংঘটিত হলে আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে সরকারকে চাপ প্রয়োগ করা;
৭. চরম দারিদ্র্য বাল্যবিবাহকে উৎসাহিত করে। দারিদ্র্য লাঘবে সরকারকে গঠনমূলক তৎপরতা প্রয়োগে উদ্ধুদ্ধ করা; এবং
৮. নারীবান্ধব সংস্কৃতি ও সামাজিক রেওয়াজ পুনর্গঠন করতে জনমত গড়ে তোলা ও নারী-পুরুষ সাম্য প্রতিষ্ঠায় তৎপর হওয়া।

সারসংক্ষেপ

বাল্যবিবাহের ফলে নারী শারীরিকভাবে অনুপযুক্ত থাকে বিধায় নানাবিধ শারীরিক জটিলতা সৃষ্টি হয় এবং অপরিণত বয়সে গর্ভধারণের ফলে যে সন্তান জন্মদান করে তার বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। বাল্যবিবাহ রোধে একজন সমাজকর্মী সচেতনতা গড়ে তুলতে পারে ও আইনের প্রয়োগ নিশ্চিত করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। অল্প বয়সী নারী গর্ভধারণ করলে কোন সমস্যার সৃষ্টি হয়?
- ক) অপুষ্ট সন্তানের জন্ম হয়
- খ) সন্তান বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে প্রখর হয়
- গ) সন্তানের ওজন স্বাভাবিক ওজনের চেয়ে বেশি হয়
- ঘ) গর্ভধারিণী মা ভাল বোধ করে

২। বাল্যবিবাহ নারী কল্যাণের ক্ষেত্রে−
- ক) সহায়ক
- খ) ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করে
- গ) অভিশাপ স্বরুপ
- ঘ) নারী-পুরুষ সাম্য সৃষ্টি করে

পাঠ-৩.১৩ মাদকাসক্তির ধারণা, কারণ ও পরিস্থিতি (Concept, Causes and Situation of Drug Addiction)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৩.১৩.১ মাদকাসক্তি ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৩.১৩.২ বাংলাদেশে মাদকাসক্তির কারণসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৩.১৩.৩ বাংলাদেশে মাদকাসক্তি সমস্যার পরিস্থিতি বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.১৩.১ মাদকাসক্তির ধারণা

পশ্চিমের উন্নত সমাজে সামাজিক সমস্যা হিসেবে মাদকাসক্তির উৎপত্তি ঘটলেও দ্রুত ভয়াবহ এই সমস্যাটি পৃথিবীর অন্যান্য উন্নয়নশীল ও অনুন্নত দেশে ছড়িয়ে পড়ে যার আওতা হতে বাদ যায়নি বাংলাদেশ। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে মাদকাসক্তি অন্যতম যা সমাজজীবনে সরাসরি নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। পৃথিবীর প্রায় সকল সমাজেই সাম্প্রতিক সময়ে মাদকাসক্তি এক বিশেষ ও ভয়াবহ সমস্যা হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। অতীতে সাধারণ ও ঐতিহ্যগত নেশাদ্রব্যের প্রতি মানুষের আকর্ষণ ছিল কিন্তু আশির দশকের শুরু থেকে মাদকাসক্তি প্রকট আকার ধারণ করে এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা, সামাজিক অস্থিতিশীলতা এবং নানাবিধ সামাজিক অনাচারের সাথে সমস্যাটির সংশ্লিষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। সাধারণত মাদকাসক্তি হলো মাদকদ্রব্যের প্রতি আসক্তি। মাদকদ্রব্যের প্রতি কোনো ব্যক্তির ক্রমাগত নির্ভরশীলতাকেই মাদকাসক্তি বলে ধরা হয়। মাদকাসক্তি মূলত এক ধরনের অবস্থা যেখানে ব্যবহৃত মাদকের প্রতি ব্যবহারকারী শারীরিক ও মানসিক উভয় দিক থেকে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, মাদকের প্রতি সে তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে এবং এরই সাথে মাদক গ্রহণের মাত্রা বা পরিমাণ দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে থাকে।



চিত্র ৩.১৩.১ : মাদককে না বলুন

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক প্রদত্ত মাদকাসক্তির সংজ্ঞায় বলা হয়েছে– "নেশা বা মাদকাসক্তি হচ্ছে ব্যক্তি ও সমাজের জন্য ক্ষতিকর এমন একটি মানসিক বা শারীরিক প্রতিক্রিয়া যা জীবিত প্রাণী ও মাদকের মিথস্ক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে সৃষ্টি হয়।" অর্থাৎ মাদকাসক্তি হলো মাদক গ্রহণের শারীরিক ও মানসিক বাধ্যতামূলক তীব্র আকাঙ্খা যাতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অস্বাভাবিক দৈহিক ও মানসিক অনুভূতি প্রাপ্ত হয় এবং তা পাবার ইচ্ছার জন্য মাদকদ্রব্যের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

৩.১৩.২ মাদকাসক্তির কারণ

মাদকাসক্তির ক্ষেত্রে কোনো একটি নির্দিষ্ট দেশের জন্য কোনো একক কারণ দায়ী না। বাংলাদেশের মাদকাসক্তি ও মাদকদ্রব্যের ব্যাপক ব্যবহার ও এর প্রভাব প্রকট হওয়ার পশ্চাতে বহুবিধ কারণ বিদ্যমান। সামাজিক, অর্থনৈতিক, মানসিক, নৈতিক বহুবিধ কারণেই ব্যক্তি মাদকাসক্ত হতে পারে। মাদকাসক্তির কারণগুলো আলোচনা করা হলো:

১. **ভৌগোলিক অবস্থান ও মাদকের সহজলভ্যতা:** এদেশের ভৌগোলিক অবস্থানকে বর্তমান সময়ে ভয়াবহ মাদক সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে ব্যাপক ভিত্তিতে মাদক উৎপন্ন হয় এবং খুব সহজেই সীমানা পেরিয়ে তা এদেশে প্রবেশ করে। বাংলাদেশ মাদক চোরাচালানের রুট হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। মাদকাসক্ত ও যে কোনো সাধারণ ব্যক্তির কাছে মাদক এক সহজলভ্য পণ্য।

২. **দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও হতাশা:** তৃতীয় বিশ্বের দেশ হিসেবে এদেশের বহু মানুষ আর্থিক দৈন্য ও বেকারত্বের শিকার। দারিদ্র্য ও বেকারত্ব মানুষের জীবনে সৃষ্টি করছে হতাশা ও নৈরাশ্য। এই হতাশা ও নৈরাশ্য ভুলে থাকার অভিপ্রায়ে অনেকেই মাদকের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে।

৩. **ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় এবং অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ:** বিশৃঙ্খল সামাজিক পরিবেশে মানুষের ধর্মীয় ও সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় হচ্ছে। আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবে এদেশে অন্যের সংস্কৃতি ও অপসংস্কৃতির সংমিশ্রণ হচ্ছে। ফলে মূল্যবোধগত দ্বন্দ্ব তৈরি হচ্ছে যা মাদকাসক্তির ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করছে।

৪. **হীনমন্যতা ও মনস্তাত্ত্বিক সংকট:** জটিল আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির ব্যবধানজনিত কারণে ব্যক্তির মাঝে হীনমন্যতা ও মনস্তাত্ত্বিক সংকট তৈরি হচ্ছে। ফলে ব্যক্তি নিজেকে অতি হীন মনে করছে এবং তা থেকে পরিত্রাণ পেতে চাইছে। আর তাই মাদকে আশ্রয় নিয়ে ব্যক্তি পরিস্থিতি থেকে নিষ্কৃতি পেতে চাইছে। তবে এর ফলাফল যে মারাত্মক ক্ষতিকর যে তা বুঝতে পারে না।

৫. **সঙ্গদোষ ও কৌতূহল:** মাদকাসক্তের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গ এবং এর সাথে মনে স্বাভাবিক কৌতূহলের কারণে অনেকে মাদকাসক্ত হয়ে পড়েন। সঙ্গদোষ ও নতুন অভিজ্ঞতা প্রাপ্তির ঝোঁক মাদকের ক্ষেত্রে ব্যক্তিকে আসক্ত করে তোলে।

৬. **পারিবারিক বিশৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণহীনতা:** যেসকল পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সুষ্ঠু সম্পর্ক বজায় থাকে না এবং পারিবারিক বিশৃঙ্খলা বিরাজ করে এবং পারিবারিক নিয়ন্ত্রণ থাকে না সে পরিবারের সদস্যদের মাদকাসক্ত হওয়ার আশংকা থাকে। পারিবারিক স্নেহ ও ভালবাসার অভাব থেকে ব্যক্তির মধ্যে হতাশা তৈরি হয় যা ব্যক্তিকে মাদকাসক্ত করতে পারে।

৭. **সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা:** সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা মাদকাসক্তির প্রকোপ বৃদ্ধির পিছনে গুরুত্বপূর্ণ এক কারণ হিসেবে বিবেচিত। রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা জনিত পারিপার্শ্বিক অবস্থা সমাজজীবনের নানামুখী অন্যায়, বৈষম্য, বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য প্রভৃতির কারণে সৃষ্ট হতাশা থেকেও মানুষ মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে।

৮. **প্রশাসনিক দুর্বলতা ও দুর্নীতি:** মাদকদ্রব্য সহজলভ্য এবং অবাধ বেচাকেনা হলেও এক্ষেত্রে প্রশাসনিক দুর্বলতা লক্ষণীয়। চোরাকারবারীদের সাথে স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশের যোগ সাজোশ থাকায় মাদকের অবৈধ ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না এবং মাদকাসক্তি বেড়ে চলেছে।

৩.১৩.৩ বাংলাদেশে মাদকাসক্তির পরিস্থিতি

মাদকাসক্তি যেমন নীরবে মানুষকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় তেমনি মাদকদ্রব্যের চোরাচালান একটি দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক কাঠামোকে পঙ্গু করে দেয়। বর্তমানে এদেশের প্রায় ৪৬ লাখ মাদকাসক্ত রয়েছে। এদের মধ্যে ৪০ ভাগ হেরোইনসেবী। দেশে মোট যে অপরাধ হয় তার ৩০ শতাংশ মাদক সংশ্লিষ্ট। মাদকদ্রব্যের খরচ যোগাতে গিয়ে মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা মাদকদ্রব্য পাচারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক মাদকাসক্তদের নেশা বাবদ বার্ষিক দু'হাজার কোটি টাকা অপচয় হয়।

সারসংক্ষেপ

মাদক গ্রহণের তীব্র ইচ্ছা থেকে মাদকদ্রব্যের উপর কোনো ব্যক্তির ক্রমাগত নির্ভরশীলতা ও ক্রমাগত মাদক গ্রহণের হার বৃদ্ধিকে মাদকাসক্তি বলা হয়। বর্তমানে মাদকাসক্তি বাংলাদেশের এক বড় সমস্যা। পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে বিপুল পরিমাণে মাদক উৎপাদন ও মাদক চোরাচালানের রুট হিসেবে বাংলাদেশকে ব্যবহার এদেশে মাদককে অত্যন্ত সহজলভ্য করে তুলেছে এবং বহুবিধ কারণে মাদকাসক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। মাদকাসক্তি হচ্ছে:

ক) ক্রমাগত মাদকের উপর নির্ভরশীলতা খ) কোনো একদিন মাদক গ্রহণ করা
গ) মাদক স্পর্শ করা ঘ) মাদক ব্যবসায় জড়িত থাকা

২। কোন দ্রব্যের ব্যাপক চোরাচালানের রুট হিসেবে বাংলাদেশ ব্যবহৃত হয়?

ক) পরমাণু অস্ত্র খ) মাদক
গ) ইলেকট্রিক সরঞ্জামাদি ঘ) খাদ্য দ্রব্য

পাঠ-৩.১৪ মাদকাসক্তির প্রভাব ও মাদকাসক্তি মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা (Impact of Drug Addiction and the Role of Social Worker to Combat Drug Addiction)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৩.১৪.১ মাদকাসক্তির প্রভাব সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

৩.১৪.২ মাদকাসক্তি মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.১৪.১ মাদকাসক্তির প্রভাব

মাদকাসক্তি আর্থ-সামাজিক জীবনে সুদূরপ্রসারী মারাত্মক পরিণতি বয়ে আনে। বর্তমান বিশ্বের ধনী দরিদ্র সকল দেশ মাদকের মরণছোবলের শিকার। বিশ্বের কোটি কোটি লোক সর্বনাশা মাদকে আক্রান্ত। নিচে মাদকাসক্তির প্রভাব তুলে ধরা হলো:

১. নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির সামাজিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে তার মধ্যে অপরাধবোধ ও পরাজয়ের মনোভাব গড়ে ওঠে। সে তার পরিবার, সমাজ ও আপনজনের কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেয়।
২. মাদকাসক্ত ব্যক্তি মাদকদ্রব্যের খরচ যোগাতে প্রথমে বাড়ির জিনিসপত্র চুরি ও নির্দ্বিধায় মিথ্যা বলতে শুরু করে। নেশাগ্রস্ত ব্যক্তির নৈতিক অবক্ষয় শুরু হয়।
৩. মাদকাসক্ত ব্যক্তি মাদকের খরচ যোগাতে মাদকদ্রব্য পাচারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে। সে নানাবিধ অপরাধ ও চোরাকারবারির সঙ্গে জড়িয়ে থাকে।
৪. জাতিসংঘের আন্তর্জাতিক মাদক নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচির তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে প্রতি বছর নেশার পেছনে পাঁচ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হচ্ছে যার সিংহভাগ চলে যাচ্ছে পাচার হয়ে দেশের বাইরে। মাদকাসক্তি অর্থনীতির উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে।
৫. সমাজের সবচেয়ে সৃজনশীল জনগোষ্ঠী অর্থাৎ যুবসম্প্রদায় মাদকের শিকারে পরিণত হয়ে ক্রমান্বয়ে শারীরিক, মানসিক ও সামাজিক পঙ্গুতে পরিণত হয় এবং অপাংক্তেয় হিসেবে বিবেচিত হয়।
৬. মাদকাসক্ত পিতামাতার সন্তানেরা সুষ্ঠু সামাজিকীকরণ ও ব্যক্তিত্ব গঠন হতে বঞ্চিত হয়, তাদের মধ্যে কিশোর অপরাধ প্রবণতা ব্যাপকভাবে লক্ষণীয়।
৭. বাংলাদেশের সড়ক দুর্ঘটনার অন্যতম কারণ চালকের মাদকাসক্তি। এরা নেশাগ্রস্থ অবস্থায় গাড়ি চালাতে গিয়ে মারাত্মক দুর্ঘটনা ঘটায়।
৮. বাংলাদেশে শিক্ষিত যুবসমাজ ক্রমান্বয়ে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ছে। যার ফলে শিক্ষার পরিবেশ আজ হুমকির সম্মুখীন।
৯. মাদকাসক্তি স্বাস্থ্যহীনতা ও জনস্বাস্থ্যের অবনতির জন্য বিশেষভাবে দায়ী। মাদকদ্রব্য গ্রহণের ফলে ফুসফুস, যকৃত, হৃদযন্ত্র প্রভৃতি আক্রান্ত হয়ে স্বাস্থ্যের মারাত্মক অবনতি ঘটে।
১০. মাদকাসক্তি নীরবে গোটা সমাজকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। সমাজ গঠনের মূল অনু মানুষ মাদকের দংশনে নিস্তেজ হয়ে পড়ে।

৩.১৪.২ মাদকাসক্তি মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

মাদকাসক্ত সমস্যাটি বর্তমানে আমাদের সমাজের অনেক গভীরে এর মূল বিস্তার করেছে। এর ক্ষতিকর ও ধ্বংসাত্মক প্রভাব সুষ্ঠু ও সুন্দর সামাজিক জীবনযাপন বিপর্যস্ত করে তুলছে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় সমাজকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। মাদকাসক্তি মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা হ্রাস করতে কর্তৃপক্ষকে চাপ প্রয়োগ;
২. মাদক নিয়ন্ত্রণে দেশে বিদ্যমান আইনসমূহ কঠোরভাবে প্রয়োগে সরকারকে চাপ প্রয়োগ;
৩. সামাজিক অস্থিরতা মাদকাসক্তির প্রকোপ বৃদ্ধি করে। সামাজিক অস্থিরতা রোধে ভূমিকা পালন করা;
৪. পারিবারিক পরিবেশকে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ করতে পারিবারিক কাউন্সেলিং প্রদান;

৫. দারিদ্র্য ও বেকারত্ব লাঘবে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়ক ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা করা;
৬. কিশোর ও যুবদের মাঝে নৈতিক মূল্যবোধ জাগ্রত করতে সমাজকর্মী প্রচারণা চালানো;
৭. সারা বছরব্যাপী মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কিত প্রচারণা চালাবেন এবং জনমত গঠন করা;
৮. মাদকাসক্তদের ঘৃণা বা অবহেলা না করে উপযুক্ত কাউন্সেলিং এর মাধ্যমে এই পথ থেকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করা;
৯. সকল পাঠ্যক্রমে মাদকের কুফল অন্তর্ভুক্ত করতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা; এবং
১০. মাদকাসক্তদের যথাযথ চিকিৎসার জন্য পর্যাপ্ত অবকাঠামো গড়ে তুলতে সরকারকে উদ্বুদ্ধ করা।

সারসংক্ষেপ

মাদকাসক্ত ব্যক্তি সবকিছু থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেয়। তার নৈতিক অবক্ষয় ঘটে এবং হীনমন্যতা কাজ করে। মাদকাসক্ত ব্যক্তিরা অপরাধমূলক কাজে জড়িয়ে পড়ে। একজন সমাজকর্মী মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন। তাছাড়া মাদকের সহজলভ্যতা রোধে সরকারকে পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। একজন মাদকাসক্ত ব্যক্তি–
ক) বলিষ্ঠ চরিত্রের হয়ে থাকেন
খ) দৃঢ়চেতা হয়ে থাকেন
গ) দূরদর্শী হয়ে থাকেন
ঘ) হীনমন্য হয়ে থাকেন

২। মাদকাসক্তের প্রভাব কোনটি?
ক) মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়
খ) উন্নতি করতে থাকে
গ) সুখী জীবন যাপন করতে পারে
ঘ) পারিবারিক সমৃদ্ধি সাধিত হয়

পাঠ-৩.১৫ অটিজমের ধারণা ও পরিস্থিতি (Concept and Situation of Autism)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৩.১৫.১ অটিজম ধারনাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৩.১৫.২ বাংলাদেশে অটিজম পরিস্থিতি বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.১৫.১ অটিজমের ধারণা

আমাদের সমাজে এমন কিছু ব্যক্তি পাওয়া যাবে যারা আর দশ জন মানুষ থেকে ভিন্ন। তারা বহুলাংশেই নিঃসঙ্গ, চারপাশের জগৎ ও মানুষ সম্পর্কে উদাসীন। অন্যের সাথে কখনই সমাজিক বা আবেগীয় সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে না। এমনকি পরিবারের সদস্যদের সাথেও দু'একটি বিষয় ছাড়া কোনো আন্ত-যোগাযোগ বা মনোভাবের আদানপ্রদানে সক্ষম হয় না। এরা অন্য মানুষের চিন্তা, অনুভূতি ও চাহিদাকে বুঝতে পারে না। ব্যক্তির এরূপ আচরণ পর্যবেক্ষণ করে সর্বপ্রথম পল ইউজেন ব্লুলার নামের একজন চিকিৎসক ১৯১২ সালে এই সমস্যার নামকরণ করেন 'অটিজম' যার বাংলা অর্থ দাঁড়ায় আত্ম-মগ্ন ব্যক্তি। মূলত অটিজম মস্তিষ্কজাত এক স্নায়বিক সমস্যা যা মস্তিষ্কের সাধারণ কর্মক্ষমতাকে ব্যাহত করে। সমস্যাটি জন্মের পর প্রথম তিন বছরের মধ্যেই দেখা দেয় এবং প্রতি হাজারে ২ থেকে ৬ জন শিশুর মধ্যে এই সমস্যার বিকাশ ঘটতে পারে। মস্তিষ্কের সমস্যার কারণে ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক আচরণ, আন্তব্যক্তিক যোগাযোগ এবং অবসর বিনোদনের ক্ষেত্রে যে জটিলতা দেখা দেয় তাকে অটিজম বলা হয়। কখনো কখনো অটিস্টিক ব্যক্তির মধ্যে আক্রমণাত্মক বা আত্মবিধ্বংসী আচরণও দেখা যায়।

আমেরিকান সাইকিয়াট্রিক এসোসিয়েশন (২০০০) কর্তৃক প্রণীত "*Diagonostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-IV-TR*" অটিজমের সংজ্ঞায় উল্লেখ করেছে, "বিকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ও যোগাযোগ দক্ষতার ক্ষেত্রে গুরুতর ও ব্যাপক বৈকল্য অথবা শিশু ও যুবদের মাঝে গন্ডিবদ্ধ আচরণ, আগ্রহ ও কার্যাবলীজনিত যে ব্যাপক বিকাশমূলক অসংগতি পরিলক্ষিত হয় তাই হলো অটিজম (Children and youth identified as pervasive developmental disorder are characterized by severe and pervasive impairment in several areas of development: reciprocal social interaction skills, communication skills, or the presence of stereotyped behaviour interest and activities.)।"



চিত্র ৩.১৫.১ : অটিজম আক্রান্ত শিশু

অটিজম একটি জীবনব্যাপী সমস্যা যা প্রধানত সামাজিক দক্ষতার অভাব, ভাবের আদানপ্রদান বা যোগাযোগের ব্যর্থতা এবং অনাবশ্যক কোনো আগ্রহ বা অঙ্গপ্রতঙ্গ দোলানোর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে।

৩.১৩.২ অটিজম পরিস্থিতি

পৃথিবীর সব অঞ্চলে, সব দেশে এবং জাতি-ধর্ম-বর্ণ-অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে সব ধরনের পরিবারেই অটিজম আক্রান্ত ব্যক্তি দেখা যায়। তবে অটিজমের বিস্তারের হার কত এ নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। এর প্রধান কারণ কিছু জরিপে শুধুমাত্র তীব্র মাত্রার অটিজমকে বিবেচনা করা হয়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই অটিজমের হার কম পাওয় যায়। অন্য জরিপগুলো মৃদু মাত্রার অটিজমকেও জরিপের অন্তর্ভুক্ত করে, ফলে আক্রান্তের হার বেশি আসে। ২০০৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টাভিত্তিক Centre for Discase Control (CDC) এর জরিপে দেখা গেছে, ৩ থেকে ১০ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে প্রতি হাজারে ৩.৪ জন শিশুর অটিজম রয়েছে। এই হার মানসিক প্রতিবন্ধিতা ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতার চেয়ে বেশি। মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের মধ্যে অটিজম আক্রান্তের সংখ্যা অনেক বেশি হলেও মেয়েদের মধ্যে এই রোগের তীব্রতা বেশি থাকে।

সারসংক্ষেপ

অটিজম একটি বুদ্ধিবৃত্তিক সমস্যা। মস্তিষ্কের সমস্যার কারণে ব্যক্তির মধ্যে সামাজিক আচরণ, আন্ত-ব্যক্তিক যোগাযোগ এবং অবসর বিনোদনের ক্ষেত্রে যে জটিলতা দেখা দেয় তাই মূলত অটিজম। মেয়েদের চেয়ে ছেলেদের মধ্যে অটিজম আক্রান্তের সংখ্যা অনেক বেশি হয়। কিন্তু আক্রান্ত ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের মধ্যে নিম্ন বুদ্ধিমত্তা বেশি লক্ষণীয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। অটিজম সর্বপ্রথম নামকরণ করা হয় কত সালে?

ক) ১৯১০ খ) ১৯১২
গ) ১৯১৫ ঘ) ১৯১৮

২। কে প্রথম অটিজম রোগের ধারণা দেন?

ক) পল ইউজেন ব্লুলার খ) পল রুডলফ
গ) অগাস্তিয়ান সেবেলাফ ঘ) ইউ কে ফ্যাটিস

পাঠ-৩.১৬ অটিজমের প্রভাব ও অটিজম সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা (Impact of Autism and the Role of Social Worker to Combat the Autism Problem)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৩.১৬.১ অটিজম সমস্যার প্রভাব সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

৩.১৬.২ অটিজম সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৩.১৬.১ অটিজমের প্রভাব

অটিজম বিকাশের প্রতিটি ক্ষেত্রকেই প্রভাবিত করে তবে এর ফলে শিশুর সামাজিক সম্পর্ক গড়ে তোলার ক্ষমতাই সবচেয়ে বেশি বাধাগ্রস্ত হয়। অটিজমে আক্রান্ত শিশুর মধ্যে যেসকল বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব লক্ষণীয় তা হলো:

১. মা-বাবা ও অন্য শিশুদের সাথে যোগাযোগ করার ক্ষেত্রে ভাষার ব্যবহারে সমস্যা হওয়া। যেমন– প্রথম কথা বলতে অনেক দেরি হওয়া বা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে সীমিত সংখ্যক শব্দই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বারবার ব্যবহার করা যাতে মনে হয় শিশুটি ভাষা বুঝে ব্যবহার করছে না।
২. অন্যের সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে সমস্যা হওয়া, অন্যের বিষয়ে সচেতনতা কম থাকা এবং খুব কম দৃষ্টি সংযোগ করা বা তা চালিয়ে যেতে অনাগ্রহ প্রকাশ করা।
৩. ভান করা এবং কল্পনামূলক খেলা খেলতে সমস্যা হওয়া, একা খেলতে পছন্দ করা এবং অস্বাভাবিক রকমের পুনরাবৃত্তিমূলক খেলা করা।
৪. পরিবেশের প্রতি নিস্পৃহ ও নির্লিপ্ত থাকা। ক্রমাগত পুনরাবৃত্তিমূলক আচরণ করা ও অনমনীয় চিন্তাধারার অধিকারী হওয়া।
৫. খুবই গুটিয়ে থাকা ও কারও সাথে মিশতে না পারা। কোনো কারণ ছাড়াই অন্যদের আক্রমণ ও আহত করা।
৬. অদ্ভুত দেহভঙ্গি, খেলনা নাকের কাছে নিয়ে গন্ধ শোঁকা ও লেহন করা, শরীর পুড়ে গেলেও বা হাড় ভেঙ্গে গেলেও সহজে প্রকাশ না করা, নিজেকে নিজের ব্যথা দেয়ার চেষ্টা করা।
৭. অটিজমে আক্রান্তের বুদ্ধিবৃত্তিক অস্বাভাবিকতার দরুণ পরিবার ও সমাজের কাছে বোঝা হিসেবে পরিগণিত হওয়া, মানবশক্তির অপচয়।
৮. পরিবারের জন্য দুঃসহ যন্ত্রণা বয়ে আনে। পরিবারের সুখ সমৃদ্ধি ও মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটায়।
৯. কোন রাষ্ট্রের বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী অটিজমে আক্রান্ত হলে জনসংখ্যা কাঠামো ত্রুটিযুক্ত হয় ও দক্ষ জনশক্তির ঘাটতি পরিলক্ষিত হয়।

অটিজমে আক্রান্ত বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী সার্বিক রাষ্ট্রীয় উৎপাদনশীলতা ব্যাহত করে।

৩.১৬.২ অটিজম সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

এখন পর্যন্ত অটিজমের কোনো পরিপূর্ণ আরোগ্য বা নিরাময় পাওয়া যায়নি। কোনো শিশু এই ত্রুটি থেকে আপনা-আপনি আরোগ্য লাভ করে না কিন্তু শেখার এবং নতুন নতুন দক্ষতা অর্জন করার সামর্থ্য প্রতিটি শিশুর মাঝে অন্তর্নিহিত থাকে। সময়ের সাথে সাথে অটিজম আক্রান্ত শিশুদের পরিণমন ঘটে এবং শিশুটির আচরণে নতুন নতুন সফলতার ছাপ দেখা যায়। অটিজম সমস্যা মোকাবিলায় একজন সমাজকর্মী যে ভূমিকা রাখতে পারেন তা হলো:

১. অটিজমে আক্রান্ত ভাষার ব্যবহার ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে নিঃস্পৃহ হয়ে থাকে। একজন সমাজকর্মী বিশেষায়িত শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় অটিজমে আক্রান্তের যোগাযোগ দক্ষতা সৃষ্টি করতে পারেন।
২. অটিস্টিকদের সামাজিক আচরণ সম্পন্ন করতে এবং দৈনন্দিন কর্মসূচিতে অভ্যস্ত করতে সমাজকর্মী শিক্ষা প্রক্রিয়া কাজে লাগাতে পারেন।
৩. সহায়তা পেলে সময়ের সাথে সাথে অটিস্টিকদের দক্ষতা বিকশিত হয়। অটিস্টিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমাজকর্মী শিক্ষণ প্রক্রিয়া কাজে লাগাতে পারেন।

৪. উপযুক্ত বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশে অটিস্টিকদের নাটকীয় উন্নতি ঘটতে পারে। সমাজকর্মী অটিস্টিকদের নাটকীয় উন্নতি ঘটাতে পারে। সমাজকর্মী অটিস্টিকদের জন্য বুদ্ধিবৃত্তিক পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারেন।
৫. অটিস্টিকদের বিশেষায়িত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য সমাজকর্মী স্থানীয় পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।
৬. অটিজমে আক্রান্ত ব্যক্তি পরিবারের প্রতিনিয়ত বোঝা হিসেবে পরিগণিত হয় ও নিগৃহীতের শিকার হয়। অটিস্টিকদের প্রতি পরিবারের ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরিতে সমাজকর্মী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন।
৭. কিছু কিছু ক্ষেত্রে অটিস্টিকরা অধিক বুদ্ধিবৃত্তি সম্পন্ন ও সুপ্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়। সমাজকর্মী অটিস্টিকদের সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ সাধন ও বুদ্ধিবৃত্তিক উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে উৎপাদনশীল করতে পারেন।
৮. অটিজমে আক্রান্তদের প্রতি পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সচেতনতা তৈরিতে সমাজকর্মী ভূমিকা রাখতে পারেন।
৯. সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে অটিস্টিকদের কল্যাণবান্ধব নীতি, পরিকল্পনা ও কর্মসূচি তৈরির জন্য সমাজকর্মী ভূমিকা রাখতে পারেন।

সারসংক্ষেপ

অটিজম আক্রান্তরা অস্বাভাবিক আচরণসম্পন্ন হয়। তারা পরিবেশের সাথে এরা খাপ-খাওয়াতে পারে না। বুদ্ধিবৃত্তিক অস্বাভাবিকতা বিরাজ করে এবং পরিবারের বোঝা হিসেবে বিবেচিত হয় যদিও কিছু-কিছু ক্ষেত্রে এরা অধিক বুদ্ধি সম্পন্ন হতে পারে। সময়ের সাথে সাথে শিক্ষণ ও পরিণমনের ফলে এদের উন্নতি ঘটতে পারে এবং একজন সমাজকর্মী এই কাজটি করতে পারেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। অটিজম আক্রান্ত শিশুদের ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য?
ক) স্নায়বিক ত্রুটি থাকে
খ) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ত্রুটি থাকে
গ) পরিপাক তন্ত্রের ত্রুটি থাকে
ঘ) শারীরিক বিকলাঙ্গতা থাকে

২। অটিজম আক্রান্ত শিশুরা-
ক) রাষ্ট্রীয় সম্পদ হিসেবে বিবেচিত হয়
খ) পারিবারিক সম্পদ হিসেবে বিবেচিত
গ) তাদের প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক
ঘ) পারিবারিক বোঝা হিসেবে বিবেচিত হয়

পাঠ-৩.১৭ জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণা ও কারণ (Concept and Causes of Climate Change)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৩.১৭.১ জলবায়ু পরিবর্তনের সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
৩.১৭.২ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৩.১৭.১ জলবায়ু পরিবর্তনের ধারণা

বর্তমান বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তন বা climate change পদবাচ্যটি বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। শিল্পবিপ্লবের পর থেকে অতিমাত্রায় জীবাশ্ম জ্বালানী ব্যবহারের ফলে বায়ুমন্ডলে ওজনস্তর ক্ষয় ও আল্ট্রাভায়োলেট রশ্মির বর্ধিত হারে ভূ-পৃষ্ঠে অধিগ্রহণের কারণে তাপমাত্রা বৃদ্ধি আধুনিকালে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক আলোচনার মূল বিষয়বস্তু। জলবায়ু পরিবর্তন হলো বহুকালব্যপী আবহাওয়ার বণ্টনের পরিসংখ্যানগত পরিবর্তন যা কয়েক দশক হতে অনেক লক্ষ বছর হতে পারে। এই পরিবর্তন আবহাওয়ার গড় অবস্থা অথবা আবহাওয়ার উপাদানসমূহের বণ্টনের মধ্যে হতে পারে। অর্থাৎ গড় বৃষ্টিপাত অথবা গড় তাপমাত্রার পরিবর্তন কিংবা সামগ্রিক আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন। জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত জাতিসংঘ প্রদত্ত সংজ্ঞাতে বলা হয়েছে, "তুলনাযোগ্য সময়ের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের কার্যাবলী বৈশ্বিক বায়ুমন্ডলীয় মিশ্রণে যে পরিবর্তন ঘটায় এবং যা প্রাকৃতিকভাবে জলবায়ুগত তারতম্য হিসেবে পর্যবেক্ষিত হয় তা জলবায়ুগত পরিবর্তন নামে অভিহিত (A change of climate which is attributed directly or indirectly to human activity that alters the composition of global atmosphere and which is in addition to natural climate variability observed over comparable time period.)।" অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তন হলো জলবায়ু পদ্ধতির পরিসংখ্যানগত বিষয়াবলীর মধ্যে পরিবর্তন যা বহুদশক কিংবা তারও বেশি সময়ের ক্ষেত্রে বিবেচ্য এবং সুনির্দিষ্ট কারণ যেখানে অবহেলিত। পরিসংখ্যানগত বিষয়াবলীর মধ্যে গড় তাপমাত্রা অথবা সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ তাপমাত্রার পার্থক্য, বৃষ্টিপাতের নিবিড়তা, আর্দ্রতা, বায়ু প্রবাহ, বায়ুচাপ ইত্যাদিকে বুঝায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, বিগত কয়েক দশকে বাংলাদেশে বৃষ্টিপাতের বৈশিষ্ট্যে পরিবর্তন এসেছে এবং ষড় ঋতুর বৈশিষ্ট্য লোপ পেয়েছে।

৩.১৭.২ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ

জলবায়ু গঠনের ক্ষেত্রে জলবায়ু শক্তি বা Climate Forcings নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। জলবায়ু শক্তি বলতে বুঝায় বিকিরণ, পৃথিবীর কক্ষপথের বিচ্যুতি, পর্বত গঠন ও মহীসঞ্চারণ এবং গ্রীনহাউজ গ্যাসের পরিবর্তন। এই অবস্থাগুলি প্রাথমিক জলবায়ু গঠনকারী নিয়ামকগুলোর কার্যকারিতা ত্বরান্বিত অথবা হ্রাসপ্রাপ্ত করে। আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে জলবায়ু পরবর্তনের কারণসমূহ আলোচনা করা হলো:

১. **প্লেট টেকটনিক:** লক্ষ লক্ষ বছর যাবৎ প্লেট গতির তারতম্যজনিত কারণে ভূ-ত্বক ও মহাসাগরের বিন্যাসে পরিবর্তন আসছে এবং নতুন ভূ-প্রকৃতি সৃষ্টি অথবা অবলুপ্ত হচ্ছে। এই প্রক্রিয়ায় স্থানীয় এবং বৈশ্বিক জলবায়ুর ধরন বদলাতে থাকে।

২. **সৌরশক্তি উৎপাদন:** বিভিন্ন শতাব্দীতে সৌরতাপের কার্যকারিতার তারতম্য জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম শক্তি হিসেবে কাজ করে চলছে। সৌরজগতের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী তারতম্য বৈশ্বিক জলবায়ুর ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব ফেলে এবং শীতলীকরণ প্রভাব ও বৈশ্বিক উষ্ণায়নে সহায়তা করে।

৩. **কক্ষপথের পরিবর্তনশীলতা:** পৃথিবীর কক্ষপথের সামান্য পরিবর্তন বিভিন্ন ঋতুতে সূর্যালোকের তারতম্য নিশ্চিত করে। স্থানিক গড় সূর্যকিরণ ও বার্ষিক গড় সূর্যকিরণের মধ্যে সামান্য পরিবর্তন থাকলেও ভৌগোলিক ও ঋতুগত বণ্টনে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ করা যায়।

৪. **ক্রমিক ঋতু ও আকস্মিক স্থানান্তর:** পরিবর্তক শক্তির ক্রমাগত ক্রিয়ায় হঠাৎ জলবায়ু পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। ১৯৯৭ সালে আমাজান বেসিন ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নিরক্ষীয় অরণ্যে দাবানলে সৃষ্ট ধ্বংস থেকে বায়ুমন্ডলে অতিমাত্রায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড সঞ্চিত হয় এবং সারাবিশ্বে দ্রুত চরম আবহাওয়া অনুভূত হয়। এছাড়া মহাসাগরীয় স্রোতচক্রের মাধ্যমেও আকস্মিক জলবায়ু স্থানান্তর ঘটে থাকে।

৫. **অগ্ন্যুৎপাত:** অগ্ন্যুৎপাত হলো ভূ-গর্ভ থেকে উত্তপ্ত গলিত সান্দ্র অথবা বায়বীয় পদার্থ ভূ-পৃষ্ঠে উৎক্ষেপণ প্রক্রিয়া। অগ্ন্যুৎপাত বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থ, জলীয় বাষ্প, ধুলিকণা, ভষ্ম ইত্যাদি নিক্ষেপ করে থাকে। অগ্ন্যুৎপাতের সময় নিক্ষিপ্ত পদার্থের প্রায় ৯০% জলীয় বাষ্প। একারণে ব্যাপক অগ্ন্যুৎপাতের সময় সন্নিহিত অঞ্চলে বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। প্রতি শতাব্দীতেই অগ্ন্যুৎপাতের ফলে জলবায়ু অনেকখানি প্রভাবিত হয়।

৬. **মহাসাগরের পরিবর্তনশীলতা:** মহাসাগরগুলো জলবায়ুর অন্যতম নিয়ন্ত্রক বা মৌলিক অংশ। স্বল্পমেয়াদী সামুদ্রিক প্রবাহের তারতম্য জলবায়ুর আঞ্চলিক প্রভেদ সৃষ্টি করে কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী তাপ জলীয়প্রবাহ এবং অক্ষাংশ থেকে আরেক অক্ষাংশে তাপ পরিবহনের কাজ করে থাকে এবং জলবায়ু পরিবর্তনে ভূমিকা রাখে।

৭. **প্রকৃতির উপর মানুষের হস্তক্ষেপ:** মানুষের কার্যকলাপে বতর্মান বিশ্বে জলবায়ু পরিবর্তন সৃষ্টি হচ্ছে। বিগত ও বর্তমান শতাব্দীতে চলমান বৈশ্বিক উষ্ণায়ন প্রকৃতির উপর মানুষের অনাকাঙ্ক্ষিত হস্তক্ষেপের ফল। জীবাশ্ম জ্বালানির যথেচ্ছ ব্যবহার, বায়ুমণ্ডলে অতিমাত্রায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড সংযোজন, সিএফসি, মিথেন ও সালফার-ডাই-অক্সাইড নিঃসরণ, ক্রমাগত নির্বনায়ন এবং শিল্পকারখানা ও মারণাস্ত্রের ব্যাপক প্রসার পৃথকভাবে অথবা সম্মিলিতভাবে জলবায়ুর নিয়ামকসমূহের উপর প্রভাব বিস্তার করছে।

সারসংক্ষেপ

জলবায়ু পরিবর্তন হলো বহুকালব্যাপী আবহাওয়ার বণ্টনের পরিসংখ্যানগত পরিবর্তন যা কয়েক বছর হতে কয়েক লক্ষ বছর হতে পারে। সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় পার্থক্য, বৃষ্টিপাতের নিবিড়তা, ষড়ঋতুর বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন প্রভৃতি জলবায়ু পরিবর্তনের উদাহরণ। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট উভয় কারণে জলবায়ু পরিবর্তন হয়ে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। জলবায়ু পরিবর্তন বলতে কী বোঝায়?
- ক) সাময়িক আবহাওয়ার পরিবর্তন বুঝায়
- খ) দীর্ঘ সময়ব্যাপী আবহাওয়ার গড় পরিবর্তন বুঝায়
- গ) জলীয় বাষ্পকে বুঝায়
- ঘ) বৃষ্টিপাতকে বুঝায়

২। প্লেট টেকটনিক জলবায়ু পরিবর্তনের কোন ধরনের কারণ?
- ক) প্রাকৃতিক কারণ
- খ) মানবসৃষ্ট কারণ
- গ) সামাজিক কারণ
- ঘ) অর্থনৈতিক কারণ

পাঠ-৩.১৮ বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা (Impact of Climate Change on the Livelihood of the People of Bangladesh and the Role of Social Worker to Combat the Problem Induced by Climate Change)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৩.১৮.১ বাংলাদেশের মানুষের জীবন জীবিকায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

৩.১৮.২ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৩.১৮.১ জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

পৃথিবীর অন্যতম ব-দ্বীপ অঞ্চল বাংলাদেশ। বৈশ্বিক উষ্ণয়নের ফলে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সমুদ্রতলের পরিবর্তনে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাংলাদেশ। বৃহত্তর ব-দ্বীপ অঞ্চল সমুদ্রগর্ভে চলে যাবে। বিপুলসংখ্যক জনগণ কর্মহীন ও উদ্বাস্তু হয়ে পড়বে। বাংলাদেশের মানুষের জীবন-জীবিকার জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যান্য প্রভাব নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাবে ভবিষ্যতে পানির সমস্যা প্রকট হয়ে উঠবে। পানি লবণাক্ত হয়ে পড়বে এবং অনাহারে ও চাষাবাদের জন্য তীব্র পানি সংকট দেখা দিবে।

২. জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে এ দেশে বৃষ্টিপাতের বিন্যাসে পরিবর্তন আসবে। তীব্র পানি সংকটের পাশাপাশি কোথাও বৃষ্টিপাত বাড়বে আবার কোথাও অনাবৃষ্টি দেখা দিবে।

৩. বৃষ্টিপাতের বিন্যাস ও বৈশিষ্ট্য পরিবর্তনের ফলে শস্যাবর্তনেরও পরিবর্তন আসবে এবং বাস্তু অবস্থার পরিবর্তনে জীবকুলের উপর বিরূপ প্রভাব পড়বে। কৃষি উৎপাদনে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে এবং কৃষির উপর নির্ভরশীল বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবিকা অনিশ্চয়তার মুখে পড়বে।

৪. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে রোগ-ব্যাধির প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশসহ বিভিন্ন দেশে এই প্রভাব মহামারি রুপ পরিগ্রহ করার আশঙ্কা রয়েছে।



চিত্র ৩.১৮.১ : বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনজনিত

৫. সবুজঘর গ্যাসের প্রভাবে জলবায়ু গড় পরিবর্তনের ফলে শস্য ক্ষেত্রের উপর বিরুপ প্রভাব লক্ষণীয়। ধান, জব, ভুট্টাসহ বেশ কিছু শস্যাদির উপর CO_2 বৃদ্ধির প্রভাব নেতিবাচক।

৩.১৮.২ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

বর্তমানে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে জলবায়ু পরিবর্তন ও তার সম্পৃক্ত ফলাফল সারা পৃথিবীর ন্যায় বাংলাদেশকেও অত্যন্ত ভাবিয়ে তুলেছে। ধারণা করা হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অন্যতম ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হবে বাংলাদেশ। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত যে সকল সমস্যা উদ্ভূত হবে তা মোকাবিলায় সমাজকর্মী যে ভূমিকা রাখতে পারে তা নিম্নে তুলে ধরা হলো:

১. বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে বন্যার প্রকোপ আরো বৃদ্ধি পাবার আশঙ্কা রয়েছে। এতে করে দেশের অর্ধেক রাস্তাঘাট, কৃষিজমি ও বাঁধ ডুবে যেতে পারে। এ কারণে বিদ্যমান এসব অবকাঠামো সচল রাখতে উঁচু করতে হবে এবং সবধরনের আবহাওয়ায় যাতে টিকে থাকতে পারে সে ব্যবস্থা করতে সমাজকর্মী প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে।

২. এদেশে পানি নিষ্কাশনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেই। রয়েছে অপ্রতুল কালভার্ট ও রেগুলেটর। বন্যার সময় পানি চলাচল নির্বিঘ্ন করতে সমাজকর্মী উদ্যোগ নিতে পারেন।

৩. দক্ষিণ অঞ্চলের জমির লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেয়ে বিপুলসংখ্যক কৃষি শ্রমিক বেকার হয়ে পড়তে পারে। তাদের নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সমাজকর্মী ভূমিকা রাখতে পারেন।
৪. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে এদেশের উপকূলীয় এলাকা প্লাবিত হলে বিপুল সংখ্যক মানুষ বাস্তুহীন হতে পারে। তাদের পুনর্বাসন সমস্যা মোকাবিলা ও নতুন জীবনে খাপ-খাওয়ানোর ক্ষেত্রে সমাজকর্মী ভূমিকা রাখতে পারেন।
৫. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে উপকূলীয় এলাকায় পানীয় জলের সংকট হতে পারে তা মোকাবিলায় সমাজকর্মী ভূমিকা রাখতে পারেন।

এছাড়াও যেসকল মানবসৃষ্ট কারণে জলবায়ু পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে তা নিরাময়ে সচেতনতা সৃষ্টি এবং অধিক কার্বন নিঃসরণকারী শিল্পোন্নত দেশগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত টেকসই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে চাপ প্রয়োগ করতে সরকারকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

সারসংক্ষেপ

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে অন্যতম ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হবে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের নিম্নাঞ্চল সমুদ্রপৃষ্ঠে বিলীন হয়ে যাবে। উপকূলীয় এলাকার মাটি লবণাক্ত হয়ে পড়ায় চাষাবাদের অযোগ্য ও খাবার পানির তীব্র সংকট দেখা দেবে। বিপুলসংখ্যক মানুষ উদ্বাস্তু ও কর্মহীন হয়ে পড়বে। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ব্যাপক ক্ষতি সাধন হতে পারে। যেমন– নিম্নভূমি নিমজ্জিত হওয়া, জমির লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাওয়া, পানীয় জলের অভাব, বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পাওয়া প্রভৃতির ফলে এদেশের বিপুল জনগোষ্ঠী ভূক্তভোগী হবে। এসব সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মী এখন থেকেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে কী ঘটবে?
ক) জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পাবে খ) শস্য উৎপাদন বাড়বে
গ) নিম্নভূমি নিমজ্জিত হবে ঘ) উপকূল সতেজ হবে

২। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব কোনটি?
ক) পানীয় জলের সংকট দেখা দেবে খ) কৃষি উৎপাদন বাড়বে
গ) নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে ঘ) মানুষের গড় আয়ু বাড়বে

৩। ওজনস্তর ক্ষতির জন্য দায়ী কোনটি?
ক) কার্বন খ) সিএফসি
গ) মিথেন ঘ) সালফার

৪। পানীয় জলের ঘাটতি কিসের প্রভাব?
ক) জলবায়ু পরিবর্তন খ) সামাজিক অবক্ষয়
গ) সামাজিক আদর্শহীনতা ঘ) জনসংখ্যা বৃদ্ধি

পাঠ-৩.১৯ এইচআইভি/এইডস-এর ধারণা, কারণ ও সংক্রমণের বাহন (Concept, Causes and Carrier of HIV/AIDS)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৩.১৯.১ এইচআইভি/এইডস ধারণার সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
৩.১৯.২ এইচআইভি/এইড্সের কারণসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৩.১৯.৩ এইচআইভি/এইডস সংক্রমণের বাহনসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.১৯.১ এইচআইভি/এইডস-এর ধারণা

বর্তমান বিশ্বে সমগ্র মানবজাতির জীবন, সভ্যতা ও উন্নয়নের পথে একটি বড় ধরনের হুমকি, আতঙ্ক ও প্রতিবন্ধক হচ্ছে এইডস, যা ঘাতক ব্যাধি হিসেবে বিশ্বব্যাপী মহামারি আকারে ক্রমান্বয়ে বিস্তার লাভ করছে। ক্রমবর্ধমান বিশ্ব জনসংখ্যার সাথে পাল্লা দিয়ে এইচআইভি সংক্রমিত/এইডস আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই ব্যাধির কোনো চিকিৎসা বা প্রতিষেধক নেই এবং এর পরিণতি হচ্ছে নিশ্চিত অকাল মৃত্যু। এই অবাঞ্ছিত অকাল মৃত্যুকে প্রতিহত করতে বর্তমান বিশ্ববাসীর নিকট একটি বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে– "এইডস মুক্ত সুস্থ সুন্দর জীবন গঠন"। আর এ জন্য প্রয়োজন সর্বস্তরের জনগণের সচেতনতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও সার্বিক সহযোগিতামূলক মনোভাব। এইডস এর পূর্ণরূপ হলো Acquired Immune Deficiency Syndrome যা সংক্ষেপে AIDS নামে পরিচিত। Acquired অর্থ অর্জিত, Immune অর্থ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা, Deficiency অর্থ ঘাটতি এবং Syndrome অর্থ লক্ষণ। অর্থাৎ অর্জিত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ঘাটতির লক্ষণ সমষ্টি হলো AIDS। Human Immuno Deficiency Virus সংক্ষেপে HIV নামক ভাইরাস কোনো ব্যক্তির শরীরে আক্রমণের ফলে যখন তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে পড়ে এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার ঘাটতির লক্ষণ সমষ্টি পরিলক্ষিত হয় তখন সেই ব্যক্তি AIDS আক্রান্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। সর্বপ্রথম ১৯৩০ সালে আফ্রিকাতে HIV এর উৎপত্তি ঘটে এবং ১৯৮২ সালের দিকে AIDS রোগের নামকরণ করা হয়। মানবদেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা HIV নামক ভাইরাস দ্বারা সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে পড়লে, মানবদেহ নির্দিষ্ট রোগ সংক্রমণ প্রতিরোধ করতে অক্ষম হয়ে পড়ে, এইরূপ অবস্থাকে AIDS বলা হয়। কোনো ব্যক্তির শরীরে HIV পাওয়া গেলেই যে তার AIDS হয়েছে তা নয়, HIV যখন ঐ ব্যক্তির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট করবে তখন সে AIDS আক্রান্ত হিসেবে বিবেচিত হবে।



চিত্র ৩.১৯.১ : এইচআইভি/এইডস

৩.১৯.২ বাংলাদেশে এইডস বিস্তারের কারণ

বাংলাদেশ AIDS সংক্রমণের এক ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা হিসেবে বিবেচিত। বহুবিধ কারণে এদেশে AIDS সংক্রমণের আশংকা রয়েছে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কারণসমূহ তুলে ধরা হলো:

১. **ভৌগোলিক অবস্থান:** ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে বাংলাদেশ ভারত ও মায়ানমারের অতি নিকট প্রতিবেশী। উক্ত দেশ দুটির বিপুলসংখ্যক মানুষ HIV বহন করছে। বিভিন্ন প্রয়োজনে ভারত ও মায়ানমারসহ নেপাল, থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ যাতায়াত করছে। এর সাথে অবাধে ও অনিয়ন্ত্রিত যৌনকর্মে লিপ্ত হয়ে বয়ে নিয়ে আসছে HIV জীবাণু।

২. **পতিতাবৃত্তি:** বাংলাদেশে বর্তমানে দেড় লাখের মত যৌনকর্মী রয়েছে এবং এদের সংখ্যা আশংকাজনকভাবে বেড়ে যাচ্ছে। ইতিমধ্যে দেশের ৬% যৌনকর্মী HIV সংক্রমিত এবং বিভিন্ন জটিল যৌন রোগে আক্রান্ত। বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ প্রতিদিন এসব যৌনকর্মীদের সাথে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হচ্ছে এবং অনিয়ন্ত্রিত যৌন সংসর্গ HIV বিস্তার ঘটাচ্ছে।

৩. **মাদকাসক্তি:** সম্প্রতি দেশে মাদকাসক্তির হার অত্যন্ত আশংকাজনকহারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেই সাথে ইনজেকশনের মাধ্যমে মাদক ব্যবহারের প্রবণতাও উল্লেখযোগ্যভাবে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মাদক গ্রহণকারীদের একই সুঁই ভাগাভাগি করে নেওয়ার প্রবণতা HIV বিস্তার ঘটাচ্ছে।

৪. **অনিয়ন্ত্রিত যৌন আচরণ:** সংক্রমিত ব্যক্তির সাথে অনিরাপদ যৌন সংসর্গ HIV বিস্তার ঘটায়। বর্তমান অনিয়ন্ত্রিত ও অবাধ যৌন আচরণ আমাদের দেশে AIDS বিস্তারে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে।

৫. **পেশাদার রক্তদাতার বিস্তৃতি:** বর্তমানে রক্তদাতাদের মধ্যে মাদকাসক্ত ও পেশাদার রক্তদাতার সংখ্যা উল্লেখজনক। অথচ এরাই HIV আক্রান্ত হওয়ার সবচেয়ে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। অপরীক্ষিত রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে HIV বিস্তার ঘটতে পারে।

৬. **পথশিশুদের অপব্যবহার :** দেশের প্রায় ৫ লক্ষ পথশিশু প্রতিনিয়ত বিভিন্নভাবে মাদকাসক্ত ও বখাটে সন্ত্রাসীদের দ্বারা যৌন নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। সেই সাথে তাদের HIV আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হচ্ছে।

৭. **সচেতনতার অভাব:** বর্তমান সময়েও এদেশের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনগোষ্ঠীর মধ্যে এইডস সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণা ও সচেতনতার অভাব রয়েছে। প্রতিনিয়ত এরা ঝুঁকিপূর্ণ যৌন আচরণে লিপ্ত হচ্ছে। AIDS বিষয়ক অজ্ঞতা এদেশে AIDS সংক্রমণে ব্যাপক ভূমিকা রাখতে পারে।

৩.১৯.৩ এইডস (AIDS) সংক্রমণের বাহন

এইডস হচ্ছে HIV (Human Immuno Deficiency Virus) দ্বারা সংক্রমিত একটি রোগ। এই ভাইরাস কোনো ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করলে ধীরে ধীরে ব্যক্তিটি এইডস আক্রান্ত হয়। তিনটি প্রধান কারণে HIV বা AIDS বিস্তার লাভ করে তা হলো:

ক. HIV আছে বা AIDS রোগীর সঙ্গে অনিরাপদ যৌন সংসর্গের মাধ্যমে;

খ. HIV জীবাণু বহনকারী রক্ত পরিসঞ্চালনের মাধ্যমে;

গ. অনিরাপদ বা ব্যবহৃত সিরিঞ্জের পুনঃব্যবহার মাধ্যমে; এবং

এছাড়াও এইডস আক্রান্ত মা থেকে যে শিশু জন্মলাভ করে সেও এই রোগ আক্রান্ত হতে পারে। এমনকি রোগাক্রান্ত মায়ের দুধ পানের মাধ্যমেও দেহে এ রোগ সংক্রমিত হতে পারে। এইডস আক্রান্ত রোগীর রক্ত, অঙ্গ, ইন্দ্রিয়, কলা অন্যদেহে প্রতিস্থাপন করলে HIV জীবাণু সংক্রমিত হয়।

সারসংক্ষেপ

AIDS এর পূর্ণরূপ Acquired Immune Deficiency Syndrome যার অর্থ অর্জিত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ঘাটতির লক্ষণ সমষ্টি। এটি HIV ভাইরাস দ্বারা সংঘটিত একটি রোগ যা মানুষের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলে এবং এর পরিণতি নিশ্চিত মৃত্যু। এটি মূলত HIV পজিটিভ ব্যক্তির সাথে অনিয়ন্ত্রিত যৌন সংসর্গ, রক্ত গ্রহণ ও তার ব্যবহৃত সিরিঞ্জ পুনঃব্যবহারের মাধ্যমে ছড়ায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.১৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। কোন দেশে সর্বপ্রথম AIDS এর উৎপত্তি ঘটে?

ক) আফ্রিকাতে খ) আমেরিকায়
গ) ইউরোপে ঘ) এশিয়ায়

২। কত সালে AIDS রোগের নামকরণ করা হয়?

ক) ১৯৮০ সালে খ) ১৯৮২ সালে
গ) ১৯৮৪ সালে ঘ) ১৯৮৬ সালে

পাঠ-৩.২০ এইচআইভি/এইডস-এর প্রভাব ও এইচআইভি/এইডস মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা (Impact of HIV/AIDS and Role of Social Worker to Combat the HIV/AIDS)

উদ্দেশ্য

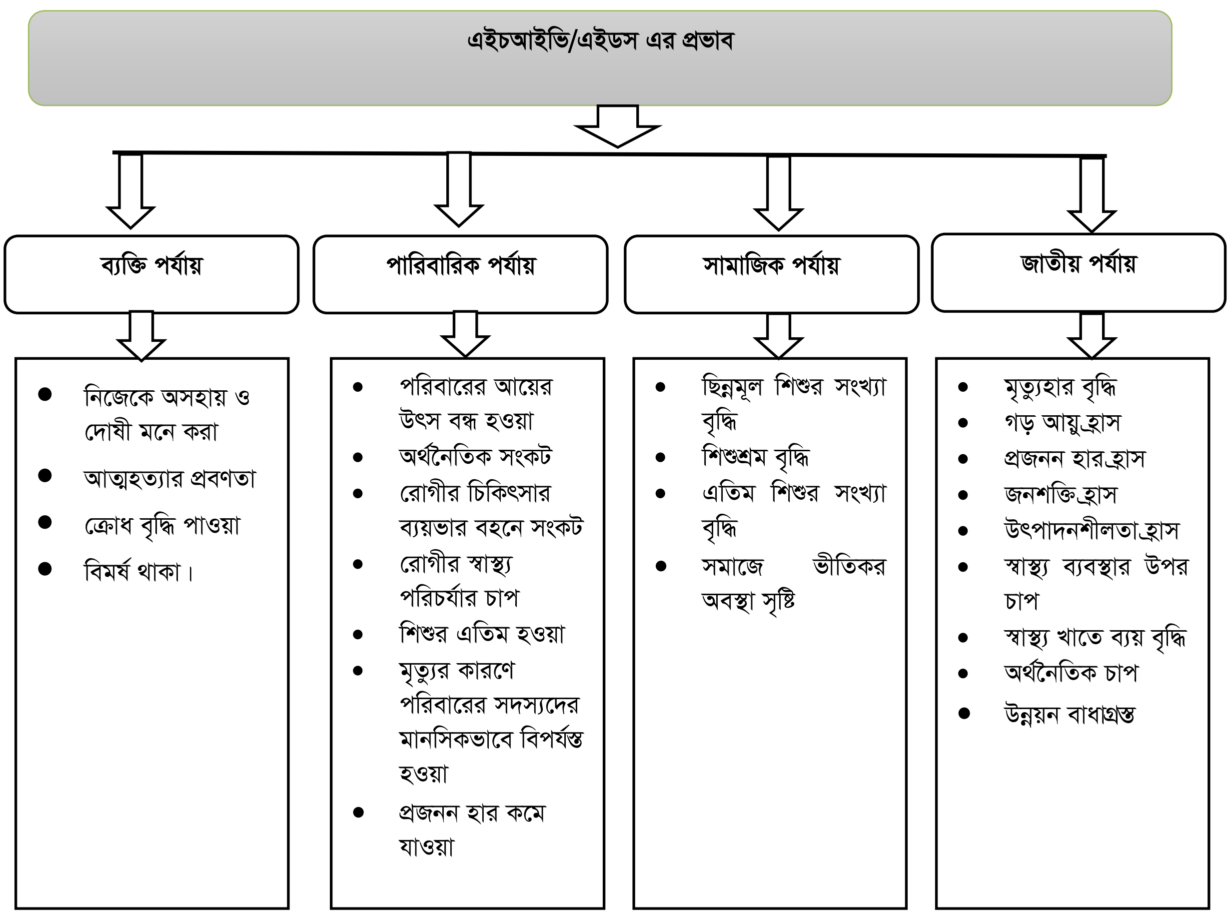
এই পাঠ শেষে আপনি–

৩.২০.১ এইচআইভি/ এইডস প্রভাব সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

৩.২০.২ এইচআইভি/এইডস সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

৩.২০.১ এইচআইভি/এইডস-এর প্রভাব

এইডস বর্তমানে শুধু স্বাস্থ্য সমস্যা নয়, বরং একটি দেশকে এইডস সামাজিক ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন করেছে। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও জনমিতিক সকল ক্ষেত্রে এইচআইভি/এইডস-এর সুদূরপ্রসারী ও ভয়ঙ্কর নেতিবাচক প্রভাব রয়েছে। এই মরণব্যাধির কারণে আক্রান্ত দেশগুলোর সার্বিক উন্নয়ন ব্যাহত হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র। মৃত্যুহার বৃদ্ধি পাচ্ছে, গড় আয়ু কমে যাচ্ছে। প্রজনন হার হ্রাস পাচ্ছে, উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাচ্ছে ও স্বাস্থ্যব্যবস্থার উপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে। নিম্নে ছকের মাধ্যমে এইচআইভি/এইডসের বহুমাত্রিক প্রভাব দেখানো হলোঃ



চিত্র ২.২০.১: এইচআইভি/এইডস এর প্রভাব

৩.২০.২ এইচআইভি/এইডস মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা

এইডস এমন এক ঘাতক ব্যাধি যার প্রতিষেধক বা ঔষধ এখনও আবিষ্কৃত হয়নি। তাই এক্ষেত্রে ব্যাপক সচেতনতাই একমাত্র প্রতিরোধ ব্যবস্থা। এই ব্যাপক সচেতনতামূলক কার্যক্রমের অংশ হিসেবে সমাজকর্মী যে সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন:

১. দেশের সর্বস্তরের জনগণকে নিরাপদ যৌন আচরণে উদ্বুদ্ধ করা। জনগণের মাঝে নৈতিক ও মূল্যবোধগত জাগরণের বিকাশে সহায়তা করা।
২. নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন ও নিরাপদ সিরিঞ্জ ব্যবহারে জনগণকে সচেষ্ট করা। অন্যের রক্ত গ্রহণকালে রক্তের গ্রুপ মিলিয়ে দেখার পাশাপাশি তা জীবাণুমুক্ত কিনা তা যাচাই করতে উদ্বুদ্ধ করা।
৩. আন্তঃশিরায় মাদক গ্রহণকারীদের কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা এবং এক্ষেত্রে মাদকাসক্ত নিরাময় কেন্দ্রগুলোকে সহায়তা করা।
৪. এইচআইভি সংক্রমিত শরীরে গর্ভধারণ না করা কিংবা গর্ভধারণের পূর্বে চিকিৎসকের পরামর্শ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা এবং এইচআইভি আক্রান্ত মায়ের বুকের দুধ সন্তানকে পান করানো থেকে বিরত রাখতে উদ্বুদ্ধ করতে করা।
৫. যৌনবাহিত রোগগুলোর দ্রুত চিকিৎসা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা ও সচেতন জীবনযাপনে প্রেষিত করা।
৬. বিশ্বস্ত যৌনসঙ্গী ও নিয়ন্ত্রিত যৌন আচরণে উদ্বুদ্ধ করা।

এইডস বিষয়ক গণসচেতনতা সৃষ্টিতে ব্যাপক প্রচারণা চালানো, গণমাধ্যমকে উৎসাহিত করা ও নিরাপদ জীবনযাপনে জনগণকে সচেতন করা।

সারসংক্ষেপ

এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির নিশ্চিত পরিণতি মৃত্যু। HIV পজিটিভ সনাক্ত হওয়ার পর ব্যক্তি যতদিন বেঁচে থাকে ততদিন মানসিক, পারিবারিক এবং সামাজিকভাবে নিগৃহীত হতে থাকে। একজন সমাজকর্মী এইডস এর বিরুদ্ধে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে পারেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৩.২০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। কত সালে সর্বপ্রথম AIDS সনাক্ত হয়?
 ক) ১৯৩০ সালে খ) ১৯৪০ সালে
 গ) ১৯৫০ সালে ঘ) ১৯৬০ সালে

২। একজন এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি–
 ক) বিমর্ষ থাকে খ) উৎফুল্ল থাকে
 গ) উৎসবমুখর থাকে ঘ) জীবনীশক্তিতে পরিপূর্ণ থাকে

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। Sociology of Social Problems গ্রন্থটির রচয়িতা কে ?
 ক) P. B Horton Ges and J.R Leslie খ) MacIver and Page
 গ) Bottomore ঘ) Stuart Magill

২। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশের জনসংখ্যা কতগুন বৃদ্ধি হয়েছে?
 ক) দেড়গুণের বেশি খ) দ্বিগুণের চেয়েও বেশি
 গ) চারগুণের বেশি ঘ) পাঁচগুণের বেশি

৩। বর্তমানে পুরুষদের কত ভাগ বেকার?
ক) ২.৩০ ভাগ খ) ৩.৫০ ভাগ
গ) ৪.৫০ ভাগ ঘ) ৬ ভাগ

৪। আয়োডিনের অভাবে কোন রোগটি হয়?
ক) গলগন্ড খ) রাতকানা
গ) মেরাসমাস ঘ) কোয়ারশিয়র

৫। যৌতুক নিরোধ আইনে বর বা কনেকে কত টাকা পর্যন্ত উপঢৌকন প্রদান করা যায়?
ক) ৫০০ খ) ১০০০
গ) ২০০০ ঘ) ৫০০০

৬। নিচের কোনটি বাল্যবিবাহের অন্যতম কারণ?
ক) নারীর ক্ষমতায়ন খ) নারী-পুরুষ সাম্য
গ) সামাজিক রেওয়াজ ঘ) জেন্ডার উন্নয়ন

৭। নিচের কোনটি মাদক?
ক) হেরোইন খ) আখের রস
গ) ফাস্টফুড ঘ) চীনা ভেজিটেবল

৮। কোনটি অটিজম রোগের লক্ষণ?
ক) যোগাযোগ দক্ষতা খ) অল্প সময়ে কথা বলতে শেখা
গ) অদ্ভূত দেহভঙ্গি ও নিজেকে ব্যথা দেয়ার চেষ্টা করা ঘ) নমনীয় চিন্তাধারার অধিকারী হওয়া

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৯ ও ১০ নং প্রেশ্নের উত্তর দিন:
এইডস হচ্ছে ভাইরাস সংক্রমিত একটি রোগ। এই ভাইরাস কোনো ব্যক্তির শরীরে প্রবেশ করলে ধীরে ধীরে ব্যক্তিটি এইডস আক্রান্ত হয়। মূলত ৩টি প্রধান কারণে এই ভাইরাস বিস্তার লাভ করে।

৯। উদ্দীপকের আলোকে কোন ভাইরাস দ্বারা AIDS সংক্রমিত হয়?
ক) HIV খ) T_2ফায
গ) ম্যালেরিয়া ভাইরাস ঘ) ব্যকটেরিয়া

১০। ৩টি প্রধান কি কি কারণে এইডস ভাইরাস বিস্তার লাভ করে?
ক) স্পর্শ, একই প্লেটে খাওয়া, এক ঘরে বসবাস
খ) এইডস রোগীর সাথে যৌন সংসর্গ, রক্ত পরিসঞ্চালন ও ব্যবহৃত সিরিঞ্জ পুনঃব্যবহার
গ) একসাথে চলাফেরা, গল্প করা, ঘুমানো
ঘ) একই বাথরুম ব্যবহার, পরিধেয় বস্ত্র ব্যবহার, পানির মাধ্যমে

১১। সুমন আনুষ্ঠানিক সর্বোচ্চ শিক্ষা গ্রহণ শেষে দীর্ঘদিন যাবৎ চাকুরী সন্ধান করছে। চাকুরি লাভের আশায় সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে নিয়োগ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তীব্র প্রতিযোগিতায় নিয়োগ লাভে ব্যর্থ হয়েছে। সুমনের ক্ষেত্রে কোনটি প্রযোজ্য?
ক) অযোগ্য ব্যক্তি খ) অক্ষম
গ) অলস ঘ) কর্মসংস্থানের স্বল্পতাজনিত বেকার

১২। একজন ব্যক্তি অত্যন্ত স্বল্প বেতনে নিম্নপদে একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত। তিনিই তার পরিবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম এবং তার উপর নির্ভরশীল পরিবারের দশজন সদস্য রয়েছে। তার যে আয় তাতে তার পক্ষে পরিবারের ভরণপোষণ ও সবার পুষ্টি চাহিদা মেটানো সম্ভব হয় না। তার পরিবারের একাধিক সদস্য অপুষ্টির মূল কারণ কী?
ক) দারিদ্র্য খ) অসচেতনতা
গ) অবহেলা ঘ) নিরক্ষরতা

খ. সৃজনশীল

১। জলবায়ু পরিবর্তন এক বৈশ্বিক সমস্যা। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনে অন্যতম ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হবে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের নিম্নভূমি নিমজ্জিত হবে, পানীয় জলের ঘাটতি দেখা দেবে, জমির লবণাক্ততা বৃদ্ধি পাবে এবং বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পাবে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ব্যাপকসংখ্যক মানুষ উদ্বাস্তু হতে পারে।

ক) কয়টি প্রধান কারণে HIV বা AIDS বিস্তার লাভ করে?
খ) বাল্যবিবাহ বলতে কী বোঝায়?
গ) জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ কীভাবে মোকাবিলা করার যেতে পারে? আলোচনা করুন।
ঘ) বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যার প্রভাবসমূহ কী হতে পারে তা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন।

২। রহিম মস্তিষ্কের ত্রুটিজনিত রোগে আক্রান্ত। তার জন্মের প্রথম ২ থেকে ৩ বছরের মধ্যেই রোগটির লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। শুরুতে তার আচরণ অধিকমাত্রায় অস্বাভাবিক ছিল। তবে উপযুক্ত শিক্ষণ ও পরিণমনের সাথে সাথে এই অস্বাভাবিকতা কিছুটা কমেছে। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী উপযুক্ত ভূমিকা পালন করতে পারেন।

ক) বেকারত্ব কোন ধরনের সমস্যা?
খ) অপুষ্টি ধারণাটি ব্যাখ্যা করুন?
গ) রহিমের সমস্যাটির প্রভাবসমূহ বর্ণনা করুন।
ঘ) রহিমের সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মীর ভূমিকা কী হতে পারে তা বিশ্লেষণ করুন?

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২ : ১। খ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৩ : ১। ক ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৪ : ১। গ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৫ : ১। ক ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৬ : ১। ক ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৭ : ১। খ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৮ : ১। খ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৯ : ১। ক ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১০ : ১। ঘ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১১ : ১। খ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১২ : ১। ক ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১৩ : ১। ক ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১৪ : ১। ঘ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১৫ : ১। খ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১৬ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১৭ : ১। খ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১৮ : ১। গ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১৯ : ১। খ ২। ক ৩। ক ৪। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২০ : ১। ক ২। ক
চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ৩ : ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ক ৫। ক ৬। গ ৭। ক ৮। গ ৯। ক ১০। খ

সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা এবং সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধ
(Social Institutions and Agencies and Prevention of Social Problem)

ইউনিট ৪

ভূমিকা

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে বসবাসরত মানুষের প্রয়োজনে সৃষ্টি হয়েছে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা। যেমন– বিবাহ, পরিবার, জ্ঞাতি সম্পর্ক, সম্পত্তি, ধর্ম, শিক্ষা, রাজনীতি, বিদ্যালয়, হাসপাতাল, এতিমখানা ইত্যাদি। এসব প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা একদিকে মানুষের বহুমুখী প্রয়োজন পূরণ করে অন্যদিকে নানাবিধ সমস্যা মোকবিলায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমাজ গঠনে মূল ভূমিকা পালন করে। এগুলোর মাধ্যমে সামাজিক বন্ধন সৃষ্টি হয় এবং মানুষ তাদের সামাজিক ভূমিকা পালন করে থাকে। অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, সামাজিক শান্তি ও শৃঙ্খলা, মানসিক আনন্দ, ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন এবং জ্ঞানচর্চা সংক্রান্ত যাবতীয় প্রয়োজন মেটানোর ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৪.১ : সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার ধারণা ও বৈশিষ্ট্য
পাঠ-৪.২ : সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবাহ ও পরিবারের ধারণা এবং কার্যাবলী
পাঠ-৪.৩ : সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা
পাঠ-৪.৪ : বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ
পাঠ-৪.৫ : ধর্মের ধারণা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে ধর্মের ভূমিকা
পাঠ-৪.৬ : ধর্মীয় মূল্যবোধ গঠনে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ
পাঠ-৪.৭ : গণমাধ্যমের ধারণা, ধরন ও সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে গণমাধ্যমের ভূমিকা
পাঠ-৪.৮ : গণমাধ্যমের ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ
পাঠ-৪.৯ : আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ধারণা, ধরন ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকা
পাঠ-৪.১০ : আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তাদানে সমাজকর্মীর ভূমিকা

পাঠ-৪.১ সামাজিক প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার ধারণা এবং বৈশিষ্ট্য (Concept and Characteristics of Social Institution and Social Agency)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৪.১.১ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৪.১.২ সামাজিক সংস্থার ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৪.১.৩ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।
৪.১.৪ সামাজিক সংস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

৪.১.১ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ধারণা (Concept of Social Institution)

সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় হলো সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সামাজিক প্রতিষ্ঠান সামাজিক নিয়ন্ত্রণ,

ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, সমস্যা সমাধান, মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে অনন্য ভূমিকা পালন করে। সামাজিক প্রতিষ্ঠান মূলত সমাজদেহের কার্যনির্বাহী অঙ্গ। সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলতে সাধারণত কোনো স্থায়ী কাঠামো বা সংগঠনকে বোঝায়। যেমন– পরিবার, রাষ্ট্র ইত্যাদি। আবার অন্য অর্থে, সামাজিক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সমাজের প্রচলিত অনুষ্ঠান, রীতি বা কর্মপদ্ধতি। যেমন– বিবাহ, সরকার প্রভৃতি।

সমাজবিজ্ঞানী Sumner and Keller (১৯৮৩) তাঁদের "*An Introduction to the Science of Society*" গ্রন্থে বলেন, "প্রতিষ্ঠান হলো এমন এক সক্রিয় ব্যবস্থা যা সামাজিক রীতিনীতি ও লোকাচারকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে (An institution is a vital interest or activity which surrounded by a cluster of mores and folkyays.)।"

সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ধারণায় H. E. Barnes (১৯৪২) তাঁর "*Social Institution*" গ্রন্থে বলেন, "সামাজিক প্রতিষ্ঠান হলো সামাজিক কাঠামো ও যন্ত্রস্বরুপ যার মাধ্যমে মানবসমাজ সংগঠিত ও পরিচালিত হয় এবং প্রয়োজন মেটানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের কার্যকলাপ সম্পাদন করে (Social institutions are social structure and machinery through which human society organizes, directs and excutes the multifarious activities required to satisfy human needs.)।" সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকাইভার ও পেজের সংজ্ঞানুযায়ী, "প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সেসব প্রতিষ্ঠিত কর্মপদ্ধতি, যার মাধ্যমে গোষ্ঠীর কার্যকলাপের বৈশিষ্ট্য সূচিত হয়।"

উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, সামাজিক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সমাজ কর্তৃক প্রবর্তিত ও অনুমোদিত এমন এক নিয়ম বা পদ্ধতি যা মানুষের আচার-আচরণ ও পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সমাজজীবনে শৃঙ্খলা ও সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি করে।

৪.১.২ সামাজিক সংস্থার ধারণা (Concept of Social Ageney)

সামাজিক সংস্থা সমাজস্থ এমন একটি স্থান যেখান থেকে কোনো বিশেষ বিষয়ে সেবাদান করা হয়। সেবাদানের কেন্দ্রবিন্দু হলো সামাজিক সংস্থা। সাধারণত এজেন্সি শব্দটি কোনো বিষয়ের কার্যালয় বা অফিস হিসেবে গণ্য হয়। কোনো কেন্দ্রীয় অফিসের অধীনে অন্য কোনো স্থান, অফিস বা কার্যালয় নিযুক্ত করাকে এজেন্সি বা সেবাদান স্থান বলা হয়। সামাজিক সংস্থা কেবলমাত্র সমাজসেবামূলক কার্যক্রমের নিযুক্ত কেন্দ্র বা কার্যালয়কে বোঝায়।

The Social Work Dictionary (১৯৯৫) এর সংজ্ঞা অনুযায়ী, "সামাজিক সংস্থা হলো এক ধরনের সংগঠন বা সুবিধা প্রদান ব্যবস্থা যাতে একটি পরিচালনা বোর্ডের উদ্যোগে সমাজসেবার সুব্যবস্থা করা হয় এবং সাধারণত মানবসেবা কর্মীদের দ্বারা সেবা প্রদান করা (Social agency is an organization or facility that delivers social services under the auspices of a board of directors and usually by human services personnel.)।"

মানবসেবামূলক তৎপরতায় নিযুক্ত আনুষ্ঠানিক কর্মসূচিকে সামাজিক সংস্থার আওতাভুক্ত করা যায়। উদাহরণ স্বরুপ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, মানবাধিকার বাস্তবায়ন সংস্থা প্রভৃতি সামাজিক সংস্থার অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বলা যায়, সামাজিক সংস্থা হলো এমন একটি সাংগঠনিক সুবিধা প্রদান ব্যবস্থা যা সচরাচর পরিচালকদের বোডের পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে এবং মানবসেবা প্রদানকারী কর্মীদের দ্বারা সমাজসেবা প্রদান করে থাকে।

৪.১.৩ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Social Institution)

সামাজিক প্রতিষ্ঠান নানাদিক দিয়ে বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। নিচে এর কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হলো:

১. মানুষের বহুমুখী চাহিদা ও প্রয়োজন থেকে সৃষ্ট;
২. সমাজদেহের কার্যনির্বাহী অঙ্গ;
৩. সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে অবশ্যই সমাজস্বীকৃত হতে হবে;
৪. সামাজিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যম;
৫. সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ পরস্পর নির্ভরশীল;
৬. সামাজিক স্থায়িত্বের রক্ষাকবচ;
৭. যৌথ জীবনযাত্রা পদ্ধতির সূতিকাগার;
৮. সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমাজ পরিচালনার বাহন;
৯. সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কর্মভার হস্তান্তরিত হতে পারে;
১০. গতিশীল ও পরিবর্তনশীল; এবং
১১. সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল সমাজজীবনের জন্য অপরিহার্য।

সামাজিক প্রতিষ্ঠান কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বাহন। এর সদস্য হওয়া যায় না, অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠান এ দুই অর্থেই Social Institution প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয়। সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা এর কর্মপদ্ধতি যদি খুব কঠোর হয়, তখন মানুষ এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। সামাজিক প্রতিষ্ঠান সমাজের অগ্রগতিকে অব্যাহত রাখে। সমাজবিজ্ঞানী গিডিংস এর ভাষায়, মানবজীবনের যা কিছু মহৎ ও কল্যাণকর তার সবই সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে এক যুগ হতে অন্য যুগে বর্তায়।

৪.১.৪ সামাজিক সংস্থার বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Social Agency)

সামাজিক সংস্থার কতকগুলো সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা নিম্নরুপঃ

১. সামাজিক সংস্থা সরকারি ও বেসরকারি উভয় পর্যায়ের হতে পারে। তবে এর পরিচয় হলো সমাজসেবামূলক;
২. সামাজিক সংস্থা সমাজ উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সাধারণত সমাজকল্যাণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন এর কর্মতৎপরতার অন্তর্ভুক্ত;
৩. সমাজে যে সমস্যা রয়েছে তা দূরীকরণের জন্য সামাজিক এজেন্সি ভূমিকা পালন করে;
৪. সমষ্টিকেন্দ্রিক সেবাদানের জন্য এজেন্সি ব্যবহৃত হয়। কোনো একটি নির্দিষ্ট সমষ্টির সেবা প্রদানের বাহন হিসেবে এজেন্সিগুলো পরিচিত;
৫. সামাজিক সংস্থা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দিক। সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা উন্নয়ন এর কার্যক্রমের আওতাভুক্ত;
৬. সামাজিক সংস্থার অর্থসংস্থান হয় মানবহিতৈষী দান, অনুদান, সরকার প্রদত্ত অর্থ, সেবার মাধ্যমে প্রাপ্ত ফি ও অন্যান্য উৎস থেকে;
৭. সামাজিক এজেন্সির পরিধি সীমিত এবং নির্দিষ্ট বিষয়ে সেবা প্রদান করে থাকে;
৮. সামাজিক সংস্থা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মতো স্থায়ী ও সর্বজনীন নয়। এটি বিলুপ্ত হতে পারে কিংবা দর্শনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে নতুন করে শুরু হতে পারে; এবং
৯. সামাজিক সংস্থার টার্গেট গ্রুপ ঝুঁকিপ্রবণ জনগোষ্ঠী এবং সারাদেশ বা সমগ্রবিশ্ব হতে পারে।

সারসংক্ষেপ

সামাজিক বিজ্ঞানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় হলো সামাজিক প্রতিষ্ঠান। সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, ঐক্য ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা, সমস্যা সমাধান, মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে সামাজিক প্রতিষ্ঠান অনন্য ভূমিকা পালন করে। সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলতে সাধারণত কোনো স্থায়ী কাঠামো বা সংগঠনকে বোঝায় যেমন– পরিবার, রাষ্ট্র ইত্যাদি। আবার অন্য অর্থে সামাজিক প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সমাজের প্রচলিত অনুষ্ঠান, রীতি বা কর্মপদ্ধতি। যেমন– বিবাহ, সরকার প্রভৃতি। অন্যদিকে সামাজিক সংস্থা সমাজস্থ এমন একটি স্থান যেখান থেকে কোনো বিশেষ বিষয়ে সেবা দান করা হয়। সাধারণত এজেন্সি শব্দটি কোনো বিষয়ের কার্যালয় বা অফিস হিসেবে গণ্য হয়। কোনো কেন্দ্রীয় অফিসের অধীনে অন্য কোনো স্থান অফিস বা কার্যালয় নিযুক্ত করাকে এজেন্সি বা সেবাদান স্থান বলা হয়। সামাজিক সংস্থা বলতে কেবল সমাজসেবামূলক কার্যক্রমের নিযুক্ত কেন্দ্র বা কার্যালয়কে বোঝায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমাজদেহের কার্যনির্বাহী অঙ্গ বলা হয় কোনটিকে?

ক) সামাজিক প্রতিষ্ঠান খ) সামাজিক অনুষ্ঠান
গ) সামাজিক সংস্থা ঘ) সামাজিক প্রথা

২। সামাজিক সংস্থা হলো এক ধরনের সংগঠন বা সুবিধা প্রদান ব্যবস্থা যাতে–

i. একটি পরিচালনা বোর্ডের উদ্যোগে সমাজসেবার সুব্যবস্থা করা হয়
ii. টার্গেট গ্রুপ ঝুঁকিপ্রবণ জনগোষ্ঠী, সারা দেশ বা সমগ্র বিশ্ব হতে পারে
iii. সাধারণত মানবসেবা কর্মীদের দ্বারা পরিচালিত হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.২ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবাহ ও পরিবারের ধারণা এবং কার্যাবলী (Concept and Activities of Marriage and Family as Social Institution)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৪.২.১ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবাহ ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৪.২.২ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবার ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৪.২.৩ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবাহের কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।
৪.২.৪ সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিবারের কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন।

৪.২.১ বিবাহের ধারণা (Concept of Marriage)

বিবাহ হচ্ছে সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্ম কর্তৃক অনুমোদিত এমন একটি সামাজিক চুক্তি, যার মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন নারী একত্রে বসবাস করার চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্জন করে। অর্থাৎ নর-নারীর দাম্পত্য বন্ধনকে বিবাহ বলে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, বিবাহ জিনিসটা সভ্য সমাজের অন্যসব ব্যাপারের মতোই প্রকৃতির অভিপ্রায়ের সাথে মানুষের অভিপ্রায়ের সন্ধি স্থাপনের ব্যবস্থা। বিবাহ সম্পর্কে নৃবিজ্ঞানী Robert H. Lowie (১৯১৯) তাঁর গ্রন্থ "Primitive Society" উল্লেখ করেন, "বিবাহ হচ্ছে অনুমোদনযোগ্য সঙ্গীর মধ্যে মোটামুটি স্থায়ী বন্ধন (Marriage relatively permanent bond between permissiable mates)।"

সমাজবিজ্ঞানী B. Malinowski বিবাহের ধারণায় "*Encyclopedia of Britannica*" (vol. 14) তে বলেন, "সামগ্রিকভাবে বিবাহ হচ্ছে যৌন সম্পর্কের আইনসম্মত অধিকার প্রদানের চেয়ে সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালনের একটি চুক্তি (Marriage on the whole is rather a contract for the production and maintenance of children than an authorization of sexual intercourse.)।"

এডওয়ার্ড ওয়েস্টারমার্ক (১৯২১) তাঁর "*History of Human Marriage*" গ্রন্থে বলেন, "বিবাহ হলো এক বা একাধিক পুরুষের সঙ্গে এক বা একাধিক স্ত্রীলোকের আইন কর্তৃক স্বীকৃত এক একটি সম্পর্ক যা বিবাহিত ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের সন্তানসমূহের জন্য নির্দিষ্ট কতগুলো অধিকার ও কর্তব্যের সৃষ্টি করে।"

উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে বলা যায়, বিবাহ হচ্ছে সমাজ অনুমোদিত নর-নারীর এমন এক চুক্তি ও আইনগত সম্পর্ক যার মাধ্যমে পরিবার গঠিত হয় ও সন্তান উৎপাদিত হয়। এর মাধ্যমে নারী-পুরুষ বৈধভাবে একত্রে বসবাস ও দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করে পারস্পরিক ভালোবাসার মাধ্যমে নিজেদের বিকশিত করতে পারে।

৪.২.২ পরিবারের ধারণা (Concept of Family):

সাধারণত পরিবার হচ্ছে সমাজ কর্তৃক অনুমোদিত ও স্বীকৃত এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে স্বামী-স্ত্রী সন্তানসহ একত্রে বসবাস করে। পরিবারের ধারণায় ম্যাকাইভার এবং পেজ (১৯৬৭) তাঁদেও "Society" গ্রন্থে বলেন বলেন, "পরিবার হলো এমন একটি গোষ্ঠী যাদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট যৌন সম্পর্ক রয়েছে এবং সে সম্পর্ক সন্তান উৎপাদন ও লালন পালনের স্বার্থে যথেষ্ট সুস্পষ্ট এবং সৃষ্ট (The family is a group defined by a sex relationship sufficiently precise and enduring to provide for the procreation and up brings of children.)।"

সমাজবিজ্ঞানী বি. ম্যালিনস্কি (B.Malinowski) এর মতে, "পরিবার হচ্ছে সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালনের একটি চুক্তি।"

সমাজবিজ্ঞানী Meyer F. Nimkoff (১৯৬৫) তাঁর "Marriage and Family Living" গ্রন্থে পরিবারের ধারণায় বলেন, "পরিবার হচ্ছে স্বামী ও স্ত্রী কর্তৃক সৃষ্ট মোটামুটি স্থায়ী সংগঠন যেখানে সন্তান-সন্ততি থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে।"

সামনার ও কেলার (Sumner and Keller) এর মতে, "পরিবার হচ্ছে রক্ত সম্পর্কের ওপর প্রতিষ্ঠিত এক ক্ষুদ্র সামাজিক সংগঠন যা কমপক্ষে দু'পুরুষকে অন্তর্ভুক্ত করে।"

উপর্যুক্ত ধারণার আলোকে বলা যায়, পরিবার হচ্ছে বিবাহবন্ধনের মাধ্যমে সৃষ্ট পুরুষ ও নারীর একত্রে বসবাসের একটি ক্ষুদ্র সামাজিক সংগঠন, যেখানে স্বামী-স্ত্রী বৈবাহিক ও রক্ত সম্পর্কের ভিত্তিতে সন্তানসহ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে জ্ঞাতি সদস্যসহ একত্রে বসবাস করে।

৪.২.৩ বিবাহের কার্যাবলী (Functions of Marriage)

মানবসমাজে বিবাহ একটি সর্বজনীন প্রথা ও প্রতিষ্ঠান। সমাজবদ্ধ মানুষের সামাজিক জীবন সুশৃঙ্খল, গঠনমূলক ও স্থিতিশীল করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ন্যায় বিবাহের ভূমিকাও অনস্বীকার্য। বিবাহ প্রসঙ্গে দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল তাঁর "*Marriage and Morals*" গ্রন্থে বলেন, "আমি বিশ্বাস করি যে, দুটি নরনারীর মধ্যে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় সম্পর্ক যদি কিছু থাকে তা হলো বিবাহ।" মানুষের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক প্রভৃতি দিকে বিবাহ যে সকল কার্যাবলী সম্পাদন করে তা নিম্নে আলোকপাত করা হলো:

ক) পরিবার গঠন: বিবাহ হচ্ছে এমন একটি কার্যপ্রণালী যার মাধ্যমে পরিবার গড়ে ওঠে। মূলত বিবাহ হচ্ছে পরিবার গঠনের উপায়। কেননা একজন নারী এবং একজন পুরুষের মাঝে পারিবারিক জীবনের সূচনা ঘটিয়ে দেয় বিবাহ। বিবাহ ছাড়া পরিবার গঠন অসম্ভব। সুতরাং পরিবার গঠনে বিবাহের গুরুত্ব ও ভূমিকা অগ্রগণ্য।

খ) যৌন চাহিদা পূরণ: মানুষসহ সকল প্রাণীরই যৌন চাহিদা একটা সহজাত প্রবৃত্তি। নির্দিষ্ট বয়সে মানুষের মধ্যে এ চাহিদা সৃষ্টি হয়, যা পূরণ করা অপরিহার্য। বৈধ ও সমাজস্বীকৃত পন্থায় এ চহিদা পূরণের একমাত্র পথ হচ্ছে বিবাহ। প্রকৃতপক্ষে নারী ও পুরুষের যৌন সংযোগ সম্পর্কের সামাজিক উদ্দেশ্য হলো সন্তান জন্মদান। বস্তুত এই উদ্দেশ্যকে সফল করে বিবাহ।

গ) সন্তান জন্মদান ও লালনপালন: সন্তান উৎপাদন ও লালনপালন বিবাহের অন্যতম কাজ। বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠিত হয়। আর পরিবার হলো সন্তান উৎপাদন ও লালনপালনের সর্বোৎকৃষ্ট প্রতিষ্ঠান। মানবশিশুর লালন-পালনের দায়িত্ব বাবা-মার ওপর। বিবাহের মাধ্যমে বাবা-মা এ দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠন করায় শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ ও লালন পালনে কোনো সমস্যা হয় না।

ঘ) উত্তরাধিকার: বিবাহ বংশের ধারা বজায় রাখতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিবাহিত পিতামাতার সন্তান বংশ সুরক্ষায় সক্ষম হয়। সন্তান পিতামাতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। বিবাহই সন্তানকে অবৈধ সন্তান পরিচয়ের গ্লানি থেকে রক্ষা করে পিতৃ পরিচয়ে গৌরবান্বিত করে। সমাজবিজ্ঞানী ম্যালিওনসকির ভাষায়, বিবাহ কেবল যৌন মিলনের অনুমতি দেয় না, বরং পিতৃত্ব ও মাতৃত্বের দায়িত্ব ন্যাস্ত করে।

ঙ) সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ: বিবাহের অন্যতম প্রধান ভূমিকা হলো সামাজিক অনাচার প্রতিরোধ। পতিতাবৃত্তি, নৈতিক অধঃপতন, উচ্ছৃঙ্খলতা ও নেশাগ্রস্ততা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে বিবাহের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মরণব্যাধি এইডস-এর প্রধান কারণ হলো বহুগামিতা বা অবাধ যৌনাচার। নিয়ন্ত্রিতভাবে যৌন ক্ষুধা নিবারণের ব্যবস্থা করে বিবাহ এইডস প্রতিরোধে ভূমিকা পালন করতে পারে।

চ) সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা: বিবাহ নতুন সামাজিক সম্পর্ক সৃষ্টি করে। বিবাহ কেবল দু'জন নর-নারীর মধ্যেই মধুর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে না, দুটো পরিবার তথা দুই পরিবারের আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবকে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ করে। বিভিন্ন মানুষ ও পরিবারের মধ্যে সেতু বন্ধন রচনা করে। এতে করে সামাজিক পরিচিতি ও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পায়।

ছ) শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ: বিবাহের মাধমে দুজন নরনারী সুখের সংসার গড়ে তোলা সুযোগ পায়। পিতামাতার স্নেহের ছায়ায় ও তত্ত্বাবধানে সন্তানের সুষ্ঠু সামাজিকীকরণ সম্ভব হয় এবং তারা সুনাগরিক হিসেবে বেড়ে ওঠে। শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি, বিকাশ ও মানস গঠনে বিবাহ কার্যকরি ভূমিকা পালন করে।

জ) সমাজের স্থায়িত্ব রক্ষা: সমাজের স্থায়িত্ব ও সংহতি সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও বিবাহের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। বিবাহের মাধ্যমে ব্যক্তিগত, পারিবারিক এবং সামাজিক সম্পর্ক প্রসারিত হয়ে পারিবারিক ও সামাজিক ঐক্য সৃষ্টি করে। এ ধরনের ঐক্য সমাজে স্থায়িত্ব, সংহতি ও গঠনমূলক পরিবেশ সৃষ্টিতে সহায়ক।

উপর্যুক্ত কার্যাবলী ছাড়াও বিবাহ ধর্মীয় নীতিমালা প্রতিষ্ঠা, প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষা, মানসিক সুস্থতা ও প্রশান্তি আনয়ন, আর্থিক সহযোগিতার সুযোগ সৃষ্টি, সামাজিক নিরাপত্তা বিধান, সামাজিক রীতিনীতি বজায় রাখা এবং সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৪.২.৪ পরিবারের কার্যাবলী (Functions of Family)

সমাজবিজ্ঞানী জিসবার্ট পরিবারকে সমাজের জন্মকোষ (germinal cell) হিসেবে অভিহিত করেছেন। পরিবারের কার্যাবলীর সঠিক সীমারেখা টানা যায় না। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের কার্যাবলীও পরিবর্তিত হচ্ছে। বিভিন্ন সমাজবিজ্ঞানী পরিবারের কার্যাবলী সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত প্রদান করেছেন। Kingsley Davis এবং Bottomore পরিবার কর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলীকে চার ভাগে ভাগ করেছেন– ১) সন্তান প্রজনন (২) সন্তান প্রতিপালন (৩) কর্মনিযুক্তির ব্যবস্থা, এবং (৪) সামাজিকীকরণ। W.F. Ogburn and M.F. Nimkoff (১৯৪৭) তাঁদের *"A Handbook of Sociology "* গ্রন্থে পরিবার দ্বারা সম্পাদিত কার্যাবলীকে ছয়টি ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা– (১) স্নেহ সম্পর্কিত, (২) অর্থনৈতিক, (৩) প্রমোদমূলক, (৪) নিরাপত্তামূলক, (৫) ধর্মীয় এবং (৬) শিক্ষা বিষয়ক। সমাজবিজ্ঞানীদের দেওয়া মতামতের ওপর ভিত্তি করে পরিবারের সামগ্রিক কার্যাবলী নিচে আলোচনা করা হলোঃ

ক) জৈবিক চাহিদা পূরণঃ মানুষের অন্যতম সহজাত প্রবৃত্তি ও মৌল চাহিদা হচ্ছে জৈবিক চাহিদা। নারী-পুরুষ বিবাহের মাধ্যমে পরিবার গঠনের মধ্য দিয়ে জৈবিক চাহিদা পূরণ করে থাকে। সুতরাং জৈবিক চাহিদা পূরণ পরিবারের অন্যতম মৌলিক কাজ।

খ) মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণঃ পরিবার স্নেহ-ভালোবাসা, মায়া-মমতা, আদর-যত্ন, সহানুভূতি-সহমর্মিতা, প্রেম-প্রীতি প্রভৃতির মাধ্যমে মনস্তাত্ত্বিক কাজ সম্পন্ন করে।

গ) অর্থনৈতিক চাহিদা পূরণঃ সামাজিক একক হিসেবে পরিবারকে নানাবিধ অর্থনৈতিক কাজ সম্পাদন করতে হয়। জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উৎপাদন, সংগ্রহ, বন্টন, কর্মসংস্থান প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ঘ) সন্তান জন্মদান ও লালনপালনঃ পরিবার সন্তান জন্মদান ও রক্ষণাবেক্ষণের ধারক ও বাহক। মানবসমাজে সন্তান প্রজননের একমাত্র স্বীকৃত সংস্থা হলো পরিবার। সুতরাং সন্তান জন্মদান ও প্রতিপালনে পরিবার মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

ঙ) শিশুশিক্ষার কেন্দ্রঃ পরিবার হচ্ছে মানব জীবনের শাশ্বত বিদ্যাপিঠ। প্রতিটি শিশু পরিবার থেকে পারস্পরিক আচরণ, নীতিবোধ, আদর্শ ইত্যাদি গুণ শিখে থাকে। তাই পরিবারকে নাগরিকের প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র বলা হয়। পরিবারকে একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হিসেবে গণ্য করা যায়, যার প্রধান পিতা বা মাতা। এ পরিমন্ডল থেকে সন্তান-সন্ততি নেতৃত্ব, দায়িত্ব, কর্তব্য, নিয়মশৃঙ্খলা, অধিকার, আনুগত্য ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা লাভ করে।

চ) ধর্মীয় শিক্ষার সূতিকাগারঃ পরিবার শিশুদের ধর্মীয়শিক্ষা প্রদানে অনন্য ভূমিকা পালন করে। ধর্মীয় রীতিনীতি, আচার-অনুষ্ঠান, নৈতিকতা, সততা, চরিত্র গঠন প্রভৃতি শিক্ষা দেয় পরিবার।

ছ) শিশুর সামাজিকীকরণঃ মানবশিশুর সামাজিকীকরণ পরিবারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ। শিশুকে সামাজিক জীবনের নিয়ম-কানুন, রীতিনীতি, আদর্শ, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রভৃতি সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণাা দিয়ে গঠনমূলক আচরণ বিকাশে পরিবারের ভূমিকা অনন্য। এসব পদক্ষেপ শিশুর সামাজিকীকরণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

এছাড়া পরিবার তার সদস্যদের নিরাপত্তা বিধান, সামাজিক পরিচিতি ও মর্যাদা, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, উত্তরাধিকার সংরক্ষণ, বিবাহদান, মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ প্রভৃতি কার্যসম্পাদন করে। পরিশেষে বলা যায়, পরিবার হলো মানব প্রকৃতির নার্সারি ও সামাজিক প্রথার সূতিকাগার। একটি সুন্দর জীবন, সুন্দর সমাজ, সুসংগঠিত জাতি ও রাষ্ট্রগঠনে পরিবারের ভূমিকা সর্বজনীন। অধ্যাপক রোজের মতে, Well integrated family life ensures astable national life।

সারসংক্ষেপ

বিবাহ হচ্ছে সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্ম কর্তৃক অনুমোদিত এমন একটি সামাজিক চুক্তি, যার মাধ্যমে একজন পুরুষ ও একজন নারী একত্রে বসবাস করার চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্জন করে। অন্যদিকে, পরিবার হচ্ছে সমাজ কর্তৃক অনুমোদিত ও স্বীকৃত এমন একটি প্রতিষ্ঠান যেখানে স্বামী-স্ত্রী সন্তানসহ একত্রে বসবাস করে। মানবসমাজে বিবাহ একটি সর্বজনীন প্রথা ও প্রতিষ্ঠান। সমাজবদ্ধ মানুষের সামাজিক জীবন সুশৃঙ্খল, গঠনমূলক ও স্থিতিশীল করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ন্যায় বিবাহের ভূমিকাও অনস্বীকার্য। বিবাহ ধর্মীয় নীতিমালা প্রতিষ্ঠা, প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষা, মানসিক সুস্থতা ও প্রশান্তি আনয়ন, আর্থিক সহযোগিতার সুযোগ সৃষ্টি, সামাজিক নিরাপত্তা বিধান করে, সামাজিক রীতিনীতি বজায় রাখে এবং সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও বিকাশ ঘটায়। আবার পরিবার তার সদস্যদের নিরাপত্তাবিধান, সামাজিক পরিচিতি ও মর্যাদা, সামাজিক নিয়ন্ত্রণ, উত্তরাধিকার সংরক্ষণ, বিবাহদান, মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ প্রভৃতি কার্যসম্পাদন করে। পরিবার হলো মানব প্রকৃতির নার্সারি ও সামাজিক প্রথার সূতিকাগার। একটি সুন্দর জীবন, সুন্দর সমাজ, সুসংগঠিত জাতি ও রাষ্ট্রগঠনে বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা সর্বজনীন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। দুইজন নরনারীর মধ্যকার সমাজ, সংস্কৃতি ও ধর্ম কর্তৃক অনুমোদিত সামাজিক চুক্তি কোনটি?

ক) বিবাহ খ) পরিবার

গ) জ্ঞাতি সম্পর্ক ঘ) উত্তরাধিকার

২। পরিবারের কার্যাবলী হলো–

i. নারী-পুরুষের জৈবিক চাহিদা পূরণ করা

ii. শিশুদের ধর্মীয় ও নৈতিকতা শিক্ষা দেওয়া

iii. সদস্যদের নিরাপত্তা বিধান, সামাজিক পরিচিতি ও মর্যাদাদান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.৩ সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা (The Role of Marriage and Family in Preventing Social Problem)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৪.৩.১ সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৪.৩.১ সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা (Role of Marriage and Family in Preventing Social Problem)

সমাজের মৌলিক প্রতিষ্ঠান পরিবার গঠনের মূল ভিত্তি হলো বিবাহ। বিবাহ ও পরিবার একে অপরের সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা বহুমুখী। সন্তান লালনপালন থেকে শুরু করে সদস্যদের প্রয়োজন পূরণ এমনকি পারিবারিক জীবনে সুষ্ঠু নিয়মনীতি প্রতিষ্ঠা বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকার পর্যায়ভুক্ত। যাতে সমাজবিরোধী কোনো ভূমিকায় পরিবারের সদস্যরা অবতীর্ণ না হয় সে বিষয়েও বিবাহ ও পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিবাহ ও পরিবারের এসব ভূমিকাকে সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা হিসেবে দেখা যায়। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন– যৌতুক, বাল্যবিবাহ, অপরাধ, যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন, জঙ্গিবাদ, অপুষ্টি, শিশু ও নারী নির্যাতন, মানসিক সমস্যা প্রভৃতি প্রথমে ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং পরবর্তীতে তা পরিবার থেকে সমাজে সম্প্রসারিত হয়। ফলে সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। নিম্নে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা আলোচনা করা হলো:

১। **যৌতুক (Dowry):** যৌতুকের কবলে আজ গোটা সমাজ নিমজ্জিত। অর্থনৈতিক দৈন্যতা, অশিক্ষা, অজ্ঞতা ও প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধের প্রশ্রয়ে সমাজে যৌতুকের ঘটনা ক্রমান্বয়ে বেড়েই চলছে। যৌতুক সমস্যা প্রতিরোধে বিবাহ ও পরিবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। কারণ যৌতুকের লেনদেন হয় বিবাহকে কেন্দ্র করে। আর পরিবার সামাজিকীকরণ, নৈতিক শিক্ষাদান, সামাজিক মূল্যবোধ শিক্ষা, ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রতকরণ, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা এবং সর্বোপরি সুস্থ সামাজিক ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের অভ্যাস গড়ে তোলে। বিবাহ ও পরিবারের এসব ভূমিকার কারণে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি হয় এবং যৌতুক নামক অবাঞ্ছিত কুপ্রথার মতো সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধ করা সম্ভব হয়।

২। **বাল্যবিবাহ (Early marriage):** বাল্যবিবাহ একটি সামাজিক সমস্যা। এর ফলে স্বামী-স্ত্রীর বয়সের সামঞ্জস্যহীনতা, দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব, অপরিপক্ক মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব প্রভৃতি স্বামী-স্ত্রীর সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। যেসকল কারণে বাল্যবিবাহের মতো সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি, সেসব দূর করার ক্ষেত্রে বিবাহ ও পরিবার ভূমিকা পালন করতে পারে। যেমন– সামাজিকীকরণ, নিরাপত্তাদান, নৈতিক শিক্ষাদান, মৌলিক প্রয়োজন পূরণ, অধিকার সংরক্ষণ ও চিত্তবিনোদনমূলক কার্যক্রম ইত্যাদি। এছাড়া মেয়েদের শিক্ষাদান ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, সামাজিক আইন এবং বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে ভূমিকা রাখতে পারে। যেহেতু বাল্যবিবাহ পারিবারিক পরিমন্ডলেই হয়ে থাকে তাই তা প্রতিরোধে পরিবারের ভূমিকাই অগ্রগণ্য।

৩। **অপরাধ (Crime):** বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যাগুলোর অন্যতম হলো অপরাধ। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, পরিবেশ এবং মনোদৈহিক সমস্যাই অপরাধ প্রবণতার জন্য দায়ী। বিবাহ ও পরিবার অপরাধ প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। পরিবার মানুষের মৌলিক মানবিক চাহিদা পূরণ, সুস্থ বিকাশ, ব্যক্তিত্ব গঠন, নৈতিকতা, আদর্শ ও উপর্যুক্ত শিক্ষা, ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে শিক্ষা দেয়। তাছাড়া দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি, শৃঙ্খলাবোধ, আইনের প্রতি আনুগত্যের গুণাবলি অর্জন, সমাজস্বীকৃত উপায়ে জৈবিক চাহিদা পূরণ ও নির্মল চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা করে অপরাধ প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

৪। **যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন (Sexual harassment and torture):** যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন একটি সামাজিক ব্যাধি। জাতীয় ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের অবক্ষয়, পরিবারিক বন্ধনে শৈথিল্য, সন্তানের প্রতি মা-বাবার উদাসীনতা, সুস্থ বিনোদন ও ধর্মীয় অনুশাসনের অভাব, অশালীন পোশাক প্রভৃতি এর প্রধান কারণ। এ সমস্যা প্রতিরোধে বিবাহ ও পরিবার অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে। মানুষের অন্যতম সহজাত প্রবৃত্তি ও মৌল চাহিদা হচ্ছে জৈবিক চাহিদা। বিবাহের মাধ্যমে সমাজস্বীকৃত উপায়ে এ চাহিদা পূরণের মাধ্যমে যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন অনেকটা প্রতিরোধ সম্ভব। পারিবারিক সুস্থ পরিবেশ, নৈতিকতা ও শালীনতার মূল্যবোধ সৃষ্টি, ছেলে সন্তানকে মেয়েদের সম্মান করার শিক্ষা, মেয়েদের প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, নির্মল আনন্দদায়ক খেলাধূলা ও সংস্কৃতিচর্চার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বিবাহ ও পরিবার যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন প্রতিরোধে ভূমিকা পালন করতে পারে।

৫। **জঙ্গিবাদ (Terrorism):** বর্তমানে জঙ্গিবাদ একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি। সাম্প্রদায়িকতা এবং উগ্র ধর্মান্ধতা ও মুক্ত চিন্তা-চেতনার অভাব জঙ্গিবাদ সৃষ্টির অন্যতম কারণ। বিবাহ ও পরিবার মানুষকে সুস্থ বিকাশ, ব্যক্তিত্ব গঠন, উদার আদর্শ, রীতিনীতি, মূল্যবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও সাংস্কৃতিক ধ্যানধারণা প্রদান করে সুষ্ঠু সামাজিকীকরণে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে, যা জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে ভূমিকা পালন করে। পরিবার দায়িত্ব ও কর্তব্য, শৃঙ্খলাবোধ, শিষ্টাচার, দেশপ্রেম, আইনের প্রতি আনুগত্য ইত্যাদি গুণাবলি শিক্ষাদানের মাধ্যমে আদর্শ সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে। পরিবার বিজ্ঞানমনস্কতা, মুক্তবুদ্ধির চর্চা এবং ধর্মীয় সর্বজনীন কল্যাণকর শিক্ষাদানের ব্যবস্থা ও চাহিদা পূরণ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক নিরাপত্তার বিধানসহ বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে ভূমিকা পালন করে।

৬। **অপুষ্টি (Malnutrition):** পুষ্টি সম্পর্কে সচেতনতার অভাব অপুষ্টি সমস্যার ব্যাপকতার জন্য বহুলাংশে দায়ী। পরিবার তার সদস্যদের মৌলিক মানবিক চাহিদাগুলো পূরণের মাধ্যমে অপুষ্টি সমস্যা প্রতিরোধে ভূমিকা পালন করে। প্রয়োজনীয় পুষ্টিকর খাবার সরবরাহ, শিক্ষার মাধ্যমে পুষ্টি ও খাদ্য সংক্রান্ত নানা ধরনের অজ্ঞতা ও কুসংস্কার দূর, বাসস্থান, পরিবেশ ও স্বাস্থ্যরক্ষার বিভিন্ন উপাদানের প্রয়োজন পূরণের মাধ্যমে পরিবার অপুষ্টি সমস্যা প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা রাখে।

৭। **শিশু ও নারী নির্যাতন (Violence against Child and Women):** শিশু ও নারী নির্যাতন বলতে শিশু ও নারীর উপর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক যে কোনো নিপীড়ন ও নির্যাতনকে বোঝায়, যা তাদের অধিকার খর্ব বা হরণ করে। শিশু ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে বিবাহ ও পরিবার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। শিক্ষাই হচ্ছে শিশু ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধের উত্তম উপায়। পরিবার মানবসন্তানের প্রাথমিক শিক্ষাকেন্দ্র হিসেবে এ ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে। তাছাড়া দারিদ্র্য দূরীকরণ, পারিবারিক সুসম্পর্ক তৈরি, অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, নৈতিক শিক্ষা, অধিকার সংরক্ষণ, সুস্থ বিনোদনের ব্যবস্থা প্রভৃতির মাধ্যমে পরিবার শিশু ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধে ভূমিকা পালন করতে পারে।

৮। **মানসিক সমস্যা (Mental Problem):** বিবাহ ও পরিবারের মাধ্যমেই শিশু, কিশোর, যুবক, বৃদ্ধ, সুস্থ ও অসুস্থ নির্বিশেষে সবাই মানসিক বিকাশ ও ভারসাম্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়। পরিবার মানসিক নিরাপত্তা প্রদানের মাধ্যমে ব্যক্তির মনে হতাশা, ব্যর্থতা, হীনমন্যতা, আশঙ্কা প্রভৃতি দূর করে সুখানুভূতি ও স্বাচ্ছন্দ্যবোধের সৃষ্টি করে। পরিবারের মধ্যেই স্নেহ-ভালোবাসার প্রীতিপূর্ণ পরিবেশ বর্তমান থাকে, যে কোনো শিশুর মানসিক দৃষ্টিভঙ্গি যথাযথভাবে বিকশিত হতে পারে। পরিবারের এ প্রীতিপূর্ণ পরিবেশে মানুষের বহুবিচিত্র কামনা-বাসনা ও মানসিক আশা-আকাঙ্খার পরিতৃপ্তি সাধিত হয়। মাতাপিতার স্বাস্থ্যকর দাম্পত্যজীবন, শিশুর প্রতি মাতাপিতার সঙ্গত ব্যবহার, সদস্যদের সহজাত স্বাভাবিক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা এবং পরিবেশের সাথে অভিযোজনের সক্ষমতা সৃষ্টির মাধ্যমে বিবাহ ও পরিবার সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা অপরিসীম। ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক একক হিসেবে মানুষের সামাজিকীকরণ, নৈতিক শিক্ষা দান, সামাজিক আচার-আচরণ শেখানো, ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রতকরণ এবং সর্বোপরি সুস্থ সামাজিক ও ভারসাম্য জীবনের অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে বিবাহ ও পরিবার সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সারসংক্ষেপ

সমাজের মৌলিক প্রতিষ্ঠান পরিবার গঠনের মূল ভিত্তি হলো বিবাহ। আর বিবাহ ও পরিবার অবিচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা বহুমুখী। সন্তান লালনপালন থেকে শুরু করে সদস্যদের প্রয়োজন পূরণ এমনকি পারিবারিক জীবনে সুষ্ঠু নিয়মনীতি প্রতিষ্ঠা বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকার পর্যায়ভুক্ত। বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা যেমন– যৌতুক, বাল্যবিবাহ, অপরাধ, যৌন হয়রানি ও নিপীড়ন, জঙ্গিবাদ, অপুষ্টি, শিশু ও নারী নির্যাতন, মানসিক সমস্যা প্রভৃতি প্রথমে ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং পরবর্তীতে তা পরিবার থেকে সমাজে সম্প্রসারিত হয়। ফলে সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা অপরিসীম। ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান ও সামাজিক একক হিসেবে মানুষের সামাজিকীকরণ, নৈতিক শিক্ষা দান, সামাজিক আচার-আচরণ শেখানো, ধর্মীয় অনুভূতি জাগ্রতকরণ এবং সর্বোপরি সুস্থ সামাজিক ও ভারসাম্য জীবনের অভ্যাস গড়ে তোলার মাধ্যমে বিবাহ ও পরিবার সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধের ভূমিকা পালন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমাজের মৌলিক প্রতিষ্ঠান কোনটি?

ক) বিবাহ
খ) পরিবার
গ) জ্ঞাতি সম্পর্ক
ঘ) উত্তরাধিকার

২। জঙ্গিবাদ সৃষ্টির অন্যতম কারণ হলো–

i. সাম্প্রদায়িকতা এবং উগ্র ধর্মান্ধতা
ii. মুক্ত চিন্তা-চেতনার অভাব
iii. দেশপ্রেম ও আইনের প্রতি আনুগত্যহীনতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.৪ বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ (Intervention of Social Worker in Developing the Role of Marriage and Family)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৪.৪.১ বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৪.৪.১ বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ (Intervention of Social Worker in Developing the Role of Marriage and Family):

বিবাহ ও পরিবার দুটি মৌলিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বিবাহের মাধ্যমে সৃষ্ট পরিবার নামক প্রতিষ্ঠান থেকেই মানবজাতির উন্নয়ন ও বিকাশ হয়েছে। বিবাহ ও পরিবারের সুষ্ঠু ভূমিকা পালনের ওপর নির্ভর করে সমাজের উন্নতি আর প্রগতি। বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে একজন পেশাদার সমাজকর্মীর পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা এবং হস্তক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নের জন্য সমাজকর্ম পেশা কর্তৃক নির্ধারিত ও স্বীকৃত জ্ঞান, মূল্যবোধ ও কলা কৌশলের ভিত্তিতে সমাজকর্মী কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম হচ্ছে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ। বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নের জন্য বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা পালনের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বাস্তবমুখী তথ্যের প্রয়োজন। সমাজকর্মী এক্ষেত্রে সমাজকর্ম গবেষণা কৌশল প্রয়োগ করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে বাস্তবমুখী ও কার্যকর কর্মসূচি গ্রহণে সহায়তা করে। সাধারণভাবে সমাজকর্ম পদ্ধতির আলোকে যদি সমাজকর্মীর ভূমিকাকে বিবেচনা করা হয় তাহলে বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মীর তিন ধরনের ভূমিকা উল্লেখ করা যায়– ক) ব্যক্তিগত পর্যায়ের ভূমিকা, খ) দলগত পর্যায়ের ভূমিকা এবং গ) সমষ্টিগত পর্যায়ের ভূমিকা। নিম্নে বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ আলোচনা করা হলো:

ক) ব্যক্তিগত পর্যায়ের ভূমিকা: ব্যক্তিগত পর্যায়ের ভূমিকার ক্ষেত্রে একজন সমাজকর্মী বিবাহিত দম্পতি ও পরিবারের যেসব সদস্য তাদের সঠিক ভূমিকা পালনে অক্ষম হচ্ছে তাদের জন্য পৃথক পৃথক কাউন্সেলিং-এর ব্যবস্থা করতে পারেন। এক্ষেত্রে ব্যক্তিকে শিক্ষার মাধ্যমে মানসিকতার পরিবর্তন, দক্ষতা কাজে লাগানোর ক্ষমতার উন্নয়ন এবং ব্যক্তিত্বের উন্নয়ন ঘটানো হয়। অনেক সময় ব্যক্তির বন্ধু, আত্মীয় এবং সহকর্মী যারা তার ভূমিকা উন্নয়নে সাহায্য করতে পারে তাদের নিয়েও কাজ করতে হয়।

খ) দলগত পর্যায়ের ভূমিকা: দলগত পর্যায়ে সমাজকর্মী বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে সাহায্য করতে পারেন। দলগত পর্যায়ে সমাজকর্মী বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে সকল সদস্যকে একসাথে নিয়ে কাউন্সেলিং-এর ব্যবস্থা করতে পারেন, যা সাধারণত family group work এর অংশ। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী সমগ্র পরিবারটিকে একটি দল হিসেবে বিবেচনা করে পরিবারের সদস্যদের যথাযথ ভূমিকা পালনে সাহায্য করার জন্য দল সমাজকর্মের কৌশলগুলো প্রয়োগ করতে পারেন। আবার role play method প্রয়োগ করার মাধ্যমেও সদস্যদের স্ব স্ব ভূমিকা উপলব্ধি করতে সাহায্য করতে পারেন, যা বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে কার্যকর অবদান রাখতে পারে।

গ) সমষ্টিগত পর্যায়ের ভূমিকা: সমষ্টিগত পর্যায়ে বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মী সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করা। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী বিভিন্ন সভা, সেমিনার, টেলিভিশন, রেডিও এবং প্রিন্ট মিডিয়ার মাধ্যমে বিবাহ ও পরিবারের সঠিক ভূমিকা পালনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতন করতে পারেন।

এছাড়াও সমাজকর্মীগণ বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে তিন ধরনের সেবা প্রদান করে থাকেন। যেমন– ১) প্রাক-বিবাহ পরামর্শ, ২) বিবাহ পরামর্শ এবং ৩) পারিবারিক পরামর্শ।

১) **প্রাক-বিবাহ পরামর্শ (Pre-marital councelling):** দাম্পত্য জীবনের সুখের মুলে রয়েছে উপযুক্ত সঙ্গী নির্বাচন। বিবাহ প্রস্তুতিকালীন সময়ে সঙ্গী/সঙ্গিনী নির্বাচন ও পরিকল্পনা সংক্রান্ত সমস্যা মোকাবিলায় সমাজকর্মী তার পেশাগত দক্ষতা প্রয়োগ করে ব্যক্তিকে তার সমস্যা মোকাবিলায় সহায়তা করে থাকেন।

২) **বিবাহ পরামর্শ (Marriage councelling):** প্রতিটি মানুষের স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি, রুচিবোধ, পছন্দ-অপছন্দ এবং দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে নিজস্ব পরিকল্পনা থাকে। এ কারণে অনেক সময় দাম্পত্যজীবনে ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী সমাজকর্মের কৌশল প্রয়োগ করে দাম্পত্য সম্পর্ক উন্নয়ন ও জোরদারকরণে পরামর্শ দিয়ে থাকেন। বিবাহ পরামর্শ কার্যক্রমে সমাজকর্মী কখনো স্বামী-স্ত্রীকে আলাদা আলাদাভাবে, আবার কখনো এক সঙ্গে, আবার কখনো পরিবারের সদস্য ও সংশ্লিষ্টদের সম্পৃক্ত করে একত্রে পরামর্শ দিয়ে থাকেন।

৩) **পারিবারিক পরামর্শ (Family councelling):** পারিবারিক সংহতি ও সম্পর্কন্নোয়ন, পরিবারের সদস্যদের ভূমিকা উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সামর্থ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে পারিবারিক পরামর্শসেবা দেয়া হয়ে থাকে। পরিবারের সদস্যদের মধ্যে মেলামেশা, যোগাযোগ, পারিবারিক সমস্যা সম্পর্কে পারস্পরিক উপলব্ধি ও আলোচনার সুযোগ বৃদ্ধি করা পারিবারিক পরামর্শ সেবার অন্তর্গত।

এ ছাড়াও পারিবারিক শিক্ষা, সামাজিকীকরণ, পারিবারিক বাজেট, পরিবারিক সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং বিকাশ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সমাজকর্মী বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন যা পরিপূর্ণ পারিবারিক ভূমিকা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।

সারসংক্ষেপ

বিবাহ ও পরিবার দুটি মৌলিক সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বিবাহের মাধ্যমে সৃষ্ট পরিবার নামক প্রতিষ্ঠান থেকেই মানবজাতির উন্নয়ন ও বিকাশ হয়েছে। তাই বিবাহ ও পরিবারের সুষ্ঠু ভূমিকা পালনের ওপর নির্ভর করে সমাজের উন্নতি আর প্রগতি। বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে একজন পেশাদার সমাজকর্মীর পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা এবং হস্তক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নের জন্য সমাজকর্ম পেশা কর্তৃক নির্ধারিত ও স্বীকৃত জ্ঞান, মূল্যবোধ ও কলা কৌশলের ভিত্তিতে সমাজকর্মী কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম হচ্ছে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ। বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নের জন্য বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা পালনের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে বাস্তবমুখী তথ্যের প্রয়োজন। সমাজকর্মী এক্ষেত্রে সমাজকর্ম গবেষণা কৌশল প্রয়োগ করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করে বাস্তবমুখী ও কার্যকর কর্মসূচি গ্রহণে সহায়তা করে। এ ছাড়াও পারিবারিক শিক্ষা, সামাজিকীকরণ, পারিবারিক বাজেট, পরিবারিক সম্পর্ক বৃদ্ধি এবং বিকাশ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে সমাজকর্মী বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন যা পরিপূর্ণ পারিবারিক ভূমিকা নিশ্চিত করতে সহায়তা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। সমাজকর্মের পদ্ধতির আলোকে সমাজকর্মী বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নে কয় ধরনের ভূমিকা পালন করে থাকেন?

ক) তিন ধরনের খ) চার ধরনের
গ) পাঁচ ধরনের ঘ) ছয় ধরনের

২। বিবাহ ও পরিবারের ভূমিকা উন্নয়নের জন্য সমাজকর্মী পেশাগত যেসব বিষয় প্রয়োগ করে থাকেন-

i. জ্ঞান ও দক্ষতা
ii. নীতি ও মূল্যবোধ
iii. কৌশল ও পদ্ধতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.৫ ধর্মের ধারণা ও সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে ধর্মের ভূমিকা (Concept of Religion and the Role of Religion in Preventing Social Problem)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৪.৫.১ ধর্মের ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৪.৫.২ সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে ধর্মের ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

৪.৫.১ ধর্মের ধারণা (Concept of Religion)

ধর্ম একটি মৌল ও সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান। সমাজ সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকে ধর্মের অস্তিত্ব বিদ্যমান। ধর্মের ইংরেজি Religion শব্দটি ল্যাটিন Religere শব্দ থেকে এসেছে। যার অর্থ সংযোগ বা বন্ধন। সুতরাং অভিধানিক অর্থে ধর্ম বলতে এমন এক বিষয়কে বুঝায়, যা ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে বন্ধন সৃষ্টি করে ও সংহতি আনয়ন করে। আবার সংস্কৃত 'ধৃ' ধাতু হতে ধর্ম প্রত্যয়ের উৎপত্তি। 'ধৃ' অর্থ ধারণ করা। এই অর্থে বলা যায়, মানুষ যা ধারণ করে তাই ধর্ম।



চিত্র ৪.৫.১ : সামাজিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধর্ম

সাধারণত ধর্ম হচ্ছে বিশ্বাসগত ব্যাপার, যাতে স্রষ্টাকে সন্তুষ্ট করার জন্য নানাবিধ ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত হয়। প্রখ্যাত নৃবিজ্ঞানী ই. বি. টেইলর (E.B. Tylor) ধর্মের ধারণায় বলেন, "ধর্ম হলো অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস এবং এরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে সংযুক্ত প্রতিষ্ঠান ও সেগুলোর অনুশীলন (Religion is the belief in supernatural being and the institutions and Practices associated with these beliefs.)।"

ধর্মের সংজ্ঞায় জেমস জি. ফ্রেজার (James G. Frazer) বলেন, "ধর্ম হলো মানুষের চেয়ে উচ্চতর এমন এক শক্তিতে বিশ্বাস, যা মানবজীবন ও প্রকৃতির ধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে।"

সমাজবিজ্ঞানী ইমিল ডুরখেইম (Emile Durkhaim) এর মতে, "ধর্ম হচ্ছে স্রষ্টার উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত বিশ্বাস ও অনুশীলনের সুষম পদ্ধতি।"

ধর্ম সম্পর্কে গ্লক এবং স্টার্ক ((Glock and Stark) বলেন, "ধর্ম হচ্ছে স্রষ্টার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত উপাসনার রীতি, বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং অনুশীলনের প্রাতিষ্ঠানিক পদ্ধতি যা পারলৌকিক পরিণতি সম্পর্কে বিশ্বাসের ভিত্তিতে পরিচালিত হয় (Religion is a institutionalized system of symbols, beliefs, values and practices focuses on questions of ultimate meanings.)।"

সুতরাং বলা যায়, ধর্ম হলো এমন কতগুলো নিয়মকানুন, আচার-অনুষ্ঠান বা বিশ্বাস, যা মানবজীবনকে সত্য সুন্দর, পবিত্র ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করে। অন্যভাবে বলা যায়, ধর্ম হচ্ছে এমন একটি মানসিক চেতনা যা সর্বশক্তিমান সত্ত্বার উপর মানুষের বিশ্বাস এবং এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে নানা রকম ধর্মীয় রীতিনীতি ও কর্মকান্ডের মধ্য দিয়ে যুগ যুগ ধরে টিকে থাকে।

৪.৫.২ সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে ধর্মের ভূমিকা (Role of Religion in Combating Social Problem):

সামাজিক সমস্যা নিয়ন্ত্রণে ধর্ম তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে। কেননা ধর্ম সমাজে নীতিবোধের প্রকাশ ঘটিয়ে মানুষকে অপরাধমূলক কর্মকান্ড থেকে বিরত রাখে। প্রচলিত অর্থে আইনের যে বাহ্যিক বা আনুষ্ঠানিক শাসন রয়েছে তার তুলনায় ধর্মের নৈতিক মূল্যবোধসমূহ মানুষকে অপরাধমূলক কাজ থেকে বিরত থাকতে অধিক সাহায্য করে। ধর্মের যে নৈতিক ধ্যান ধারণা তা মানুষের সামাজিক নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখে এবং এ উপলব্ধি থেকে সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে ধর্মের ভূমিকা রয়েছে বলে মনে করা হয়। নিচে সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে ধর্মের ভূমিকা আলোচনা করা হলো :

ক) মানসিক নির্ভরশীলতা: ধর্ম দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্য রোগগ্রস্ততা ইত্যাদি থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য পুনঃনিশ্চয়তা প্রদান করে। মানুষ অনেক সময় বিভিন্ন জটিল জীবনে নিপতিত হয়। এ সমস্ত জটিলতা থেকে মানুষ মুক্তি পাবার জন্য ধর্মের আশ্রয় নেয়। ধর্ম মানুষের মানসিক শক্তি ও আনন্দ দান করে। তাই মানুষ বিপদে শক্তি ও সাহস পায়। এ উপলব্ধি মানুষের সমস্যামুক্ত জীবনযাপনে সাহায্য করে।

খ) সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশ: ধর্ম মানুষের সামাজিক মূল্যবোধগুলো বিকশিত করে সমস্যামুক্ত জীবনযাপনে অভ্যস্ত করে তোলে। যেমন– মিথ্যা কথা বলা, দায়িত্বে অবহেলা করা, চুরি করা, মানুষের মনে কষ্ট দেওয়া ইত্যাদি মানুষের সামাজিক মূল্যবোধের পরিপন্থী কাজ। ধর্ম এসব কাজকে ধর্মবিরোধী আখ্যা দেয়। এর ফলে মানুষ সচরাচর এসব কাজে উদ্বুদ্ধ হয় না।

গ) সামাজিক ঐক্য ও শৃঙ্খলা: ধর্ম সমাজজীবনে ঐক্য ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সহায়তা করে। ধর্মীয় বিশ্বাস, শিক্ষা, অনুশাসন ও আচার-অনুষ্ঠান মানুষকে সুসংগঠিত করে এবং তাদেরকে সহিষ্ণু ও সহনশীল করে তোলে। সুতরাং ধর্মের মাধ্যমে সামাজিক বিক্ষোভ, বিশৃঙ্খলা, অসন্তুষ্টি প্রভৃতি দূর হয় এবং বিভিন্ন সমস্যা প্রতিরোধ করা যায়।

ঘ) সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধ: ধর্ম মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ও সম্প্রীতির বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত যাতায়াতের ফলে মানুষের মধ্যে পরিচিতি, সম্পর্ক, বন্ধন, সহানুভূতি, সহযোগিতা, সহমর্মিতা, ভ্রাতৃত্ব, সম্প্রীতি ইত্যাদি গুণাবলি বিকশিত হয়। এসব গুণ সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে সাহায্য করে।

ঙ) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ: সমস্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সামাজিক নিয়ন্ত্রণ তাৎপর্যপূর্ণ। ধর্মীয় বিশ্বাসের কারণে মানুষ অন্যায় ও অসৎ কাজ থেকে বিরত থাকে। রাষ্ট্র ও আইনের চোখ ফাঁকি দিয়ে অনেক সময় অপকর্ম করলেও সৃষ্টিকর্তাকে ফাঁকি দিয়ে কোনো অপকর্ম করা সম্ভব নয়। এ বিশ্বাস ও নীতিবোধ সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

চ) আর্তমানবতার সেবা: আর্তমানবতার সেবায় ধর্ম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ধর্মীয় অনুপ্রেরণাতে মানুষ দুঃস্থ, অসহায়, এতিম, বিধবা, প্রবীণ, অসুস্থ, দরিদ্র প্রভৃতি শ্রেণির সহায়তায় এগিয়ে আসে। এতে পরোক্ষভাবে অনেক সমস্যার সমাধান হয়। আবার সমাজসেবার সাথে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সুসম্পর্ক বিদ্যমান। মসজিদ, মাদ্রাসা, মন্দির, গির্জা, প্যাগোডা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের সাথে সাথে শিক্ষা, সচেতনতা সৃষ্টি, সমাজসংস্কার, সামাজিকীকরণ, মানবিক চাহিদা পূরণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করে, যা প্রকারান্তরে সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে সহায়ক।

ছ) শান্তির নিশ্চয়তা বিধান: ধর্ম পার্থিবজীবন এবং পারলৌকিক জীবন এ দুটো ক্ষেত্রেই শান্তির নিশ্চয়তা বিধান করে। এজন্য ধার্মিক লোকের বৈষয়িক চাহিদা কম যা মানুষকে পরকালের সুন্দর জীবনের জন্য সৎকাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখে। মানুষের জীবনের এই যে নিশ্চয়তা তা সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে ভূমিকা রাখে।

জ) জনকল্যাণ: ধর্ম জনকল্যাণে ব্যাপক অবদান রাখে। সনাতন সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান যেমন– জাকাত, দানশীলতা, ফিতরা, ওয়াক্ফ, দেবোত্তর প্রথা, ধর্মগোলা, দাতব্য চিকিৎসালয়, লঙ্গরখানা, এতিমখানা প্রভৃতি জনকল্যাণ ও সমাজকল্যাণে অনন্য ভূমিকা পালন করে। এরূপ কল্যাণমূলক কর্মকান্ড সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধ করে।

ঝ) অর্থনৈতিক নিরাপত্তা: অর্থনৈতিক নিশ্চয়তার মাধ্যমে মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। ধর্মীয় অনুশাসন পালনের পাশাপাশি ধর্ম অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিযুক্ত হওয়ার জন্যও উৎসাহিত করে, যা সত্যিকার অর্থে দারিদ্র্যমুক্ত হয়ে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার প্রচেষ্টা। মানুষ বিভিন্ন কারণে অপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়তে পারে। ধর্মের প্রায়শ্চিত্তমূলক পদক্ষেপ মানুষকে অপরাধবোধ থেকে মুক্ত করে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনযাপনে সহায়তা করে।

উপর্যুক্ত বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, ধর্ম মানুষের নীতিবোধ ও নৈতিক শিক্ষার উৎস, যা মানুষের আত্মউন্নয়ন ঘটায়। যাতে মানুষ আত্মবিশ্বাসী হয়ে অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পারে। এজন্য ধর্মের অনুসারীরা পবিত্র জীবনের আশায় নিজেদের ভালো কাজ করার প্রেরণা লাভ করে, যা সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সারসংক্ষেপ

ধর্ম একটি মৌলিক ও পুরাতন সামাজিক প্রতিষ্ঠান। প্রাচীন সমাজব্যবস্থায়ও ধর্মের অস্তিত্ব দেখা যায়। আভিধানিক অর্থে ধর্ম বলতে এমন এক বিষয়কে বুঝায়, যা ব্যক্তি ও জাতীয়জীবনে বন্ধন সৃষ্টি করে ও সংহতি আনয়ন করে। আবার সংস্কৃত 'ধৃ' ধাতু হতে ধর্ম প্রত্যয়ের উৎপত্তি। 'ধৃ' অর্থ ধারণ করা। এই অর্থে বলা যায়, মানুষ যা ধারণ করে তা-ই ধর্ম। ধর্ম হলো এমন কতগুলো নিয়মকানুন, আচার-অনুষ্ঠান বা বিশ্বাস, যা মানবজীবনকে সত্য সুন্দর, পবিত্র ও কল্যাণের পথে পরিচালিত করে। সাধারণত ধর্ম হচ্ছে বিশ্বাসগত ব্যাপার, যাতে স্রষ্টাকে সন্তুষ্ট করার জন্য নানাবিধ ক্রিয়াকলাপ সংঘটিত হয়। সামাজিক সমস্যা নিয়ন্ত্রণে ধর্ম তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখে। কেননা ধর্ম সমাজে আইন ও নীতিবোধের প্রকাশ ঘটিয়ে মানুষকে অপরাধমূলক কর্মকান্ড থেকে বিরত রাখে। প্রচলিত অর্থে আইনের যে শাসন রয়েছে তার তুলনায় ধর্মের নৈতিক শাসন বেশি কার্যকর। ধর্ম মানুষের নীতিবোধ ও নৈতিক শিক্ষার উৎস, যা মানুষের আত্মউন্নয়ন ঘটায়। ফলে মানুষ আত্মবিশ্বাসী হয়ে সকল প্রকার অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। Religion শব্দটি কোন শব্দ থেকে এসেছে?

ক) ইংরেজি খ) গ্রিক

গ) ল্যাটিন ঘ) স্প্যানিশ

২। সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে ধর্ম কীভাবে ভূমিকা রাখে-

i. সমাজে আইন ও নীতিবোধের প্রকাশ ঘটিয়ে

ii. মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও ভ্রাতৃত্ববোধের বিকাশ ঘটিয়ে

iii. মানুষের নীতিবোধ ও নৈতিক শিক্ষার উন্নয়ন ঘটিয়ে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.৬ ধর্মীয় মূল্যবোধ গঠনে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ (Intervention of Social worker in Forming Religious Values)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৪.৬.১ ধর্মীয় মূল্যবোধ গঠনে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৪.৬.১ ধর্মীয় মূল্যবোধ গঠনে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ (Intervention of Social Worker in Forming Social Values)

সাধারণভাবে ধর্মীয় অনুশাসন এবং নির্দেশনার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বিশ্বাস, রীতিনীতি, আদর্শ, দর্শন, ধ্যানধারণা, আচার-আচরণ, মতামত ইত্যাদির সমষ্টিকে ধর্মীয় মূল্যবোধ বলা হয়। সকল ধর্মের মূল্যবোধগুলো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও মানবকল্যাণে নিবেদিত। যার মধ্যে মানবীয় মর্যাদার মূল্য ও স্বীকৃতি, সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য, পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা, শ্রমের মর্যাদা, সামাজিক সাম্য ও ন্যায়বিচার, মানবতার সেবা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সামাজিক মূল্যবোধ গঠনের জন্য সমাজকর্মী যেসব মৌলিক কৌশল ব্যবহার করতে পারেন তার মধ্যে অন্যতম হলো সমাজকর্ম হস্তক্ষেপ কৌশল।

সমাজকর্ম পেশা কর্তৃক নির্ধারিত ও স্বীকৃত জ্ঞান, মূল্যবোধ ও কলাকৌশলের ভিত্তিতে সমাজকর্মী কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম হচ্ছে সমাজকর্ম হস্তক্ষেপ। সমাজকর্মীকে প্রথমে ধর্মীয় মূল্যবোধ গঠনের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও এজেন্সির সঙ্গে একটি লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হতে হবে এবং একটি সুপরিকল্পিত কর্মকাঠামো তৈরি করতে হবে। সামাজিক মূল্যবোধ গঠন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, ধর্মীয় বিশ্বাস, ধর্মীয় অনুশাসন, পারলৌকিকতা, ন্যায়বোধ, মানবতা প্রভৃতি বিষয় পর্যবেক্ষণ ও বিবেচনায় আনতে হবে। তাছাড়া সমাজের মূল্যবোধ ব্যবস্থা এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ গঠন সংক্রান্ত বিষয়ে সামাজিক গবেষণা পরিচালনা করে এক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাগুলো চিহ্নিত করতে হবে।

বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করলেই সমাজকর্মী ধর্মীয় মূল্যবোধের গঠনের ক্ষেত্রে সমস্যা ও করণীয় সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পাবে। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও পরিবারিক নিয়ন্ত্রণহীনতা, ধর্মীয় বিশ্বাস ও অনুশাসনের প্রতি অশ্রদ্ধা, ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা ও ব্যক্তিগত/রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য ধর্মকে একটা ঢাল হিসেবে অপব্যবহার, ন্যায় ও মানবতা-বিবর্জিত মানসিকতা, ভারসাম্যহীন সামাজিক ব্যবস্থা, বস্তুবাদী ও ভোগবাদী চিন্তাভাবনা, নৈতিক অধঃপতন, সামাজিক ভাঙন ও বিচ্ছিন্নতা, প্রভৃতি ধর্মীয় মূল্যবোধ গঠনে প্রতিবন্ধক হিসেবে বিবেচিত হতে পারে।

ধর্মের মানবতাবাদী আহ্বানকে কাজে লাগিয়ে ধর্মীয় মূল্যবোধ গঠনে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সমাজকর্মী ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি সমাজকর্মী পদ্ধতি প্রয়োগের পাশাপাশি সামাজিক কার্যক্রম প্রক্রিয়াকে কাজে লাগাতে পারে। ব্যক্তি পর্যায়ে সামাজিক মূল্যবোধ গঠনে সমাজকর্মী ব্যক্তির অন্তর্নিহিত ও সুপ্ত ক্ষমতাকে ব্যাবহার করে সামাজিক শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মীয় মূল্যবোধ গঠনে পরিবার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সমাজব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হিসেবে কাজ করে, তাই ব্যক্তিজীবন থেকে শুরু করে পরিবার ও সমাজ সর্বক্ষেত্রে ধর্মীয় মূল্যবোধ গঠনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য সমাজকর্মীকে স্থানীয় নেতৃত্ব ও প্রভাবশালী মহলকে নিয়ে কাজ করতে হয়। তাই এর পক্ষে জনমত সৃষ্টি করতে হয়। সমাজকর্মীকে সভাসমিতি, সেমিনার, বক্তৃতা, রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা, পোস্টার, মুক্ত আলোচনা ইত্যাদির সাহায্যে জনসচেতনতা সৃষ্টি করে ইতিবাচক ধর্মীয় মূল্যবোধ গঠনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হয়।

সমাজকর্ম অনুশীলনধর্মী (practice oriented) সামাজিক বিজ্ঞান যার অন্যতম পদ্ধতি হলো ব্যক্তি সমাজকর্ম, দল সমাজকর্ম, সমষ্টি সংগঠন ও সামাজিক কার্যক্রম। উক্ত সকল পদ্ধতিতেই ধর্মীয় মূল্যবোধের ব্যবহার হয়ে থাকে। বিশেষ করে সমষ্টি সংগঠন ও সামাজিক কার্যক্রমে সামাজিক আন্দোলন পরিচালনায় স্থানীয় এলাকায় অনুসৃত ধর্মীয় মূল্যবোধ অনুসরণ প্রয়োজন হয়ে থাকে। যেমন– দুর্নীতি, যৌতুক, নারীনির্যাতন, বাল্যবিবাহ, এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি ও সামাজিক আন্তঃক্রিয়ার প্রয়োজন হয়। এ ধরণের হস্তক্ষেপে প্রয়োজন অনুযায়ী সামাজিক মূল্যবোধ গঠন করা হয়। বলা হয় মূল্যবোধের অভাবে সামাজিক আন্তঃক্রিয়া ব্যবস্থা বিপজ্জনক, কঠিন ও বিশৃঙ্খল রুপ

ধারণ করে। তাই ধর্মীয় মূল্যবোধকে কাজে লাগিয়ে ইতিবাচক সামাজিক মূল্যবোধ গঠনে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ কৌশল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উপর্যুক্ত কৌশলগুলো অবলম্বন করে সমাজকর্মী, আন্তঃব্যক্তিক ও পরিবেশগত হস্তক্ষেপের মাধ্যমে সামাজিক মূল্যবোধ গঠনের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে সামাজিক সচেতনা সৃষ্টি করে থাকেন।

সারসংক্ষেপ

সাধারণভাবে ধর্মীয় অনুশাসন এবং নির্দেশনার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা বিশ্বাস, রীতিনীতি, আদর্শ, দর্শন, ধ্যানধারণা, আচার-আচরণ, মতামত ইত্যাদির সমষ্টিকে ধর্মীয় মূল্যবোধ বলা হয়। সকল ধর্মের মূল্যবোধগুলো ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা ও মানবকল্যাণে নিবেদিত যার মধ্যে মানবীয় মর্যাদা মূল্যের স্বীকৃতি, সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য, পারস্পরিক সাহায্য ও সহযোগিতা, শ্রমের মর্যাদা, সামাজিক সাম্য ও ন্যায়বিচার, মানবতার সেবা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ধর্মীয় অনুশাসনের ইতিবাচক ব্যবহারের মাধ্যমে সামাজিক মূল্যবোধ গঠনের জন্য সমাজকর্মী যেসব মৌলিক কৌশল ব্যবহার করেন তার মধ্যে অন্যতম হলো সমাজকর্ম হস্তক্ষেপ কৌশল। সমাজকর্মী আন্তঃব্যক্তিক ও পরিবেশগত হস্তক্ষেপের মাধ্যমে মূল্যবোধ গঠনের প্রয়োজনীয়তার ব্যাপারে সামাজিক সচেতনা সৃষ্টি করে সামাজিক মূল্যবোধ গঠনে সহযোগিতা করে থাকেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। কোনটি অনুশীলনধর্মী (practice oriented) সামাজিক বিজ্ঞান?

ক) সমাজকর্ম খ) সমাজবিজ্ঞান
গ) অর্থনীতি ঘ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান

২। সমাজকর্মের যেসকল পদ্ধতিতে ধর্মীয় মূল্যবোধের ব্যবহার হয়ে থাকে–

i. ব্যক্তি সমাজকর্ম
ii. সমষ্টি সংগঠন
iii. সামাজিক কার্যক্রম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.৭ গণমাধ্যমের ধারণা, ধরন ও সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে গণমাধ্যমের ভূমিকা (Concept, Types and the Role of Mass Media in Preventing Social Problem)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৪.৭.১ গণমাধ্যম্যের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৪.৭.২ গণমাধ্যম্যের ধরন বর্ণনা করতে পারবেন।
৪.৭.৩ সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে গণমাধ্যমের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৪.৭.১ গণমাধ্যম্যের ধারণা (Concept of Mass Media)

গণমাধ্যমের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো 'Mass Media'। ইংরেজি 'Mass' শব্দের অর্থ গণ বা বৃহৎ জনগোষ্ঠী এবং 'Media' শব্দের অর্থ মাধ্যম বা বাহন। অতএব, শব্দগত অর্থে Mass Media হচ্ছে যে মাধ্যমে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হয় অথবা সংবাদ পৌঁছায় বা সম্পর্কের উন্নতি হয়।

সাধারণ অর্থে গণমাধ্যম বলতে জনগণের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমকে বুঝায়। অন্যভাবে বলা যায়, গণমাধ্যম হচ্ছে এমন একটি উপায় যার মাধ্যমে সমাজের ব্যাপক সংখ্যক মানুষের সাথে আন্তঃযোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। গণমাধ্যমের ভিত্তি হচ্ছে ভাষা। ভাষা ছাড়া যোগাযোগ অসম্ভব। যেমন– বইপুস্তক, সাময়িকী, বেতার, টেলিভিশন, চলচ্চিত্র ইত্যাদি। সুতরাং, ভাষাভিত্তিক যে যোগাযোগের মাধ্যমে সমাজের অসংখ্য মানুষের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হয় এবং তথ্যের আদানপ্রদান হয় তাই গণমাধ্যম।

গণমাধ্যমের ধারণায় সমাজবিজ্ঞানী B. Bhusan (১৯৮৯) বলেন, "গণমাধ্যম প্রত্যয়টি যোগাযোগের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত যে কোনো উপায়কে বোঝায়, যার মাধ্যমে কোনো তথ্য ব্যাপক সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে (Mass media is the concept used for any means of instrument of communication which is reaching large number of people like books, periodicals radio, television and motion picture.)।" M. C. Forland গণমাধ্যমের ধারণা দিতে গিয়ে বলেন, "গণমাধ্যম হচ্ছে জনগণের মধ্যে কোনো কিছুর অর্থ সম্পর্কে অনুভূতি সঞ্চার করা এবং ভাব বা ধারণার প্রেরণ প্রক্রিয়া।"

D.S Mehta বলেন, "একই সময়ে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর নিকট সংবাদ, ধ্যানধারণা, বিনোদন প্রভৃতি পরিবেশন করাকে গণমাধ্যম হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।"

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণের আলোকে বলা যায়, গণমাধ্যম হচ্ছে যোগাযোগের এমন একটি উপায় যার মাধ্যমে সমাজের অধিকাংশ মানুষের মধ্যে একটি সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং তথ্যের আদানপ্রদান করা হয়। গণযোগাযোগের কাজে ব্যবহারের জন্য যে মাধ্যম তা হলো গণমাধ্যম। অগণিত পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন, চলচ্চিত্রের সমন্বয়ই গণমাধ্যম।

৪.৭.২ গণমাধ্যমের ধরন (Types of Mass Media)

আধুনিক সমাজে তিন ধরনের গণমাধ্যম রয়েছে। যথা–

১। মুদ্রিত গণমাধ্যম; যেমন– সংবাদপত্র, বই, জার্নাল, ম্যাগাজিন, লিফলেট ইত্যাদি।
২। ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম; যেমন– চলচ্চিত্র, রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট ইত্যাদি।
৩। অপ্রত্যক্ষ গণমাধ্যম; যেমন– সংবাদ সংস্থাসমূহ, সাংবাদিক সংঘ, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি।

নিচে বর্তমান যুগে প্রচলিত গণমাধ্যমসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হলো:

৪.৭.২.১ পত্র-পত্রিকা (Papers-journals): আধুনিক গণমাধ্যমের সর্বাধিক প্রভাবশালী উপাদান হচ্ছে পত্র-পত্রিকা। এর চাহিদা, উপযোগিতা, গ্রহণযোগ্যতা ও জনপ্রিয়তা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। জানা যায় চীনারা সর্বপ্রথম সংবাদপত্র ব্যবহার করতো। উপমহাদেশের প্রথম বাংলা সংবাদপত্রের নাম 'সমাচার দর্পণ' ১৮১৮ সালে প্রকাশিত হয়। পত্র-পত্রিকা হচ্ছে সমাজের দর্পণ। প্রতিদিন সমাজে যা কিছু ঘটে তাই পত্রিকার পাতায় সাজানো থাকে। তথ্য সরবরাহ, জনমত গঠন,

মানুষের মতামত প্রকাশ, সত্য উপস্থাপন ইত্যাদি ক্ষেত্রে পত্র পত্রিকা অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভূমিকা পালন করে। পত্র-পত্রিকা সামাজিক ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ দলিল। বলা যেতে পারে, একটি পূর্ণাঙ্গ পত্রিকার পাতায় চোখ বুলালে সমগ্র সমাজ-সংস্কৃতি সম্পর্কে অতি সহজেই ধারণা লাভ করা যায়। তাই পত্র-পত্রিকাকে 'সমাজের দর্পণ' বলে উল্লেখ করা যেতে পারে।

৪.৭.২.২ বেতার (Radio): গণমাধ্যমের আরো একটি শক্তিশালী উপাদান হচ্ছে রেডিও। ইলেকট্রনিক এই সামগ্রীর সাথে পরিচিত নয় এমন মানুষ বিরল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে রেডিওর প্রচলন হয়। Wikipedia, "*The Free Encyclopedia*" এর তথ্যানুযায়ী, ১৯৩৯ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ বেতার স্থাপন করা হয়। বর্তমানে এটি চিত্তবিনোদন, সংবাদ পরিবেশন, সচেতনতা সৃষ্টি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষিবিষয়ক অসংখ্য অনুষ্ঠান প্রচার করছে। মানুষের মধ্যে রেডিওর প্রভাব অপরিসীম। অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন চ্যানেলে পরিবেশিত অনুষ্ঠানমালা এবং পরিবেশিত সংবাদ ও তথ্যপ্রবাহ গণমাধ্যমের শক্তিশালী উপাদান হিসেবে কাজ করে। সম্প্রতি এফ.এম. রেডিও এক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে।

৪.৭.২.৩ টেলিভিশন (Television): গণমাধ্যমের অন্যতম শক্তিশালী বাহন হচ্ছে টেলিভিশন। বিংশ শতাব্দীর ত্রিশের দশকে এটি যাত্রা করে আজ সমগ্র বিশ্বের জনপ্রিয় গণমাধ্যম হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। Wikipedia, "*The Free Encyclopedia*" এর তথ্যানুযায়ী, ১৯৬৪ সালের ২৫ ডিসেম্বর বাংলাদেশ টেলিভিশন স্থাপিত হয় এবং ১৯৮০ সালে দেশে রঙিন টেলিভিশন চালু হয়। স্যাটেলাইটের এ যুগে টেলিভিশনের আবেদন ও উপযোগিতা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। মানুষ খুব সহজেই বিশ্বকে দেখতে পায় তার ড্রয়িং রুমে বসে। শিক্ষা, সচেতনতা, জনমত গঠন ইত্যাদি ক্ষেত্রে টেলিভিশন সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। টেলিভিশন হচ্ছে একটি প্রতিষ্ঠান। সমাজস্থ মানুষের খুব কাছের একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে এর সাথে মানুষের সখ্যতা রয়েছে। তাই সমাজে এর প্রভাব ও প্রয়োজনীয়তা অতুলনীয়।



চিত্র ৪.৭.১ : গণমাধ্যম হিসেবে টেলিভিশন

৪.৭.২.৪ চলচ্চিত্র (Cinema): গণমাধ্যমের অন্যতম আধুনিক উপাদান হচ্ছে চলচ্চিত্র। Wikipedia, "*The Free Encyclopedia*" এর তথ্যানুযায়ী, বিশ্বে চলচ্চিত্রের যাত্রা শুরু হয় ১৮৯০ সালে। ১৯২৭-২৮ সালে ঢাকার নওয়াব পরিবারের কয়েকজন তরুণ মিলে সুকুমারী নামক চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। ১৯৫৬ সালে মুখ ও মুখোশ নামক পূর্ণদৈর্ঘ্য সবাক চলচ্চিত্র নির্মান করেন আবদুল জব্বার খান। সুনির্দিষ্ট গল্প-কাহিনী নির্ভর চলচ্চিত্র কিংবা প্রামাণ্যচিত্র মানবসমাজে গভীরভাবে প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। এখানে সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ইত্যাদি চমৎকারভাবে পরিবেশন করা হয়। অন্য যে কোনো মাধ্যম অপেক্ষা চলচ্চিত্র মানুষকে অধিকতর প্রভাবিত করে।

৪.৭.২.৫ ইন্টারনেট (Internet): গণমাধ্যমের সাম্প্রতিক ও সর্বাধুনিক বাহন হচ্ছে ইন্টারনেট। ইন্টারনেটের মাধ্যমে তথ্যপ্রবাহে নবযুগের সূচনা ঘটেছে। ইন্টারনেটের বিস্ময়কর যাদুর স্পর্শে আমরা আজ ঘরে বসেই সারা বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহ শোনা, দেখা ও তথ্যের আদানপ্রদান করতে পারছি। আবার ইন্টারনেটে বিখ্যাত লাইব্রেরির বইপুস্তক, গবেষণাগ্রন্থ, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদি পড়ার চমৎকার সুযোগ রয়েছে। Wikipedia, "*The Free Encyclopedia*" এর তথ্যানুযায়ী, ইন্টারনেটের আবিষ্কার ১৯৬০ সালের শেষের দিকে এবং বাংলাদেশে ১৯৯৫ সালে অফলাইন ই-মেইল এর মাধ্যমে সীমিত আকারে ইন্টারনেটের ব্যবহার শুরু হয়। বিশ্বের অগণিত মানুষ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েছে ইন্টারনেটের কল্যাণে, ইন্টারনেট বিশ্বকে অনেক ছোট ও গতিশীল করে তুলেছে। ইন্টারনেট বহুবিধ সুবিধা প্রদান করে বদলে দিয়েছে আমাদের জীবনযাত্রাকে।

৪.৭.৩ সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে গণমাধ্যমের ভূমিকা (Role of Mass Media in Preventing Social Problem):

আধুনিক সমাজের একটি প্রভাবশালী এবং বহুল ব্যবহৃত প্রত্যয় হচ্ছে গণমাধ্যম। গণমাধ্যম মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। জনগণ তথা সমাজের সাথে এর অধিক সম্পৃক্ততার কারণে সমাজদেহে সৃষ্ট বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা

প্রতিরোধের ক্ষেত্রে গণমাধ্যম অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। নিম্নে সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে গণমাধ্যমের ভূমিকা আলোচনা করা হলো:

ক) সামাজিক আচরণে পরিবর্তন আনয়ন: বর্তমান যুগ হলো গণমাধ্যমের যুগ। বিভিন্ন গণমাধ্যম যেমন– সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি মানুষের সামাজিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এর মাধ্যমে সামাজিক আদর্শ, মূল্যবোধ, বিভিন্ন রকম সংস্কার ও বিশ্বাস মানুষের আচরণে স্থায়িত্ব লাভ করে, যা মানুষকে নৈতিক পথে ধাবিত করে এবং সামাজিক সমস্যা ও কুপ্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মনোভাব গড়ে তুলতে সাহায্য করে এবং আদর্শ মানুষের অনুসরণে সমস্যামুক্ত জীবনযাপনে সক্ষম করে তোলে।

খ) জনমত গঠন: গণমাধ্যম জনমত গঠনের শক্তিশালী বাহন। সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের মাধ্যমে অন্যায়, অপরাধ, দুর্নীতি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি, নারী নির্যাতন ইত্যাদি সামাজিক সমস্যা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তুলতে এবং প্রতিরোধে প্রবল জনমত গড়ে তুলতে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। উদাহরণস্বরুপ বলা যায়, কিছুদিন পূর্বে ইভটিজিং নামক সামাজিক ব্যাধি সমাজে ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। এর বিরুদ্ধে প্রবল জনমত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গণমাধ্যম কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। যার ফলে এর মাত্রা অনেক কমে এসেছে।

গ) সামাজিক ঐক্য ও সম্প্রীতি স্থাপন: সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা, ঐক্য ও সংহতি স্থাপনে গণমাধমের ভূমিকা ও গুরুত্ব অপরিসীম। মূলত গণমাধ্যম মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, মূল্যবোধ, আচরণ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে সমাজে শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। তাছাড়া নাগরিকদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলে গণমাধ্যম। যা সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে ভূমিকা পালন করে।

ঘ) জনসংখ্যা বিস্ফোরন রোধ: গণমাধ্যম পরিকল্পিত পরিবার গঠনে জনগণকে অনুপ্রাণিত করে জনসংখ্যা সমস্যা প্রতিরোধে ভূমিকা পালন করে।

ঙ) দুর্যোগ মোকাবিলা: জরুরি অবস্থা মোকাবিলায় গণমাধ্যমের ভূমিকা অগ্রগণ্য। বর্তমানে দুর্যোগের আগাম বার্তা প্রচারের মাধ্যমে গণমাধ্যম দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমের সুষ্ঠু বাস্তবায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে।

চ) চিত্তবিনোদনের মাধ্যম: চিত্তবিনোদনের মাধ্যম হিসেবেও গণমাধ্যম ব্যবহৃত হয় যা ক্লান্তি, হতাশা ও অশান্তি দূর করে দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

ছ) জনসচেতনতা সৃষ্টি: গণমাধ্যম মানুষের বিভিন্নমুখী শিক্ষা প্রদান করে তাদের সচেতন ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলে যেমন– গণশিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা, সামাজিক শিক্ষা প্রভৃতি সম্প্রসারনের মাধ্যমে সাহায্য করে। মাদকদ্রবের অপব্যবহার প্রতিরোধে গণমাধ্যম ভূমিকা পালন করে। বয়ঃসন্ধিকালের সমস্যা সমাধানে গণমাধ্যম বিভিন্ন প্রচারণার মাধ্যমে ভূমিকা রাখে। অপরাধ ও কিশোর অপরাধ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করে গণমাধ্যম। স্বাস্থ্যহীনতা একটি মারাত্মক সামাজিক সমস্যা। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন প্রতিরোধ করে সুস্থ সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে গণমাধ্যমের ভূমিকা অগ্রগণ্য।

জ) অপরাধ দূরীকরণে আইন প্রণয়ন ও আইনের বাস্তবায়ন: মাদকাসক্তি প্রতিরোধে গণমাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। বিভিন্ন গণমাধ্যম যেমন– পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ইত্যাদি মাদকাসক্তের কুফল সম্পর্কে প্রচারণা চালিয়ে জনগণকে সচেতন করে তুলতে পারে। মাদকাসক্তি দূরীকরণে দেশের বিদ্যমান আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন এবং প্রয়োজনবোধে নতুন আইন প্রণয়নের জন্য সরকারের ওপর গণমাধ্যম চাপ সৃষ্টি করতে পারে। বিভিন্ন গণমাধ্যম যেমন– পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ইত্যাদি মাদকাসক্তের কুফল সম্পর্কে প্রচারণা চালিয়ে জনগণকে সচেতন করে তুলতে পারে।

ঝ) যৌতুক নিরোধ: যৌতুক একটি জঘন্যতম ও ঘৃণ্যতম প্রথা। যৌতুকের অভিশাপ থেকে সমাজকে সুরক্ষায় গণমাধ্যম কার্যকর অবদান রাখতে পারে। যৌতুক বিরোধী সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি, যৌতুক বিরোধী অইনের যথাযথ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন, যৌতুক দাবীকারীদের সামাজিকভাবে বয়কট করার প্রবণতা সৃষ্টি করে গণমাধ্যম যৌতুক সমস্যা প্রতিরোধে অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

ঞ) নারী ও শিশু পাচার রোধ: নারী ও শিশু পাচার রোধেও গণমাধ্যম শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারে। যেখানে প্রতিকারহীন শক্তির অপরাধে বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে, সেখানেই গণমাধ্যমের নির্ভীক উচ্চারণ ধ্বনিত হয়। দেশের নারীদের সার্বিক অবস্থা তুলে ধরে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, নারীশিক্ষা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি করে নারীমুক্তিতে গণমাধ্যম তার বলিষ্ঠ অবদান রাখে।

এছাড়া গণমাধ্যম নাগরিক স্বার্থ সংরক্ষণ, জাতিগত সমস্যা নিরসন, মানসিক ও সামাজিক প্রয়োজন পূরণ, মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সামাজিক আইনের যথাযথ প্রয়োগ ইত্যাদির মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

সারসংক্ষেপ

গণমাধ্যম বলতে জনগণের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমকে বুঝায়। অন্যভাবে বলা যায়, গণমাধ্যম হচ্ছে এমন একটি উপায় যার মাধ্যমে সমাজের ব্যাপকসংখ্যক মানুষের সাথে একটি আন্তঃযোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। গণমাধ্যমের ভিত্তি হচ্ছে ভাষা। ভাষা ছাড়া যোগাযোগ অসম্ভব। সুতরাং ভাষাভিত্তিক যোগাযোগের মাধ্যমে সমাজের অসংখ্য মানুষের মধ্যে যে সম্পর্ক তৈরি হয় এবং তথ্যের আদানপ্রদান হয় তাই গণমাধ্যম। আধুনিক সমাজে তিন ধরনের গণমাধ্যম রয়েছে। যথা– ক) মুদ্রিত গণমাধ্যম, যেমন– সংবাদপত্র, বই, জার্নাল, ম্যাগাজিন, লিফলেট ইত্যাদি, খ) ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম, যেমন– চলচ্চিত্র, রেডিও, টেলিভিশন, ইন্টারনেট ইত্যাদি গ) অপ্রত্যক্ষ গণমাধ্যম, যেমন– সংবাদ সংস্থাসমূহ, সাংবাদিক সংঘ, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি। আধুনিক সমাজের একটি প্রভাবশালী এবং বহুল ব্যবহৃত প্রত্যয় হচ্ছে গণমাধ্যম। গণমাধ্যম মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। জনগণ তথা সমাজের সাথে এর অধিক সম্পৃক্ততার কারণে সমাজদেহে সৃষ্ট বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধের ক্ষেত্রে গণমাধ্যম অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। গণমাধ্যম নাগরিক স্বার্থ সংরক্ষণ, জাতিগত সমস্যা নিরসন, মানসিক ও সামাজিক প্রয়োজন পূরণ, মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, সামাজিক আইনের যথাযথ প্রয়োগ ইত্যাদির মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার মাধ্যম কোনটি?

ক) গণমাধ্যম   খ) সামজিক কার্যক্রম

গ) সামজিক আন্দোলন   ঘ) ধর্ম

২। বাংলাদেশে রঙিন টেলিভিশন চালু হয় কত সালে?

ক) ১৯৭০ সালে   খ) ১৯৭৫ সালে

গ) ১৯৮০ সালে   ঘ) ১৯৮৫ সালে

পাঠ-৪.৮ গণমাধ্যমের ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ (Intervention of Social Worker in Developing the Role of Mass Media)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৪.৮.১ গণমাধ্যমের ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৪.৮.১ গণমাধ্যমের ভূমিকা উন্নয়নে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ (Intervention of Social Worker in Developing the Role of Mass Media)

গণমাধ্যম আধুনিক বিশ্বে যোগযোগের গুরুত্বপূর্ণ বাহন। এগুলোতে নিজস্ব সমাজ-সংস্কৃতিসহ বহির্বিশ্বের জীবনচিত্রের প্রতিফলন ঘটে যা পাঠক, দর্শক ও শ্রোতাদের প্রতীকীমূলক ভাবের আদানপ্রদান হয়। এসব ভাবের আদানপ্রদান সকল শ্রেণির মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। যেমন– বস্তুনিষ্ট সংবাদ পরিবেশনা, রুচিসম্মত অনুষ্ঠান প্রচার, নির্মল বিনোদন আয়োজন প্রভৃতি। যদি এগুলোর ব্যত্যয় ঘটে তাহলে সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাই তাদের যথাযথ ভূমিকা পালনে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়।

গণমাধ্যমকে বলা হয় সমাজের দর্পণ। সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গণমাধ্যমের ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। বর্তমানে বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে গণমাধ্যম তার যথার্থ ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হচ্ছে আর এ অবস্থা উত্তরণে সমাজকর্মী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন। সমাজকর্মী তার পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা ও নৈপূণ্যকে কাজে লাগিয়ে গণমাধ্যমের ভূমিকা উন্নয়নের ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রতিবন্ধকতাগুলো দূর করে সঠিক ভূমিকা পালনে সক্ষম করে তোলার ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ কৌশল অবলম্বন করেন।

সমাজকর্মী প্রথমে কার্যক্ষেত্রে একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হবেন এবং গণমাধ্যমের ভূমিকা উন্নয়নে একটি সুপরিকল্পিত কর্মকাঠামো তৈরি করবেন। গণমাধ্যম সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের জন্য বিভিন্ন ব্যক্তি, সংস্থা, প্রতিষ্ঠান ও মাধ্যমের সাথে যোগাযোগ করবেন। এক্ষেত্রে মানবাধিকার সংস্থা, মিডিয়াকর্মী, গণমাধ্যমের ভূমিকা উন্নয়নে নিয়োজিত সংগঠন, গণমাধ্যমের উন্নয়নে পরিচালিত গবেষণা প্রতিবেদনসহ বিভিন্ন উৎস পর্যালোচনা করে বিদ্যমান বিভিন্ন প্রতিকূলতা চিহ্নিত করবেন।

সরকার ও বিভিন্ন সরকারি সংস্থার নিয়ন্ত্রণ আরোপ, নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের আনুগত্য, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব, দক্ষ জনশক্তির অভাব, তথাকথিত গডফাদারদের হুমকি, গণমাধ্যম কর্মীদের নিরাপত্তাহীনতা, বস্তুনিষ্ঠতার অভাব প্রভৃতিকে গণমাধ্যমের ভূমিকা উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

গণমাধ্যমের ভূমিকা উন্নয়নে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মী দল সমাজকর্ম ও সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতির পাশাপাশি সামাজিক কার্যক্রম প্রক্রিয়াকে কাজে লাগাতে পারেন। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীকে সভাসমিতি, সেমিনার, বক্তৃতা, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা, পোস্টারিং, মুক্ত আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করে গণমাধ্যমের ভূমিকা উন্নয়নের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, আইনবিদ, সুশীলসমাজ, নীতি নির্ধারক, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, মানবাধিকার সংস্থা, সামাজিক সংগঠনসহ বিভিন্ন পেশা ও সংস্থার প্রতিনিধিদের সমর্থনে গণমাধ্যমের উন্নত ভূমিকা পালনে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সমাজকর্মী অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

সারসংক্ষেপ

গণমাধ্যম আধুনিক বিশ্বে যোগযোগের গুরুত্বপূর্ণ বাহন। এগুলোতে নিজস্ব সমাজ-সংস্কৃতিসহ বহির্বিশ্বের জীবনচিত্রের প্রতিফলন ঘটে যা পাঠক, দর্শক ও শ্রোতাদের প্রতীকীমূলক ভাবের আদানপ্রদান হয়। এসব ভাবের আদানপ্রদান সকল শ্রেণির মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করে। এক্ষেত্রে গণমাধ্যমের সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য রয়েছে। যেমন– বস্তুনিষ্ট সংবাদ পরিবেশনা, রুচিসম্মত অনুষ্ঠান প্রচার, নির্মল বিনোদন আয়োজন প্রভৃতি। যদি এগুলোর ব্যত্যয় ঘটে তাহলে

সমস্যার সৃষ্টি হয়। তাই তাদের যথাযথ ভূমিকা পালনে সমাজকর্মীর হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়। সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, আইনবিদ সুশীল সমাজ, নীতি নির্ধারক, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, মানবাধিকার সংস্থা, সামাজিক সংগঠনসহ বিভিন্ন পেশা ও সংস্থার প্রতিনিধিদের সমর্থনে গণমাধ্যমের উন্নত ভূমিকা পালনে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সমাজকর্মী অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। সমাজের দর্পণ বলা হয় কোনটিকে ?

ক) সংস্কৃতি　　খ) গণমাধ্যম
গ) সমাজ সংস্কার　　ঘ) ধর্ম

২। গণমাধ্যমের প্রতিবন্ধকতাগুলো হলো–

i. সরকার ও বিভিন্ন সরকারি সংস্থার নিয়ন্ত্রণ আরোপ
ii. স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাব
iii. গণমাধ্যম কর্মীদের নিরাপত্তাহীনতা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii　　খ) i ও iii
গ) ii ও iii　　ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.৯ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ধারণা ও ধরন এবং সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকা (Concepts and Types of Law Enforcement Agency and the Role of Law Enforcement Agency to Combat Social Problem)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৪.৯.১ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কী তা বলতে পারবেন।
৪.৯.২ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ধরনসমূহ লিখতে পারবেন।
৪.৯.৩ সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

৪.৯.১ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ধারণা (Concept of Law Enforcement Agency)

সাধারণভাবে বলা যায়, দেশের প্রচলিত আইনের প্রতিষ্ঠা এবং প্রয়োগের জন্য যে সংগঠনগুলো নিবেদিতপ্রাণ তাদেরকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বলা হয়।

Burton's Legal Theasaurus Dictionary (২০০৭) এর ভাষ্য অনুযায়ী, "স্থানীয় রাজ্য অথবা জাতীয় সরকার দ্বারা অনুমোদিত একটি সংস্থা যা আইন প্রয়োগ করে এবং আইন ভঙ্গকারীদের গ্রেফতার করে (A body sanction by local, state or national government to enforce laws and apprehend those who break them.)।"

Word Net 30 এর সংজ্ঞানুযায়ী, "আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হলো এমন একটি সংস্থা যা অপরাধ তদন্তের ব্যাপারে বিশেষভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত (Law enforcement agency's an agency responsible to insure obedience to the laws.)।"



চিত্র ৪.৯.১ : বিভিন্ন আইন প্রয়োগকারী সংস্থা

Wikipedia ত বলা হয়েছে, "আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হলো এমন একটি সংস্থা যা আইনকে প্রয়োগ করে। এটা স্থানীয়, রাজ্য বা ফেডারেল সংস্থা হতে পারে।" যেমন– সিআইডি। এটা আরো বুঝাতে পারে জাতীয় পুলিশ বাহিনীকে, তাছাড়া আরো বুঝাতে পারে কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থাকে, যেমন– ইন্টারপোল, ইউরোপোল ইত্যাদি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান (ধারা ১৫২[১]) অনুসারে, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী অর্থ (ক) স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনী (খ) পুলিশ বাহিনী (গ) আইনের দ্বারা এ সংজ্ঞার অন্তর্গত বলে ঘোষিত যেকোনো শৃঙ্খলা বাহিনীকে বোঝানো হয়েছে।

উপর্যুক্ত সংজ্ঞাগুলোর আলোকে বলা যায়, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হলো এমন একটি সরকারি সংস্থা যা একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার প্রচলিত আইন প্রয়োগের ব্যাপারে ক্ষমতাবান, অপরাধ তদন্ত এবং জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত, যাদের রয়েছে এমন কিছু ক্ষমতা যা অন্য সরকারি সংস্থা ভোগ করে না। যেমন– কোনো কিছু অনুসন্ধান, আটক এবং বাধাগ্রস্ত করার ক্ষমতা।

৪.৯.২ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ধরন (Types of Law Enforcement Agencies)

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ক্ষমতা একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। কার্যক্রমের ধরন অনুযায়ী আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে পৃথক করা যায়। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা স্থানীয়, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক হতে পারে।

বিভিন্ন দেশ তাদের অবস্থান অনুযায়ী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার শ্রেণিবিন্যাস করে থাকে। বাংলাদেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা প্রধানত চার ধরণের। যথা:

(১) বাংলাদেশ পুলিশ (Bangladesh Police);
(২) বাংলাদেশ আনসার (Bangladesh Ansar);
(৩) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড (Bangladesh Coast Guard);
(৪) গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী (Village Defence Party)।

(১) বাংলাদেশ পুলিশ (Bangladesh Palice): বাংলাদেশের প্রধান আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হলো বাংলাদেশ পুলিশ। এটা বাংলাদেশ সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচলিত হয়। এটি বাংলাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবায়নে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদিও পুলিশ প্রধানত আইন ও আদেশ বাস্তবায়ন এবং জনগণের জানমালের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত, তবুও অপরাধ বিচার ব্যবস্থায়ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ পুলিশের কতগুলো শাখা রয়েছে। যেমন–

- র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটিলিয়ন বা র‍্যাব (Rapid Action Battalian) RAB
- বিশেষ মহিলা পুলিশ বাহিনী (Special Women Police Contingent)
- বিমানবন্দর সশস্ত্র পুলিশ (Airport Armed Police)
- জেলা পুলিশ (District Police)
- মেট্রোপলিটন পুলিশ (Metropoliton Police)
- গোয়েন্দা শাখা বা ডিবি (Detective Branch) DB
- বিশেষ অস্ত্র ও কৌশল ইউনিট বা সোয়াট (Special Weapons and Tactics) SWAT
- ট্রাফিক পুলিশ (Traffic Police)
- বিশেষ শাখা বা এসবি (Special Branch) SB
- অপরাধ তদন্ত বিভাগ বা সিআইডি (Criminal Investigation Department) CID
- রেলওয়ে পুলিশ (Railway Police)
- ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ (Industrial Police) ইত্যাদি।

(২) বাংলাদেশ আনসার (Bangladesh Ansar): বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা এবং আইন প্রয়োগে নিয়োজিত একটি সুশৃঙ্খল বাহিনী হলো বাংলাদেশ আনসার। বাংলাদেশ সরকারেরর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে এ বাহিনী পরিচালিত হয়। আরবি শব্দ আনসার থেকে নামকরণ করা হয়েছে। যার অর্থ সাহায্যকারী।

(৩) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড (Bangladesh Coast Guard): বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত সংস্থা। এটি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত কিন্তু এর অফিসাররা বাংলাদেশ নৌবাহিনী থেকে বদলী হয়ে আসে। এর সদর দপ্তর ঢাকায় অবস্থিত।

(৪) গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী (Village Defence Party): গ্রাম প্রতিরক্ষা দল বাংলাদেশের একটি আইন প্রয়োগকারী বাহিনী। এর ইউনিটগুলো-জেলা, উপজেলা এবং গ্রাম পর্যায়ে বিস্তৃত। যদিও অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা বিধানই এর প্রধান উদ্দেশ্য তবুও গ্রামীণ উন্নয়নমূলক এবং কল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বও এ বাহিনীর রয়েছে।

৪.৯.৩ সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকা (The Role of Law Enforcement Agency to Combat Social Problem)

আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এমন একটি সুশৃঙ্খল বাহিনী যারা দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠায় আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন এবং জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় তাদের রয়েছে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা। সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকা নিচে দেওয়া হলো:

অপরাধ বর্তমান সময়ের একটি মারাত্মক সামাজিক সমস্যা। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা অপরাধ দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অপরাধীদের আটক, অপরাধ তদন্ত ও বিশ্লেষণ, অপরাধীদের শাস্তি প্রদান, অপরাধ প্রতিরোধমূলক যোগাযোগ

ব্যবস্থা সৃষ্টি, সর্বোপরি অপরাধ নির্মূল অভিযান পরিচালনা প্রভৃতির মাধ্যমে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা অপরাধ সংশ্লিষ্ট সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় ভূমিকা রাখে।

মাদকাসক্তি বর্তমানের এক সর্বগ্রাসী সমস্যা। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই এটি ভয়াবহ এক সামাজিক সমস্যা হিসেবে বিবেচিত। সার্থকভাবে সমস্যাটি সমাধানের জন্য প্রতিকার, প্রতিরোধ ও উন্নয়নমূলক সকল ধরনের পদক্ষেপেই আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ও তার অপব্যবহার রোধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা মাদকের চোরাচালান প্রতিরোধ, মাদক ব্যবসায়ীদের গ্রেফতার ও আইনের হাতে হস্তান্তর এবং মাদকের কুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করতে প্রচারণামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, হত্যা, নারী নির্যাতন প্রতিরোধেও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকা রয়েছে। নারী ও শিশু অপহরণ, ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, পাচার, যৌতুকের কারণে নির্যাতন, পতিতাবৃত্তিতে নিয়োগ, ইভটিজিংসহ অন্যান্য সহিংসতা প্রতিরোধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা প্রশাসনকে সহায়তা করে।

জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ, রাজনৈতিক সহিংসতা প্রভৃতি ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ দমন করে সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা ও সংহতি স্থাপনে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ভূমিকা সর্বজনবিদিত। তাছাড়া মানুষের অগ্রহণীয় ও সমাজবিরোধী আচার-আচরণ ও কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে সামাজিক সমস্যা সমাধানে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ভূমিকা পালন করে।

আইনের শাসন এবং সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠায় দুর্নীতি, সাইবার অপরাধ, চুরি, ডাকাতি, সংঘবদ্ধ অপরাধ, চোরাচালান, ঘুষ প্রভৃতি সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে। অগ্নিকান্ড, বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, ভূমিকম্প, মহামারি প্রভৃতি দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে জরুরি সাহায্য প্রদান করার ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। গ্রাম প্রতিরক্ষা দল গ্রামীণ উন্নতি ও কল্যাণমূলক প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় ভূমিকা পালন করে।

শিশুশ্রম বর্তমান বিশ্বের অন্যতম সামাজিক সমস্যা। বিদ্যমান শিশুশ্রম নিরসনমূলক আইনসমূহ এবং শিশুর অধিকার সম্পর্কিত আইনগুলোর যথাযথ ও কার্যকর প্রয়োগে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার রয়েছে বিশেষ ভূমিকা। যুব অসন্তোষ, শ্রমিক অসন্তোষ ও পরিবেশদূষণ প্রতিরোধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সহায়তা করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সামাজিক সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখে।

এছাড়া ট্রাফিক আইন বজায় রাখা, নিয়মিত পাহারার ব্যবস্থা, গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা, বিচারিক দলিলাদি ও সাক্ষীদের নিরাপত্তা, খাদ্যদ্রব্যের ভেজাল প্রতিরোধ ও গুণগতমান পরীক্ষা, সড়ক, রেলপথের নিরাপত্তা বিধান, যানজট নিরসন ও সড়ক দুর্ঘটনা রোধ, ইভটিজিং প্রতিরোধ, অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার এবং নাগরিক সচেতনতা বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় আইন প্রয়োগকারী সংস্থা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

সারসংক্ষেপ

সাধারণভাবে বলা যায়, দেশের প্রচলিত আইনের প্রতিষ্ঠা এবং প্রয়োগের জন্য যে সংগঠনগুলো নিবেদিতপ্রাণ তাদেরকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বলা হয়। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা হলো এমন সরকারি সংস্থা যা একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার প্রচলিত আইন প্রয়োগের ব্যাপারে ক্ষমতাবান এবং অপরাধ তদন্ত ও জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত, যাদের রয়েছে এমন কিছু ক্ষমতা যা অন্য সরকারি সংস্থা ভোগ করে না। যেমন– কোনো কিছু অনুসন্ধান, আটক এবং বাধাগ্রস্ত করার ক্ষমতা। বাংলাদেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা প্রধানত চার ধরনের। যথা– (১) বাংলাদেশ পুলিশ, (২) বাংলাদেশ আনসার, (৩) বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড ও (৪) গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী। আইন প্রয়োগকারী সংস্থা এমন একটি সুশৃঙ্খল বাহিনী যারা দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি প্রতিষ্ঠায় আইনের প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন এবং জনসাধারণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সামাজিক সমস্যা সমাধানে তাদের রয়েছে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। বাংলাদেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা প্রধানত কয় ধরণের?

ক) তিন খ) চার

গ) পাঁচ ঘ) ছয়

২। বাংলাদেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সাধারণত যে কাজগুলো করে থাকে–

i. নাগরিক অধিকার সংরক্ষণ এবং সামাজিক আইন প্রয়োগে সহায়তা

ii. গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনা, বিচারিক দলিলাদি ও সাক্ষীদের নিরাপত্তা

iii. অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার এবং নাগরিক সচেতনতা বিষয়ক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৪.১০ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়িত্ব পালনে সমাজকর্মীর সহায়তামূলক ভূমিকা (The Helping Role of Social Worker in Performing Duties of Law Enforcement Agency)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৪.১০.১ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়িত্ব পালনে সমাজকর্মীর সহায়তামূলক ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৪.১০.১ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়িত্ব পালনে সমাজকর্মীর সহায়তামূলক ভূমিকা (The Role of Social Worker in Performing Duties of Law Enforcement Agency)

দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, প্রচলিত আইনের প্রয়োগ এবং জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি সংস্থাকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বলা হয়। সমাজকর্মী হলেন পেশাদার সমাজকর্মে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, দক্ষ, আভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি, যিনি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করেন। এ ক্ষেত্রে সমাজকর্মীর ভূমিকা হচ্ছে সক্ষমকারী, সমন্বয়কারী, সহায়তাকারী, পরিচালক প্রভৃতি। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তা প্রদানে সমাজকর্মীর ভূমিকা নিচে আলোচনা করা হলো :

সমাজকর্মী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সহায়তা দানে প্রথমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও এজেন্সির সঙ্গে একটি লিখিত চুক্তিতে আবদ্ধ হবেন। পর্যাপ্ত তথ্য অনুসন্ধান করবেন। এ স্তরে সমাজকর্মীকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, সম্পদ, সমস্যা, উদ্দেশ্য, আদর্শ, শক্তি-সামর্থ্য, পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, কর্মপরিবেশ প্রভৃতি সম্পর্কে জরিপের মাধ্যমে পর্যাপ্ত তথ্য অনুসন্ধান করতে হয়।

জরিপের মাধ্যমে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার ব্যাপারে সংগৃহীত তথ্য বিশ্লেষণ করে সমাজকর্মী আইন প্রয়োগকারী সংস্থার যথাযথ ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে প্রধান বাধাগুলো চিহ্নিত করবেন। যেমন–স্বাধীনতার অভাবে ক্ষমতায় থাকা দলের স্বার্থ সংরক্ষণ করে আইন প্রয়োগ, আত্মরক্ষা ও আইনবিরোধী কাজ প্রতিরোধের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদের অভাব, পর্যাপ্ত ভৌত অবকাঠামো যেমন– যানবাহন, অস্ত্র, গোলাবারুদ ও প্রযুক্তির অভাব, অপরাধী ও সন্ত্রাসীদের সাথে সখ্য, পরিবারিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সুবিধা, সামাজিক মর্যাদা, পদোন্নতি, চাকরির নিশ্চয়তা প্রভৃতির ব্যাপারে রাজনৈতিক বিবেচনা, ভালো কাজের জন্য পর্যাপ্ত প্রণোদনার অভাব, অযোগ্য প্রশাসনিক ব্যাবস্থা, বিভিন্ন সামাজিক আইন সম্পর্কে অজ্ঞতা, পেশাদারি মনোভাবের অভাব প্রভৃতি।

উপরোক্ত সমস্যাগুলো সমাধান করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার যথাযথ ভূমিকা পালনে সহায়তা করার জন্য সমাজকর্মী সমস্যার ব্যাপকতা ও প্রভাব সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলার মাধ্যমে জনমত সৃষ্টি করতে পারেন। এক্ষেত্রে যোগাযোগ প্রক্রিয়ার বিভিন্ন কৌশল ও মাধ্যমের যেমন– সভা, সেমিনার, বক্তৃতা, রেডিও, টেলিভিশন, পত্র-পত্রিকা, পোস্টার, মুক্ত আলোচনা প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করতে পারেন।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাহায়তাদান কর্মসূচি সফল বাস্তবায়নে সমাজকর্মীকে সামজে অবস্থিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, দল, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সমর্থন অর্জন অত্যাবশ্যক। এক্ষেত্রে আইনবিদ, শিক্ষক, আইন প্রয়োগকারী দল, সুশীলসমাজ, আইনি সহায়তাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও মানবাধিকার সংস্থা প্রভৃতি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সাথে নিয়ে সমাজকর্মী অগ্রসর হবেন।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থা যাতে স্বাধীনতা, পর্যাপ্ত সম্পদের প্রাপ্যতা, অনুপ্রেরণা ও যোগ্য প্রশাসন ব্যবস্থাপনা ও অনুকূল পরিবেশ প্রভৃতি প্রাপ্তির নিশ্চয়তা লাভ করে সঠিক ভূমিকা পালন করতে পারে সেজন্য সমাজকর্মী নীতিনির্ধারক ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে যুক্তিপূর্ণ আলোচনা করে সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে আগ্রহী করে তুলবেন। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দেশপ্রেম, কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার মানসিকতা সৃষ্টিতে সমাজকর্মী ভূমিকা পালন করতে পারেন।

সারসংক্ষেপ

দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা, প্রচলিত আইনের প্রয়োগ এবং জনগণের জানমালের নিরাপত্তা বিধানের ব্যাপারে দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি সংস্থাকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বলা হয়। সমাজকর্মী হলেন পেশাদার সমাজকর্মে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, দক্ষ, আভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি, যিনি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি হিসেবে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সহায়তা করেন। এ ক্ষেত্রে সমাজকর্মীর ভূমিকা হচ্ছে সক্ষমকারী, সমন্বয়কারী, সহায়তাকারী, পরিচালক প্রভৃতি। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাহায়তাদান কর্মসূচি সফল বাস্তবায়নে সমাজকর্মীকে সামজে অবস্থিত বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি, দল, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার সমর্থন অর্জন অত্যাবশ্যক। এক্ষেত্রে আইনবিদ, শিক্ষক, আইন প্রয়োগকারী দল, সুশীল সমাজ, আইনি সহায়তাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও মানবাধিকার সংস্থা প্রভৃতি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে সাথে নিয়ে সমাজকর্মী অগ্রসর হবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। পেশাদার সমাজকর্মে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, দক্ষ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে বলা হয়–

ক) সমাজকর্মী খ) সমাজবিজ্ঞানী
গ) রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ঘ) অর্থনীতিবিদ

২। বাংলাদেশের আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাধারণত যেসকল প্রতিকূলতা রয়েছে–

i. স্বাধীনতার অভাবে ক্ষমতাসীন দলের স্বার্থ সংরক্ষণ
ii. আইনবিরোধী কাজ প্রতিরোধের জন্য পর্যাপ্ত সম্পদের অভাব
iii. পর্যাপ্ত ভৌত অবকাঠামো যেমন– যানবাহন, অস্ত্র, গোলাবারুদ ও প্রযুক্তির অভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। আধুনিক সমাজজীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ কোনটি?

ক) সামাজিক প্রতিষ্ঠান খ) সামাজিক সংস্থা
গ) সামাজিক পরিবেশ ঘ) রাজনৈতিক সংগঠন

২। বিবাহ কী?

ক) একটি দলিল খ) সামাজিক চুক্তি
গ) সামজিক সংস্থা ঘ) সামাজিক প্রথা

৩। বাংলাদেশের প্রধান আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কোনটি?

ক) বাংলাদেশ সেনাবাহিনী খ) র‌্যাব
গ) বাংলাদেশ পুলিশ ঘ) বাংলাদেশ নৌবাহিনী

৪। বাল্যবিবাহের ফলে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে যেসকল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়-

i. স্বামী-স্ত্রীর বয়সের মধ্যে সামঞ্জস্যহীনতা
ii. অপরিপক্ক মাতৃত্ব ও পিতৃত্ব
iii. দাম্পত্যজীবন সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫। অপরাধ প্রবণতার অন্যতম কারণ–

i. অধিক জনসংখ্যা

ii. মনোদৈহিক সমস্যা

iii. পর্যাপ্ত কর্মসংস্থানের অভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৬। মানব জীবনের শাশ্বত বিদ্যাপীঠ কোনটি?

ক) পরিবার খ) বিদ্যালয়

গ) সমাজ ঘ) মক্তব

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৭ ও ৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিন:

রিফাত বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত সংস্থার একজন অফিসার। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাভূক্ত সংস্থাটির সদর দপ্তর ঢাকায় অবস্থিত।

৭। উদ্দীপকে রিফাতের কর্মরত সংস্থাটি নিচের কোনটিকে নির্দেশ করে?

ক) বাংলাদেশ নৌবাহিনী খ) বাংলাদেশ কোস্টগার্ড

গ) বাংলাদেশ আনসার ঘ) বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ

৮। উদ্দীপকে রিফাতের কর্মপরিধি নির্দেশ করে–

i. বাংলাদেশের সমুদ্রসীমায় অবৈধভাবে অনুপ্রবেশকারী জেলেদের অনুপ্রবেশ ঠেকানো

ii. সমুদ্রপথে চোরাচালান রোধ করা

iii. বাংলাদেশের সমুদ্রসম্পদ রক্ষা করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৯। বাংলাদেশ দুর্যোগপ্রবণ দেশ। বর্তমানে দুর্যোগের আগাম খবর প্রচারের মাধ্যমে গণমাধ্যম যে ধরনের ভূমিকা পালন করে–

i. সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠু বাস্তবায়ন

ii. দুর্যোগকালীন ক্ষয়ক্ষতি রোধ

iii. দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১০। নিচের কোনটির মাধ্যমে তথ্যপ্রবাহে নবযুগের সূচনা ঘটেছে?

ক) রেডিও খ) টেলিভিশন

গ) ইন্টারনেট ঘ) ফেসবুক

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১। যৌতুকের দাবিতে স্বামী ও শ্বশুর কর্তৃক নির্যাতিত রহিমা গ্রামের মাতব্বরদের কাছে ধরনা দিয়েও কোনো বিচার না পেয়ে অবশেষে একটি দৈনিক পত্রিকার স্থানীয় রিপোর্টারের কাছে নিজের অসহায়ত্বের কথা খুলে বলে। দৈনিক পত্রিকাটি উক্ত খবর প্রকাশ করার পর আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী গ্রামের মাতব্বরসহ অপরাধীদের গ্রেফতার করে।

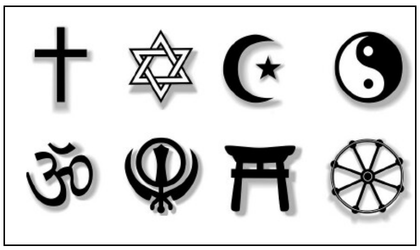
ক) বাংলাদেশে সর্বপ্রথম ইন্টারনেট চালু হয় কবে? ১

খ) ধর্ম বলতে কী বোঝেন? ২

গ) উদ্দীপকে কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা বেশি গুরুত্বপূর্ণ? আলোচনা করুন। ৩

ঘ) উদ্দীপকে উল্লেখিত দুটি সামাজিক প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতামূলক ভূমিকা অপরাধ নির্মূলে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে– উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করুন। ৪

২। নিচের চিত্রসমূহ দেখুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।



ক) বাংলাদেশে সর্বপ্রথম কবে টেলিভিশন চালু হয়? ১

খ) বিবাহ বলতে কী বোঝেন? ২

গ) উদ্দীপকে কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ধারণা চিত্রিত হয়েছে? ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ) বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা সমাধানে উদ্দীপকে চিত্রিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অপরিসীম– উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩ : ১। খ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৪ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৫ : ১। গ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৬ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৭ : ১। ক ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৮ : ১। খ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৯ : ১। খ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১০ : ১। খ ২। ঘ
চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ৪ : ১। ক ২। খ ৩। গ ৪। ঘ ৫। ঘ ৬। ক ৭। ক
৮। ঘ ৯। ঘ ১০। গ

সামাজিক আইন ও সমাজকর্ম
(Social Legislation and Social Work)

ইউনিট
৫

ভূমিকা

সামাজিক আইন সমাজের সকল প্রকার কুসংস্কার, কুপ্রথা ও ক্ষতিকর অবস্থা দূর করে একটি নিরাপদ ও কল্যাণকর সমাজ প্রতিষ্ঠায় তৎপর। সমাজের উন্নয়ন, সমাজের মানুষের কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাবার জন্য সামাজিক আইন কার্যকর ভূমিকা রাখে। সামাজিক আইন ব্যতীত সামাজিক নীতি প্রণয়ন সম্ভব নয়। সরকারকে জনকল্যাণকর নীতি গ্রহণ করতে হলে তা কেবল সামাজিক আইনের মাধ্যমেই সম্ভব। এজন্য বলা হয় সামাজিক আইন সামাজিক নীতির প্রধান চালিকা হিসেবে কাজ করে। সাধারণত সমাজের দুর্বল ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সামাজিক আইন প্রণীত হয়। পরিবর্তিত সামাজিক পরিস্থিতিতে ক্ষতিকর অবস্থার মোকাবিলা, বঞ্চিত ও অবহেলিত শ্রেণির অধিকার প্রতিষ্ঠা, মৃত্যু, অসুস্থতা, দুর্ঘটনা, উপার্জনহীনতা মোকাবিলা, সামাজিক কুপ্রথা ও কুসংস্কার দূরীকরণে সামাজিক আইন অনবদ্য ভূমিকা পালন করে থাকে। অসামাজিক আইন হলো সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত ও বাস্তবায়নকৃত এমন সব জনকল্যাণমূলক ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা যা পালন করা সকলের জন্য বাধ্যতামূলক এবং অমান্য করা দন্ডনীয় অপরাধ। সামাজিক স্থিতিশীলতা, শৃঙ্খলা এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক আইন প্রবর্তন করা হয়।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ–৫.১ : সামাজিক আইনের ধারণা, উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব
পাঠ-৫.২ : সামাজিক সমস্যা ও সামাজিক আইন
পাঠ-৫.৩ : মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১
পাঠ-৫.৪ : শিশু আইন, ১৯৭৪
পাঠ-৫.৫ : যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০
পাঠ-৫.৬ : নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ১৯৮৩
পাঠ-৫.৭ : মাদক নিরোধ অধ্যাদেশ, ১৯৮৯
পাঠ-৫.৮ : নারী ও শিশু নির্যাতনরোধ আইন, ২০০৩
পাঠ-৫.৯ : হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন, ২০১২
পাঠ-৫.১০ : সামাজিক আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে সমাজকর্মীর ভূমিকা

পাঠ-৫.১ সামাজিক আইনের ধারণা, উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব (Concept, Objectives and Importance of Social Legislation)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৫.১.১ সামাজিক আইন কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৫.১.২ সামাজিক আইনের উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৫.১.৩ সামাজিক আইনের গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

৫.১.১ সামাজিক আইনের ধারণা (Concept of Social Legislation)

সামাজিক আইন বলতে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত এমন সব বিধিবিধানকে বোঝায় যা সমাজের অবহেলিত ও বঞ্চিত শ্রেণি বিশেষ করে শারীরিকভাবে অক্ষম, দরিদ্র, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধা বঞ্চিতদের অধিকার সংরক্ষণ করে এবং সমাজের বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার ও কুপ্রথা দূর করে সমাজকে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের দিকে ধাবিত করে।

Dictionary of Social Welfare (১৯৪৮) এ বলা হয়েছে, "সমাজের বঞ্চিত শ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষণ ও কল্যাণের জন্য অথবা সাধারণ মানুষের মধ্যে যারা শারীরিক ও মানসিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সুবিধা কম থাকার কারণে সন্তোষজনক জীবনযাপনে অক্ষম, তাদের প্রয়োজনসমূহ পূরণে কল্যাণমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করার লক্ষ্যে প্রবর্তিত আইন হলো সামাজিক আইন।"

D. Paul Chowdhury (১৯৭৯) তাঁর "*Social Administration*" গ্রন্থে বলেন, "সামাজিক আইন সমাজের অবস্থার উন্নয়ন ও বৈরি অবস্থান সমূহ প্রতিরোধ কল্পে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করে এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠানাদির সংস্কার সাধনে প্রয়োগ করা হয় (Social legislation tries to bring about reform in the working of social institutions and enables action to prevent social ill-health and preserve and promote social health.)।"

মোঃ আলী আকবরের মতে, "সামাজিক আইন সরকারের কার্যক্রম এগিয়ে নেয়ার জন্য সামাজিক প্রগতি সৃষ্টির লক্ষ্যে কাজ করে, যাতে সামাজিক লক্ষ্য নির্ধারণ অথবা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে যেসব উপাদান বাধা সৃষ্টি করে তা দূর হয়।"

Robert L. Barker (১৯৯৫) তাঁর "*Dictionary of Social Work*" উল্লেখ করেন, "সামাজিক আইন হলো মানবকল্যাণের আবশ্যকীয় প্রয়োজনসমূহ, আয়-নিরাপত্তা, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, নাগরিক অধিকার, ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণ এবং সামাজিক সমস্যা মোকাবিলার জন্য গৃহীত কর্মসূচি পরিচালনা ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত আইনসমূহ (Social legislation, laws and resource allocation providing for human welfare needs, income security, education and cultural progress, civil rights, consumer protection and programs that address social problems.)।"

উপরোক্ত সংজ্ঞাগুলো বিশ্লেষণ করে বলা যায় যে সামাজিক আইন হলো, রাষ্ট্র কর্তৃক প্রবর্তিত এমন সকল বিধিবিধান যা বিশেষ করে দুর্বল, অসহায় ও অবহেলিত গোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ ও সার্বিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানসহ সমাজজীবনের ক্ষতিকর অবস্থা নিরসন করে একটি সুস্থ, সুন্দর ও উন্নত সমাজ গঠনে সাহায্য করে।

৫.১.২ সামাজিক আইনের উদ্দেশ্য (Objectives of Social Legislation)

সমাজজীবনের কল্যাণ, উন্নয়ন এবং সুস্থতা বর্ধন সামাজিক আইনের চূড়ান্ত লক্ষ্য। সমাজের যেসকল মানুষ পশ্চাৎপদ তাদেরকে উন্নয়নের গতিধারায় আনয়ন, সমস্যা মুক্তকরণ এবং সামাজিক প্রয়োজন পূরণ করাই হলো সামাজিক আইনের উদ্দেশ্য।

মোঃ আলী আকবর (১৯৬৫) তাঁর "*Elements of Social Welfare*" গ্রন্থে সামাজিক আইনের নির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন। যেমন– ক) সমাজ নিয়ন্ত্রণ; খ) সমাজসংস্কার ও পরিকল্পিত পরিবর্তন; গ) সামাজিক স্থিতিশীলতা ও ঐক্যবদ্ধতা; ঘ) মূল্যবোধ ও জীবনমানের দ্বন্দ্ব নিরসন; ঙ) সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ; চ) সামাজিক সুবিচার ও সমতা; এবং ছ) সেবা সম্প্রসারণ ও সামঞ্জস্য বিধানের কর্মপন্থা গ্রহণ।

ডি. পল চৌধুরীর মতে, সামাজিক আইনের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো সমাজের অনাকাঙ্ক্ষিত ও অবাঞ্ছিত অবস্থা নিরসন, জনকল্যাণ ও প্রগতি অর্জন এবং আইনের মাধ্যমে মানবাধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষণ করা।

সমাজ জীবন থেকে অবাঞ্ছিত ও অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতি ও কুপ্রথা নিরসনকল্পে এবং আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক আইন প্রণীত হয়েছে। বহু প্রাচীন প্রথা যেমন– দাসপ্রথা, সতীদাহপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ প্রভৃতির প্রেক্ষিতে নিরাপত্তা ও অধিকার সংরক্ষণে সামাজিক আইন প্রণীত হয়েছে। আবার সামাজিক আইনের মাধ্যমে সমাজের নারী, শিশু, প্রতিবন্ধী, যুব, প্রবীণ কল্যাণসহ সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

সামাজিক সমস্যা দূরীকরণ ও আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক আইন প্রণয়ন করা হয়। এছাড়া সামাজিক আইনের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন অনাচার ও কুসংস্কার দূর করার চেষ্টা করা হয়।

সামাজিক আইন সমাজ থেকে সকল প্রকার অবাঞ্ছিত ও অনাকাঙ্খিত অবস্থা দূর করে সামাজিক নিরাপত্তা, মানবাধিকার, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করে। সমাজের সকল সমস্যার প্রতিকার ও প্রতিরোধের মাধ্যমে বৃহত্তর পরিসরে সামজিক কল্যাণ নিশ্চিত করে।

এ প্রসঙ্গে এম. আব্দুল হালিম বলেন, অধিকতর কার্যকরভাবে সমাজ কল্যাণমূলক আইন অসুবিধাগ্রস্থদের প্রতিরোধমূলক, সমাজসেবামূলক এবং জীবনমান সংরক্ষণে সামাজিক নীতিকে রুপান্তর ঘটিয়ে থাকে। এর উদ্দেশ্য হলো উন্নত জীবন মান সৃষ্টি করা।

৫.১.৩ সামাজিক আইনের গুরুত্ব (Importance of Social Legislation)

সামাজিক আইনের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সুনিয়ন্ত্রিত ও পরিকল্পিত সমাজকাঠামো গঠন করে সমাজের প্রতিটি ব্যক্তির ন্যায়সংগত অধিকার সংরক্ষণ এবং বাহ্যিক আচরণ নিয়ন্ত্রণের মাঝে নিহিত। প্রকৃতপক্ষে অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের মাধ্যমে সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা; সামাজিক অনাচার, কুপ্রথা ও কুসংস্কার দূরীকরণ; অবহেলিত ও বঞ্চিত মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণ, শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণ নিশ্চিতকরণ এবং জনগণের অধিকার রক্ষা এবং ন্যায়বিচারের প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে সামাজিক আইন কার্যকর ভূমিকা পালন করে। সামাজিক আইনের মাধ্যমে শিশু, যুবক, বৃদ্ধ, নারী, শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুবিধাগ্রস্ত ব্যক্তি অথবা কোনো কারণে উপার্জন করতে অক্ষম নির্ভরশীল ব্যক্তিদের ন্যায়সংগত অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়।

Encyclopedia of Social Work in India (vol.II, 1968) গ্রন্থে বলা হয়েছে- সামাজিক আইন মানবসমাজের ব্যাপক এলাকায় ব্যাপৃত যেমন– মানব সমাজের বহুমুখী চাহিদা নিরসনে বিভিন্ন আইন কাজ করে। এ আইনগুলোর অন্তর্ভুক্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানকেন্দ্রিক যেমন– বিবাহ, পঙ্গু ব্যক্তি এবং সংখ্যালঘু বা ক্ষমতাহীন গোষ্ঠী; সামাজিক ব্যাধি কেন্দ্রিক কিছু সংস্কারমূলক ব্যবস্থা যেমন ভবঘুরে, কিশোর অপরাধ, ভিক্ষাবৃত্তি এবং কিছু আইন রয়েছে যা সামাজিক নিরাপত্তা কেন্দ্রিক।

সামাজিক আইন সমাজ উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে গণ্য হয়। সামাজিক আইন সামাজিক চাহিদাসমূহ পূরণ এবং সামাজিক সমস্যাবলী মোকাবিলার মাধ্যমে একটি উন্নত ও কল্যাণমুখী সমাজ বিনির্মাণে অবদান রাখে। এছাড়া সামাজিক নীতি প্রণয়ন, কার্যকর মানবকল্যাণ এবং সমাজ কাঠামোর সম্পর্ক উন্নয়নে সামাজিক আইন কার্যকর ভূমিকা পালন করে।

সামাজিক আইন সমাজের অনাকাঙ্খিত অবস্থা দূর করে সমাজের বাঞ্ছিত পরিবর্তন বা সমাজ সংস্কার করে থাকে। সমাজে যেসকল ক্ষতিকর প্রথা বা অবস্থা থাকে তা দূর করে একটি কল্যাণমুখী ও সুস্থ সমাজ গঠন শুধু সামাজিক আইনের মাধ্যমেই সম্ভব।

পরিশেষে বলা যায়, সামাজিক আইন সমাজের বিভিন্ন সমস্যা, কুপ্রথা ও কুসংস্কার দূর করে সমাজের বাঞ্ছিত পরিবর্তন সাধনের মাধ্যমে মানুষের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এছাড়া সামাজিক নিরাপত্তা, মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি কাঙ্খিত ও উন্নত সমাজ গঠনে সামাজিক আইনের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

সারসংক্ষেপ

সামাজিক আইন বলতে রাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত এমনসব বিধিবিধানকে বোঝায় যা সমাজের অবহেলিত ও বঞ্চিত শ্রেণি বিশেষ করে শারীরিকভাবে অক্ষম, দরিদ্র, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুবিধাবঞ্চিতদের অধিকার সংরক্ষণ করে, সমাজের বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার ও কুপ্রথা দূর করে সমাজকে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের দিকে ধাবিত করে। অর্থ্যাৎ সামাজিক আইন হলো রাষ্ট্র কর্তৃক প্রবর্তিত এমন সকল বিধিবিধান যা বিশেষ করে দুর্বল, অসহায় ও অবহেলিত গোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণ ও সার্বিক নিরাপত্তার নিশ্চয়তা বিধানসহ সমাজ জীবনের ক্ষতিকর অবস্থা নিরসন করে একটি সুস্থ, সুন্দর ও উন্নত সমাজ গঠনে সাহায্য করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। পশ্চাৎপদ মানুষকে উন্নয়নের গতিধারায় আনয়ন এবং সামাজিক প্রয়োজন পূরণের জন্য প্রণয়ন করা হয় কী?

ক) সামাজিক আইন খ) সামাজিক পরিকল্পনা

গ) সামাজিক নীতি ঘ) সামাজিক মূল্যবোধ

২। সামাজিক আইন হলো এমন সব বিধি বিধান যা–

i. অবহেলিত ও বঞ্চিতদের অধিকার সংরক্ষণ করে

ii. সমাজের বিভিন্ন ধরনের কুসংস্কার, কুপ্রথা দূর করে

iii. সমাজকে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়নের দিকে ধাবিত করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.২ সামাজিক সমস্যা ও সামাজিক আইন (Social problem and Social Legislation)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৫.২.১ সামাজিক সমস্যা ও সামাজিক আইনের মধ্যকার সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।

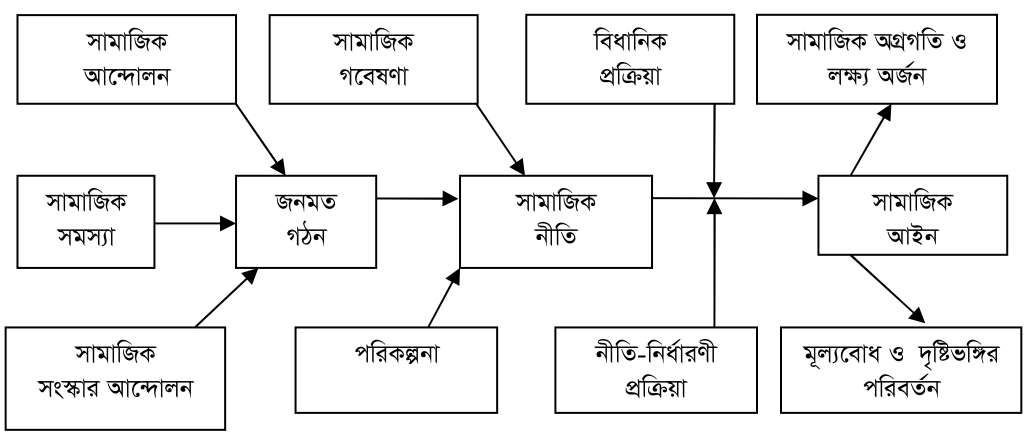
৫.২.১ সামাজিক সমস্যা ও সামাজিক আইন (Social problem and Social Legislation)

মানুষ সমাজে কতগুলো স্থায়ী ব্যবস্থা বা সম্পর্কের ভিত্তিতে তাদের জৈবিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজনসমূহ মিটিয়ে নিরাপদ জীবনযাপনের চেষ্টা করে। কিন্তু কখনো কখনো এমন সব পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে যার ফলে সমাজের ব্যাপক অংশের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়, অনেক সময় বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন এ অবাঞ্ছিত পরিস্থিতিকে সামাজিক সমস্যা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।

মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান (২০০৩:৬২০) তাঁর সমাজবিজ্ঞান পরিচিতি গ্রন্থে বলেছেন, "সামাজিক সমস্যা বলতে এমন একটি পরিস্থিতি বা অবস্থাকে বোঝায় যা সমাজের মানুষের দৃষ্টিতে সমাজের জন্য হুমকিস্বরুপ বলে অনুমিত হয়। আর তাই স্বাভাবিকভাবে তার প্রতিকার একটা জরুরি কাজ বলে মনে করা হয়। সমাজের এই অনাকঙ্খিত ও অবাঞ্ছিত অবস্থা থেকে উত্তরণের চুড়ান্ত উপায় হলো সামাজিক আইন।" সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় প্রণীত হয় সমাজিক আইন। সামাজিক সমস্যা মানুষের সমাজজীবনকে বিপর্যস্ত ও বিপন্ন করে তোলে। সমাজের মানুষ এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়। এজন্য তারা ঐক্যবদ্ধ হয়ে সমবেত প্রচেষ্টায় গড়ে তোলে সামাজিক আন্দোলন। সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে জনমত গঠন করা হয়। অর্থাৎ সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজ থেকে সমস্যা দূরীকরণের জন্য মানুষের মধ্যে সচেতনতাবোধ জাগিয়ে তোলা হয়।

সচেতন এসকল জনগণ সমাজ থেকে সমস্যা দূরীকরণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সরকার বিষয়টির যথার্থ গুরুত্ব দিয়ে এর সমাধানের জন্য সাংবিধানিক প্রক্রিয়া শুরু করে। অর্থাৎ একটি খসড়া আইন প্রণয়ন করে থাকে। নিচের ছকে বিষয়টি যথার্থভাবে তুলে ধরা হলো:

চিত্র ৫.২.১ : সামাজিক সমস্যা ও সামাজিক আইন



(উৎস: সরকার ও অন্যান্য ২০০১:২৫)

খসড়া আইনটি সংসদে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে গৃহীত হয়। পরবর্তীতে রাষ্ট্র প্রধানের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আইনটি পাস হয়। প্রণীত আইনটি পরবর্তীতে তার লক্ষ্য অর্জনে অর্থাৎ সামাজিক বিপর্যস্ত অবস্থা দূর করার জন্য প্রয়োগ করা হয়। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, সামাজিক আইন ও সামাজিক সমস্যা পরস্পর সম্পর্কিত। সামাজিক সমস্যা সমাজ জীবনে অচলাবস্থার সৃষ্টি করে। সমাজের মানুষের জীবনকে করে তোলে অশান্ত ও বিশৃঙ্খল। সামাজিক বিভিন্ন কাঠামো ও প্রতিষ্ঠান ভেঙে পড়ে। আর এ অবস্থা থেকে সমাজকে উত্তরণের জন্য প্রণীত হয় সামাজিক আইন।

সারসংক্ষেপ

সামাজিক সমস্যা বলতে এমন একটি পরিস্থিতি বা অবস্থা বোঝায় যা সমাজের মানুষের দৃষ্টিতে সমাজের জন্য হুমকিস্বরূপ বলে অনুমিত হয়। আর তাই স্বাভাবিকভাবে তার প্রতিকার একটা জরুরি কাজ বলে মনে করা হয়। সমাজের এই অনাকাঙ্ক্ষিত ও অবাঞ্ছিত অবস্থা থেকে উত্তরণের চূড়ান্ত উপায় হলো সামাজিক আইন। সামাজিক সমস্যা সমাজ জীবনে অচলাবস্থার সৃষ্টি করে। সমাজের মানুষের জীবনকে করে তোলে অশান্ত ও বিশৃঙ্খল। সামাজিক বিভিন্ন কাঠামো ও প্রতিষ্ঠান ভেঙে পড়ে। আর এ অবস্থা থেকে সমাজকে উত্তরণের জন্য প্রণীত হয় সামাজিক আইন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। সচেতন জনগণ সমাজ থেকে সমস্যা দূরীকরণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কার দৃষ্টি আকর্ষণ করে?

ক) রাষ্ট্র খ) রাজনৈতিক দল
গ) সরকার ঘ) সামাজিক প্রতিষ্ঠান

২। সামাজিক আইন প্রণয়নে যেসকল প্রক্রিয়া অনুসরন করা হয় তা হলো–

i. সামাজিক আন্দোলন
ii. জনমত গঠন
iii. সামাজিক নীতি প্রণয়ন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৩ মুসলিম পরিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (Muslim Family Law Ordinance, 1961)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৫.৩.১ ১৯৬১ সালের মুসলিম পরিবারিক আইনের ধারাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

৫.৩.১ মুসলিম পরিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (Muslim Family Law Ordinance, 1961)

সমাজে বসবাস করতে গিয়ে মানুষকে সমাজের বিভিন্ন বিধিবিধান মেনে চলতে হয়। সমাজের এ সকল বিধিবিধান সমাজের মানুষের রক্ষাকবচ স্বরুপ। সময়ের প্রেক্ষাপটে সমাজের মানুষের স্বার্থে সরকার বিভিন্ন সময় বিভিন্ন সামাজিক আইন প্রণয়ন করেছেন। এমনই কিছু সামাজিক আইন হলো– মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১; শিশু আইন, ১৯৭৪; যৌতুক আইন, ১৯৮০; নারী নির্যাতন আইন, ১৯৮৩; মাদক নিরোধ অধ্যাদেশ, ১৯৮৯; নারী ও শিশু নির্যাতনরোধ আইন, ২০০৩; হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন, ২০১২; পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন; ২০১০ ইত্যাদি। পরবর্তী পাঠে উল্লিখিত আইনগুলো এবং আইনগুলোর বিভিন্ন ধারা আলোচনা করা হয়েছে। প্রথমে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ আলোচনা করা হলো:

বর্তমান বাংলাদেশে নারী ও পুরুষের অধিকার সকল ক্ষেত্রে সমান। কিন্তু একসময় এ অবস্থা ছিল না। সকল ক্ষেত্রে নারীরা ছিল বঞ্চিত। বিশেষ করে বিবাহ, দেনমোহর, উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে নারীদের কোনো অধিকার ছিল না। এজন্য তৎকালীন পাকিস্তান সরকার (বর্তমান বাংলাদেশ) নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ নামে একটি অধ্যাদেশ জারি করে। ১৯৬১ সালের ১৫ জুলাই হতে এ অধ্যাদেশটি বাংলাদেশের সকল মুসলিম নাগরিকের জন্য কার্যকর হয়। এ আইনের উল্লেখযোগ্য বিধানগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১। **বিবাহের বয়স:** এ আইন অনুসারে বিবাহের ক্ষেত্রে ছেলেদের বয়স ন্যূনতম ২১ বছর এবং মেয়েদের ক্ষেত্রে ন্যূনতম ১৮ বছর হতে হবে।

২। **মেয়ের মতামতের প্রাধান্য:** এ অধ্যাদেশ-এ পাত্র পছন্দের ক্ষেত্রে মেয়েদের মতামতকে প্রাধান্য দেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

৩। **বিবাহ রেজিস্ট্রেশন:** এ আইন অনুযায়ী প্রতিটি বিবাহ রেজিস্ট্রি করতে হবে। এজন্য ইউনিয়ন পরিষদ বা পৌরসভা এক বা একাধিক ব্যক্তিকে লাইসেন্স প্রদান করে এবং এ ব্যক্তি নিকাহ রেজিস্টার বলে গণ্য হন।

৪। **দ্বিতীয় বিবাহ:** এ আইন অনুসারে প্রথম স্ত্রী বেঁচে থাকতে দ্বিতীয় বিবাহ করা যাবে না। তবে প্রথম স্ত্রীর বন্ধ্যাত্ব, স্থায়ী শারীরিক ও মানসিক অসুস্থতা ইত্যাদি কারণে ইউনিয়ন পরিষদ/পৌরসভা চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে স্বামী ও স্ত্রীর মনোনীত প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত সালিশি পরিষদের অনুমতিক্রমে দ্বিতীয় বিবাহ করা যাবে।

৫। **দেনমোহর:** এ আইন অনুসারে স্ত্রীর দেনমোহর পরিশোধ বাধ্যতামূলক। স্বামী দেনমোহর প্রদানে ব্যর্থ হয়ে অভিযুক্ত হলে এক বছর কারাদন্ড অথবা এক হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন।

৬। **তালাক:** এ আইনের বিধান মোতাবেক স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দিতে চায় তাহলে তালাক ঘোষণার পর (মৌখিক অথবা লিখিত) যথাশীঘ্রই সালিশি পরিষদের চেয়ারম্যানকে লিখিতভাবে তালাকের নোটিশ প্রদান করতে হবে এবং এর এক কপি স্ত্রীকে প্রদান করতে হবে। এ বিধান ভঙ্গ করলে স্বামীকে সর্বাধিক এক বছর কারাদন্ড অথবা পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ড ভোগ করতে হবে। নোটিশ প্রাপ্তির পর চেয়ারনম্যান সালিশি পরিষদের মাধ্যমে ৯০ দিনের মধ্যে উভয়ের মিলনের চেষ্টা করবেন এবং ৯০ দিন পর চেষ্টা ব্যর্থ হলো তালাক কার্যকর হবে। তবে তালাকের সময় স্ত্রী গর্ভবতী হলো গর্ভকাল অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত তালাক কার্যকর হবে না। এ আইন অনুযায়ী স্ত্রী চাইলেও স্বামীকে তালাক দিতে পারবে।

৭। **ভরণপোষণ:** এ আইন অনুযায়ী স্বামী যদি স্ত্রীর ভরণপোষণে অক্ষম হন বা একাধিক স্ত্রী রাখেন এবং তাদের সমানভাবে প্রতিপালন করতে ব্যর্থ হন, সেক্ষেত্রে স্ত্রী বা স্ত্রীগণ লিখিতভাবে সালিশি পরিষদ চেয়ারম্যানের নিকট

অভিযোগ করতে পারেন। এক্ষেত্রে সালিশি পরিষদ স্বামীকে স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্য টাকার পরিমাণ নির্দিষ্ট করে নির্দেশ দিতে পারেন।

৮। **উত্তরাধিকার:** এ আইন অনুসারে কোনো পরিবারে দাদা জীবিত থাকা অবস্থা বাবা মারা গেলে দাদার সম্পত্তি থেকে নাতি-নাতনীদের বঞ্চিত করা যাবে না। তারা দাদার সম্পত্তির ন্যায্য অংশ পাওয়ার অধিকারী।

১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ নারীকল্যাণমূলক একটি সামাজিক আইন। নারীর স্বার্থ সংরক্ষণ এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণের লক্ষ্যে এ আইনটি প্রণীত হয়। এ আইনের মাধ্যমে মুসলিম সমাজের বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। এছাড়া এ আইনের মাধ্যমে নারীর স্বাধীনতা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

বর্তমান বাংলাদেশে নারী ও পুরুষের অধিকার সকল ক্ষেত্রে সমান। কিন্তু একসময় এ অবস্থা ছিল না। সকল ক্ষেত্রে নারীরা ছিল বঞ্চিত। বিশেষ করে বিবাহ, দেনমোহর, উত্তরাধিকার ইত্যাদি বিষয়ে নারীদের কোনো অধিকার ছিল না। এজন্য তৎকালীন পাকিস্তান সরকার (বর্তমান বাংলাদেশ) বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, **১৯৬১** জারি করে। **১৯৬১** সালের **১৫** জুলাই হতে এ আইনটি বাংলাদেশের সকল মুসলিম নাগরিকের জন্য কার্যকর হয়। এ আইনে বিশেষ করে ছেলেমেয়েদের বিবাহের বয়স নির্ধারণ, বিবাহের ক্ষেত্রে মেয়েদের মতামতের প্রাধান্য দান, বিবাহ রেজিস্ট্রেশন, দ্বিতীয় বিবাহ, দেনমোহর, ভরণপোষন, তালাক, সম্পত্তির উত্তরাধিকারসহ নানা বিষয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। **১৯৬১** সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ অনুযায়ী বিবাহের ক্ষেত্রে ছেলেমেয়ের বয়স কত?

ক) ২১ ও ১৮ বছর খ) ২২ ও ২০ বছর

গ) ২৫ ও ২১ বছর ঘ) ২৬ ও ২২ বছর

২। **১৯৬১** সালের মুসলিম পারিবারিক আইনে যেসকল বিষয় নিশ্চিত করা হয়েছে তা হলো–

i. স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ

ii. বহুবিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদকে নিরুৎসাহিত করা

iii. বাল্যবিবাহকে উৎসাহিত করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৪ শিশু আইন, ১৯৭৪ (The Children Act, 1974)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৫.৪.১ শিশু আইন, ১৯৭৪ এর ধারাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

৫.৪.১ শিশু আইন, ১৯৭৪ (The Children Act, 1974)

বাংলাদেশের শিশুদের মানবীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাসহ শিশুদের সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য শিশু আইন ১৯৭৪ প্রণীত হয়। ১৯৭৬ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ঢাকায় এবং ১৯৮০ সালের ১ জুন বাংলাদেশের সর্বত্র এ আইটি কার্যকর হয়। আইনটিতে ১০টি ভাগে মোট ৭৮টি ধারা রয়েছে। এ আইনের উল্লেখযোগ্য ধারাগুলো নিচে আলোচনা করা হলো-

ধারাঃ ১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামঃ এ আইন শিশু আইন, ১৯৭৪ নামে অভিহিত হবে।

ধারা ২। সংজ্ঞাসমূহঃ বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কিছু না থাকলে এ আইনে–

ক. প্রাপ্ত বয়স্কঃ এরুপ ব্যক্তি যিনি শিশু নন।

খ. শিশুঃ ১৬ বছরের কম বয়স্ক কোনো ছেলে বা মেয়ে।

গ. অভিভাবকঃ এরুপ ব্যক্তি যিনি শিশু বা কিশোর অপরাধী সম্পর্কে গৃহীত কার্যধারা মেনে নিয়ে তার দায়িত্ব বা নিয়ন্ত্রণ ভার গ্রহণ করেন।

ধারা-৪। শিশু আদালতের এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতসমূহঃ এ আইনে শিশু আদালতের ওপর অর্পিত ক্ষমতাসমূহ হাইকোর্ট বিভাগ, দায়রা আদালত, অতিরিক্ত দায়রা জজ ও সহকারী দায়রা জজের আদালত, মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট এবং প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট প্রয়োগ করতে পারবেন।

ধারা-৯। শিশু আদালতে যারা উপস্থিত থাকতে পারবেঃ আদালতের সদস্যগণ ও কর্মকর্তা, মামলার সংশ্লিষ্ট পক্ষ, পুলিশ, শিশুর পিতামাতা বা অভিভাবক এবং আদালত কর্তৃক বিশেষভাবে অনুমোদিত ব্যক্তিগণ।

ধারা-১১। শিশুর হাজিরা মওকুফঃ মামলার শুনানিতে আদালত শিশুর উপস্থিতি অনাবশ্যক মনে করলে তার হাজিরা মওকুফ করতে পারে।

ধারা-১৪। রোগাক্রান্ত শিশুকে অনুমোদিত স্থানে প্রেরণঃ এ আইন অনুসারে বিচারাধীন কোনো শিশু যদি শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়, সেক্ষেত্রে আদালত শিশুটিকে চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল বা অনুমোদিত যে কোনো স্থানে যতদিন আবশ্যক মনে করেন ততদিনের জন্য প্রেরণ করবেন।

ধারা-১৫। আদালতের আদেশ প্রদানে বিবেচ্য বিষয় সমূহঃ এ আইনের অধীনে কোনো শিশুর মামলার আদেশ প্রদানের জন্য শিশুর চরিত্র ও বয়স, শিশুর জীবনধারণের পরিবেশ, শিক্ষানবিশ কর্মকর্তা কর্তৃক প্রণীত রিপোর্ট ইত্যাদি বিষয় বিবেচনা করবেন।

ধারা-১৭। মামলায় জড়িত শিশুর পরিচয় প্রকাশের ওপর নিষেধাজ্ঞাঃ বিচারাধীন কোনো শিশুর ছবি বা পরিচয় প্রকাশ করে এমন কোনো সংবাদ কোনো সংবাদপত্র বা সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ করা যাবে না। তবে আদালত যদি মনে করেন সংবাদ প্রকাশ শিশুর স্বার্থে কল্যাণকর, তখনই কেবল সংবাদ প্রকাশ করা যাবে।

ধারা-৩১। শিক্ষানবিশ কর্মকর্তা নিয়োগঃ সরকার প্রত্যেক জেলায় একজন শিক্ষানবিশ কর্মকর্তা নিয়োগ করতে পারেন। তিনি শিশুর আচরণ সম্পর্কে আদালতে রিপোর্ট দেবেন, শিশুকে উপদেশ দেবেন, সহায়তা করবেন এমনকি প্রয়োজনবোধে শিশুর উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবেন।

ধারা-৩২ ও ৩৩। অবহেলিত শিশুদের তত্ত্বাবধান ও পালনের কর্মপন্থাঃ দুস্থ ও অবহেলিত শিশুর (যেমন– গৃহহীন, পিতৃমাতৃহীন, ভবঘুরে, নিষ্ঠুর আচরণের শিকার ইত্যাদি) তত্ত্বাবধান ও পালনের জন্য শিক্ষানবিশ কর্মকর্তা বা কমপক্ষে সাব-ইন্সপেক্টরের পদমর্যাদা সম্পন্ন পুলিশ কর্মকর্তা বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো ব্যক্তিকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রে

আদালত উক্ত শিশু/শিশুদের সর্বিক অবস্থা বিবেচনা করে কিশোর হাজত, সংশোধনী কেন্দ্র বা আত্মীয়-স্বজনের বাসায় রাখতে পারেন।

ধারা-৩৪। শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতার দন্ডঃ কারো হেফাজতে থাকা অবস্থায় যদি কোনো শিশুকে আক্রমণ, উৎপীড়ন, অবহেলোা, বর্জন ও অরক্ষিত অবস্থায় ত্যাগ করে যার ফলে শিশুটির স্বাস্থ্যের ক্ষতি হয়, তার দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তি নষ্ট হয়ে যায় বা মানসিক বিকৃতি ঘটে, তাহলে উক্ত ব্যক্তি দুই বছর মেয়াদের কারাদন্ড বা এক হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন।

ধারা-৩৫। শিশুকে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োগের দন্ডঃ কোনো ব্যক্তি যদি শিশুর দ্বারা ভিক্ষা করান বা ভিক্ষার উদ্দেশ্যে নিয়োগদানে অজ্ঞতার ভান করেন, কিংবা উৎসাহ দেন অথবা শিশুকে আলামত হিসেবে ব্যবহার করেন, তবে উক্ত ব্যক্তি এক বছর মেয়াদি কারাদন্ড বা তিনশত টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন।

ধারা-৩৭। শিশুকে নেশাগ্রস্তকারী সুরা বা বিপজ্জনক ওষুধ প্রদানের দন্ডঃ কোনো শিশুকে তার অসুস্থতা বা অন্য কোনো জরুরি কারণে যোগ্যতা সম্পন্ন ডাক্তারের পরামর্শ ব্যতীত কেউ যদি কোনো নেশাগ্রস্তকারী সুরা বা বিপজ্জনক ওষুধ প্রদান করেন তবে ওই ব্যক্তি এক বছর মেয়াদের কারাদন্ড বা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন।

ধারা-৪১। শিশুকে পতিতালয়ে রাখার অনুমতিদানের দন্ডঃ যদি কোনো ব্যক্তি চার বছর বা তদূর্ধ্ব কোনো শিশুকে পতিতালয়ে বাস করতে কিংবা প্রায়শ যাতায়াত করতে সুযোগ বা অনুমতি দেয়, তাহলে উক্ত ব্যক্তি দুই বছর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদন্ড অথবা এক হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন।

ধারা-৪২। অসৎ পথে পরিচালনা করানোর দন্ডঃ ১৬ বছরের কম বয়স্ক কোনো মেয়ের হেফাজতকারী যদি তাকে বেশ্যাবৃত্তিতে প্রবৃত্ত করায় বা উৎসাহ দেয় অথবা স্বামী ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তিকে তার সাথে যৌনসঙ্গম করায় বা উৎসাহ দেয়, তবে ওই ব্যক্তি দুই বছর পর্যন্ত মেয়াদের কারাদন্ড বা এক হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন।

ধারা-৪৪। শিশু কর্মচারীকে শোষণের দন্ডঃ যদি কোনো শিশুকে কেউ ঘরের কাজে, কারখানায় বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকের কাজের আড়ালে শিশুটিকে নিজ স্বার্থে শোষণ করে, আটকিয়ে রাখে বা তার উপার্জন ভোগ করে, তবে তিনি এক হাজার টাকা পর্যন্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত হবেন। একইভাবে যদি শিশুকে সমকাম, বেশ্যাবৃত্তি বা অন্যান্য নীতিগর্হিত কাজে লিপ্ত হতে বাধ্য বা উৎসাহিত করে তবে দুই বছর পর্যন্ত কারাদন্ড বা এক হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন।

ধারা- ৪৬। শিশু সম্পর্কিত রিপোর্ট বা ছবি প্রকাশের দন্ডঃ বিচারাধীন শিশু সম্পর্কিত কোনো রিপোর্ট বা ছবি আদালতের অনুমতি ব্যতীত প্রকাশ করলে দুই মাস মেয়াদের কারাদন্ড বা দু'শ টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ডের ব্যবস্থা রয়েছে।

ধারা-৫১। শিশুর শাস্তি বিধানে বাধানিষেধঃ কোনো শিশুকে মৃত্যুদন্ড, যাবজ্জীবন কারাদন্ড অথবা কারাদন্ড দেয়া যাবে না। তবে শিশুটির অপরাধ যতি এতই গুরুতর হয় যে কারাদন্ড ছাড়া মামলাটি সুরাহা সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে আদালত শিশুটিকে কারাদন্ড প্রদান কিংবা যেরুপ উপযুক্ত মনে করেন, সেরুপ স্থানে শর্তাধীনে আটক রাখার নির্দেশ দিতে পারেন।

ধারা-৫২। শিশুকে প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউটে সোপর্দঃ কোনো শিশু মৃত্যুদন্ড, যাবজ্জীবন কারাদন্ড অথবা কারাদন্ডে দন্ডনীয় অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে আদালত তার ক্ষেত্রে সমীচীন বিবেচনা করলে অন্যূন দুই বছর এবং অনধিক দশ বছর মেয়াদে আটক রাখার জন্য কোনো প্রত্যয়িত ইনস্টিটিউটে প্রেরণ করতে পারেন।

শিশুকল্যাণমূলক আইনের ক্ষেত্রে ১৯৭৪ সালের শিশু আইন একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এ আইন কার্যকর করার প্রেক্ষিতে ১৯২২ সালের বেঙ্গল শিশু আইন ও রিফরমেটরি স্কুল অ্যাক্ট রহিত করা হয়। এটি শিশুদের হেফাজত, রক্ষণাবেক্ষণ, তাদের সাথে ব্যবহার, চিকিৎসা ও কিশোর অপরাধীদের বিচার ও শাস্তি সম্পর্কিত আইন একীভূত ও সংশোধন করার জন্য একটি আইন।

শিশু আইন মূলত বাংলাদেশের শিশু ও কিশোরদেরকে অপরাধের পথ থেকে ফিরিয়ে এনে সুস্থ-সুন্দর জীবনযাপন বা সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা জন্য এক অনবদ্য পদক্ষেপ। এ আইন শিশু শ্রেণিকে সকল অত্যাচার নিপীড়ন থেকে দূরে সরিয়ে রেখে ভবিষ্যতে যাতে তারা দেশ ও জাতির কল্যাণে নিয়োজিত হতে পারে তার জন্য সকল ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। একই সাথে শিশুর প্রতি অভিভাবক, আত্মীয়স্বজন, সরকারসহ সংশ্লিষ্ট মহলের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন করা হয়েছে। তাই বলা যায়, শিশু আইন, ১৯৭৪ এদেশের শিশুদের কল্যাণে একটি পূর্ণাঙ্গ পদক্ষেপ।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের শিশুদের মানবীয় অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাসহ শিশুদের সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য শিশু আইন, ১৯৭৪ প্রণীত হয়। ১৯৭৬ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ঢাকায় এবং ১৯৮০ সালের ১ জুন বাংলাদেশের সর্বত্র এ আইটি কার্যকর হয়। আইনটিতে ১০টি ভাগে মোট ৭৮টি ধারা রয়েছে। শিশুকল্যাণমূলক আইনের ক্ষেত্রে ১৯৭৪ সালের শিশু আইন একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এ আইন কার্যকর করার প্রেক্ষিতে ১৯২২ সালের বেঙ্গল শিশু আইন ও রিফরমেটরি স্কুল অ্যাক্ট রহিত করা হয়। এটি শিশুদের হেফাজত, রক্ষণাবেক্ষণ, তাদের সাথে ব্যবহার, চিকিৎসা ও কিশোর অপরাধীদের বিচার ও শাস্তি সম্পর্কিত আইন একীভূত ও সংশোধন করার একটি অনন্য আইন। শিশু আইন মূলত বাংলাদেশের শিশু ও কিশোরদেরকে অপরাধের পথ থেকে ফিরিয়ে এনে সুস্থ-সুন্দর জীবনযাপন বা সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা জন্য এক অনবদ্য পদক্ষেপ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। শিশু আইন, ১৯৭৪ অনুযায়ী শিশু কারা?

ক) ১৫ বছরের কম বয়স্ক কোনো ছেলে বা মেয়ে
খ) ১৬ বছরের কম বয়স্ক কোনো ছেলে বা মেয়ে
গ) ১৭ বছরের কম বয়স্ক কোনো ছেলে বা মেয়ে
ঘ) ১৮ বছরের কম বয়স্ক কোনো ছেলে বা মেয়ে

২। শিশু আইন, ১৯৭৪-এ শিশুদের যেসকল অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে তা হলো:

i. মামলায় জড়িত শিশুর পরিচয় প্রকাশ করা যাবে না
ii. কোনো শিশুকে মৃত্যুদন্ড, যাবজ্জীবন কারাদন্ড অথবা কারাদন্ড দেয়া যাবে না
iii. কোনো শিশুকে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োগ করা যাবে না

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৫ যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০ (Prohibition of Dowry Act, 1980)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৫.৫.১ যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০ এবং ধারাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

৫.৫.১ যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০ (Prohibition of Dowry Act, 1980):

মুসলিম পরিবারিক আইন, ১৯৬১ তে বহু বিবাহের ক্ষেত্রে একদিকে যেমন কিছু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে, অন্যদিকে, বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা সৃষ্টির মাধ্যমে স্বামী পরিত্যক্তা নারীদের দেনমোহর প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। ফলে বাধ্যতামূলক দেনমোহর একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় পুরুষের জন্য। এরই প্রভাব হিসেবে যৌতুকের প্রচলন দেখা দেয়। যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধি, যা সমাজের নারীকে হেয়প্রতিপন্ন করে এবং নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। নারীকে যৌতুক নামক অভিশাপ থেকে মুক্ত করে সমাজে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে প্রণীত হয় যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০। ১৯৮১ সালের ১ অক্টোবর থেকে সারা বাংলাদেশে আইনটি কার্যকর হয়। নিচে এ আইনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো আলোচনা করা হলো:

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন:** এ আইনটি যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০ নামে অখ্যায়িত হবে। সরকারি গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হতে আইনটি কার্যকর হবে।

২। **যৌতুকের সংজ্ঞা:** এ আইনে যৌতুক বলতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রদত্ত যে কোনো সম্পত্তি বা মূল্যবান জামানতকে বোঝায়; যা বিয়ে অনুষ্ঠানে একপক্ষ অন্য পক্ষকে প্রদান করে অথবা বিয়ের কোনো এক পক্ষের পিতামাতা বা অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বিয়ের যে কোনো পক্ষকে বিয়ের আসরে অথবা বিয়ের পূর্বে বা পরে, বিয়ের পণরুপে প্রদান করে বা প্রদান করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়। কতটাকা যৌতুক বলে বিবেচিত হবে তা উল্লেখ করতে হবে। তবে যৌতুক বলতে মুসলিম পরিবারিক আইন মোতাবেক ব্যবস্থিত দেনমোহর বা মোহরানা বোঝায় না।

৩। **যৌতুক প্রদান ও গ্রহণের শাস্তি:** এ আইন কার্যকর হওয়ার পর কোনো ব্যক্তি যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ করলে অথবা প্রদান ও গ্রহণে সহায়তা করলে পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড যা এক বছরের কম হবে না বা পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন।

৪। **যৌতুক দাবির শাস্তি:** এ আইন কার্যকর হওয়ার পর কোনো ব্যক্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কনে অথবা বরের পিতামাতা বা অভিভাবকের নিকট যৌতুক দাবি করলে পাঁচ বছর মেয়াদে কারাদন্ড যা এক বছরের কম হবে না অথবা পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন।

৫। **যৌতুক প্রদান বা গ্রহণের চুক্তি বাতিল:** এ আইন বলবৎ হওয়ার পর যৌতুক প্রদান বা গ্রহণের যে কোনো চুক্তি বাতিল বলে গণ্য হবে।

৬। **অপরাধসমূহের আমল:** এ আইনের কোনো অপরাধ প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেটের নিচের কোনো আদালত বিচার করতে পাবেন না। অপরাধ সংঘটনের তারিখ থেকে এক বছরের মধ্যে অভিযোগ দায়ের করা না হলে আদালত এ আইনের কোনো অপরাধ আমলে নেবেন না। এছাড়াও এ আইন আমলযোগ্য অপরাধের জন্য অপরাধী ব্যক্তিকে আইনানুযায়ী যেকোনো দন্ড প্রদানে প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট বৈধ ক্ষমতার অধিকারী।

৭। **অপরাধসমূহ আমল-অযোগ্য, জামিন-অযোগ্য ও আপোষযোগ্য**

ক. আমল-অযোগ্য অপরাধ: যেসকল অপরাধের ক্ষেত্রে কোনো পুলিশ কর্মকর্তা গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ব্যতীত আসামিকে গ্রেপ্তার করতে পারেন না, সে সকল অপরাধ আমল-অযোগ্য। এ আইন অনুযায়ী একজন প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট গ্রেপ্তারি পরোয়ানা ইস্যু করলে তবেই কোনো পুলিশ কর্মকর্তা অপরাধীকে গ্রেপ্তার করতে পারবেন।

খ. জামিন-অযোগ্য অপরাধ: এ আইনে কেউ অপরাধ করলে তা জামিন-অযোগ্য। তবে, জামিন মঞ্জুর করা বা না করা আদালতের বিবেচনাপ্রসূত ক্ষমতার ওপর নির্ভরশীল।

গ. আপোষযোগ্য: যেসকল অপরাধের জন্য শাস্তির বিধান রয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে অপরাধীর শাস্তি পাওয়া উচিত। তবে ফরিয়াদি ও আসামি যদি তাদের বিবাদ মীমাংসা করে নেন তবে তা অনুমোদনযোগ্য।

এ আইনটি বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ। এ আইন প্রণীত হওয়ার পর থেকে এদেশের নারীরা যৌতুক নামক অভিশাপ থেকে অনেকটা মুক্তি পেয়েছে। যৌতুকের অভিশাপে অনেক দরিদ্র পরিবার তাদের কন্যাকে বিয়ে দিতে পারতো না এবং বিয়ে দেওয়ার পরও অত্যাচার, নির্যাতন ও তালাকের সম্মুখীন হতে হতো। এ আইন নারীদেরকে এ অবস্থা থেকে অনেকটা মুক্ত করতে সক্ষম হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

১৯৬১ সালের মুসলিম পরিবারিক আইনে বহু বিবাহের ক্ষেত্রে একদিকে যেমন কিছু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা হয়েছে, অন্যদিকে বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা সৃষ্টির মাধ্যমে স্বামী পরিত্যক্তা নারীদের দেনমোহর প্রাপ্তির নিশ্চয়তা বিধান করা হয়। ফলে বাধ্যতামূলক দেনমোহর একটি সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় পুরুষের জন্য। এরই প্রভাব হিসেবে যৌতুকের প্রচলন দেখা দেয়। যৌতুক একটি সামাজিক ব্যাধি, যা সমাজের নারীকে হেয়প্রতিপন্ন করে এবং নারী উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। নারীকে যৌতুক নামক অভিশাপ থেকে মুক্ত করে সমাজে তাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে প্রণীত হয় যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০। ১৯৮১ সালের ১ অক্টোবর থেকে সারা বাংলাদশে আইনটি কার্যকর হয়। এ আইনটি বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ। এ আইন প্রণীত হওয়ার পর থেকে এদেশের নারীরা যৌতুক নামক অভিশাপ থেকে অনেকটা মুক্তি পেয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০ সারা বাংলাদেশে কবে থেকে কার্যকরী হয়?

ক) ১৯৮১ সালের ১ সেপ্টেম্বর
খ) ১৯৮১ সালের ১ অক্টোবর
গ) ১৯৮১ সালের ১ নভেম্বর
ঘ) ১৯৮১ সালের ১ ডিসেম্বর

২। যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০-এর অধীন সংঘটিত অপরাধসমূহ হলো–

i. আমল-অযোগ্য
ii. জামিন-অযোগ্য
iii. আপোষযোগ্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৬ নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ (The Cruelty to Women [Deterent Punishment] Ordinance-1983)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৫.৬.১: নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর ধারাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

৫.৬.১ নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ (The Cruelty to Women [Deterent Punishment] Ordinance-1983)

১. নারী নির্যাতন বাংলাদেশে নিত্য ঘটনা। নারীকে শারীরিকভাবে নির্যাতন, অপহরণ, যৌতুকের কারণে হত্যা, ধর্ষণ, ধর্ষণের উদ্দেশ্যে হত্যা প্রভৃতি অপরাধ উল্লেখযোগ্য। সমাজে নারীকে এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রণীত হয় নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩। এ আইনটি ১৯৮৩ সালের ৩ অক্টোবর থেকে বাংলাদেশে কার্যকর হয়। এ আইনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১। **শিরোনাম ও প্রয়োগ:** এ অধ্যাদেশ নারীদের প্রতি নৃশংস আচরণ বা নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ, ১৯৮০ হিসেবে অভিহিত হবে। বাংলাদেশের সকল নাগরিক, তারা যেখানে থাকুক না কেন এবং বাংলাদেশে সাময়িকভাবে বসবাসরত যে কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে এ আইন প্রযোজ্য হবে।

২। **অন্যান্য সকল আইনের ওপর এর প্রাধান্য:** বর্তমানে প্রচলিত সকল আইনের ওপর এ আইনের বিধানসমূহ কার্যকর হবে।

৩। **বে-আইনি বা অসৎ উদ্দেশ্যে নারী অপহরণ বা অপহরণের শাস্তি:** যদি কোনো ব্যক্তি যে কোনো বয়সী নারীকে জোরপূর্বক অপহরণ করে পতিতাবৃত্তি বা কোনো অসৎ উদ্দেশ্যে নিয়োগ বা ব্যবহার করে, নারীকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তিকে বিবাহ করতে বাধ্য করে অথবা অবৈধ যৌনসঙ্গমে বল প্রয়োগ বা প্রলুব্ধ করো, তবে ঐ ব্যক্তি যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা চৌদ্দ বছর সশ্রম কারাদন্ড বা অর্থদন্ড (এক লাখ টাকা পর্যন্ত) বা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন।

৪। **নারী ব্যবসা পরিচালনার শাস্তি:** যে কেউ যে কোনো বয়সের নারীকে যদি পতিতাবৃত্তি বা কোনো ব্যক্তির সাথে নিষিদ্ধ যৌনসঙ্গমের উদ্দেশ্যে বা কোনো বেআইনি ও অনৈতিক উদ্দেশ্যে আমদানি-রপ্তানি বা বিক্রি করে, ভাড়া দেয় বা অন্যভাবে হস্তান্তর করে বা ক্রয় করে বা অন্যদের কোনোভাবে দখলে নেয়, তবে ওই ব্যক্তি মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা চৌদ্দ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড যা সাত বছরের কম হবে না বা অর্থদন্ড অথবা উভয়দন্ডে দন্ডিত হবেন।

৫। **যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানোর শাস্তি:** যদি কোনো নারীর স্বামী বা স্বামীর পিতামাতা বা অভিভাবক বা আত্মীয়স্বজন যৌতুকের জন্য উক্ত নারীর মৃত্যু ঘটায় বা ঘটানোর চেষ্টা করে, তবে ওই ব্যক্তি মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা চৌদ্দ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদন্ড বা অর্থদন্ড অথবা উভয় দন্ডে দন্ডিত হবেন।

৬। **ধর্ষণের ক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটানোর শাস্তি:** যদি কেউ ধর্ষণ করতে গিয়ে বা ধর্ষণের চেষ্টা করে কোনো নারীর মৃত্যু ঘটায় অথবা ধর্ষণের পরে যদি নারীকে হত্যা করে তবে সে মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন করাদন্ড এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হবেন।

৭। **ধর্ষণের ক্ষেত্রে মৃত্যু বা গুরুতর আঘাত করার শাস্তি:** যদি কেউ ধর্ষণ করতে গিয়ে অথবা ধর্ষণের চেষ্টা করতে গিয়ে কোনো নারীর মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করে বা গুরুতর আঘাত করে, তাহলে সে যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা চৌদ্দ বছর মেয়াদের কারাদন্ড বা অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে।

৮। **অপরাধের সহায়তা ও প্ররোচনা:** যদি কেউ এ অধ্যাদেশের দন্ডনীয় কোনো অপরাধের সহায়তা করে বা প্ররোচনা দেয়, তাহলে অপরাধের জন্য যে শাস্তি, ওই ক্ষেত্রে সে একই শাস্তি ভোগ করবে।

নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ নারী সমাজের নিরাপত্তা বিধান, মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং সকল প্রকার নির্যাতন থেকে নারীকে রক্ষার জন্য এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এ আইনের মাধ্যমে নারীকে দিয়ে অবৈধ ও অনৈতিক ব্যবসা পরিচালনাসহ নারীকে যথেচ্ছা ব্যবহারের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

নারী নির্যাতন বাংলাদেশে নিত্য ঘটনা। নারীকে শারীরিকভাবে নির্যাতন, অপহরণ, যৌতুকের কারণে হত্যা, ধর্ষণ, ধর্ষণের উদ্দেশ্যে হত্যা প্রভৃতি অপরাধ উল্লেখযোগ্য। সমাজে নারীকে এ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য প্রণীত হয় নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩। এ আইনটি ১৯৮৩ সালের ৩ অক্টোবর থেকে বাংলাদেশে কার্যকর হয়। ১৯৮৩ সালের এই আইন নারী সমাজের নিরাপত্তা বিধান, মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং সকল প্রকার নির্যাতন থেকে নারীকে রক্ষার জন্য এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। এ আইনের মাধ্যমে নারীকে দিয়ে অবৈধ ও অনৈতিক ব্যবসা পরিচালনাসহ নারীকে যথেচ্ছা ব্যবহারের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ অনুযায়ী ধর্ষণের ফলে মৃত্যু ঘটানোর শাস্তি কী?
- ক) মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ড
- খ) মৃত্যুদন্ড বা ১৫ বছরের সশ্রম কারাদন্ড
- গ) মৃত্যুদন্ড বা ১৪ বছরের সশ্রম কারাদন্ড
- ঘ) যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা ১০ বছরের সশ্রম কারাদন্ড

২। নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ অনুযায়ী যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানোর শাস্তি কী?
- ক) মৃত্যুদন্ড বা ১০ বছরের সশ্রম কারাদন্ড
- খ) মৃত্যুদন্ড বা ২০ বছরের সশ্রম কারাদন্ড
- গ) মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ড
- ঘ) যাবজ্জীবন কারাদন্ড বা ৫ বছরের সশ্রম কারাদন্ড

পাঠ-৫.৭ মাদক নিরোধ অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ (Drug Control Ordinance, 1989)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৫.৭.১ মাদক নিরোধ অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ এর ধারাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

৫.৭.১: মাদক নিরোধ অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ (Drug Control Ordinance, 1989)

বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে মাদকাসক্তি অন্যতম। মাদকের মরণছোবলে দেশের তরুণ ও যুবশক্তি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। এ ভয়াবহ অবস্থা থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষার জন্য ১৯৮৬ সালে গঠন করা হয় "মাদকদ্রব্য বিরোধী জাতীয় কমিটি"। ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ সালে মাদকদ্রব্যবিরোধী জাতীয় কমিটির প্রথম সভার মাদকদ্রব্য সম্পর্কিত প্রচলিত আইনসমূহ সংস্কার ও নতুন আইন প্রণয়নের জন্য কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে ১৯৮৯ সালের ২০ জানুয়ারি "জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড" গঠিত হয় এবং মাদক নিয়ন্ত্রন অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ জারি করা হয়। মাদকাসক্তদের পুনর্বাসন, চিকিৎসা ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালের ২ জানুয়ারি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ বলবৎ করা হয়। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশের বিধান মোতাবেক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো:

১। **মাদকদ্রব্য:** মত্ততাজনক বা নেশাগ্রস্ত দ্রব্য যা গ্রহণ বা সেবনে মানুষ অপ্রকৃতিস্থ হয়ে যেতে পারে বা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

'ক' শ্রেণির মাদকদ্রব্য: অপিয়াম, পপি, আফিম উদ্ভূত মাদকদ্রব্য যেমন– মরফিন, কোডিন, থিবাইন, নোজকাপাইন, নারকোটিন ইত্যাদি। আফিম সমধর্মী মাদকদ্রব্য যেমন– পেথিডিন, মেথাডন, আলফা প্রোডাইন, বেটাপ্রোডাইন ইত্যাদি। কোকেন বা কোকা উদ্ভূত যেকোনো পদার্থ, ক্যানাবিস, চরশ, হাশিশ, হেরোইন, মরফিন ইত্যাদি।

'খ' শ্রেণির মাদকদ্রব্য: গাঁজা, ভাং, তামাকদ্রব্য, অ্যালকোহলো, সকল প্রকার মদ, মিথাইল ইত্যাদি।

'গ' শ্রেণির মাদকদ্রব্য: তাড়ি, পঁচুই, স্পিরিট, অক্সাজিপাম, লোরাজিপাম, টেমাজিপাম ইত্যাদি।

২। **মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড:** মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য "জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড" নামক ১৯ সদস্যবিশিষ্ট একটি নীতিনির্ধারণী সংস্থা গঠন করা হয়। সরকার মনোনীত একজন সদস্য এ বোর্ডের চেয়ারম্যান। এছাড়া সরকারের এগারো জন মন্ত্রী ও একজন সচিব বোর্ডের অন্যতম সদস্য।

বোর্ডের দায়িত্ব ও কর্তব্য:

ক. মাদকসৃষ্ট সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া রোধের জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ;

খ. মাদকদ্রব্য উৎপাদন, সরবরাহ, ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন;

গ. মাদকসংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য সংগ্রহের জন্য যেকোনো ধরনের গবেষণা ও জরিপ পরিচালনা;

ঘ. মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনসংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন এবং তা বাস্তবায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;

ঙ. মাদকদ্রব্যের কুফল সম্পর্কে জনসাধারণকে সচেতন করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও প্রচারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

চ. মাদকদ্রব্য সংক্রান্ত বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সাথে যোগাযোগ স্থাপন এবং সংশ্লিষ্ট যাবতীয় কাজের সমন্বয় সাধন।

৩। **মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর:** এ আইনের বিধানমতে, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের যাবতীয় সিদ্ধান্ত ও কার্যক্রম পরিচালনার জন্য "জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর" প্রতিষ্ঠা করা হয়। একজন মহাপরিচালক এ অধিদপ্তরের যাবতীয় কার্যাবলী পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।

৪। **মাদকদ্রব্য উৎপাদন ও ব্যবহার:** এ আইন অনুসারে–

ক. অ্যালকোহলো ব্যতীত সকল প্রকার মাদকদ্রব্য এবং মাদক উৎপাদনে ব্যবহৃত হয় এমন সব উপকরণের চাষাবাদ, উৎপাদন, প্রক্রিয়াজাত, পরিবহন, আমদানি, রপ্তানি, সরবরাহ, ক্রয়বিক্রয়, ধারণ, সংরক্ষণ, গুদামজাতকরণ, প্রদর্শন ও ব্যবহার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

খ. শর্তসাপেক্ষে অ্যালকোহলো উৎপাদন, বাজারজাতকরণ ও ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হবে। প্রধান প্রধান শর্তগুলো হলো:

১। এ আইনের অধীনে প্রদত্ত অনুমতি ব্যতীত অ্যালকোহলো উৎপাদনের জন্য কারখানা স্থাপন করা যাবে না;

২। কোনো ওষুধ তৈরির উপাদান হিসেবে ব্যবহার;

৩। অধিদপ্তরের অনুমতি ব্যতীত কোনো ব্যক্তি অ্যালকোহলো পান করতে পাবে না;

৪। কোনো বিদেশি নাগরিক প্রকাশ্যে নয়, লাইসেন্স প্রাপ্ত বার-এ বসে অ্যালকোহলো পান করতে পারবে; এবং

৫। চিকিৎসার প্রয়োজনে ও সিভিল সার্জন বা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপকের লিখিত ব্যবস্থাপত্র এবং সেই ব্যবস্থাপত্রের জন্য অধিদফতরের মহাপরিচালকের লিখিত অনুমোদন ছাড়া কোনো মুসলমানকে অ্যালকোহলো গ্রহণের অনুমতি দেওয়া যাবে না।

৫। মাদকের দোকান বন্ধকরণ: কোনো এলাকার আইনশৃংখলা পরিস্থিতির অবনতির আশঙ্কায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ কমিশনার যে কোনো লাইসেন্সপ্রাপ্ত মদের দোকান অনধিক ১৫ দিনের জন্য বন্ধ ঘোষণা করতে পাবেন। প্রয়োজনে বোর্ডের অনুমতিক্রমে এ মেয়াদ ত্রিশ দিন পর্যন্ত বাড়ানো যাবে।

৬। দেহ তল্লাশি: মাদকদ্রব্য বহনে সন্দেহভাজন ব্যক্তির সর্বোতভাবে দেহ তল্লশি করা যাবে।

৭। মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র: প্রয়োজনে সরকার এক বা একাধিক মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

৮। মাদকাসক্ত ব্যক্তির চিকিৎসা: কোনো মাদকাসক্ত ব্যক্তি স্বেচ্ছায় বা তার অভিভাবক মাদকাসক্তির চিকিৎসার ব্যবস্থা না নিলে অধিদপ্তরের মহাপরিচালক বা তার মনোনীত প্রতিনিধি মাদকাসক্ত ব্যক্তিকে চিকিৎসা কেন্দ্রে পাঠাতে নির্দেশ দিতে পারবেন।

৯। শাস্তির বিধান: এ আইনের বিধান লঙ্ঘন করে মাদকদ্রব্য গ্রহণ, সরবরাহ, বহন, বিপণন, চাষাবাদ ও সংরক্ষণ ইত্যাদি করলে মাদকদ্রব্যের শ্রেণি, প্রকৃতি, পরিমাণ, প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী সর্বনিম্ন দুই বছর থেকে যাবজ্জীবন, মৃত্যুদন্ড এবং অর্থদন্ডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

এছাড়া কোনো ব্যক্তি যদি সজ্ঞানে এ আইনের অধীন কোনো অপরাধ সংঘটনের জন্য তার মালিকানাধীন বা দখলীয় ঘরবাড়ি, জমি, যানবাহন, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ব্যবহারের অনুমতি দেন, তাহলে তিনি অনূর্ধ্ব পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড এবং অর্থদন্ডে দন্ডিত হবেন।

এ আইনটিতে ১৯৩০ সালের "বিপজ্জনক ড্রাগস অ্যাক্ট"- এ যে সকল বিষয়ে অস্পষ্টতা ও জটিলতা ছিল তা দূর করা হয়েছে। আইনটি মূলত এদেশের তরুণ ও যুবসমাজকে মাদকের মরণছোবল থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইনের সবচেয়ে উল্লেযোগ্য বিষয় হলো মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে মাদকাসক্তি অন্যতম। মাদকের মরণছোবলে দেশের তরুণ ও যুবশক্তি ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। এ ভয়াবহ অবস্থা থেকে দেশ ও জাতিকে রক্ষার জন্য ১৯৮৬ সালে গঠন করা হয় মাদকদ্রব্য বিরোধী জাতীয় কমিটি। ২৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ সালে মাদকদ্রব্য বিরোধী জাতীয় কমিটির প্রথম সভার মাদকদ্রব্য সম্পর্কিত প্রচলিত আইনসমূহ সংস্কার ও নতুন আইন প্রণয়নের জন্য কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে ১৯৮৯ সালের ২০ জানুয়ারি "জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড" গঠিত হয়। মাদকাসক্তদের পুনর্বাসন, চিকিৎসা ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ১৯৯০ সালের ২ জানুয়ারি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ বলবৎ করা হয়। এ আইনটিতে ১৯৩০ সালের "বিপজ্জনক ড্রাগস অ্যাক্ট"- এ যে সকল বিষয়ে অস্পষ্টতা ও জটিলতা ছিল তা দূর করা হয়েছে। আইনটি মূলত এদেশের তরুণ ও যুবসমাজকে মাদকের মরণছোবল থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য প্রণয়ন করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। বাংলাদেশের জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ড-এর সদস্য সংখ্যা কতজন?

ক) ১৯ জন খ) ২১ জন
গ) ২৩ জন ঘ) ২৫ জন

২। মাদক নিরোধ অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ অনুযায়ী মাদকদ্রব্য হলো–

i. অপিয়াম পপি, মরফিন, নারকোটিন, পেথিডিন, হেরোইন, মরফিন
ii. গাঁজা, ভাং, তামাকদ্রব্য, অ্যালকোহল, সকল প্রকার মদ, মিথাইল
iii. তাড়ি, পঁচুই, স্পিরিট, অক্সাজিপাম, লোরাজিপাম, টেমাজিপাম

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৮ নারী ও শিশু নির্যাতনরোধ আইন, ২০০৩ (Women and Children Repression Prevention Act, 2003)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৫.৮.১ নারী ও শিশু নির্যাতনরোধ আইন, ২০০৩-এর ধারাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

৫.৮.১ নারী ও শিশু নির্যাতনরোধ আইন, ২০০৩ (Women and Children Repression Prevention Act, 2003)

নারী ও শিশু নির্যাতন, নারীর প্রতি অব্যাহত বৈষম্য ও সহিংসতা রোধে ১৯৮৩ ও ১৯৮৫ সালে পৃথক দুটি আইন প্রণয়ন হলেও তা কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া সময়ের পরিবর্তনে নারী ও শিশু নির্যাতনে যে নতুন রুপে প্রকাশ পায় তারই প্রেক্ষিতে প্রণীত হয় "নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০"। কিন্তু আইনটির কিছু অস্পষ্টতা ও দুর্বলতার কারণে কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। ফলে আইনটির সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এরই প্রেক্ষিতে প্রণীত হয় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন ২০০৩। এ আইনে 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০'-এর ১২টি অনুচ্ছেদে সংশোধনী আনা হয়েছে এবং অপরাধের তদন্ত ও বিচার সম্পর্কিত ৬টি নতুন ধারা সংযোজিত হয়েছে। এ আইনের উল্লেখযোগ্য দিকগুলো নিচে আলোচনা করা হলো:

১। **শিশু:** এ আইনে শিশু বলতে অনধিক ১৬ বছরের ছেলেমেয়েকে বুঝানো হয়েছে।

২। **যৌতুক:** এ আইনে যৌতুক বলতে, কোনো বিবাহের বর বা বরের পিতা বা মাতা বা প্রত্যক্ষভাবে বিবাহের সঙ্গে জড়িত বরপক্ষের অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত বিবাহের সময় বা তার পূর্বে বা বৈবাহিক সম্পর্ক বিদ্যমান থাকাকালে বিবাহ স্থির থাকার শর্তে, বিবাহের পণ হিসেবে কনেপক্ষের কাছে দাবিকৃত অর্থ, সামগ্রী বা অন্যবিধ সম্পদ। অথবা, কোনো বিবাহে কনে কর্তৃক বিবাহের পর বরপক্ষের অন্য কোনো ব্যক্তিকে উক্ত বিবাহের সময় বা তার পূর্বে বা বৈবাহিক সম্পর্ক থাকাকালে, বিবাহ স্থির থাকার শর্তে বিবাহের পণ হিসেবে প্রদত্ত বা প্রদানে সম্মত অর্থ, সামগ্রী বা অন্যবিধ সম্পদ।

৩। **দহনকারী পদার্থ দ্বারা সংঘটিত অপরাধের শাস্তি:** যদি কোনো ব্যক্তি দহনকারী বা ক্ষয়কারী পদার্থ দ্বারা নারী বা শিশুর মৃত্যু ঘটায় বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করে তাহলে অভিযুক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ড এবং অতিরিক্ত অনুর্ধ্ব একলক্ষ টাকা অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে। এছাড়া শীরের অন্য কোনো অঙ্গহানি, বিকৃতি বা নষ্ট হলে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড এবং অতিরিক্ত ৫০ হাজার টাকা জরিমানা করা হবে।

৪। **নারী পাচার ও শাস্তি:** কোনো ব্যক্তি যদি বে-আইনি বা নীতিগর্হিত কাজে নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে কোনো নারীকে বিদেশে পাচার বা প্রেরণ অথবা ক্রয়বিক্রয়, ভাড়া বা নির্যাতনের উদ্দেশ্যে হস্তান্তর বা আটক রাখার জন্য অভিযুক্ত হয়, তবে ওই ব্যক্তি মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ডসহ অতিরিক্ত অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে।

৫। **শিশুর প্রতি অবিচার ও শাস্তি:** নারী ও শিশু ক্রয়বিক্রয়, আটক বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে অপহরণের ক্ষেত্রে যাবজ্জীবন বা অন্যূন ১৪ বছর সশ্রম কারাদন্ডসহ অতিরিক্ত অর্থদন্ডের বিধান রয়েছে। এছাড়া মুক্তিপণ আদায়ের উদ্দেশ্যে নারী বা শিশুকে আটক রাখার ক্ষেত্রে মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডসহ অর্থদন্ডের বিধান রয়েছে।

৭। **ধর্ষণের শাস্তি:** কোনো নারী বা পুরুষকে ধর্ষণ করলে অভিযুক্ত ব্যক্তি যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ডসহ অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে।

৮। **ধর্ষণের ফলে জন্ম নেওয়া শিশুর ভরণপোষণ:** এ আইন অনুযায়ী ধর্ষণের ফলশ্রুতিতে জন্মলাভকারী শিশুর ভরণপোষণের দায়িত্ব সরকার বহন করবে। পুত্র সন্তানের ক্ষেত্রে ২১ বছর এবং কন্যা সন্তানের ক্ষেত্রে বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত ভরণপোষণের যাবতীয় খরচ ধর্ষকের নিকট থেকে সরকার আদায় করবে।

৯। **যৌন নিপীড়ন:** এ আইনে কোনো পুরুষ অবৈধভাবে তার যৌনাকাঙ্খা পূরণের উদ্দেশ্যে তার শরীরের যে কোনো অঙ্গ বা কোনো বস্তু দ্বারা কোনো নারী বা শিশুর যৌনাঙ্গ বা অন্য কোনো অঙ্গ স্পর্শ করলে তা যৌন নিপীড়ন হিসেবে বিবেচিত হবে। এক্ষত্রে অভিযুক্তের শাস্তি হবে ন্যূনতম ৩ থেকে ১০ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড।

১০। **সম্ভ্রমহানি জনিত কারণে আত্মহত্যা:** কোনো নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো ব্যক্তির ইচ্ছাকৃত কোনো কাজের দ্বারা সম্ভ্রমহানি হওয়ার প্রত্যক্ষ কারণে কোনো নারী আত্মহত্যা করলে বা উক্ত ব্যক্তি নারীকে প্ররোচিত করলে অভিযুক্ত ব্যক্তি অনধিক ১০ বছর, ন্যূনতম ৫ বছর সশ্রম কারাদন্ডে দন্ডিত হবে।

১১। **যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানোর শাস্তি:** কোনো নারীর স্বামী, পিতামাতা, অভিভাবক, আত্মীয় বা স্বামীর পক্ষের অন্য কোনো ব্যক্তি যদি যৌতুকের জন্য মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করে, আহত করে তবে যাবজ্জীবন কারাদন্ডসহ অর্থদন্ডে দন্ডিত হবে।

১২। **তদন্তের সময়সীমা:** এ আইনের আওতায় সংঘটিত কোনো অপরাধ হাতেনাতে ধরা পড়লে অপরাধ সংঘটনের ১৫ দিনের মধ্যে বিচার কার্য শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রে তদন্তের জন্য সর্বোচ্চ ১০৫ দিন ধার্য করা হয়েছে।

১৩। **রুদ্ধদ্বার কক্ষে বিচার:** সংশোধিত বিধান অনুযায়ী বাদী বা বিবাদীর আবেদনের প্রেক্ষিতে ধর্ষণ সংক্রান্ত মামলার বিচার রুদ্ধদ্বার কক্ষে পরিচালনার সুযোগ রাখা হয়েছে।

আইনটি নারী ও শিশুর কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ। পূর্বের আইনগুলোর তুলনায় আইনটি যথেষ্ট বাস্তবসম্মত। এ আইনে নারী ও শিশুর সার্বিক বিষয় বিবেচনা করে অপরাধীদের কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

নারী ও শিশু নির্যাতন, নারীর প্রতি অব্যাহত বৈষম্য ও সহিংসতা রোধে ১৯৮৩ ও ১৯৮৫ সালে পৃথক দুটি আইন প্রণয়ন হলেও তা কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়। তাছাড়া সময়ের পরিবর্তনে নারী ও শিশু নির্যাতনের যে নতুন রূপ প্রকাশ পায় তারই প্রেক্ষিতে প্রণীত হয় "নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০"। কিন্তু আইনটির কিছু অস্পষ্টতা ও দুর্বলতার কারণে কার্যকর ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। ফলে আইনটির সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এরই প্রেক্ষিতে প্রণীত হয় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩। এ আইনে 'নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০'-এর ১২টি অনুচ্ছেদে সংশোধনী আনা হয়েছে এবং অপরাধের তদন্ত ও বিচার সম্পর্কিত ৬টি নতুন ধারা সংযোজিত হয়েছে। আইনটি নারী ও শিশুর কল্যাণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি যুগোপযোগী পদক্ষেপ। পূর্বের আইনগুলোর তুলনায় আইনটি যথেষ্ট বাস্তবসম্মত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। এ আইনের আওতায় সংঘটিত কোনো অপরাধ হাতেনাতে ধরা পড়লে কতদিনের মধ্যে বিচার কার্য শুরু করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে?

ক) ১৫ দিন খ) ৩০ দিন
গ) ৪৫ দিন ঘ) ৬০ দিন

২। এ আইন অনুযায়ী বে-আইনি বা নীতিগর্হিত কাজে নিয়োগ করার উদ্দেশ্যে কোনো নারীকে বিদেশে পাচারের শাস্তি–

i. মৃত্যুদন্ড বা যাবজ্জীবন কারাদন্ড
ii. যাবজ্জীবন কারাদন্ডসহ অতিরিক্ত অর্থদন্ড
iii. মৃত্যুদন্ড বা ১৪ বছর সশ্রম কারাদন্ড

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৫.৯ হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন, ২০১২ (The Hindu Marriage Registration Act, 2012)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৫.৯.১ হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন, ২০১২-এর ধারাসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

৫.৯.১ হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন, ২০১২ (The Hindu Marriage Registration Act, 2012)

বাংলাদেশে বসবাসরত হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের শাস্ত্রীয় বিবাহের দালিলিক প্রমাণ সুরক্ষার জন্য "হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন, ২০১২" প্রণীত হয়। ২০১২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখে প্রণীত আইনটিতে সর্বমোট ১৫টি ধারা রয়েছে। এ আইনের ধারাসমূহ নিচে আলোচনা করা হলো:

ধারা-১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ ও প্রবর্তন: এ আইন হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন, ২০১২ নামে অভিহিত হবে এবং নাগরিকত্ব নির্বিশেষে বাংলাদেশে বসবাসরত সকল হিন্দু ধর্মাবলম্বীর জন্য এটি প্রযোজ্য হবে। সরকারি গেজেটে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হতে এটি কার্যকর হবে।

ধারা-২। সংজ্ঞা: বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকলে এ আইনে–

ক) হিন্দু অর্থ বাংলাদেশের হিন্দু ধর্মাবলম্বী কোনো নাগরিক;

খ) হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক অর্থ ধারা-৪ এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক;

গ) হিন্দু বিবাহ অর্থ হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সম্পন্ন ও হিন্দু শাস্ত্র মোতাবেক প্রচলিত প্রথা ও রীতি অনুযায়ী অনুমোদিত বিবাহ; এবং

ঘ) জেলা রেজিস্ট্রার অর্থ Registration Act, 1908 এর অধীন নিযুক্ত রেজিস্ট্রার বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা।

ধারা-৩। হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন: অন্য কোনো আইন, প্রথা ও রীতিনীতিতে যাই থাকুক না কেন, হিন্দু বিবাহের দালিলিক প্রমাণ সুরক্ষার উদ্দেশ্যে হিন্দু বিবাহ বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধন করা যাবে। তবে কোনো হিন্দু বিবাহ এ আইনের অধীনে নিবন্ধিত না হলেও হিন্দু শাস্ত্র অনুযায়ী সম্পন্ন বিবাহের বৈধতা ক্ষুণ্ন হবে না।

ধারা-৪। বিবাহ নিবন্ধক নিয়োগ: এ আইনের অধীনে হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের উদ্দেশ্যে সরকার সিটি করপোরেশন এবং প্রতিটি উপজেলায় একজন করে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক নিয়োগ প্রদান করবে যিনি এ আইনে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক হিসেবে অভিহিত হবেন।

ধারা-৫। হিন্দু বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ: অন্য কোনো আইনে যাই থাকুক না কেন **২১** বছরের কম বয়স্ক কোনো হিন্দুপুরুষ ও **১৮** বছরের কম বয়স্ক কোনো হিন্দু নারী বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলে এ আইনের অধীনে তা নিবন্ধনযোগ্য হবে না।

ধারা-৬। বিবাহ নিবন্ধন পদ্ধতি: হিন্দু ধর্ম, রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান অনুযায়ী হিন্দু বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর উক্ত বিবাহের দালিলিক প্রমাণ সুরক্ষার উদ্দেশ্যে বিবাহের যে কোনো পক্ষের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক নির্ধারিত পদ্ধতিতে নিবন্ধন করবেন। এ আইন কার্যকর হওয়ার পূর্বে হিন্দু ধর্ম, রীতিনীতি ও আচার-অনুষ্ঠান অনুযায়ী সম্পন্নকৃত বিবাহের ক্ষেত্রে একই পদ্ধতিতে নিবন্ধন করা যাবে।

ধারা-৭। বিবাহ নিবন্ধন ফিস: সরকার সময় সময় বিধি দ্বারা হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন ফিস এবং প্রতিলিপি সরবরাহের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় ফিস নির্ধারণ করতে পারবে।

ধারা-৮। বিবাহ নিবন্ধকের দায়িত্ব পালন: ধারা ৪ অনুযায়ী নিয়োগপ্রাপ্ত হিন্দু বিবাহ নিবন্ধকের দায়িত্ব পালন সরকারি চাকুরি হিসেবে গণ্য হবেনা।

ধারা-৯। সবেতনে চাকরির ক্ষেত্রে বাধা নিষেধ: কোনো হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক তাকে যে এলাকার জন্য নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে সে এলাকার নির্ধারিত প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোথায়ও সবেতনে চাকরি করতে পারবেন না।

ধারা-১০। নিবন্ধন বহিসমূহ পরিদর্শন: কোনো ব্যক্তি নির্ধারিত ফিস পরিশোধ করে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন বহি পরিদর্শন বা এর অন্তর্ভুক্ত কোনো বিবাহ নিবন্ধনের প্রতিলিপি সংগ্রহ করতে পারবেন।

ধারা-১১। নিবন্ধন বহি সংরক্ষণ: প্রত্যেক হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক বছরের শুরুতে নিবন্ধন বহিতে নতুন ক্রমিক নম্বর উল্লেখপূর্বক বিবাহ নিবন্ধন করবেন এবং নিবন্ধক দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেলে নিবন্ধন বহি ও অন্যান্য কাগজপত্র নিরাপত্তা হেফাজতের জন্য সংশ্লিষ্ট জেরা রেজিস্ট্রারের নিকট জমা প্রদান করবেন।

ধারা-১২। বিবাহ নিবন্ধনের প্রতিলিপি প্রদান: এ আইনের অধীন হিন্দু বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষেত্রে বিবাহের পক্ষদ্বয় বা তাদের মনোনীত প্রতিনিধি কর্তৃক আবেদনের প্রেক্ষিতে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত বিবাহ নিবন্ধনের প্রতিলিপি সরবরাহ করবেন।

ধারা-১৩। তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি: প্রত্যেক হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক সংশ্লিষ্ট জেলার রেজিস্ট্রারের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে থেকে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা-১৪। নিয়োগ স্থগিত বা বাতিলকরণ: সরকারের নিকট যদি সন্তোষজনকভাবে এই মর্মে প্রতীয়মান হয় যে, কোনো হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক তার দায়িত্ব পালনে কোনো অসদাচরণের জন্য দায় অথবা দায়িত্ব পালনে অক্ষম তাহলে সরকার লিখিত আদেশ দ্বারা তার নিয়োগ অনধিক দুই বছরের জন্য স্থগিত বা বাতিল করতে পারেন।

ধারা-১৫। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা: এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা সরকার যেকোনো বিধি প্রণয়ন করতে পারবেন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে বসবাসরত হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের শাস্ত্রীয় বিবাহের দালিলিক প্রমাণ সুরক্ষার জন্য "হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন, ২০১২" প্রণীত হয়। ২০১২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখে প্রণীত আইনটিতে সর্বমোট ১৫টি ধারা রয়েছে। বাংলাদেশে এই প্রথম হিন্দু বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন সংক্রান্ত কোনো আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশে বসবাসরত সকল হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জন্য এ আইন প্রযোজ্য হবে। এ আইন অনুযায়ী পুরুষের বয়স ২১ এবং মহিলোাদের বয়স ১৮ বছরের কম হলে বিবাহ নিবন্ধনযোগ্য হবে না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন, ২০১২-এর বিধান অনুযায়ী ছেলেমেয়ের বিবাহের ন্যূনতম বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে কত বছর?

ক) ১৮ ও ১৫ বছর খ) ২১ ও ১৮ বছর
গ) ২৩ ও ২০ বছর ঘ) ২৫ ও ২৩ বছর

২। বাংলাদেশে হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন, ২০১২ কবে প্রণীত হয়?

ক) ২৪ জুলাই, ২০১২ খ) ২৪ আগস্ট, ২০১২
গ) ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১২ ঘ) ২৪ অক্টোবর, ২০১২

পাঠ-৫.১০ সামাজিক আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে সমাজকর্মীর ভূমিকা (The Role of Social Worker in the Formulation and Implementation of Social Legislation)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৫.১০.১ সামাজিক আইন প্রণয়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

৫.১০.২ সামাজিক আইন প্রয়োগে সমাজকর্মীর ভূমিকা বর্ণনা করতে পারবেন।

৫.১০.১ সামাজিক আইন প্রণয়নে সমাজকর্মীর ভূমিকা (The Role of Social Worker in the Formulation of Social Legislation)

সমাজকর্ম আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক সমস্যা সমাধানকারী প্রক্রিয়া। আধুনিক জীবনের নানাবিধা মনো-সামাজিক সমস্যা দূর করার ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করা হয়। সমাজকর্ম মূলত পদ্ধতিনির্ভর একটি ব্যবহারিক বিজ্ঞান। এর মূল লক্ষ্য হলো সামাজিক ভূমিকা পালনের জন্য প্রতিটি স্তরের জনগণকে সক্রিয় ও সক্ষম করে তোলা এবং অনুকূল সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা। আধুনিক শিল্পসমাজে পেশাদার সমাজকর্মীরা সাধারণত সমাজকর্মের নীতি ও আদর্শ এবং কৌশল অনুসরণ করে এ কাজগুলো করে থাকেন।

সমাজের অনাকাঙ্খিত অবস্থা দূরীকরণ, অবহেলিত শ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষণ, সর্বোপরি সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে প্রয়োজন হয় সামাজিক আইন প্রণয়নের। সমাজকর্মীগণ তাদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতার সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে সামাজিক আইন প্রণয়নে ভূমিকা পালন করে থাকেন।

সামাজিক আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে কতগুলো প্রক্রিয়া বা ধাপ অনুসরণ করতে হয়। যেমন– সমস্যা নির্দিষ্ট বা চিহ্নিত করা, জনমত গঠন, সামাজিক আন্দোলন, আইনের খসড়া তৈরি, রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত গ্রহণ, সংসদে উপস্থাপন, সর্বশেষ রাষ্টপ্রধানের অনুমোদন। সামাজিক আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ার এসব ধাপে সমাজকর্মীগণ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থেকে কখনো নেতৃত্ব দিয়ে আবার কখনো সমন্বয়কারীর দায়িত্ব পালন করে থাকেন।

সমাজকর্মীগণ সমাজকর্ম গবেষণার জ্ঞান ব্যবহার করে প্রথমে সমাজের সমস্যাগুলোর মধ্য থেকে একটি নির্দিষ্ট সমস্যা চিহ্নিত করে তার প্রকৃতি ও ভয়বহতা সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলেন। অতঃপর সমাজ থেকে এ সমস্যা দূর করতে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। সামাজিক আন্দোলনের মাধ্যমে নীতিনির্ধারণী কর্তৃপক্ষকে এ সমস্যার দিকে দৃষ্টিপাতে সক্ষম হন। যার ফলে কর্তৃপক্ষ অনেক সময় স্ব-উদ্যোগে আবার কখনো জনগণের চাপে আইন প্রণয়নে বাধ্য হন। এরপর দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর মতামত গ্রহণ করা হয়। এখানে সমাজকর্মী একজন সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করে থাকেন। রাজনৈতিক দলগুলোর মতামতের প্রেক্ষিতে সংসদে উন্মুক্ত আলোচনার মাধ্যমে অধিকাংশের সমর্থনের প্রেক্ষিতে আইন পাস হয়। সর্বশেষ রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আইনটি পূর্ণাঙ্গ রুপ পায় এবং আইনটিকে তার উদ্দেশ্য পূরণের জন্য বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়।

এভাবে সমস্যা চিহ্নিত করা থেকে শুরু করে সামাজিক আইন প্রণয়নের শেষ অবধি একজন সমাজকর্মী তার পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগ করে থাকেন।

৫.১০.২: সামাজিক আইন প্রয়োগে সমাজকর্মীর ভূমিকা (The Role of Social Worker in the Implementation of Social Legislation)

সমাজকর্ম একটি সাহায্যকারী ও সক্ষমকারী প্রক্রিয়া যার রয়েছে বৈজ্ঞনিক ভিত্তি, নিজস্ব জ্ঞানভাণ্ডার, দক্ষতা ও নিজস্ব মূল্যবোধ। সমাজকর্ম ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে সাহায্য করার মাধ্যমে তাদের সমস্যাসমূহের সমাধান করে কার্যকর জীবনযাপনে সক্ষম করে তুলতে প্রয়াসী হয়। অন্যদিকে সমাজকর্মীগণ সমাজকর্মের নীতি ও আদর্শের ভিত্তিতে সংগঠিত উপায়ে সেবাকর্ম পরিচালনা করে থাকেন।

সমাজকর্মীগণ সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য শুধু সামাজিক আইন প্রণয়নে কার্যকর ভূমিকা পালনের মাধ্যমে তাদের দায়িত্ব শেষ করেন না। প্রণীত আইনটির যথাযথ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে যাতে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য অর্জিত হয় সে ব্যাপারেও যথাযথ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

প্রণীত সামাজিক আইন প্রয়োগের সবচেয়ে বড় বাধা হলো জনগণের সচেতনতার অভাব। এ ক্ষেত্রে সমাজকর্মী জনগণকে সচেতন ও সংগঠিত করতে বিভিন্ন গণমাধ্যম যেমন– সংবাদপত্র, রেডিও, টেলিভিশনে আইনটি সম্পর্কে প্রচারণা চালাতে পারেন। অন্যদিকে, বিভিন্ন সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়ামের মাধ্যমেও আইনটি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করে থাকেন।

আইন প্রয়োগে যেমন জনগণের সচেতনতার প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে উদ্বুদ্ধকরণ। এক্ষেত্রে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার উদ্যোগকে উৎসাহিত করা হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মী একজন সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করে থাকেন।

অনেক সময় দেখা যায়, প্রণীত সামাজিক আইন বাস্তবায়নে সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ বা প্রথা বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এ ক্ষেত্রে সমাজকর্মীগণ সমাজের কল্যাণের পথে অনিষ্টকর ও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী প্রথা ও মূল্যবোধকে দূর করে গঠনমূলক ও উন্নয়নমুখী মূল্যবোধ গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন।

সামাজিক সমস্যার সমাধান করে সুষ্ঠু সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করা সমাজকর্মের প্রধান লক্ষ্য কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় সুষ্ঠু সামাজিক পরিবেশ বিরাজমান না থাকায় সামাজিক আইনের প্রয়োগ বাধাগ্রস্ত হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীগণ সমাজের বিভিন্ন কুসংস্কার ও কুপ্রথা দূর করে গঠনমূলক সামাজিক পরিবেশ সৃষ্টি করে থাকেন। অনেক সময় দেখা যায়, সমাজে প্রচলিত আইনের কারণে সামাজিক আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন সম্ভব হয় না। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীগণ জনগণকে সচেতন ও সংগঠিত করে সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে পূর্বেকার আইন বা প্রণীত আইনের প্রয়োজনীয় সংশোধন, প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়নে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন।

সারসংক্ষেপ

সমাজকর্ম একটি সাহায্যকারী ও সক্ষমকারী প্রক্রিয়া যার রয়েছে বৈজ্ঞনিক ভিত্তি, নিজস্ব জ্ঞান ভান্ডার, দক্ষতা ও নিজস্ব মূল্যবোধ। সমাজকর্ম ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে সাহায্য করার মাধ্যমে তাদের সমস্যাসমূহের সমাধান করে কার্যকর জীবনযাপনে সক্ষম করে তুলতে প্রয়াসী হয়। আধুনিক জীবনের নানাবিধ মনো-সামাজিক সমস্যা দূর করার ক্ষেত্রে এটি প্রয়োগ করা হয়। সমাজের অনাকাঙ্খিত অবস্থা দূরীকরণ, অবহেলিত শ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষণ, সর্বোপরি সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে প্রয়োজন হয় সামাজিক আইন প্রণয়নের। সমাজকর্মীগণ তাদের পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতার সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে সামাজিক আইন প্রণয়নে ভূমিকা পালন করে থাকেন। সমাজকর্মীগণ সমাজের সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্য শুধু সামাজিক আইন প্রণয়নে কার্যকর ভূমিকা পালনের মাধ্যমে তাদের দায়িত্ব শেষ করেন না। প্রণীত আইনটির যথাযথ বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে যাতে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জিত হয় সে ব্যাপারেও যথাযথ ভূমিকা পালন করে থাকেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। নিচের কোনটি সাহায্যকারী ও সক্ষমকারী প্রক্রিয়া?

ক) সমাজবিজ্ঞান	খ) নৃবিজ্ঞান
গ) সমাজকর্ম	ঘ) অর্থনীতি

২। সমাজকর্মীগণ সামাজিক আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে যেসমস্ত ভূমিকা পালন করে–

i. সমাজে প্রচলিত সমস্যাগুলোর মধ্যে থেকে একটি নির্দিষ্ট সমস্যা চিহ্নিত করে
ii. সমস্যা দূর করতে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলে
iii. আইন প্রয়োগে জনগণকে সচেতন করে তোলে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii	খ) i ও iii
গ) ii ও iii	ঘ) i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। সামাজিক আইন এর ইংরেজি প্রতিশব্দ কী?

ক) Social Reform খ) Social Problem
গ) Social Legislation ঘ) Social Policy

২। কোন আইন অনুসারে প্রথম স্ত্রী বেঁচে থাকতে দ্বিতীয় বিবাহ করা যাবে না?

ক) মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ খ) যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০
গ) হিন্দু বিবাহ আইন, ২০১২ ঘ) পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫

৩। ১৯৭৪ সালের শিশু আইন কয়টি ভাগে বিভক্ত?

ক) ৬ টি খ) ৮ টি
গ) ১০ টি ঘ) ১২ টি

৪। যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০ অনুযায়ী ধর্ষণের ক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটানোর শাস্তি হচ্ছে–

i. মৃত্যুদন্ড
ii. যাবজ্জীবন কারাদন্ড
iii. অর্থদন্ড

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৫। জসিম একজন সমাজকর্মী। সামাজিক আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে জসিম সমাজকর্মের যেসকল প্রক্রিয়া অনুসরণ করে–

i. নীতি
ii. কৌশল
iii. মূল্যবোধ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৬ ও ৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দিন:

বাংলাদেশের শিশুদের অধিকার রক্ষার জন্য সরকার একটি বিশেষ আইন প্রণয়ন করে। আইনটি ১৯৭৬ সালে ঢাকায় এবং ১৯৮০ সালে সারা বাংলাদেশে কার্যকর করা হয়।

৬। উদ্দীপকে কোন আইনের কথা বলা হয়েছে?

ক) রিফরমেটরী স্কুল এ্যাক্ট, ১৮৯৯ খ) প্রবেশন অব অফেন্ডার্স এ্যাক্ট, ১৯৬০
গ) শিশু আইন, ১৯৭৪ ঘ) শিশু ও নারী নির্যাতন দমন আইন, ২০০০

৭। উক্ত আইনের উল্লেখযোগ্য দিক হলো–

i. শিশুর বয়স নির্ধারণ
ii. অপরাধী শিশুদের বিচারের জন্য আলাদা আদালত স্থাপন
iii. গণমাধ্যমে অপরাধী শিশুদের পরিচয় প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৮। কোনো ব্যক্তি যৌতুক গ্রহণ বা প্রদান করলে অথবা সহায়তা করলে সর্বোচ্চ কত বছর কারাদন্ড হবে?

ক) চার বছর খ) পাঁচ বছর

গ) ছয় বছর ঘ) সাত বছর

৯। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ জারি করা হয় যে কারণে–

i. মাদকের সরবরাহ ও অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে

ii. মাদকাসক্তদের শাস্তি দিতে

iii. মাদকের ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া প্রতিরোধ করতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

১০। হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন অনুযায়ী বিবাহ নিবন্ধনের ক্ষেত্রে পাত্র-পাত্রীর বয়স কমপক্ষে কত বছর হওয়া উচিত?

ক) ছেলে ১৮ ও মেয়ে ১৫ বছর খ) ছেলে ২০ ও মেয়ে ১৮ বছর

গ) ছেলে ২১ ও মেয়ে ১৮ বছর ঘ) ছেলে ২৫ ও মেয়ে ২১ বছর

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১। দাদা জীবিত থাকা অবস্থায় বাল্যবয়সে রফিকের বাবা মারা যায়। পরবর্তীতে রফিকের দাদার সম্পত্তি ভাগ বাটোয়ারার সময় তার চাচারা তাকে দাদার সম্পত্তি দিতে অস্বীকার করে। কারণ হিসেবে রফিকের চাচারা দাদা জীবিত থাকাকালীন তার বাবা মারা যাওয়ার কথা বলে। এ অবস্থায় রফিক কোনো দিশা না পেয়ে তার স্কুলের শিক্ষকের শরণাপন্ন হয়। রফিকের স্কুলের শিক্ষক বলেন, ষাট এর দশকে প্রণীত একটি আইন দ্বারা মুসলমান সমাজের এ প্রথা রহিত করা হয়েছে। তিনি আরো বলেন, আইনটি মুসলিম সমাজের জন্য একটি মাইলফলকও।

ক) জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সদস্য সংখ্যা কত? ১

খ) যৌতুক বলতে কী বোঝেন? ২

গ) উদ্দীপকে রফিকের স্কুল শিক্ষক কোন আইনের কথা বলেছেন? উত্তরাধিকার নির্ণয়ে উক্ত আইনের বিধান আলোচনা করুন। ৩

ঘ) "উক্ত আইনটি মুসলিম সমাজের জন্য মাইলফলকও"– উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করুন। ৪

২। গ্রামের দরিদ্র কৃষক রহমত মিয়ার একমাত্র মেয়ে জুলেখার বিয়ে হয় পার্শ্ববর্তী গ্রামের সুরুজ মিয়ার ছেলে সবুজ মিয়ার সাথে। একমাত্র মেয়ে হওয়ায় রহমত মিয়া যথাসাধ্য ধুমধাম করে বিয়ের আয়োজন করে। বিয়ের পর কিছুদিন যেতে না যেতেই সবুজ মিয়া জুলেখার বাবর কাছে ৫০,০০০ টাকা দাবি করে। রহমত মিয়া টাকা দিতে অস্বীকৃতি জানালে সবুজ ও তার বাবা সুরুজ মিয়া দুজনে মিলে জুলেখার উপর শারীরিক অত্যাচার শুরু করে। জুলেখা নির্যাতন সইতে না পেরে অবশেষে সে তার স্বামী ও শ্বশুরের বিরুদ্ধে মামলা করে। মামলার বিচারে বাপ ও ছেলে দুজনেরই শাস্তি হয়।

ক) হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন প্রণয়ন করা হয় কবে? ১

খ) সামাজিক আইন বলতে কী বোঝায়? ২

গ) উদ্দীপকে জুলেখার স্বামী ও শ্বশুরের শাস্তি হয়েছে কোন আইনের পরিপ্রেক্ষিতে? ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ) বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে যৌতুক প্রথা নিরোধের জন্য উক্ত আইনটি কী যথার্থ বলে আপনি মনে করেন? আপনার উত্তরের স্বপক্ষে মতামত দিন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.২ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৩ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৪ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৫ : ১। গ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৬ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৭ : ১। ক ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৮ : ১। খ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৯ : ১। খ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১০ : ১। খ ২। ঘ
চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ৫ : ১। গ ২। ক ৩। গ ৪। ঘ ৫। ঘ ৬। গ ৭। ঘ ৮। ক ৯। খ ১০। গ

বাংলাদেশের সরকারি সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

(Government Social Development Activities of Bangladesh)

ইউনিট ৬

ভূমিকা

বর্তমানে সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম দুইটি ধারায় পরিচালিত হচ্ছে– একটি সরকারি সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এবং অন্যটি বেসরকারি সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে গৃহীত, পরিচালিত, বাস্তবায়িত ও নিয়ন্ত্রিত সমাজ উন্নয়ন মূলক কার্যক্রমকে সরকারি সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম বলা হয়। বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালায়ের অধীনে গৃহীত সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মসূচিসমূহ এ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫(ঘ) অনুচ্ছেদের আলোকে দেশের বিভিন্ন অনগ্রসর শ্রেণির জন্য সাংবিধানিক অঙ্গীকার পূরণের লক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয় পথিকৃৎ হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। দুঃস্থ, অসহায়, অস্বচ্ছল, অনগ্রসর, ঝুঁকিপূর্ণ ও নাজুক জনগোষ্ঠীর কল্যাণে এ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যেমন– গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি, শহর সমাজসেবা কর্মসূচি, শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র ইত্যাদি। সমাজকলাণ মন্ত্রণালায় ছাড়াও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিভিন্ন ধরনের সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। যেমন– খাদ্য ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে দূর্যোগ বিষয়ক কর্মকাণ্ড, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয় মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় মানবাধিকার বিষয়ক কর্মকাণ্ড ইত্যাদি। সুনির্দিষ্ট নীতি ও পরিকল্পনার অধীনে এসব সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এসব কার্যক্রমের ফলপ্রসূ বাস্তবায়নের মাধ্যমে কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনে সমাজকর্মীরা গতিশীল ভূমিকা পালন করতে পারে। সমাজকর্মের নীতি, কৌশল, পদ্ধতি, জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োগের মাধ্যমে সরকারি সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমকে আরো ফলপ্রসূ করা সম্ভব।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ–৬.১ : বাংলাদেশে সরকারি সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ঐতিহাসিক বিবর্তন
পাঠ–৬.২ : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পরিচিতি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং বাস্তবায়ন কৌশল
পাঠ–৬.৩ : সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তর ও সংস্থা
পাঠ–৬.৪ : বাংলাদেশে সরকারি সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের পরিচিতি
পাঠ–৬.৫ : গ্রামীণ সমাজসেবার ধারণা ও উদ্দেশ্য
পাঠ–৬.৬ : গ্রামীণ সমাজসেবা কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ
পাঠ–৬.৭ : শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের ধারণা ও উদ্দেশ্য
পাঠ–৬.৮ : শহর সমাজসেবা কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ
পাঠ–৬.৯ : শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম
পাঠ–৬.১০ : শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ
পাঠ–৬.১১ : বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভিশন ও কার্যক্রম
পাঠ–৬.১২ : সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকিহ্রাস, প্রস্তুতি ও সাড়াদান ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ
পাঠ–৬.১৩ : জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম
পাঠ–৬.১৪ : জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

পাঠ-৬.১ বাংলাদেশে সরকারি সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ঐতিহাসিক বিবর্তন (Historical Evolution of Government Social Development Activities in Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৬.১.১ বাংলাদেশে সরকারি সমাজউন্নয়নমূলক কার্যক্রমের বিবর্তনের বিবরণ দিতে পারবেন।

৬.১.১ বাংলাদেশে সরকারি সমাজউন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ঐতিহাসিক বিবর্তন

ব্রিটিশ শাসিত বাংলাদেশে ১৯৪৩ সালে সরকারি পর্যায়ে ৪টি এতিমখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকারি সমাজকল্যাণ কার্যক্রমের সূচনা হয়। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসিত ভারতীয় উপমহাদেশ দ্বি-জাতিতত্ত্বে ভিত্তিতে বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হয়। বাংলাদেশ পাকিস্তানের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। যার নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। ভারত বিভক্তির পর ব্যাপক সংখ্যক মোহাজের ভারত থেকে বাংলাদেশে আগমনের ফলে সৃষ্ট আর্থ-সামাজিক সমস্যা মোকাবিলার জন্য তৎকালীন সরকার জাতিসংঘের নিকট আবেদন করে। জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ দলের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৫৩ সালে ঢাকায় সমাজকর্মের ওপর তিন মাসব্যাপী স্বল্পকালীন 'প্রশিক্ষণ কোর্স' প্রবর্তন করা হয় যার মাধ্যমে বাংলাদেশে পেশাদার সমাজকর্ম শিক্ষার সূচনা হয়। ১৯৫৪ সালে 'ঢাকা প্রজেক্ট' নামে পরীক্ষামূলকভাবে শহর সমষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এই প্রজেক্টের সাফল্যের ভিত্তিতে ঢাকার কায়েতটুলীতে ১৯৫৫ সালে পরীক্ষামূলকভাবে শহর সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প (Urban Community Development Project-UCDP) গ্রহণ করে। এ প্রকল্পের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশে আনুষ্ঠানিক সমাজকর্মের গোড়াপত্তন হয়। স্বেচ্ছামূলক সমাজসেবার প্রাতিষ্ঠানিক রুপ দানের লক্ষ্যে ১৯৫৬ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজে হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম প্রবর্তন করা হয়। সময়ের প্রয়োজনে সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা ও পরিকল্পনার জন্য ১৯৬১ সালে ত্রাণ মন্ত্রণালয় থেকে হস্তান্তরিত ভবঘুরে কল্যাণ কেন্দ্র শিক্ষা পরিদপ্তর থেকে হস্তান্তরিত সরকারি এতিমখানা এবং জাতীয় সমাজকলাণ পরিষদ থেকে হস্তান্তরিত হাসপাতাল সমাজসেবা এ তিনটি কার্যক্রম পৃথক প্রশাসনিক কাঠামোতে পরিচালনার দায়িত্ব প্রাপ্তির মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর সৃষ্টি হয়। স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা হবার পর ১৯৭৪ সালে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর সমাজকল্যাণ বিভাগে উন্নীত হয়। পরবর্তীতে ১৯৮৪ সালে সমাজকল্যাণ বিভাগকে সমাজকল্যাণ অধিদফতর উন্নীত করা হয়। বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যা মোকাবিলার লক্ষ্যে গৃহীত সরকারি সমাজসেবা কার্যক্রমের মাধ্যমে এর পরিধি বৃদ্ধি পায়। ১৯৭৪ সালে গ্রামীণ সমাজসেবা (Rural Social Service-RSS) গ্রহণের মধ্য দিয়ে সরকারি সমাজসেবা কার্যক্রম গ্রাম পর্যায়ে বিস্তার লাভ করে। নারীদের ক্ষমতায়ন, অর্থনৈতিক মুক্তি তথা আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালে পল্লী মাতৃকেন্দ্র (Rural Mothers Club-RMC) কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় পৃথক ও স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় হিসেবে পরিচিতি লাভ করার পূর্বে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে যৌথ মন্ত্রণালয় হিসেবে সংযুক্ত ছিল। ১৯৮৯ সালের নভেম্বর মাসে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নামে পৃথক ও স্বতন্ত্র দুটি মন্ত্রণালয়ের সৃষ্টি হয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কর্মসূচিকে প্রতিষ্ঠানিক ও টেকসই মর্যাদা এবং রাষ্ট্রীয় দায়িত্বের আওতায় আনয়নের জন্য The Probation of Offender Oridinance; 1960; The Voluntary Social Welfare Agencies (Regitration and Control) Ordinance, 1961; কারাগারে আটক সাজাপ্রাপ্ত নারীদের বিশেষ সুবিধা আইন, ২০০৬; ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১; শিশু আইন, ২০১৩; প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩; এবং নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ সহ উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দায়িত্ব পালন করে আসছে। জাতিসংঘ ঘোষিত সর্বজনীন মানবাধিকার সনদ, শিশু অধিকার সনদ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকারসহ টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এবং অধিকার ও ক্ষমতায়ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে নতুন নতুন কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্বক্রিয় ভূমিকা পালন করছে। বর্তমানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ৬টি দপ্তর ও সংস্থার মাধ্যমে দেশের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমস্যাগ্রস্ত মানুষের সমস্যা

মোকাবিলায় জাতীয় চাহিদা, আকাঙ্খা, সরকারের অনুসৃত নীতি, আইন ও সাংবিধানিক অঙ্গীকার বাস্তবায়নে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।। দপ্তর ও সংস্থাগুলো হচ্ছে– ১৯৫৬ সালে সৃষ্ট বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, ১৯৬১ সালে সৃষ্ট সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর যা ১৯৮৪ সালে সামাজসেবা অধিদফতরে রুপান্তরিত হয়, ১৯৮৪ সালে সৃষ্ট শেখ জায়েদ-বিন-সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট, ১৯৮৮ সালে সৃষ্ট শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট বাংলাদেশ, ২০০০ সালে সৃষ্ট জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এবং ২০১৪ সালে সৃষ্ট নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট।

সমাজকলাণ মন্ত্রণালায় ছাড়াও অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিভিন্ন ধরনের সামাজিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে দুর্যোগ বিষয়ক কর্মকাণ্ড এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত জাতীয় মানবাধিকার বিষয়ক কার্যক্রম ।

সারসংক্ষেপ

ব্রিটিশ শাসিত বাংলাদেশে ১৯৪৩ সালে সরকারি পর্যায়ে ৪টি এতিমখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সরকারি সমাজসেবা কার্যক্রমের সূচনা হয়। দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে ভারত থেকে আগত মোহাজেরদের সমস্যা মোকাবিলায় জাতিসংঘের সুপারিশের ভিত্তিতে Urban Community Development Project গ্রহণ, বাস্তবায়ন ও সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে সরকারি সমাজসেবা কার্যক্রম আরো বিকাশ লাভ করে। বর্তমানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নিয়ন্ত্রণাধীন ৬টি সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সমাজসেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এছাড়াও খ্যাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে দুর্যোগবিষয়ক কর্মকান্ড আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় মানবাধিকার বিষয়ক কার্যক্রম চালু রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সংস্থা কয়টি?

ক) চারটি　　খ) পাঁচটি

গ) ছয়টি　　ঘ) সাতটি

২। কত সালে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর সমাজকল্যাণ বিভাগে উন্নীত হয়?

ক) ১৯৭৪ সালে　　খ) ১৯৭৫ সালে

গ) ১৯৭৬ সালে　　ঘ) ১৯৭৭ সালে

পাঠ-৬.২ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পরিচিতি: লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং বাস্তবায়ন কৌশল (Introduction to Ministry of Social Welfare: Goals and Objectives; and Implementation Strategies)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৬.২.১ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ইতিহাস সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
৬.২.১ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ লিখতে পারবেন।
৬.২.১ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের বাস্তবায়ন কৌশলসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

৬.২.১ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ইতিহাস

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় পৃথক ও স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় হিসেব পরিচিতি লাভ করে ১৯৮৯ সালে। এর পূর্বে এ মন্ত্রণালয়টি বিভিন্ন মন্ত্রনায়য়ের সাথে যৌথ মন্ত্রণালয় হিসেবে সংযুক্ত ছিল। তৎকালীণ পাকিস্তান আমলে এ মন্ত্রণালয় স্বাস্থ্য, শ্রম ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং শ্রম, জনশক্তি ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় হিসেবে পরিচিত ছিল। পরবর্তীতে এ মন্ত্রণালয় সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় হিসেবে পরিচিতি লাভ করে যা ১৯৮৯ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত বহাল ছিল। পরবর্তীতে ১৯৮৯ সালের নভেম্বর মাসে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নামে পৃথক দু'টি মন্ত্রণালয়ের সৃষ্টি হয়। বর্তমানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজসেবা অধিদফতর দেশের সামগ্রিক সরকারি-বেসরকারি সমাজকল্যাণ কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে।



চিত্র ৬.২.১: সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়

৬.২.১ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের ভিশন বা লক্ষ্য হচ্ছে উন্নত জীবন এবং যত্নশীল সমাজ গঠন করা। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে সামাজিক সুরক্ষা, ক্ষমতায়ন ও উন্নয়নের মাধ্যমে দরিদ্র ও অসহায় জনগোষ্ঠী এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের উন্নত জীবন প্রস্তুত করার মিশন বা উদ্দেশ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বয়স্কভাতা, বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা, অস্বচ্ছল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নে বিভিন্ন কর্মসূচি প্রবর্তনের ক্ষেত্রে এ মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা ব্যাপকভাবে সমাদৃত। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে:

ক) মানব সম্পদ উন্নয়ন;
খ) দারিদ্র্য হ্রাসকরণ;
গ) সমাজের অনগ্রসর ও দুর্বল অংশগ্রহণের কল্যাণ, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন;
ঘ) সামাজিক সমস্যা মোকাবিলাকরণ; এবং
ঙ) ব্যক্তির সর্বোচ্চ বিকাশে সহায়তা দান।

৬.২.৩ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নীতি বাস্তবায়নের কৌশলসমূহ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় দেশের অবহেলিত, উপেক্ষিত, দারিদ্র্য পীড়িত এবং সামাজিক সমস্যায় সমস্যাগ্রস্ত মানুষের সমস্যা সমাধান এবং সর্বোচ্চ মানবিক মর্যাদা প্রদানের লক্ষ্যে ভূমিকা পালন করছে। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নীতি বাস্তবায়নের কৌশল হচ্ছে পাঁচটি। কৌশলগুলো হচ্ছে:

ক) লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে কর্মসূচির বাস্তবায়ন;
খ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় লক্ষ্যভুক্ত দলের মতামতের প্রতি গুরুত্বারোপ;
গ) প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি (input) সরবারাহ নিশ্চিতকরণ;

ঘ) ফলাবর্তন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের জন্য feedback mechanism মূল্যায়ন; এবং

ঙ) নতুন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের জন্য অনুভূত চাহিদার (felt needs) প্রতি গুরুত্বারোপ।

পরিশেষে বলা যায়, মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, সমাজের অনগ্রসর ও দুর্বল অংশের কল্যাণ, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন, সামাজিক সমস্যা মোকাবিলাকরণ এবং ব্যক্তির সর্বোচ্চ বিকাশে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কৌশলনির্ভর কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশের অবহেলিত, দুঃস্থ, উপেক্ষিত তথা সমস্যাগ্রস্ত মানুষের কল্যাণ, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

সারসংক্ষেপ

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ১৯৮৯ সালে পৃথক ও স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় হিসেব পরিচিতি লাভ করে। উন্নত জীবন এবং যত্নশীল সমাজ গঠন করার লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এসব কার্যক্রম বাস্তবায়নে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে কর্মসূচির বাস্তবায়ন; সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় লক্ষ্যভুক্ত দলের মতামতের প্রতি গুরুত্বারোপ; প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি (input) সরবারাহ নিশ্চিতকরণ; ফলাবর্তন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের জন্য feedback mechanism মূল্যায়ন; এবং নতুন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণের জন্য অনুভূত চাহিদার (felt needs) প্রতি গুরুত্বারোপ এই পাঁচটি কৌশল অবলম্বন করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। কবে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় পৃথক ও স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয় হিসেব পরিচিতি লাভ করে?

ক) ১৯৮৮ সালের অক্টোবর মাসে খ) ১৯৮৮ সালের নভেম্বর মাসে
গ) ১৯৮৯ সালে অক্টোবর মাসে ঘ) ১৯৮৯ সালে নভেম্বর মাসে

২। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নীতি বাস্তবায়নের কৌশল কয়টি?

ক) চারটি খ) পাঁচটি
গ) ছয়টি ঘ) সাতটি

পাঠ-৬.৩ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তর এবং সংস্থা (Departments and Organs Under the Ministry of Social Welfare)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৬.৩.১ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তর ও সংস্থাসমূহ কী তা লিখতে পারবেন।

৬.৩.২ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তর ও সংস্থাসমূহ পরিচিতি সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

৬.৩.১ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তর ও সংস্থা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় হচ্ছে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে মোট ছয়টি দপ্তর ও সংস্থা রয়েছে। দপ্তর ও সংস্থাসমূহ হচ্ছে– ক) সমাজসেবা অধিদফতর; খ) বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ; গ) জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন; ঘ) শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট; ঙ) শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট (মৈত্রী শিল্প); এবং চ) নিউরো-ডেভেলপমেন্ট প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট।

৬.৩.১ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন দপ্তর ও সংস্থা পরিচিতি

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীন মোট ছয়টি দপ্তর ও সংস্থাসমূহের পরিচিতি নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো:

৬.৩.১.১ সমাজসেবা অধিদফতর: সমাজসেবা অধিদফতর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ অন্যতম বৃহত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ অধিদফতর। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য ১৯৬১ সালে সৃষ্ট সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর যা ১৯৮৪ সালে সমাজসেবা অধিদফতরে রুপান্তরিত হয়। সমাজসেবা অধিদফতরের ভিশন বা লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের অনগ্রসর, বঞ্চিত, দরিদ্র ও সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কল্যাণসাধন, সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান এবং ক্ষমতায়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। এ ভিশনকে সামনে রেখে– ক) ২০২১ সালের মধ্যে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে অধিদফতরের আইসিটি কার্যক্রম গ্রহণ; খ) ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের শতকরা ৫০ ভাগ অসহায় ও সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীকে সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান; গ) সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদানের মাধ্যমে ২০১৫ সালের মধ্যে দেশের শতকরা ৫০ ভাগ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও দারিদ্র্য বিমোচন; ঘ) এতিম, অবহেলিত, দুস্থ ও বিপন্ন শিশুদের অধিকার সুরক্ষা, প্রতিপালন, কল্যাণ, উন্নয়ন ও পুনর্বাসন; ঙ) সামাজিক অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের সংশোধন, উন্নয়ন ও পুনর্বাসন; চ) অসহায়, দুঃস্থরোগীদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা প্রদান; ছ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার সুরক্ষা, প্রতিপালন, কল্যাণ, উন্নয়ন ও পুনর্বাসন; জ) স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহকে নিবন্ধন প্রদান, তাদের কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান ও তত্ত্বাবধান; ঝ) সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের কল্যাণ, উন্নয়ন ও পুনর্বাসন; ঞ) সামাজিক অনাচার প্রতিরোধে সহায়তা প্রদান ও উদ্বুদ্ধকরণ; চ) পেশাজীবী সমাজকর্মীদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান; এবং ছ) এসিডদগ্ধ মহিলাদের সহায়তা ও উন্নয়ন করার উদ্দেশ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

চিত্র ৬.৩.১ : সমাজসেবা অধিদফতর

৬.৩.১.২ বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ: বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্ত একটি প্রতিষ্ঠান যা ১৯৫৬ সালে রেজল্যুশনের মাধ্যমে গঠিত হয়। এ পরিষদের অন্যতম কাজ হচ্ছে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠানসমূহে উৎসাহ-উদ্দীপনা, আর্থিক সহায়তা প্রদান, আত্ম-কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান, বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানের সুপারিশ প্রণয়ন করা।

৬.৩.১.৩ জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন: প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের কল্যাণ ও উন্নয়নে গৃহীত কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে ২০০০ সালে জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন গঠিত হয়। এ ফাউন্ডেশনের উদ্দেশ্যসমূহ হচ্ছে:

১. বাংলাদেশের প্রতিবন্ধী নাগরিকগণের সমমর্যাদা, সমঅধিকার, পূর্ণ অংশগ্রহণ ও সুযোগসুবিধা নিশ্চিত করার পদক্ষেপ গ্রহণ;
২. প্রতিবন্ধীত্বের কারণ এবং প্রতিরোধ মূলক ব্যবস্থা সম্পর্কে গবেষণা/প্রকাশনা ও জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ। এই লক্ষ্যে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস ও উৎসবসমূহ উদযাপন করা হয়;
৩. প্রতিবন্ধীদের জন্য গবেষণা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠাকরণ এবং সহযোগিতা প্রদান;
৪. প্রতিবন্ধীদের চিহ্নিত ও সনাক্তকরণপূর্বক বাস্তবসম্মত পরিকল্পনা প্রনয়ণ ও কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ; এবং
৫. প্রতিবন্ধীদের কল্যাণ ও উন্নয়নে কর্মরত প্রতিষ্ঠান/সমিতি/সংগঠন/সংস্থাকে প্রয়োজনীয় সাহায্য-সহযোগিতা ও উৎসাহ প্রদান ও সংশ্লিষ্ট কাজের সমন্বয় সাধন।

জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অনুসৃত আইন/বিধি/নীতিমালার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– প্রতিবন্ধী সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা-২০০৯, প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা আইন ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৯ নং আইন), নিউরো ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাষ্ট আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৫২ নং আইন), প্রতিবন্ধীসেবা ও সাহায্য সংক্রান্ত নীতিমালা ইত্যাদি। এছাড়া রয়েছে প্রতিবন্ধীসেবা ও সাহায্যকেন্দ্র শীর্ষক কর্মসূচি, অটিজম, এনডিডি কর্নার স্থাপন, প্যারেন্টস কমিটি গঠন, অটিজম রিসোর্স সেন্টার, ফ্রি স্কুল ফর চিলড্রেন উইথ অটিজম ভ্রাম্যমাণ ওয়ান স্টপ থেরাপি সার্ভিস, কর্মজীবী প্রতিবন্ধী পুরুষ ও মহিলা হোস্টেল, প্রতিবন্ধিতা সম্পর্কিত সমন্বিত বিশেষ শিক্ষা নীতিমালা-২০০৯, অসহায় সেরিব্রাল পালসি শিশুর লালনপালন, টেলিথেরাপি সার্ভিস প্রবর্তন, জাতীয় বিশেষ শিক্ষা কেন্দ্র, দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ঋণ ও অনুদান কার্যক্রম, জাতীয় প্রতিবন্ধী কমপ্লেক্স, প্রকাশনা কার্যক্রম, গণসচেতনতা, প্রতিবন্ধী উত্তরণ মেলা এবং নীলবাতি প্রজ্জলনসহ বিভিন্ন কর্মসূচি।

৬.৩.১.৪ শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট, বাংলাদেশ: সংযুক্ত আরব আমিরাত সরকার ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে সমঝোতা কার্যবিবরণী স্বাক্ষরের মাধ্যমে ২২ জুন ১৯৮৪ সালে শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট, বাংলাদেশ গঠিত হয় যা সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। পারিবারিক পরিবেশে মাতৃস্নেহ, ভালবাসা ও যত্নের সাথে লালনপালন করে অসহায় এতিম শিশুদের মধ্যে দায়িত্ব ও শৃংখলাবোধ সৃষ্টিপূর্বক উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা ও পুনর্বাসন করার লক্ষ্যে ট্রাস্ট টি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বর্তমানে এ ট্রাস্ট পরিচালিত ০২টি এতিমখানার মাধ্যমে দেশের ৪০০ জন এতিম মেয়েদের ভরণপোষণ, লেখাপড়া ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে সেলাই ও কম্পিউটারসহ বিভিন্ন ধরনের কারিগরি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

৬.৩.১.৫ শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট (মৈত্রী শিল্প): শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট (মৈত্রী শিল্প) সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং সুইডিস ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (সিডা) এর আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় ১৯৮১ সালে টংগীতে প্রতিষ্ঠিত হয়। দুই দেশের বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ প্রতিষ্ঠানটি 'মৈত্রী শিল্প' নামে পরিচিত লাভ করে। এই ট্রাস্ট উৎপাদন ও বিপনণের মাধ্যমে শারীরিক প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষার জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি এবং পুনর্বসান কার্যক্রম জোরদার করার লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রতিষ্ঠাকালীণ সময়ে ট্রাস্টটি সামজসেবা অধিদফতরের মাধ্যমে পরিচালিত হলেও পরবর্তীতে ২০১২ সালে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের সরাসরি অধীনে আনা হয়।

৬.৩.১.৬ নিউরো-ডেভেলপমেন্ট প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট: অটিজম বা অটিজম স্পেকট্রাম ডিসঅর্ডার, বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা, সেরিব্রাল পালসি, ডাউন সিনড্রোম ইত্যাদি স্নায়বিক বা নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধিতা এ চার ধরনের নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অধিকার ও সুরক্ষা নিশ্চিতকল্পে সরকার নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করছে। এরই ধারাবাহিকতায় নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট, ২০১৪ সালের জুন মাস থেকে কার্যক্রম শুরু করেছে। নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে– ক) যথাসম্ভব শারীরিক, মানসিক ও আর্থিকভাবে সহায়তা প্রদান করা; খ) উপোযোগী শিক্ষা ও কারিগরী জ্ঞানের ব্যবস্থা করা; এবং গ) সামাজিকভাবে ক্ষমতায়ন করা।

পরিশেষে বলা যায়, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় উন্নত জীবন এবং যত্নশীল সমাজ গঠন করার ভিশন বাস্তবায়নে ছয়টি দপ্তর ও সংস্থার মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সারসংক্ষেপ

বর্তমানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় হিসেব ৬টি দপ্তর ও সংস্থার মাধ্যমে উন্নত জীবন এবং যত্নশীল সমাজ গঠন করার লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। দপ্তর ও সংস্থাগুলো হচ্ছে– ১৯৫৬ সালে সৃষ্ট বাংলাদেশ জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, ১৯৬১ সালে সৃষ্ট সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর যা ১৯৮৪ সালে সমাজসেবা অধিদফতর হয়, ১৯৮৪ সালে সৃষ্ট শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল-নাহিয়ান ট্রাস্ট, ১৯৮৮ সালে সৃষ্ট শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট (মৈত্রী শিল্প), ২০০০ সালে সৃষ্ট জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন এবং ২০১৪ সালে সৃষ্ট নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। কোন সংস্থার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় শারীরিক প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট (মৈত্রী শিল্প) প্রতিষ্ঠিত হয়?

ক) সুইডিস ডেভেলপমেন্ট অথরিটি
খ) কানাডিয়ান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি
গ) জাপানিজ ডেভেলপমেন্ট অথরিটি
ঘ) আমেরিকান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি

২। কত সালে নিউরো-ডেভেলপমেন্টাল প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন প্রণীত হয়েছিল?

ক) ২০১৩ সালে
খ) ২০১৪ সালে
গ) ২০১৫ সালে
ঘ) ২০১৬ সালে

পাঠ-৬.৪ বাংলাদেশে সরকারি সমাজসেবা পরিচিতি (Introduction to Government Social Services in Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৬.৪.১ বাংলাদেশে সরকারিভাবে পরিচালিত সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমসমূহের বিবরণ লিখতে পারবেন।

৬.৪.১ বাংলাদেশে সরকারি সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচিতি

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মানবসম্পদ উন্নয়নে সম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়সমূহের মধ্যে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অন্যতম। এ মন্ত্রণালয়ধীন সমাজসেবা অধিদফতর দেশের দুঃস্থ, দরিদ্র, এতিম, বয়স্ক, বিধবা, বিপন্নশিশু, প্রতিবন্ধী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, কল্যাণ, অধিকার সুরক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তামূলক বহুমাত্রিক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে আসছে। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর ভারত থেকে আগত মাহজেরদের কারণে সৃষ্ট আর্থ-সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় সর্বপ্রথম ১৯৫৫ সালে ঢাকার কায়েতটুলিতে Urban Community Development Project-UCDP চালু হয়। দেশ স্বাধীনের পর সমাজসেবা কার্যক্রমের ব্যাপক বিকাশ, ব্যাপ্তি ও বিবিধ সামাজিক সমস্যা মোকাবিলার জন্য জাতীর জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় ১৯৭৪ সালে সমাজকল্যাণ বিভাগের আত্মপ্রকাশ ঘটে। ১৯৮৪ সালে সমাজকল্যাণ বিভাগের নাম পরিবর্তন হয়ে পূর্ণাঙ্গ অধিদফতর যা সমাজসেবা অধিদফতর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। সময়ের প্রয়োজনে ভবঘুরেকল্যাণ কেন্দ্র, সরকারি এতিমখানা এবং হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালনার নিমিত্তে ১৯৬১ সালে স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর সৃষ্টি হয়। স্বাধীন বাংলাদেশে মন্ত্রণালয়টি, সমাজকল্যাণ, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ১৯৮৯ সালের নভেম্বর মাসে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় নামে পৃথক দুটি মন্ত্রণালয় সৃষ্টি হয়। বর্তমানে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, সমাজের অনগ্রসর ও দুর্বল অংশের কল্যাণ, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন; সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা এবং মানুষের আর্থ-সামাজিক ও মানবীয় বিকাশে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ৬টি সংস্থার মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত এবং তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর মধ্যম-আয়ের দেশ হিসেবে উন্নত করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উচ্চ-আয়ের উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতর পরিচালিত কার্যক্রমসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। একই সাথে নিবন্ধিত সংস্থার উন্নয়মূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। সমাজের অনগ্রসর, বঞ্চিত, দরিদ্র ও সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধন, সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান এবং ক্ষমতায়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে দারিদ্র্য বিমোচন, সামাজিক নিরাপত্তা, প্রতিবন্ধীদের সুরক্ষা, সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ, শিশু অধিকার সুরক্ষা, নারী দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন, সেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা নিবন্ধন ও পরিচালনা, রাজস্ব বাজেটে পরিচালিত নতুন কর্মসূচি, প্রতিবন্ধীতার সহায়ক সমাগ্রী উৎপাদন কেন্দ্র, শিশু উন্নয়ন এবং সেবামূলক ও কমিউনিটি ক্ষমতায়ন কর্মসূচি পরিচালিত হচ্ছে। এছাড়া উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ, আইন ও নীতিমালা প্রণয়নে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। সমাজসেবা অধিদফতর (২০১৭) হতে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী নিম্নে কর্মসূচিসমূহের বিবরণ তুলে ধরা হলো:

৬.৪.১.১ দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি

কর্মসূচির নাম	কর্মসূচি শুরুর সময়	কার্য এলাকা/ইউনিট	সুফলভোগীর সংখ্যা
পল্লী সমাজসেবা (RSS)	১৯৭৪ সাল	৪৮৭ উপজেলা	২৪ লক্ষ ৪০ হাজার পরিবার
শহর সমাজসেবা (UCD)	১৯৫৫ সাল	৬৪ জেলা শহরে ৮০ ইউনিট	১ লক্ষ ৩০ হাজার পরিবার
পল্লী মাতৃকেন্দ্র (RMC)	১৯৭৫ সাল	৩১৮ উপজেলা	৮ লক্ষ ৬৮ হাজার ৫১৬ পরিবার
দগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম	২০০০ সাল	সকল উপজেলা ও ৮০টি শহর	১ লক্ষ ৬২ হাজার ৩১৬ পরিবার
আশ্রয়ণ প্রকল্প	২০০১ সাল	৫৭ টি জেলার ১৮১টি উপজেলা	৪৬ হাজার ২৫৮ পরিবার

৬.৪.১.২ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি

কর্মসূচি	কর্মসূচি শুরুর সময়	কার্য এলাকা	ভাতাভোগীর সংখ্যা (জন)
বয়স্ক ভাতা	১৯৯৭-৯৮ অর্থ বছর	দেশব্যাপী	৩১ লক্ষ ৫০ হাজার
বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুস্থ মহিলা ভাতা	১৯৯৮-৯৯ অর্থ বছর	দেশব্যাপী	১১ লক্ষ ৫০ হাজার
অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা	২০০৫-০৬ অর্থ বছর	দেশব্যাপী	৭ লক্ষ
প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি	২০০৭-০৮ অর্থ বছর	দেশব্যাপী	৭০ হাজার
ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন ও বিকল্প কর্মসংস্থান	২০১০ সাল	দেশব্যাপী	২ হাজার

৬.৪.১.৩ প্রতিবন্ধী বিষয়ক কর্মসূচি

কর্মসূচি	কর্মসূচি শুরুর সময়	ইউনিট সংখ্যা	সুফলভোগীর সংখ্যা (জন)
সমন্বিত দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিক্ষা কার্যক্রম (সকল জেলা)	১৯৭৪ সাল	৬৪ টি	১,১৬৮
সরকারি দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী বিদ্যালয়	১৯৬২ সাল	৫ টি	৪২৮
সরকারি বাক-শ্রবণ প্রতিবন্ধী বিদ্যালয়	১৯৬৪ সাল	৭ টি	১,৫৭১
মানসিক প্রতিবন্ধী শিশুদের প্রতিষ্ঠান (রাউফাবাদ, চট্টগ্রাম)	২০০০ সাল	১ টি	১১২
জাতীয় দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (টংগী, গাজীপুর)	১৯৭৮ সাল	১ টি	৭৩৫
শারীরিক প্রতিবন্ধীদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (টংগি, গাজীপুর)	১৯৭৮ সাল	১ টি	১,৮৯৪
প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের গ্রামীণ পুনর্বাসন কেন্দ্র (ফকিরহাট, বাগেরহাট)	১৯৭৮ সাল	১ টি	৩৩৯

৬.৪.১.৪ সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ কর্মসূচি

কর্মসূচি	কর্মসূচি শুরুর সময়	ইউনিট সংখ্যা	পুনর্বাসন সংখ্যা
শিশু (বালক-বালিকা) উন্নয়ন কেন্দ্র (টংগী ও কোনাবাড়ী, গাজীপুর এবং পুলেরহাট, যশোর)	১৯৭৮ সাল	৩ টি (২টি বালক ও ১টি বালিকা)	২৩,৮৭৯ জন
সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র	২০০২-০৩ অর্থ বছর	৬ টি	১,০৫৯ জন
সরকারি আশ্রয় কেন্দ্র	১৯৪৭ সাল	৬টি	৫১,৮৬৩ জন
মহিলা ও শিশু-কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন (সেফ হোম)	২০০২ সাল	৬টি	৮,৫৬৩ জন
প্রবেশন ও আফটার কেয়ার সার্ভিসেস	১৯৬০ সাল	৭২টি	প্রবেশন ১৩,৩৭৭ জন ও আফটার কেয়ার ৮১,৬৬০ জন

৬.৪.১.৫ শিশু অধিকার সুরক্ষামূলক কর্মসূচি

কর্মসূচি	কর্মসূচি শুরুর সময়	ইউনিট সংখ্যা	পুনর্বাসন সংখ্যা (জন)
সরকারি শিশু পরিবার/শিশু সদন	১৯৪৩ সাল	৮৫টি (ছেলে ৪৩টি, মেয়ে ৪১টি এবং মিশ্র ১টি)	৫৭,৫৪৯ জন
ছোটমণি নিবাস (০ থেকে ৭ বছর)	১৯৬২ সাল	৬টি	১,২০৬ জন
দিবাকালীণ শিশু যত্ন কেন্দ্র (ঢাকায় আজিমপুরে)	১৯৬২ সাল	১ টি	৮,২৮২ জন
দুস্থ শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বসন কেন্দ্র	১৯৮১ সাল	৩ টি	৪,৪৩৭ জন
ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট প্রাপ্ত বেসরকারি এতিমখানা	-	৩,৫২০ টি	৬৭,০৬৬ জন
প্রাকবৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	-	৫ টি	২,৭৯৮ জন
মহিলাদের আর্থ-সামাজিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম	১৯৭৩ সাল	২ টি	১৬,৭৬২ জন
দুস্থ মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র (টংগী, গাজীপুর)	১৯৭৮ সাল -	১ টি	৬২৩ জন
এতিম ছেলে-মেয়েদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	-	৪ টি (২টি ছেলে ও ২টি মেয়েদের)	কার্যক্রম চলমান

৬.৪.১.৬ মহিলাদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

কর্মসূচি	কর্মসূচি শুরুর সময়	ইউনিট সংখ্যা	পুনর্বাসন সংখ্যা
মহিলাদের আর্থ-সামাজিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	১৯৭৩ সাল	২ টি	১৬,৭৬২ জন
দুস্থ মহিলাদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র (টংগী, গাজীপুর)	১৯৭৮ সাল	১ টি	৬২৩ জন

৬.৪.১.৭ রাজস্ব বাজেটে পরিচালিত নতুন কর্মসূচি

কর্মসূচি	কর্মসূচি শুরুর সময়	কার্যএলাকা	সুফলভোগীর সংখ্যা
হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন	২০১২-১৩ অর্থ বছর	২১ জেলা	উপবৃত্তি ও ভাতা ৩,৬৫৬ ও প্রশিক্ষণ ১,৫০০ জন
দলিত, বেদে ও হরিজন সম্প্রদায়ের জীবনমান উন্নয়ন	২০১২-১৩ অর্থ বছর	২১ জেলা	শিক্ষা উপবৃত্তি ও ভাতা ২৭,৮৮৫ ও প্রশিক্ষণ ১,০৫০ জন

কর্মসূচি	কর্মসূচি শুরুর সময়	কার্যএলাকা	সুফলভোগীর সংখ্যা
কিডনি, লিভার সিরোসিস, ক্যান্সার, স্ট্রোকে প্যারালাইজড এবং জন্মগত হৃদরোগীর আর্থিক সহায়তা	২০১৩-১৪ অর্থ বছর	দেশব্যাপী	৮,৭৩৩ জন
চা-শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়ন	২০১৩-১৪ অর্থ বছর	মৌলভীবাজার সদর ও রাজনগর উপজেলা	৬৯,৩৪৭ জন
ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত জনগোষ্ঠীর বিকল্প কর্মসংস্থান	২০০৯-১০ অর্থবছর	ঢাকা মহানগরীর ৬টি ভিআইপি জোন ৩৮টি জেলা	২৪৪ জনকে পুনর্বাসন ও ঢাকা মহানগরীর ৬টি জোনকে ভিক্ষমুক্ত করার কাজ চলমান
প্রতিবন্ধিতা শনাক্তকরণ জরিপ	২০১২ সাল	দেশব্যাপী	কার্যক্রম চলমান (এ যাবত জরিপভূক্ত ১৮,০৩,৪৫৬ জন ও সনাক্তকৃত ১৫,০০,৬৯৭জন)

৬.৪.১.৮ প্রতিবন্ধিতার সহায়ক সমাগ্রী উৎপাদন কেন্দ্র

কেন্দ্রের নাম	কর্মসূচি শুরুর সময়	ইউনিট
প্লাস্টিক সামগ্রী উৎপাদন কেন্দ্র (টংগী, গাজীপুর)	১৯৯৫ সাল	১ টি
মিনারের/ডিংকিং ওয়াটার প্লান্ট (টংগী, গাজীপুর)	১৯৯৫ সাল	১ টি
কৃত্রিম অংগ উৎপাদন কেন্দ্র (টংগী, গাজীপুর)	১৯৯৫ সাল	১ টি
ব্রেইল প্রেস (টংগী, গাজীপুর)	১৯৯৫ সাল	১ টি

৬.৪.১.৯ শিশু সুরক্ষা প্রকল্প

প্রকল্পের নাম	কর্মসূচি শুরুর সময়	ইউনিট	সেবা ও পুনর্বাসন
Child Sensitive Social Protection in Bangladesh (CSPB)	২০১২ সাল	১ টি	২০,৫৮৪ জন
সার্ভিসেস ফর চিলড্রেন এট রিস্ক (SCAR)	২০০৯ সাল	১ টি	৬২৪৫ জন
দৃষ্টিপ্রতিবন্ধী শিশুদের জন্য হোস্টেল নির্মাণ	-	৩৭ টি	৯ টি সম্পন্ন ও অবশিষ্ট চলমান
সরকারি শিশু পরিবার হোস্টেল নির্মাণ	-	৮ টি	চলমান

৬.৪.১.১০ সেবামূলক ও কমিউনিটি ক্ষমতায়ন কার্যক্রম

কর্মসূচি	কর্মসূচি শুরুর সময়	ইউনিট
হাসপাতাল সমাজসেবা কার্যক্রম (সরকারি ও বেসরকারি মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল)	১৯৫৮ সাল	৯৯ টি
রোগীকল্যাণ সমিতির মাধ্যমে হাসপাতাল সামাজসেবা কার্যক্রম (উপজেলা হেলোথ কমপ্লেক্স)	২০১৪-১৫ অর্থবছর	৪১৯ টি
স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধন কার্যক্রম	১৯৬২ সাল	৬২,৪৫৭ টি

৬.৪.১.১১ কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

কেন্দ্রের নাম	কর্মসূচি শুরুর সময়	ইউনিট
জাতীয় সমাজসেবা একাডেমি (আগারগাঁও, ঢাকা)	১৯৬৭ সাল	১ টি
আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট)	১৯৮১-৮২ অর্থবছর	৬ টি

৬.৪.১.১২ উন্নয়নমূলক প্রকল্প এবং প্রণয়নকৃত আইন ও নীতিমালা

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে প্রণয়নকৃত আইন ও নীতিমালাসমূহ হচ্ছে– 'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার সুরক্ষা আইন, ২০১৩'; 'নিউরো-ডেভেলপমেন্ট প্রতিবন্ধী সুরক্ষা ট্রাস্ট আইন,২০১৩'; 'শিশু আইন, ২০১৩'; 'ভবঘুরে ও নিরাশ্রয় ব্যক্তি (পুনর্বাসন) আইন, ২০১১'; 'পিতামাতা ভরণপোষণ আইন, ২০১৩'; 'সমাজসেবা অধিদফতর গেজেটেড কর্মকর্তা এবং নন-গেজেটেড কর্মচারী নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৩'; 'পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম (RSS) বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০১১'; 'বয়স্কভাতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০১৩'; 'বিধবা ও দুঃস্থ মহিলাভাতা কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমলা, ২০১৩'; অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০১৩'; প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা উপবৃত্তি, ২০১৩'; 'এসিডদগ্ধ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ব্যক্তিদের পুনর্বাসন কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালা ২০১৩'; 'এতিম ও প্রতিবন্ধী ছেলে-মেয়েদের জন্য কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০১৩'; 'বেসরকারি এতিমখানায় ক্যাপিটেশন গ্র্যান্ট বরাদ্দ ও বণ্টন নীতিমালা, ২০০৯'; শহর সমজসেবা কার্যক্রম (UCD) বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০০৫'; 'ছোটমণি নিবাস ব্যবস্থাপনা

নীতিমালা, ২০০৩'; 'জাতীয় সমাজকল্যাণ নীতি ২০০৫'; 'সামাজিক প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র বাস্তবায়ন নীতিমালা, ২০০২'; এবং 'সরকারি শিশুসদন/শিশু পরিবার ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ২০০২'।

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালায় ছাড়াও অন্যান্য মন্ত্রণালয় যেমন– খ্যাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অধীনে দুর্যোগ বিষয়ক কর্মকান্ড এবং আইন, বিচার ও সংসদ বিষয় মন্ত্রণালয়ের অধীনে জাতীয় মানবাধিকার বিষয়ক কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে ।

সারসংক্ষেপ

মানবসম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, সমাজের অনগ্রসর ও দুর্বল জনগোষ্ঠীর কল্যাণ, উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন, সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা এবং ব্যক্তির সর্বোচ্চ বিকাশে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ৬টি সংস্থার মাধ্যমে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে একটি ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত, তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে একটি উন্নত দেশে পরিণত করার লক্ষ্যে সমাজসেবা অধিদফতর পরিচালিত কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সর্বোপরি সমাজের অনগ্রসর, বঞ্চিত, দরিদ্র ও সমস্যাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর কল্যাণ সাধন, সামাজিক নিরাপত্তা প্রদান এবং ক্ষমতায়নের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজসেবা কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজসেবা অধিদফতর পরিচালিত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি কোনটি?
   ক) পল্লী মাতৃকেন্দ্র
   খ) বয়স্ক ভাতা
   গ) ছোটমণি নিবাস
   ঘ) হাসপাতাল সমাজসেবা

২। সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজসেবা অধিদফতর পরিচালিত সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ কর্মসূচি কোনটি?
   ক) শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র
   খ) সরকারি শিশু পরিবার
   গ) দুঃস্থ শিশুদের প্রশিক্ষণ ও পুনর্বাসন কেন্দ্র
   ঘ) বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তা দুঃস্থ মহিলা ভাতা

পাঠ-৬.৫ পল্লী সমাজসেবার ধারণা এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Concept and Goals and Objectives of Rural Social Service)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৬.৫.১ পল্লী সমাজসেবা কর্মসূচি বর্ণনা করতে পারবেন।

৬.৫.২ পল্লী সমাজসেবার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

৬.৫.১ পল্লী সমাজসেবা ধারণা

বাংলাদেশ একটি কৃষিভিত্তিক গ্রাম প্রধান দেশ। মোট জনসংখ্যার ৭৬% লোক গ্রামে বসবাস করে। জাতিসংঘের সুপারিশের ভিত্তিতে ১৯৫৫ সালে সর্বপ্রথম শহরকেন্দ্রিক উন্নয়নমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হলেও গ্রামের উন্নয়নে তেমন কোনো কর্মসূচি ছিল না। তৎকালীণ পূর্বপাকিস্তানে ১৯৫২ সালে যুক্তরাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সহযোগিতায় The Village Agricultural and Industrial Development (V-AID) কর্মসূচি শুরু হয় যা ১৯৫৯ সালে বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার পর যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে তৎকালীণ ১৯টি জেলার ১৯টি থানায় প্রান্তিক লক্ষভুক্ত জনগোষ্ঠীর কল্যাণে পল্লী সমাজসেবা (Rural Social Service-RSS) কর্মসূচি চালু করা হয় । বর্তমানে দেশের সকল পল্লী জনগণের নিজস্ব সম্পদ ও সামর্থের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে পল্লী জনগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধানে সমন্বিত উন্নয়ন প্রক্রিয়া হলো পল্লী সমাজসেবা। পল্লী সমাজসেবা হলো সমষ্টি উন্নয়নকেন্দ্রিক একটি বহুমুখী (Community Based Multidimentional Development Process) সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন প্রক্রিয়া। বাংলাদেশ সরকারের সমাজসেবা অধিদফতর (২০১৩) কর্তৃক প্রকাশিত *''Social Services in Bangladesh''*-এ পল্লী সমাজসেবার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে,"পল্লী সমাজসেবা হচ্ছে বহুমুখী ও সমন্বিত গ্রাম উন্নয়ন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ভূমিহীন ও অসুবিধাগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর সংগঠন, প্রতিভা, নেতৃত্ব প্রদান এবং উন্নয়ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ ক্ষমতার বিকাশ সাধনের প্রচেষ্টা চালানো হয় যাতে সীমিত সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে সব শ্রেণির গ্রামীণ জনগণের সুষম উন্নয়ন ও কল্যাণ সাধনের সঙ্গে মানব সম্পদের উন্নয়ন ঘটে"। সুতরাং বলা যায় পল্লী সমাজসেবা বা RSS হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি যা দেশের পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত দারিদ্র্য পীড়িত পশ্চাদপদ, অবহেলিত, দুঃস্থ ও অসহায় এবং সুবিধাবঞ্চিত সকল শ্রেণীর লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে। পল্লী সমাজসেবা কর্মসূচিকে গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি হিসেবেও অভিহিত করা হয়। বর্তমানে ৬৪টি জেলার ৪৮৭টি উপজেলায় পল্লী সমাজসেবা কর্মসূচিটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

৬.৫.২ পল্লী সমাজসেবার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

পল্লী সমাজসেবার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের পল্লী অঞ্চলের বসবাসরত দারিদ্র্য পীড়িত পশ্চাদপদ, অবহেলিত, দুঃস্থ, অসহায় এবং সুবিধাবঞ্চিত সকল শ্রেণির লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক নীন্নয়ন নিশ্চিত করা। সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক ২০১০ সালে প্রকাশিত পল্লী সমাজসেবা (RSS) কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালায় ষোলটি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তুলে ধরা হয়েছে তা হলো–

১) পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত ভূমিহীন দরিদ্র কৃষক, বেকার যুবক, যুব মহিলা, শ্রমিক, দুঃস্থ মহিলা, সকল ধরনের প্রতিবন্ধী ও সংশোধনোত্তর/সাজামুক্ত ব্যক্তি এবং দারিদ্র্য সীমার নিচে সববাসরত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধণ;

২) পল্লীর দরিদ্র জনগণের মধ্যে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং তাদের সুসংগঠিত ও একতাবদ্ধভাবে দেশের সকল প্রকার উন্নয়ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য কর্মদল গঠন করা;

৩) দলীয় সদস্যদের সঞ্চয়ী মনোভাব গড়ে তোলা এবং সঞ্চয় সৃষ্টির মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর নিজস্ব তহবিল গঠনপূর্বক তাদেরকে স্বাবলম্বী হতে সহযোগিতা করা;

৪) লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর জন্য আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, প্রাথমিক স্বাস্থ্য, পুষ্টি, মা ও শিশু যত্ন, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ও বিশুদ্ধ/নিরাপদ পানি ব্যবহার, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক বনায়ন, সাক্ষরতা, খেলাধুলা ও চিত্তবিনোদন ইত্যাদি কার্যক্রমে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে তাদের জীবনমান উন্নয়ন;

৫) সুদমুক্ত ক্ষুদ্রপুঁজি প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনমূলক ও আয়বর্ধক কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন;

৬) বিনিয়গকৃত ঘূর্ণায়মান তহবিল হতে প্রাপ্ত সার্ভিসচার্জ দ্বারা কার্যক্রমভুক্ত গ্রামের নিজস্ব পুঁজি বা গ্রাম তহবিল গঠন;

৭) সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিজস্ব পুঁজি দ্বারা কার্যক্রম পরিচালনা করার লক্ষ্যে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা;

৮) দারিদ্র্যসীমার উর্ধ্বে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর মধ্যে সামাজিক চেতনার বিকাশ সাধনের জন্য সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে তাদেরকে সম্পৃক্ত করা;

৯) কারিগরি/বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও অদক্ষ জনশক্তিকে দক্ষ জনশক্তিতে রুপান্তরিত করা;

১০) পারিকারিক ও সামাজিকবন্ধন দৃঢ়করণ, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ নিরুৎসাহিতকরণ, যৌতুকপ্রথা রোধকরণ এবং মহিলাদের সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ এবং ক্ষমতায়নে উদ্বুদ্ধকরণ;

১১) এসিড নিক্ষেপের ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি এবং তা রোধকল্পে কার্যকর ব্যবস্থা করা;

১২) শিশু-কিশোরদের খেলাধূলা ও চিত্তবিনোদনের মাধ্যমে তাদের সুষ্ঠু মানসিকতার বিকাশ এবং অপরাধ প্রবণতা রোধে জনসচেতনতা সৃষ্টিসহ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রতিটি শিশুর জন্মনিবন্ধনকরণে উদ্বুদ্ধকরণ;

১৩) নারী ও শিশুপাচার রোধে জনগোষ্ঠীকে সচেতন করে তোলা;

১৪) শিশু ও কিশোর বয়সে তাদের অনৈতিক ও অসামাজিক কাজে জড়িয়ে পড়া রোধে নৈতিক, পারিবারিক ও সামাজিক মূল্যবোধ বিষয়ে সচেনতা সৃষ্টি করা এবং সরকারি-বেসরকারি আশ্রয় কেন্দ্র হতে অব্যাহতি প্রাপ্ত কিশোর অপরাধীদেরকে পারিবারিক পর্যায়ে সামাজিকভাবে পুনর্বাসনে সহায়তা প্রদান করা;

১৫) প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য স্থানীয় প্রশাসনের সাথে সমন্বয় রেখে ত্রাণ তৎপরতা পরিচালনা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

১৬) প্রবীণ ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শনের বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে পারিবারিক তথা সামাজিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করা।

সুতরাং পল্লী সমাজসেবা (RSS) কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত দুঃস্থ, অসহায়, অবহেলিত, অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন করা।

সারসংক্ষেপ

পল্লী সমাজসেবা মূলত গ্রামের দুঃস্থ, অসহায়, অবহেলিত, অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করার একটি বহুমুখী সমষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রম যা ১৯৭৪ সালে পরীক্ষামূলক যাত্রা শুরু করে। বর্তমানে এই কর্মসূচি দেশের ৪৮৭টি উপজেলায় পরিচালিত হচ্ছে। এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হচ্ছে দেশের পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র, দুঃস্থ, অসহায়, অবহেলিত, অনগ্রসর, পশ্চাদপদ ও সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। পল্লী সমাজসেবা কর্মসূচি কত সালে যাত্রা শুরু করে?

ক) ১৯৭৩ সালে খ) ১৯৭৪ সালে
গ) ১৯৭৫ সালে ঘ) ১৯৭৬ সালে

২। সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক প্রকাশিত পল্লী সমাজসেবা (RSS) কার্যক্রম বাস্তবায়ন নীতিমালায় কয়টি লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়েছে?

ক) ষোলটি খ) সতেরটি
গ) আঠারোটি ঘ) উনিশটি

পাঠ-৬.৬ পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের বিবরণ ও পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ (Discription of Rural Social Services Programme and Application of Social Work Methods in Rural Social Service programme)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৬.৬.১ পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

৬.৬.২ পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

৬.৬.১ পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম

পল্লী সমাজসেবা (RSS) কার্যক্রম বাংলাদেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক মুক্তির ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী ইতিহাস সূচনা করে । জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশনায় সমাজসেবা অধিদফতরের মাধ্যমে ১৯৭৪ সালে পরীক্ষামূলকভাবে তৎকালীণ ১৯টি থানায় পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমের যাত্রা শুরু হয়। এর সফলতার আলোকে ১৯৭৭ সালে আরো ২১ টি থানায় এ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়। পরবর্তীতে দ্বিতীয় পর্বে (১৯৮০-৮৭) ১০৩টি উপজেলায়, তৃতীয় পর্বে (১৯৮৭-৯২) ১২০টি উপজেলায়, চতুর্থ পর্বে (১৯৯৫-২০০২) ১১৯ টি উপজেলায়, ষষ্ঠ পর্বে (২০০৪-২০০৭) ৪৭০টি উপজেলায় পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা হয়। এই ধারাবাহিকতায় ২০১১-১২ অথবছর থেকে ৪৮৭ টি উপজেলায় সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম খাতে নিয়মিত বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। এ কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে সভাপতি করে মোট ১৬ সদস্য বিশিষ্ট পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটি (UPIC) উপজেলা পর্যায়ে রয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে আর্থ-সামাজিক জরিপের মাধ্যম্যে লক্ষ্যভুক্ত পরিবারগুলোকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। শ্রেণিগুলো হলো– 'ক' শ্রেণি, 'খ' শ্রেণি এবং 'গ' শ্রেণি। গ্রামের যেসকল পরিবারের বার্ষিক গড় আয় ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত বা কম হলে 'ক' শ্রেণির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তারা দরিদ্রতম বলে অবিহিত হবে। পরিবারের বার্ষিক গড় আয় ৫০,০০১ টাকা থেকে ৬০,০০০ টাকা পর্যন্ত হলে 'খ' শ্রেণির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তারা দরিদ্র বলে অভিহিত হবে। পরিবারের বার্ষিক গড় আয় ৬০,০০১ টাকার উর্ধ্বে হলে 'গ' শ্রেণির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে যারা ধনী বা দারিদ্র্যসীমার উর্ধ্বে অবস্থান করছে বলে অবিহিত হবে। প্রতিটি কার্যক্রমে 'ক' ও 'খ' শ্রেণির পরিবার হতে প্রতিনিধি নিয়ে কমপক্ষে ১টি নারী দলসহ সর্বোচ্চ ১০টি কর্মদল গঠন করা হয়। প্রতিটি কর্মদলের সংখ্যা ১০-২০ জন পর্যন্ত হয়ে থাকে। দরিদ্রতম ('ক' শ্রেণিভুক্ত) এবং দরিদ্র ('খ' শ্রেণিভুক্ত) পরিবারের জন্য ঋণদান কর্মসূচি প্রযোজ্য হয়। এছাড়া অন্যান্য কর্মসূচি যেমন– পরিবার পরিকল্পনা, স্বাস্থ্য পরিচর্যা ও সমষ্টি উন্নয়ন কর্মসূচিতে সকল শ্রেণি অর্থাৎ ক, খ ও গ শ্রেণির পরিবারকে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে। পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়ন কমিটির অনুমোদনক্রমে একজন ঋণগ্রহীতা প্রয়োজনে সর্বাধিক তিনবার ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। এ কর্মসূচির আওতায় পরিবার প্রতি সর্বনিম্ন ৫,০০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৩০,০০০ টাকা পর্যন্ত সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে ১০% সার্ভিস চার্জসহ সমান ১০টি কিস্তিতে সর্বোচ্চ এক বছর মেয়াদে ঋণ পরিশোধযোগ্য দেশের পল্লী অঞ্চলে বসসাসরত দুঃস্থ, অসহায়, অবহেলিত, অনগ্রসর ও পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনে পল্লী সমাজসেবা বহুমুখী ও সমন্বিত কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। নিম্নে প্রধান কর্মসূচিসমূহ তুলে ধরা হলো:

৬.৬.১.১ বৃত্তিমূলক ও কারিগরি কর্মসূচি: পল্লী সমাজসেবার গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি হচ্ছে গ্রামের লক্ষ্যভুক্ত দরিদ্র জনগণ ও বেকার যুবক বিশেষ করে নারীদের বৃক্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা। এই কর্মসূচির আওতায় বাঁশ ও বেতের কাজ, মৎস্য চাষ, গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগী পালন, পাট ও কাঠের কাজ, তাঁত ও বয়ন কাজ, এমব্রয়ডারী এবং উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। মূলধন বিনিয়োগ ও মূলধন সৃষ্টির জন্য সমবায় স্থাপন, ধানভানা প্রকল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এছাড়া ট্রাস্টভিত্তিক দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

৬.৬.১.২ ঋণদান কর্মসূচি: গ্রামের দরিদ্রতম ও দরিদ্র শ্রেণিভুক্ত পরিবারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সুদমুক্ত ঋণ প্রদান করা হয়ে থাকে। প্রতিটি লক্ষ্যভুক্ত পরিবারকে পাঁচ হাজার টাকা থেকে ত্রিশ হাজার করে টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। ১৯৭৪

সালের মার্চ মাসে ১ কোটি ৭ লক্ষ টাকা নিয়ে দেশের তৎকালীণ ১৯টি থানায় এ কার্যক্রম চালু হয়। ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে সর্বমোট ৫০ কোটি টাকা পল্লী সমাজসেবার সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রমে বরাদ্দ করা হয়। সমাজসেবা অধিদফতর (২০১৭) এর তথ্যানুযায়ী, শুরু থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত এ খাতে সর্বমোট ৩৫৪,৯৩,২৫,০০০ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য 'ক' শ্রেণিভুক্ত দরিদ্রতম এবং 'খ' শ্রেণিভুক্ত দরিদ্র পরিবারের জন্য ঋণদান কর্মসূচি প্রযোজ্য হলেও 'গ' শ্রেণিভুক্ত পরিবারকে ঋণ প্রদান করা হয় না।

৬.৬.১.৩ সচেতনতামূলক কর্মসূচি: পল্লী সমাজসেবা গ্রামের মা ও শিশুস্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে।

৬.৬.১.৪ সামাজিক কর্মসূচি: স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহার, বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার, জ্বালানীসাশ্রয়ী চুলা ব্যবহার ও সামাজিক বনায়নে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করা হয়। স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা স্থাপন, বিশুদ্ধ ও আর্সেনিক মুক্ত নিরাপদ পানি পান ও ব্যবহারে নলকূপ স্থাপনে RSS লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করে।

৬.৬.১.৫ স্বাস্থ্য কর্মসূচি: RSS মা ও শিশুর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা সম্পর্কিত বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ, মা ও শিশুকে রোগ প্রতিষেধক টিকা প্রদান এবং পারিবার পরিকল্পনায় উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি পরচিালনা করে থাকে। এছাড়া স্বাস্থ্য ও পুষ্টিজ্ঞান প্রদান, পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী বিতরণ, পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, সামাজিক বনায়ন ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কর্মসূচি চালু রয়েছে।

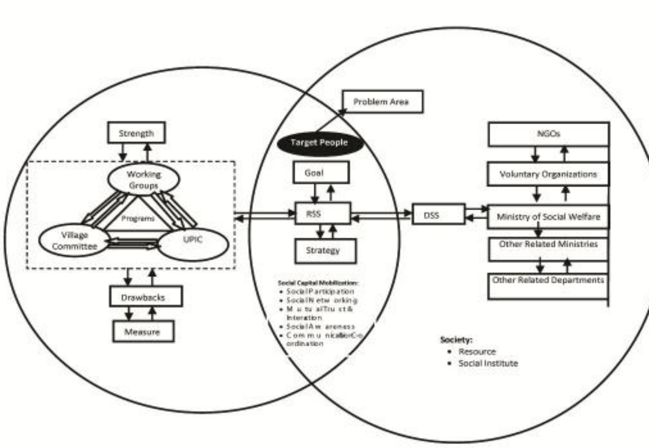
৬.৬.১.৬ অন্যান্য কর্মসূচি: এছাড়াও পল্লী সমাজসেবার অধীনে দলীয় সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধকরণ এবং খেলাধূলা ও চিত্তবিনোদনের জন্য প্রতিযোগিতামূলক খেলারও আয়োজন করা হয়।

পরিশেষে বলা যায়, পল্লী অঞ্চলে বসবাসরত দুঃস্থ, অসহায়, অবহেলিত, অনগ্রসর ও পশ্চাদপদ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধনে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম বহুমুখী ও সমন্বিত কর্মসূচি পরিচালনা করছে।

৬.৬.২ পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

বাংলাদেশ একটি গ্রামপ্রধান দেশ। বাংলাদেশ আদমশুমারী-২০১১ অনুযায়ী, এদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ৭৬% গ্রামে বসবাস করে। গ্রামই হলো দেশের উন্নয়নের প্রাণকেন্দ্র। গ্রামের অধিকাংশ জনগোষ্ঠী বেকারত্ব, দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, অপুষ্টি, স্বাস্থ্যহীনতা, কুসংস্কার, নিরাপত্তাহীনতাসহ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত। পল্লী সমাজসেবা হলো সমষ্টি উন্নয়নকেন্দ্রিক বহুমুখী সমন্বিত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রক্রিয়া। গ্রামীণ জনগণের নিজস্ব সম্পদ এবং সরকারি আর্থিক ও কারিগরি সহায়তার মাধ্যমে RSS লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালায়। পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমাজকর্মের বিভিন্ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়।

RSS-এ সামাজিক জরিপের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী চিহ্নিত করে পরিকল্পিতভাবে দল গঠন করে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ, সদমুক্ত ঋণদান ও সামাজিক কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এক্ষেত্রে সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতি সমাজকর্ম গবেষণা প্রয়োগ করা হয়। দল গঠন, দলীয় নেতৃত্ব বিকাশ, দলীয় গতিশীলতা, দলীয় ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া RSS-এর সফল বাস্তবায়নের জন্য একান্ত আবশ্যক। যেখানে দল সমাজকর্ম পদ্ধতির নীতিমালা ও কৌশল প্রয়োগ করা যেতে পারে। সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা গতিশীল ভূমিকা পালন করতে পারেন। RSS-এর কার্যক্রমে জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, পারস্পরিক বিশ্বাস তৈরি, সামাজিক নেটওয়ার্কিং তৈরি তথা social capital mobilzation এ সমাজকর্মের সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। পল্লী সমাজসেবা (RSS) কার্যক্রমে Social capital mobilization এ networking অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আর ক্ষেত্রে সমাজকর্মী সমষ্টি উন্নয়ন সমাজকর্মের জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারেন। এ প্রসঙ্গটি S. R. Dey (২০১৫) তাঁর প্রবন্ধ "*Social Capital Mobilzation for Community Development in Bangladesh: Experience from Rural Social Service Program*" একটি চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন যা নিম্নরূপ:



চিত্র ৬.৬.১ : পল্লী সমাজসেবা (RSS) কার্যক্রমে Social Capital Mobilization এ নেটওয়ার্কিং

সমাজসেবা কর্মকর্তারা গ্রামের লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক ও জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে কাজ করে থাকেন। আর এক্ষেত্রে সামাজিক হস্তক্ষেপের মতো গুরুত্বপূর্ণ কৌশল প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে। সমাজকর্মেও কৌশল হচ্ছে পরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তন, সামাজিক উপযোজন ও সামাজিক উদ্ভাবন পদ্ধতি প্রয়োগ কার্যক্রমটি RSS-এর সক্ষমতা নিশ্চিতকরণে ভূমিকা রাখবে। ব্যক্তি সমাজকর্ম, দল সমাজকর্ম এবং সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির নীতিমালা ও কর্মকৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে RSS কার্যক্রমকে আরো বেশি ফলপ্রসূ করা যেতে পারে। RSS-এর কর্মদলের উদ্দেশ্য, আদর্শ, আকার, নিয়মনীতি, মূল্যবোধ, কাঠামো, নেতৃত্ব, দলীয় ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও গতিশীলতা আনয়নে একজন দল সমাজকর্মী ভূমিকা রাখতে পারে। গ্রামের লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর তালিকা প্রণয়ন, বিদ্যমান সমস্যা নির্ণয়ে সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগে সমাজকর্মী ভূমিকা পালন করতে পারে। গ্রামের আর্থ-সামাজিক সমস্যা নিরসনে সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতির পাশাপাশি সহায়ক পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সারসংক্ষেপ

পল্লী সমাজসেবা হচ্ছে সমষ্টি উন্নয়ন কেন্দ্রিক বহুমুখী সমন্বিত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রক্রিয়া। গ্রামের পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্রঋণ প্রদান, শিক্ষা ও সচেতনতামূলক কর্মসূচিসহ বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। পল্লী সমাজসেবা কর্মসূচি যথাযথ বাস্তবায়নে সমাজকর্মের জ্ঞান, নীতি, মূল্যবোধ, কৌশল ও পদ্ধতি প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। পল্লী সমাজসেবা কর্মসূচির লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী কয় শ্রেণির হয়ে থাকে?

ক) তিন　　খ) চার

গ) পাঁচ　　ঘ) ছয়

২। পল্লী সমাজসেবা কর্যক্রমের UPIC কত সদস্য বিশিষ্ট হয়ে থাকে?

ক) ১৫ সদস্য　　খ) ১৬ সদস্য

গ) ১৭ সদস্য　　ঘ) ১৮ সদস্য

পাঠ-৬.৭ শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের ধারণা এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Concept and Goals and Objectives of Urban Social Service Programme)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৬.৭.২ শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট বর্ণনা করতে পারবেন।
৬.৭.১ শহর সমাজসেবা কার্যক্রম কী তা লিখতে পারবেন।
৬.৭.৩ শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

৬.৭.২ শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজসেবা অধিদফতরের দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রমগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শহর সমাজসেবা (Urban Social Service-USS) কার্যক্রম। বাংলাদেশে পেশাগত সমাজকর্মের বিকাশে শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের যোগসূত্র রয়েছে। শহরাঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে তৎকালীণ সরকার ১৯৫৫ সালে Dhaka Urban Community Development Board গঠন করে। এই বোর্ডের অনুমোদনক্রমে ১৯৫৫ সালে ঢাকায় কায়েতটুলীতে পরীক্ষামূলকভাবে শহর সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। পরীক্ষামূলক প্রকল্পটির সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৭-৫৮ সালে ঢাকার গোপীবাগ, লালবাগ ও মোহাম্মদপুরে আরো ৩টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৫৯-৬০ সালে চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, বরিশাল, দিনাজপুর, যশোর ও ময়মনসিংহে মোট ১২টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ১৯৬১ সালে সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর প্রতিষ্ঠিত হবার পর বাস্তব প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে শহর সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যাপক প্রসার ঘটে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর শহরে বসবাসরত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য শহর সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্পের সংখ্যা সম্প্রসারণ করা হয়। প্রশাসনিক পুনর্গঠনের ফলে ১৯৮৪ সালে সমাজকল্যাণ বিভাগের নাম পরিবর্তন করে সমাজসেবা অধিদফতর করা হয়। তখন শহর সমাজসেবা উন্নয়ন প্রকল্পের নামকরণ করা হয়েছিলো পৌর সমাজসেবা প্রকল্প যা পরবর্তীতে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম (Urban Social Service-USS) নামে পরিচালিত হচ্ছে। সমাজসেবা অধিদফতর (২০১৬) এর তথ্যানুযায়ী, বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলায় ৮০টি ইউনিটের মাধ্যমে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে যার মধ্যে ৫০টি রাজস্ব এবং ৩০টি উন্নয়ন খাতে রয়েছে।

৬.৭.২ শহর সামাজসেবার ধারণা

শহর সমাজসেবা কার্যক্রম হলো সমষ্টিকেন্দ্রিক সমাজসেবা কার্যক্রম যা শহরবাসীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, পারস্পারিক, সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে শহর জীবনকে সুন্দর করে তোলার লক্ষ্যে পরিচালিত হয়। অন্যভাবে বলা যায়, শহর সমাজসেবা হচ্ছে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনে সমাজসেবা অধীদপ্তর কর্তৃক পরিচালিত একটি দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি যা শহরের জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমষ্টিকেন্দ্রিক প্রয়াস চালায়।

সুতরাং বলা যায়, শহর সমাজসেবা হচ্ছে শহর এলাকায় পরিচালিত একটি সমষ্টি উন্নয়নমূলক কার্যক্রম যা সরকারের আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় এবং জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণে শহররে জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রচেষ্টা চালায়। এ কার্যক্রমে জনগণের সুখী ও সুন্দর জীবন গঠনের লক্ষ্যে এখানে পারস্পরিক সম্পর্ক, সোহার্দ্য ও সহযোগিতার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।

৬.৭.৩ শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের লক্ষ্য হচ্ছে শহর এলাকায় বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন করা। শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের উদ্দেশ্য হচ্ছে শহর এলাকায় বসবাসরত স্বল্প-আয়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা বৃদ্ধি, আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম গ্রহণ এবং সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে সহায়তা প্রদান।

জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ এইচ. চার্লস (H. Charles) শহর সমষ্টি উন্নয়নের দুটি উদ্দেশ্য চিহ্নিত করেছেন। তা হলো:

১) শহর এলাকার লোকজন যাতে সেখানকার জীবনযাত্রার সঙ্গে খাপখাইয়ে চলতে পারে সে জন্য তাদের মধ্যে সামাজিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি এবং নীতি অনুসরণ করে তাদেরকে সহযোগিতামূলক কর্মসূচিতে উদ্বুদ্ধ করা; এবং

২) দায়িত্বশীল ও প্রতিনিধিত্ব মূলক নাগরিক সংস্থা গঠন করে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন জোরদার করা। পৌরসভা ও সরকারি সংস্থাগুলোর সঙ্গে পৌর এলাকার সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা।

সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক প্রকাশিত শহর সমাজসেবা কার্যক্রম নীতিমালায় শহর সমজসেবা কার্যক্রমের নিম্নোক্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়েছে–

১) শহর এলাকায় বসবাসরত স্বল্প আয়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিবারের সদস্যদের সংগঠিতকরণ;
২) আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত জনগণের দক্ষতা বৃদ্ধি;
৩) দরিদ্র জনগণের আয় বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের জন্য ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম গ্রহণ; এবং
৪) সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নিয়োজিত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে সহায়তা প্রদান।

এছাড়া সমাজসেবা অধিদফতর ওয়েবসাইট অনুযায়ী শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো:

১) শহরাঞ্চলের বস্তিবাসীদের সামাজিক জরিপের মাধ্যমে সমস্যা ও চাহিদা চিহ্নিতকরণ এবং তাদের বসবাসের পরিবেশের উন্নয়ন;
২) দরিদ্র বস্তিবাসীদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান এবং আত্ম-কর্মসংস্থানের জন্য সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা;
৩) বিভিন্ন পরিবেশে বসবাসরত শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশিক্ষণ এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে কর্মসূচি প্রণয়ন করা;
৪) প্রাথমিক চিকিৎসাসেবা ও পরিবার পরিকল্পনা সেবা প্রদান।
৫) গ্রাম থেকে শহরে স্থানান্তরিতদের গ্রামে ফিরে যেতে উদ্বুদ্ধকরণ;
৬) বস্তিবাসী এবং শহরের সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের মধ্যে সমন্বয় সাধন;
৭) স্থানীয় নেতৃত্ব তৈরি এবং প্রকল্প সমন্বয় পরিষদ গঠন এবং
৮) চাহিদা এবং সম্পদের মধ্যে ভারসাম্য স্থাপনের লক্ষ্যে কল্যাণমূখী কর্মসূচির উদ্যোগ গ্রহণ।

সুতরাং বলা যায়, স্থানীয় জনগণের যৌথ উদ্যোগে প্রয়োজনীয় আর্থ-সামাজিক সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা চালানোই শহর সমাজসেবার মূল লক্ষ্য।

সারসংক্ষেপ

শহর সমাজসেবা (Urban Social Service-USS) কার্যক্রম হচ্ছে অন্যতম দারিদ্র্য বিমোচন কার্যক্রম যা শহরাঞ্চলে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৫৫ সালে চালু হয়। বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলায় ৮০টি ইউনিটের মাধ্যমে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে যার মধ্যে ৫০টি রাজস্ব এবং ৩০টি উন্নয়ন খাতে রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। বর্তমানে দেশের ৬৪টি জেলায় কতটি ইউনিটের মাধ্যমে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে?

ক) ৮০টি খ) ৮১টি
গ) ৮২টি ঘ) ৮৩টি

২। জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ এইচ. চার্লস (H. Charles) শহর সমষ্টি উন্নয়নের কয়টি উদ্দেশ্য চিহ্নিত করেছেন?

ক) একটি খ) দুইটি
গ) তিনটি ঘ) চারটি

পাঠ-৬.৮ শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের বিবরণ এবং শহর সমাজসেবা কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ (Description of Urban Social Service Programme and Application of Social Work Methods in Urban Social Service Programme)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৬.৮.১ শহর সমাজসেবা কার্যক্রমসমূহ লিখতে পারবেন।

৬.৮.২ শহর সমাজসেবা কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ ও এর গুরুত্ব বর্ণনা করতে পারবেন।

৬.৮.১ শহর সমাজসেবা কার্যক্রম

শহরাঞ্চলে বসবাসরত লক্ষ্যভুক্ত দরিদ্র ও বস্তিবাসী জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শহর সমাজসেবা নানা ধরনের কর্মসূচি পরিচালনা করে থাকে। বেকারত্ব, পুষ্টিহীনতা, স্বাস্থ্যহীনতা, অপরাধ ও কিশোর অপরাধ, মাদকাসক্তি, ভিক্ষাবৃত্তি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশসহ অন্যান্য অসামঞ্জস্য নিরসনে শহর সমাজসেবা কার্যক্রম প্রচেষ্টা চালায়। শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর সমাগ্রিক কল্যাণে নিম্নোক্ত কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে:

৬.৮.১.১ বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি: শহর সমাজসেবা কার্যক্রম শহর এলাকায় লক্ষ্যভুক্ত দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির জন্য উৎপাদনশীল ও আয়বর্ধক কাজের উপর প্রশিক্ষণ কর্মসূচি বাস্তবায় করছে। শহর সমাজসেবার আওতায় পাট, বস্ত্র ও বেতের কাজ; সেলাই ও উল বুনন; কার্পেট, মাদুর ও পুতুল তৈরি; বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি মেরামতের কাজ; মোটর ড্রাইভিং, বাইসাইকেল ও রিক্সা মেরামত; শর্টহ্যান্ড ও টাইপ রাইটিং এবং ওয়েল্ডিং ও গ্রীলের কাজ ইত্যাদি বিষয়ে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দিয়ে ঘূর্নায়মান তহবিলের আওতায় স্বকর্মসংস্থানে সহায়তা করছে।

৬.৮.১.২ শিক্ষা ও সচেতনতা বিষয়ক কর্মসূচি: শিক্ষা ও সচেতনতা বিষয়ক কর্মসূচি শহর সমাজসেবার অন্যতম গুরত্বপূর্ণ কার্যক্রম। শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় অজ্ঞ ও অশিক্ষিত জনগণকে শিক্ষিত করে তোলা, নিরক্ষরতা দূরীকরণ এবং সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্র, প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা, নৈশ বিদ্যালয় পরিচালনা, সাধারণ পাঠাগার স্থাপন, ধর্মীয় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এবং সামাজিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু রয়েছে।

৬.৮.১.৩ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক কর্মসূচি: শহর সমাজসেবা কার্যক্রমে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক কর্মসূচি চালু রয়েছে। শহর সমাজসেবা কার্যক্রমে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে দলীয় কার্যক্রমের মাধ্যমে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা, বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার, জলাবদ্ধ পায়খানা ব্যবহার, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, শিশুযত্ন, পরিবার পরিকল্পনা গ্রহণ, পুষ্টি, পরিবেশ উন্নয়ন, বৃক্ষরোপন, হাতে স্যালাইন তৈরি ইত্যাদি বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচি পরিচালিত হয়ে থাকে।

৬.৮.১.৪ সুদমুক্ত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি: দারিদ্র্য বিমোচনে আত্মকর্মসংস্থান ও পারিবারিক আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে শহর এলাকায় বসবাসরত লক্ষ্যভুক্ত দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি চালু রয়েছে। শহর এলাকায় বসবাসরত দরিদ্র ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মধ্যে যাদের বার্ষিক মাথাপিছু গড় আয় ৭,৫০০ টাকা অর্থাৎ দরিদ্রতম ('ক' শ্রেণি) জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ঘূর্ণায়মান তহবিল হিসেবে ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করে থাকে।

৬.৮.১.৪ অন্যান্য কর্মসূচি: শহর সমাজসেবা কার্যক্রমের আওতায় অন্যান্য কর্মসূচিরসমূহ হলো:

ক) স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সৃষ্টি, উন্নয়ন, তদারকি ও সমাজ কল্যাণমূলক কাজে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে অংশগ্রহণে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান;

খ) সামাজিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত বিভিন্ন সংগঠনের কর্মকর্তাদের নেতৃত্ব বিকাশ ও কর্মসূচি পরিচালনায় পরামর্শ ও প্রশিক্ষণ প্রদান;

গ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলায় কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন এবং নিয়োজিত অন্যান্য সংস্থাকে সহযোগিতা প্রদান;

ঘ) এসিডদগ্ধ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের আর্থ-সামাজিক পুনর্বাসনমূলক কাজে সক্রিয় সহায়তা প্রদান;

ঙ) শিশু অধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন, কিশোর অপরাধী সংশোধন ও সমষ্টি ক্ষমতায়ন (community empowerment) ইত্যাদি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি;

চ) সামাজিক গবেষণা ও জরিপ কাজ পরিচালনা;

ছ) সামাজিক উন্নয়ন ও জাতি গঠনমূলক কাজে নিয়োজিত বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংগঠন/সংস্থার উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদান এবং সমন্বয় সাধন।

৬.৮.২ শহর সমাজসেবা কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ ও গুরুত্ব

শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমাজকর্ম পদ্ধতির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। শহরাঞ্চলে বস্তিতে আর্থ-সামজিক জরিপের মাধ্যমে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে দল গঠন, দলীয় নেতৃত্ব সৃষ্টি, দলের সামাজিক কার্যাবলী নির্ধারণে আলোচনা ও পরামর্শ প্রদান এবং তদারকি করতে পৌর সমাজকর্মীকে বিভিন্ন কৌশল প্রয়োগ করতে হয়। লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পৌর সমাজকর্মী ব্যক্তি, দল এবং সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি, কৌশল ও নীতি প্রয়োগ করতে পারেন। শহর সমাজসেবায় পৌর সমাজকর্মীর কাজে সমাজকর্ম পদ্ধতি ও কৌশলের মিল রয়েছে। শিক্ষামূলক কার্যাবলিতে সমাজকর্মীরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শিক্ষামূলক কর্মসূচি বাস্তবায়নে উদ্বুদ্ধকরণ ও প্রচারণার ক্ষেত্রে সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল প্রয়োগে সাফল্য বয়ে আনতে পারে। শহর সমাজসেবা কার্যক্রম বাস্তবায়নে উন্নয়নকর্মীরা উদ্বুদ্ধকরণ, প্রচারণা, সমাবেশ, দলীয় সভা, শিক্ষাদান এবং প্রদর্শন কৌশল প্রয়োগ করেন। এসব কৌশল সমাজকর্মের কৌশলের সাথে মিল রয়েছে। তবে বাংলাদেশে সমাজকর্মের পেশাগত স্বীকৃতি না থাকায় এসব কর্মসূচি পেশাদার সমাজকর্মীর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হচ্ছে না। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই যথাযথ সফলতা অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে না। স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও সচেতনতা বিষয়ক কর্মসূচিতে নিয়োজিত কর্মীকে সচেতনতা সৃষ্টি, প্রচার, উদ্বুদ্ধকরণ, সম্পর্ক স্থাপন, দলীয় সভা, গবেষণা, সমাবশে, সামাজিক আন্দোলন কৌশল প্রয়োগ করতে হয়। এসব কৌশল সমাজকর্মের পদ্ধতি ও কৌশলের সাথে সম্পর্কযুক্ত। পরিবেশ উন্নয়ন বিষয়ক কার্যক্রমে সচেতনা বৃদ্ধি ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সমাজকর্মের সামজিক কার্যক্রম পদ্ধতি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। শহরাঞ্চলের বস্তিবাসী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সমাজকর্মের কৌশলসমূহ প্রয়োগের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। সুতরাং শহর সমাজসেবা কার্যক্রম সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী নিয়োজিত হলে কর্মসূচিটি লক্ষ্য অর্জনে আরো বেশি ফলপ্রসূ হবে।

সারসংক্ষেপ

শহর সমাজসেবা কার্যক্রম শহরাঞ্চলে বসবাসরত দরিদ্র ও বস্তিবাসীদের জীবনমান উন্নয়নে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সচেতনতা, ক্ষুদ্রঋণ, পরিবেশ বিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করছে। এ কার্যক্রমে শহরাঞ্চলের বস্তিবাসী দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে সমাজকর্মের কৌশল প্রয়োগের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। শহর সমাজসেবা কার্যক্রমে সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন কর্মী নিয়োজিত হলে কর্মসূচি লক্ষ্য অর্জনে আরো বেশি ফলপ্রসূ হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। বাংলাদেশে পেশাগত সমাজকর্মের সূত্রপাত ঘটেছিল কোন কর্মসূচির মাধ্যমে?

ক) শহর সমাজসেবা খ) গ্রামীণ সমাজসেবা
গ) পল্লী মাতৃকেন্দ্র ঘ) জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

২। নিচের কোনটি শহর সমাজসেবা কর্মসূচি?

ক) ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি খ) পুনর্বাসন কর্মসূচি
গ) ঋণদান কর্মসূচি ঘ) কোনটিই নয়

পাঠ-৬.৯ শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রঃ ধারণা এবং লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (Child Development Centre: Concept and Goal and Objectives)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৬.৯.১ শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র কার্যক্রমটি কী তা লিখতে পারবেন।
৬.৯.২ শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

৬.৯.১ শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রঃ ধারণা

শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র হচ্ছে সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত একটি সামাজিক অপরাধ প্রতিরোধ কর্মসূচি যা নিবিড় তত্ত্বধানের মাধ্যমে আইনের সংস্পর্শে আশা (contact with law) এবং আইনের সাথে সংঘর্ষে (conflict with law) জড়িত শিশু-কিশোর অপরাধমূলক আচরণ সংশোধন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে কিশোর হাজত, কিশোর আদালত এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এ তিনটি অঙ্গের মাধ্যমে কর্মকান্ড পরিচালনা করে থাকে। পূর্বে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র নামে পরিচিত ছিল।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশই হচ্ছে শিশু-কিশোর। বাংলাদেশের শিশু আইন,২০১৩ অনুসারে শিশু-কিশোরদের বয়সসীমা হচ্ছে ১৮ বছর। বয়সসীমা ০-১৮ বছরের মধ্যে হলে শিশু এবং ৭-১৬ বছরের মধ্যে হলে কিশোর বলা হয়। আমাদের সমাজে নানাবিধ কারণে শিশু-কিশোরীরা অপরাধমূলক আচরণ করে থাকে। পারিবারিক বিশৃংঙ্খলা, পিতামাতার কঠোর শাসন বা অত্যাধিক স্নেহ, কুসঙ্গ, ক্রটিপূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থা, দারিদ্র্য, মাদকের সহজলভ্যতা, পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অনুপ্রবেশসহ বিভিন্ন কারণে শিশু-কিশোররা আপরাধমূলক কর্মকান্ডে জড়িয়ে পড়ছে।

বিচার প্রক্রিয়ায় আটকাদেশ প্রাপ্ত শিশু আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু এবং বিচারের আওতাধীন শিশুর আবাসন, সংশোধন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে শিশু আইন, ১৯৭৪, জাতীয় শিশু নীতিমালা, ১৯৭৮, প্রবেশন অফ অফেন্ডার্স অর্ডিন্যান্স, ১৯৬০ এবং শিশু আইন, ২০১৩ (ধারা ৫৯) অনুসারে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। আইনের সংস্পর্শে আসা এবং বিচারের আওতাধীন এসব শিশু-কিশোরকে সমাজে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে সর্বপ্রথম ১৯৭৮ সালে গাজীপুরের টঙ্গীতে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক) প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্নে এই প্রতিষ্ঠানটির নাম ছিলো জাতীয় কিশোর অপরাধী সংশোধন প্রতিষ্ঠান। দেশে কিশোর অপরাধের মাত্রা ও সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে ১৯৯২ সালে যশোরের পুলেরহাটে ১টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালক) এবং ২০০২ সালে গাজীপুরের কোনাবাড়িতে ১টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালিকা) প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে সমাজসেবা অধিদফতর পরিচালিত ৩টি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের মোট আসন সংখ্যা ৫০০টি। সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক প্রকাশিত জতীয় সমাজসেবা দিবস ২০১৬ স্মরণিকার তথ্য মোতাবেক, ২০১৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রতিষ্ঠান তিনটির মোট নিবাসীর সংখ্যা ৭১৮ জন এবং পুনর্বাসিত ও সংশোধিত শিশুর সংখ্যা ২২০৬৬ জন। এছাড়া জয়পুরহাট জেলায় ৩০০ আসনবিশিষ্ট চতুর্থ কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রক্রিয়া চলছে। বর্তমানে যশোর ও টঙ্গীতে অবস্থিত কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধিসহ অতিরিক্ত ৩৫০ টি আসন বৃদ্ধির বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

৬.৯.২ শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

শাস্তি নয়, সংশোধনের লক্ষ্যে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হচ্ছে–

১) শাস্তি নয়, সংশোধনের জন্য অপরাধপ্রবণ ও অপরাধী শিশু-কিশোরদের শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে গ্রহণ করা হয়;
২) অতি মানবতার সাথে আদালতের রায় প্রতিপালন করা;
৩) সমাজের অন্যান্য সদস্যদের ন্যায় শিশু-কিশোরদের সুযোগ-সুবিধা এবং অধিকার সুরক্ষা করা;
৪) প্রতিষ্ঠানের শিশু-কিশোরকে সমাজে প্রচলিত আইন মেনে চলা এবং উৎপাদনশীল সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার জন্য পুনর্বাসন ও সমন্বয়ের মাধ্যমে সাহায্য করা;
৫) শিশু-কিশোর সংশোধন প্রক্রিয়ায় পরিবার ও সমাজের গুরুত্ব প্রদান করা; এবং
৬) শিশু-কিশোরদের অপরাধপ্রবণ ও অপরাধী করে গড়ে তোলে এমন প্রতিকূল পরিবেশ ও প্রভাব আধুনিক ও বৈজ্ঞানিক উপায়ে দূর করা।

এই প্রসঙ্গে সমাজসেবা অধিদফতরের ওয়েবসাইটে উল্লেখ করা হয়েছে,"শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের লক্ষ্য হচ্ছে আইনের আশ্রয়াধীন শিশুদের সুরক্ষা, অস্তিত্ব ও উন্নয়নের সকল দিকে প্রয়োজনীয় নজরদারির মাধ্যমে পরিবার ও সমাজে ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করা।" (The objective of the Child Development Centre is to create a congenial atmosphere in the family and also in the society by giving due attention to all dimensions of protection, survival and development of the children who are in contact with law.) সুতরাং বলা যায়, কিশোর অপরাধীদের শাস্তির পরিবর্তে সংশোধনের মাধ্যমে সমাজ ও রাষ্ট্রের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই হচ্ছে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশই হচ্ছে শিশু-কিশোর। বাংলাদেশের শিশু আইন,২০১৩ অনুসারে শিশু-কিশোরদের বয়সসীমা হচ্ছে ১৮ বছর। বয়সসীমা ০-১৮ বছরের মধ্যে হলে শিশু এবং ৭-১৬ বছরের মধ্যে হলে কিশোর বলা হয়। শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র হচ্ছে সমাজসেবা অধিদফতর কর্তৃক পরিচালিত একটি সামাজিক অবক্ষয় প্রতিরোধ কর্মসূচি যা শিশু-কিশোরদের অপরাধীদের শাস্তি নয়, সংশোধনের মাধ্যমে সমাজের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের মূল লক্ষ্য কী?

ক) শাস্তি নয়, উন্নয়ন
খ) শাস্তি নয়, প্রশিক্ষণ
গ) শাস্তি নয়, সংশোধন
ঘ) শাস্তি ও সংশোধন

২। বর্তমানে কতটি শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র (বালিকা) রয়েছে?

ক) ১ টি
খ) ২ টি
গ) ৩ টি
ঘ) ৪ টি

পাঠ-৬.১০ শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রম ও শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে সমাজকর্মের পদ্ধতির প্রয়োগ (Programmes of Child Development Centre and Application of Social Work Methods in Child Development Centre)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৬.১০.১ শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রম সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

৬.১০.২ শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে সমাজকর্মের পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

৬.১০.১ শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রম

শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে নিবিড় তত্ত্বাবধানের মাধ্যমে আইনের সংস্পর্শে আশা (contact with law) এবং আইনের সাথে সংঘর্ষে (conflict with law) জড়িত শিশু-কিশোরদের কেস ওয়ার্ক, কেস ম্যানেজমেন্ট, গাইডেন্স, কাউন্সেলিং, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং ডাইভারশন ও বিকল্প পরিচর্যা পদ্ধতির মাধ্যমে পরিবার ও সমাজে পুনঃএকত্রিত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করে। শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রম তিনটি অঙ্গের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। অঙ্গ তিনটি হলো– ক) কিশোর হাজত খ) কিশোর আদালত এবং গ) প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা সংশোধনী প্রতিষ্ঠান। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো:

৬.১০.১.১ কিশোর হাজত: শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের অন্যতম অঙ্গ হচ্ছে কিশোর হাজত। শিশু-কিশোর অপরাধীদের বিচারের পূর্বে বা বিচার চলাকালীণ সময়ে অথবা বিচারের পর সংশোধনের জন্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে প্রেরণের পূর্ব পর্যন্ত যেখানে রাখা হয়, তাকে কিশোর হাজত বলা হয়। সাধারণ জেল-হাজতের প্রাপ্ত বয়স্ক ও দাগী অপরাধীদের কু-প্রভাব হতে শিশু-কিশোর অপরাধীদের মুক্ত রাখার লক্ষ্যেই এটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কিশোর হাজতকে শিশু-কিশোর অপরাধীদের পর্যাবেক্ষণে রাখা হয়। কিশোর হাজতকে আটক নিবাসও বলা হয়। কিশোর হাজত বা আটক নিবাসের কার্যক্রম প্রশাসন, সমাজকর্মী, আদালতের কর্মকর্তা এবং শিশু বিশেষজ্ঞের সমন্বয়ে পরিচালিত হয়। নিবাসে অবস্থানরত নিবাসীদের চারিত্রিক ও নৈতিক উন্নয়নের জন্য শিক্ষা, চিকিৎসা এবং ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। কিশোর অপরাধীদের অপরাধমূলক আচরণ সংশোধনে এ ব্যবস্থা অনুকূল প্রভাব সৃষ্টি করে।

৬.১০.১.২ কিশোর আদালত: শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে কিশোর আদালত। কিশোর আদালত হচ্ছে শিশু-কিশোর অপরাধীদের বিচারের জন্য বিশেষ ধরনের আদালত ব্যবস্থা যেখানে অত্যন্ত ঘরোয়া পরিবেশে তাদের সংশোধনের প্রচেষ্টা চালানো হয়। সাধারণ আদালতের মতো বাদী-বিবাদী, আইনজীবী নিয়োগ ও শাস্তিদানের ব্যবস্থা কিশোর আদালতে নেই। কিশোর আদালত ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের বিধান অনুযায়ী গঠিত হয়েছিলো। বর্তমানে শিশু আইন, ২০১৩ অনুযায়ী কিশোর আদালত পরিচালিত হচ্ছে। এখানে যেসব কিশোর অপরাধীদের বয়স ১৮ বছরের নিচে শুধু তাদের বিচার করা হয়। একজন প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট, প্রবেশন অফিসার, মনোচিকিৎসক, কিশোর-কিশোরীর পিতামাতা বা অভিভাবক এবং সংশ্লিষ্টদের উস্থিতিতে সম্পূর্ণ ঘরোয়া পরিবেশে কিশোর অপরাধীর অপরাধের সঠিক দিক বিশ্লেষণ করে সংশোধন ও উন্নয়নের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কিশোর আদালতের বিচারকার্য শাস্তি প্রদানের লক্ষ্যে নয় বরং কিশোর অপরাধীদের চরিত্র সংশোধনের জন্য পরিচালিত হয়। ফলে এখানে কোনো উকিল নিয়োগ বা আত্মপক্ষ সমর্থনের প্রয়োজন হয় না। কিশোর আদালতে দুই ধরনের কেসে শিশু-কিশোর অপরাধীদের বিচার করা হয়। একটি হচ্ছে অভিভাক কেস এবং অন্যটি হচ্ছে পুলিশ কেস। শিশু-কিশোরের আইনসঙ্গত অভিভাবক কর্তৃক দায়েরকৃত কেসকে অভিভাবক কেস বলা হয়। ১৯৭৪ সালের শিশু আইনের ধারা অনুযায়ী শিশুর আইনসঙ্গত অভিভাবক অবাধ্য বা অপরাধপ্রবণ কোনো শিশু-কিশোরের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করতে পারেন। মামলা দায়েরে পর ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয় অভিভাবকে জিজ্ঞাসাবাদ করে শিশু-কিশোর অপরাধীকে কিশোর হাজতে রাখার হুকুম দেন এবং চূড়ান্ত ফয়সালার জন্য তারিখ ঘোষণা করেন। অন্যদিকে যেসব শিশু-কিশোর বাংলাদেশ দণ্ডবিধি মোতাবেক কোনো অপরাধ করে এবং তাদের বিরুদ্ধে পুলিশ থানায় মামলা দায়ের করে তাকে পুলিশ কেস বলা হয়। পুলিশ কেসে শিশু-কিশোর অপরাধীদের বিচারও কিশোর আদালতে সম্পন্ন হয়। যে কোনো আদালত হতে মামলাগুলো কিশোর আদালতে স্থানান্তর করা যায়। এসব মামলা পরিচালনার সময় একজন পুলিশ কর্মকর্তা উপস্থিত থাকেন। এসব মামলার ক্ষেত্রে শিশু-কিশোর অপরাধীর পক্ষে উকিল

নিয়োগ করা যেতে পারে। মধ্যবর্তী সময়ে একজন প্রবেশন অফিসার মামলাটি তদন্ত করেন। প্রবেশন অফিসার অপরাধপ্রবণ কিশোরের সার্বিক দিক সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিবেদন পেশ করেন। প্রতিবেদনের ভিত্তিতে চূড়ান্ত বিচারকার্য সম্পন্ন করা হয়।

৬.১০.১.৩ প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা সংশোধনী প্রতিষ্ঠান: শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হচ্ছে প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা সংশোধনী প্রতিষ্ঠান। কিশোর আদালতে বিচারে দোষী সাব্যস্ত এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংশোধনের প্রয়োজন হলে অপরাধপ্রবণ শিশু ও কিশোর অপরাধীদের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা সংশোধনী প্রতিষ্ঠানে রাখা হয়। তাদের অপরাধমূলক আচরণ সংশোধনের পাশাপাশি বিভিন্ন বৃত্তিমূলক ও কারিগরি প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। যাতে করে ভবিষ্যত জীবনে তারা আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে সুষ্ঠুভাবে পুনর্বাসিত হয়ে স্বনির্ভর জীবনযাপনে সক্ষম হয়ে ওঠে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অবস্থানরত শিশু ও কিশোর অপরাধীদের নিবাসী বলা হয়। নিবাসীদের শারীরিক গঠন, শিক্ষার মান, আগ্রহ, বুদ্ধিমাত্রা ও মননশীলতা পর্যবেক্ষণ এবং বিশ্লেষণ করে কারিগরি শিক্ষার কোর্স বা বিষয় নির্বাচন করা হয়। এছাড়া নিবাসীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টির জন্য নিয়মমাফিক শারীরিক প্ররিশ্রম ও শারীরিক চর্চা, বিচিত্রানুষ্ঠান, বনভোজন, খেলাধুলা এবং চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র কিশোর অপরাধী ও অপরাধপ্রবণ শিশু-কিশোরদের অপরাধমূলক আচরণ সংশোধন করে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াস চালায়। এ কেন্দ্রের মধ্যমে নিম্নোক্ত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়িত হচ্ছে–

ক) নিবাসীদের ভরণপোষণ, প্রযত্ন, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা বিধান;
খ) নিবাসীদের চিকিৎসা নিশ্চিতকরণ;
গ) সাধারণ শিক্ষা কর্মসূচি;
ঘ) ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা কর্মসূচি;
ঙ) নিবাসীদের চরিত্র গঠন, মানসিক উন্নয়ন, সংশোধন ও পুনর্বাসনে উদ্বুদ্ধকরণ ও কাউন্সিলিং সেবা;
চ) বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা এবং কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা গ্রহণ;
ছ) বিবাহযোগ্য মেয়েদের বিয়ের মাধ্যমে সামাজিক পুনর্বাসনে সহায়তা করা;
জ) প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কিশোর নিবাসীদের আত্মকর্মসংস্থানকল্পে স্থানায়মান তহবিল কর্মসূচির আওতায় সেবা প্রদান; এবং
ঝ) নিবাসীদের সোশ্যাল কেস ওয়ার্কার ও সাইকিয়াট্রিক ওয়ার্কের তত্ত্বাবধানে সেবা প্রদান করা।

৬.১০.২ শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

সংশোধন ক্ষেত্রে সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে সোশ্যাল কেস ওয়ার্কার, সাইকিয়াট্রিক সোশ্যাল ওয়ার্কার ও প্রবেশন অফিসার নিবাসীদের সমাস্যা সমাধানে সমাজকর্মের পদ্ধতি, নীতি ও কৌশল প্রয়োগ করে থাকেন। তারা অনুধ্যানের (study) মাধ্যমে নিবাসীদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক তথ্য সংগ্রহ, তাদের সমস্যা নিরুপণ (diagonosis) এবং সমস্যা সমাধান (treatment) করেন। সোশ্যাল কেস ওয়ার্কার আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সোশ্যাল কেস ওয়ার্কের বিভিন্ন কলাকৌশল প্রয়োগ করেন। অপরাধপ্রবণ নিবাসীদের সমস্যা সমাধানে দল সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে। অপরাধপ্রবণ নিবাসীদের নিয়ে ট্রিটমেন্ট গ্রুপ (treatment group) গঠন করে দলীয় অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করা যায়। শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে নিবাসীদের আর্থ-সামাজিক তথ্যাদি সংগ্রহের ক্ষেত্রে সমাজকর্ম গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে। কেন্দ্রসমূহে সমাজকর্মের মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতিসমূহ প্রয়োগের মাধ্যমে নিবাসীদের সমস্যা মোকাবিলায় সক্ষম করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখা সম্ভব। এখানে নিবাসীদের তথ্যাদির গোপনীয়তা রক্ষা করা হয় যা সমাজকর্মের অন্যতম একটি নীতি। শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রমে ক্লিনিক্যাল ও সাইকিয়াট্রিক সোশ্যাল ওয়ার্কসহ প্রভৃতি বিশেষায়িত শাখার জ্ঞান প্রয়োগ করা যেতে পারে।

সারসংক্ষেপ

শিশু উন্নয়ন কেন্দ্র কিশোর হাজত, কিশোর আদালত এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা সংশোধনী প্রতিষ্ঠান এই তিনটি অঙ্গের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। শিশু-কিশোরদের অপরাধমূলক আচরণ সংশোধনে শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগের ব্যাপক সুযোগ রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রের অঙ্গ কয়টি?

ক) ২টি
খ) ৩টি
গ) ৪টি
ঘ) ৫টি

২। শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে অবস্থানরত শিশু-কিশোর অপরাধীদের কী বলা হয়ে যায়?

ক) কিশোর অপরাধী
খ) আবাসী
গ) নিবাসী
ঘ) কয়েদী

পাঠ-৬.১১ বাংলাদেশ সারকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভিশন ও কার্যক্রম (Disaster Management Vision and Activities of the Government of Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৬.১১.১ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কী তা বলতে পারবেন।
৬.১১.২ বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভিশন সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
৬.১১.৩ বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

৬.১১.১ দুর্যোগ ব্যস্থাপনা

দুর্যোগ ব্যস্থাপনা সম্বন্ধে জানার আগে দুর্যোগ সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন। দুর্যোগ একটি প্রকৃতি বা মানবসৃষ্ট মারাত্মক পরিস্থিতি যা চলমান জীবনকে গভীরভাবে ব্যাহত করে এবং এটি মোকাবিলায় বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়। সাধারণ অর্থে দুর্যোগ বলতে আপদ (hazard) বোঝায় কিন্তু সব আপদই দুর্যোগ নয়। উদাহরণস্বরুপ বলা যেতে পারে, ভুমিকম্প একটি আপদ কিন্তু এর কারণে প্রাণহানিসহ অন্যান্য অবকাঠামো ধ্বংসের মাধ্যমে দুর্যোগ দেখা দিতে পারে। আর দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাসের লক্ষ্যে দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীণ ও দুর্যোগ-পরবর্তী সমায়ে যাবতীয় কার্যক্রম পরিকল্পনা, সংগঠন, সমন্বয়, নিয়ন্ত্রণসহ কর্মসূচি বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন পর্যন্ত সকল কর্মকান্ড সম্পাদন করাকে দুর্যোগ ব্যসস্থাপনা বলা হয়। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হচ্ছে একটি চলমান প্রতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া যা ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে, দুর্যোগের প্রতিরোধ, প্রশমন, প্রস্তুতি, ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার সুষ্ঠু প্রয়োগ এবং উন্নতি সাধনের প্রয়াস চালায়।

৬.১১.২ বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভিশন

বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে স্বীকৃত। জলবায়ু পরিবর্তন ও বৈশ্বিক উষ্ণতার কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সংকটাপন্ন, বিপন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। বাংলাদেশ সরকারের খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় (Ministry of Food and Disaster Management-MoFDM) মূলত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে একযোগে সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ সরকারের অন্যতম ভিশন হচ্ছে– প্রথমত: দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক, পরিবেশগত এবং মানবসৃষ্ট বিপদসমূহের প্রভাব জনসাধারণ বিশেষ করে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের বিপদাপন্নতা হ্রাস করে তাদেরকে একটি সহনীয় মানবিক পর্যায়ে নিয়ে আসা। দ্বিতীয়ত: বড় মাত্রার দুর্যোগ মোকাবিলায় সক্ষম একটি দক্ষ জরুরি সাড়া প্রদান পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করা। এ প্রসঙ্গে MoFDM (২০১৭) উল্লেখ করা হয়েছে যে, বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভিশন হচ্ছে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট বিপত্তি থেকে জনগণের বিশেষ করে দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিতদের ঝুঁকি হ্রাস করা, মানবীয় পর্যায়ে সহনীয় ও গ্রহণযোগ্য করে তোলা এবং বৃহৎ পরিসরে দুর্যোগ মোকাবিলায় জরুরি সাড়া প্রদান ব্যবস্থাকে দক্ষ ও সক্ষম করে তোলা (The disaster management vision of the Government of Bangladesh is to reduce the risk of people, especially the poor and the disadvantaged, from the effects of natural, environmental and human induced hazards, to a manageable and acceptable humanitarian level, and to have in place an efficient emergency response system capable of handling large scale disasters)।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ-এর প্রধান লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো–

১) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত অভিযোজন কার্যক্রম জাতীয় নীতি, প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণ;
২) দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসকল্পে অতি দরিদ্রদের কর্মসংস্থান;
৩) খাদ্য ও কর্মের অভাবের সময় দরিদ্র জনগণের খাদ্যপ্রাপ্তি সহজকরণ;
৪) দুর্যোগকালে এবং দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে জরুরি মানবিক সহায়তা প্রদান;
৫) গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে দুর্যোগ হ্রাস ও কর্মসৃজন;
৬) দুর্যোগ ব্যসস্থাপনা এবং ঝুঁকি হ্রাস ক্ষমতা জোরদারকরণ; এবং
৭) দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সহায়ক ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ।

বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভিশন হলো– "দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং দুর্যোগজনিত সকল প্রকার ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে একযোগে কাজ করা।"

৬.১১.৩ বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ বিশ্বের অন্যতম দুর্যোগপ্রবণ দেশ হিসেবে স্বীকৃত। বাংলাদেশে বন্যা, খরা, সাইক্লোন, নদীভাঙ্গন প্রভৃতি প্রকোপ বেড়েই চলছে। বাংলাদেশের দুর্যোগ মোকাবিলা, প্রতিরোধ ও উন্নয়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ এবং খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে Standing Order on Disaster (SOD) শিরোনামে বিধানাবলীর দলিল তৈরি হয়েছে। এ নির্দেশনা মোতাবেক সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। SOD হচ্ছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নীল নকশা যা জাতীয় পর্যায় থেকে শুরু করে স্থানীয় পর্যায় পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে। বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার বহুমুখী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। নিম্নে বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার গৃহীত কার্যক্রমসমূহ তুলে ধরা হলো:

১) **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনকে প্রতিষ্ঠানিকীকরণ:** দুযোর্গ ব্যবস্থাপনকে প্রতিষ্ঠানিকীকরণের মধ্যে বয়েছে–
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে জাতীয় নীতি, প্রতিষ্ঠান ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূলধারায় সম্পৃক্তকরণ;
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত আইন, বিধি ও নীতি প্রণয়ন এবং এ সংক্রান্ত স্থায়ী আদেশাবলী হালনাগাদকরণ;
- জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, ২০১০-১৫ অনুমোদন;
- ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা ২০১১ প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন; এবং
- দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার (SAARC) সদস্য রাষ্ট্রগুলোর দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নীতি ও পরিকল্পনা সমন্বিতকরণের মাধ্যমে সার্ক প্লান অব এ্যাকশান ফর ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট (SAARC Plan for Action for Disaster Managment) তৈরিতে সহায়তা করা।

২) **দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনা:** এটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে "South Asian Disaster Knowledge Network (SADKN)" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

৩) **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং ঝুঁকি হ্রাস ক্ষমতা জোরদারকরণ:** ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবিলার প্রস্তুতির লক্ষ্যে দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক গড়ে তোলা হচ্ছে। দুর্যোগকালে ও দুর্যোগ-পরবর্তী বিপদাপন্নতা হ্রাসে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগ খরা সহনশীল ধানের প্রজাতি নেরিকা'র পাইলটিং চাষ শুরু করেছে। সমাজভিত্তিক ঝুঁকি হ্রাস পর্যালোচনা এবং ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনায় জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিফলন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৪) **দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস সহায়ক ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ:** দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের লক্ষ্যে ৪১০ টি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। উপজেলা পর্যায়ে ৭৫টি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নেটওয়ার্ক সম্প্রসারণ করা হয়েছে। ৭৪টি বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে এবং আরো ১৭৪ টি নির্মাণের প্রকল্প নেয়া হয়েছে।

৫) **ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগে উদ্ধার ও অনুসন্ধান তৎপরতায় সক্ষমতা বৃদ্ধি:** ভূমিকম্প ঝুঁকি মানচিত্র তৈরি, কন্টিনজেন্সী প্লান তৈরি, বিল্ডিং কোড বাস্তবায়ন, প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা বৃদ্ধি ইত্যাদি কার্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

৬) **দুর্যোগ-পূর্ববর্তী সতর্কীকরণ কার্যক্রম:** দুর্যোগ-পূর্ববর্তী সতর্কীকরণ কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে–
- মোবাইল ফোনের মাধ্যমে দুর্যোগের বার্তা প্রচার পদ্ধতি;
- আইভির (Interactive Voice Response) আবহাওয়া ও দুর্যোগ সংক্রান্ত তথ্য ও সতর্কবার্তা মোবাইলের মাধ্যমে সাধারণের মধ্যে প্রচার করা হয়;
- মোবাইল ক্ষুদ্রবার্তা (SMS) প্রেরণ; এবং
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা তথ্যকেন্দ্র স্থাপন।

৭) **সচেতনতা ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম:** ছাত্রছাত্রীদের দুর্যোগ বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য তৃতীয় হতে দ্বাদশ শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত দক্ষ জনশক্তি তৈরির লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের ৪১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কারিকুলামে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও জলবায়ু পরিবর্তন

অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বিষয়ে স্নাতক(সম্মান) ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি চালু করা হয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগের অধীনে বাস্তায়িত প্রধান প্রকল্পসমূহ হচ্ছে– ক) Comprehensive Disaster Management Programme-CDMP (2nd phase); খ) Programme for strengthening household access to resources; এবং গ) Cyclone Preparedness Programme (CPP)। বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় যে সাংগঠনিক কমিটিসমূহ কাজ করে সেগুলোর একটি তালিকা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

সারণি ৬.১১.১ : বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সাংগঠনিক কমিটি

বাংলাদেশে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কর্মরত সাংগঠনিক কমিটিসমূহ	
• জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কাউন্সিল • আন্তমন্ত্রণালয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সমন্বয় কমিটি • জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় উপদেষ্টা কমিটি • ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচি বাস্তবায়ন বোর্ড • দুর্যোগ সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্টদের কার্যক্রম সমন্বয়কারী দল • দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও গণসচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত টাস্কফোর্স	• দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি সংস্থাসমূহের সমন্বয় কমিটি • দুর্যোগ সংক্রান্ত সংকেতসমূহ দ্রুত প্রচার সম্পর্কিত কমিটি • জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি • উপজেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি • ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কমিটি • সিটি কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি • পৌরসভা কর্পোরেশন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি

(সূত্র: MoFDM; ২০১৭)

বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কর্মসূচিসমূহকে নিম্নে একটি ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো:

সারণি: ৬.১১.২ বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি	মানবিক সহায়তা কর্মসুচি	ঝুঁকি হ্রাস কর্মসূচি/প্রকল্প
কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি টেষ্ট রিলিফ (TR) ইজিপিপি	ত্রাণ সহায়তা ভিজিএফ	প্রকল্প পরিচালক/ এক নজরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পগুলো- ইসিআরআরপি-২০০৭ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র দুর্যোগ সহনীয় গৃহ সেতু/কালর্ভাট(=<১২মি:) সেতু/কালর্ভাট(=<১২মি:) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল প্রকিউরমেন্ট অব ইক্যুইপমেন্ট (২য় ফেজ)

(সূত্র: MoFDM; ২০১৭)

বাংলাদেশ সরকার দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস এবং দুর্যোগজনিত সকল প্রকার ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের দুর্যোগ মোকাবিলা, প্রতিরোধ ও উন্নয়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ব্যুরো, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ বিভাগ এবং খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের যৌথ উদ্যোগে বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সারসংক্ষেপ

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা হচ্ছে একটি চলমান প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়া যা দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস ও মোকাবিলায় দুর্যোগপূর্ব, দুযোর্গকালীণ এবং দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে দুর্যোগ প্রতিরোধ, প্রশমন, প্রস্তুতি, ত্রাণ ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার সুষ্ঠু প্রয়োগ। ঝুঁকি হ্রাস এবং দুর্যোগজনিত সকল প্রকার ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনার উদ্দেশ্যে একযোগে কাজ করাই হচ্ছে বাংলাদেশ সরকারের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ভিশন। এই ভিশনকে সামনে রেখে বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালিত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। CDMP এর পূর্ণরুপ কী?

ক) Comprehensive Disaster Management Plan.
খ) Comprehensive Disaster Management Programme.
গ) Community Disaster Management Plan.
ঘ) Community Disaster Management Project.

২। সাধারণ অর্থে দুর্যোগ বলতে কী বোঝায়?

ক) আপদ
খ) বিপদাপন্নতা
গ) ঝুঁকি
ঘ) সামর্থ

পাঠ-৬.১২ সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি হ্রাস, প্রস্তুতি ও সাড়াদান ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ (Application of Social Work Methods in Comprehensive Disaster Management, Risk Reduction, Preparedness and Response System)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৬.১২.১ ঝুঁকি, প্রস্তুতি ও সাড়াদান ধারণাসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৬.১২.২ সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকিহ্রাস, প্রস্তুতি ও সাড়াদান ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

৬.১২.১ ঝুঁকি, প্রস্তুতি এবং সাড়াদান

কোনো আপদ বা আপদসমূহ, বিপদাপদন্ন জনগোষ্ঠী ও তার আয়, সম্পদ এবং পরিবশে– এই তিন উপাদানের নেতিবাচক সংমিশ্রণের ফলে ক্ষতিকর প্রভাবের সম্ভাবনাই হচ্ছে ঝুঁকি (Risk)। দুর্যোগ ব্যসস্থাপনার ঝুঁকি নিম্নোক্তভাবে নির্ধারণ কার হয়:

ঝুঁকি = আপদ সম্ভাবনা × বিপদাপন্নতা

প্রস্তুতি (preparedness) বলতে সেই সকল কাজের সমষ্টিকে বোঝায় যা বিপদাপন্ন (vulnerable) জনগোষ্ঠীর ঝুঁকিহ্রাসের জন্য দুর্যোগের পূর্বেই গ্রহণ করা হয়। আর দুর্যোগকালীণ এবং দুর্যোগ-পরবর্তী সময়ে জনগণের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর মৌলিক চাহিদা মেটানোর জন্য অত্যাবশ্যকীয় ভাবে সেসব কার্যক্রম গ্রহণ করতে হয় তাই হচ্ছে সাড়াদান (response)। দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাস ও দুর্যোগ-পরবর্তী জরুরী সাড়াদানের জন্য পদ্ধতিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ও কার্যক্রম গ্রহণ এবং আপদের সময় বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি ও পদক্ষেপ গ্রহণ সার্বিক দুর্যোগ ব্যস্থাপনায় অত্যাবশ্যক।

৬.১২.২ সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকিহ্রাস, প্রস্তুতি ও সাড়াদান ব্যবস্থায় সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকিহ্রাস, প্রস্তুতি ও সাড়াদান ব্যবস্থায় সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে। সমাজকর্ম সাহায্যার্থীর নিজস্ব সম্পদের সদ্ব্যবহারের মাধ্যমে সমস্যা মোকাবিলায় সক্ষম করে থাকে। দুর্যোগ সম্পূর্ণরুপে প্রতিরোধ করা যায় না। তবে দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমানোর ব্যাপারে বিভিন্ন প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা যেতে পারে। সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সমাজকর্ম প্রতিরোধমূলক, প্রতিকারমূলক এবং উন্নয়নমূলক জ্ঞান প্রয়োগের প্রচেষ্টা সফলভাবে চলতে পারে। দুর্যোগপূর্ব, দুর্যোগকালীণ এবং দুর্যোগ-পরবর্তী অবস্থাকে বাঞ্ছিত ও কাঙ্খিতমানে উন্নত করার ক্ষেত্রে সমাজকর্মের মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতি প্রয়োগের সুযোগ রয়েছে। দুর্যোগ ঝুঁকি নিরুপণ, দুর্যোগ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও সচেতনতা সৃষ্টিতে সমাজকর্মী সমষ্টি পর্যায়ে গতিশীল ভূমিকা রাখতে পারে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ঝুঁকিহ্রাস, প্রস্তুতি ও সাড়াদানের ক্ষেত্রে বিপদাপন্ন নারী, শিশু, বয়স্কব্যক্তি, প্রতিবন্ধী তথা দুর্যোগ কবলিতদের নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর এবং পূর্বসচেতনতা সৃষ্টিতে সমাজকর্ম পদ্ধতি অধিক ফলপ্রসূ হতে পারে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার নীতি ও পরিকল্পনা হালনাগাদকরণ কার্যক্রমে সমাজকর্মীরা অংশগ্রহণ করতে পারে। সামাজিক গবেষণার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত নীতি নির্ধারকদের সমাজকর্মীরা সহায়তা করতে পারেন। সমাজভিত্তিক ঝুঁকিহ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি ফলপ্রসূভাবে প্রয়োগ করা যায়। সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবিলায় প্রস্তুতি গ্রহণে সচেতনতা করা সম্ভব। দল সমাজকর্ম পদ্ধতির জ্ঞান ও কৌশল প্রয়োগ করে কার্যকর দুর্যোগ স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন ও গতিশীলতা আনয়নে সমাজকর্মীরা ভূমিকা রাখতে পারেন। সামাজিক কার্যক্রম হচ্ছে সমাজকর্মের একটি সহায়ক পদ্ধতি। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকিহ্রাস, প্রস্তুতি ও সাড়াদান ব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রে সামাজিক কার্যক্রম পদ্ধতির কৌশলসমূহ যেমন– যোগাযোগ, তথ্য ও শিক্ষা মূলক প্রচারণা ইত্যাদি কৌশল অনুশীলন করা যায়।

পরিশেষে বলা যায়, সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ঝুঁকি হ্রাস, প্রস্তুতি ও সাড়াদানে সমাজকর্মের মৌলিক, সহায়ক পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস এবং দুর্যোগজনিত সকল প্রকার ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনা সম্ভবপর। ফলে বর্তমানে সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সমাজকর্মের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সারসংক্ষেপ

সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ঝুঁকি হ্রাস, প্রস্তুতি এবং সাড়াদান অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। ঝুঁকিহ্রাস, প্রস্তুতি এবং সাড়াদানের ক্ষেত্রে সমাজকর্মের পদ্ধতি ও কৌশল প্রয়োগ করে সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনাকে আরো ফলপ্রসূ করা সম্ভব। ফলে বর্তমানে সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় সমাজকর্মের গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। ঝুঁকি কী?

ক) আপদ সম্ভাবনা × বিপদাপন্নতা
খ) সামর্থ × বিপদাপন্নতা
গ) আপদ সম্ভাবনা × প্রস্তুতি
ঘ) ঝুঁকি × বিপদাপন্নতা

২। সমাজভিত্তিক ঝুঁকি হ্রাস কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সমাজকর্মের কোন মৌলিক পদ্ধতি ফলপ্রসূভাবে প্রয়োগ করা যায়?

ক) ব্যক্তি সমাজকর্ম
খ) দল সমাজকর্ম
গ) সমষ্টি সমাজকর্ম
ঘ) সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন

পাঠ-৬.১৩ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও এর কার্যক্রম (National Human Rights Commission and Its Activities)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৬.১৩.১ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
৬.১৩.২ জাতীয় মানবাধিকার কমিনের কার্যক্রমসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

৬.১৩.১ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন

মানুষের বিকাশ এবং স্বাধীন ও মর্যাদাপূর্ণ জীবনের নিশ্চয়তায় অত্যাবশকীয় সুযোগ-সুবিধাগুলোই মানবাধিকার। মানবাধিকার রক্ষা, নিশ্চিতকরণ এবং মানবাধিকার পরিস্থিতি উন্নয়ন প্রতিটি রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। মানবাধিকার সর্বজনীন। মানুষ হিসেবে প্রত্যেকের মানবাধিকার পাওয়ার অধিকার রয়েছে। মানুষ হিসেবে পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য এ অধিকারের আবশ্যকতা রয়েছে। জাতিসংঘ ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র গ্রহণ করা হয়। এজন্য প্রতিবছর ১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস হিসেবে পালন করা হয়। মানবাধিকার ঘোষণায় মোট ২৫ টি মানবাধিকরের কথা বলা হয়েছে। যার মধ্যে ১৯ টি নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এবং ৬ টি আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রয়েছে। বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্র তার মানবাধিকার পরিস্থিতির মূল্যায়ন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান গঠন করে। বাংলাদেশে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠনের প্রথম উদ্যোগ নেওয়া হয় ১৯৯৮ সালে। UNDP এর সহায়তায় একটি আইনের খসড়া তৈরি করা হলেও দীর্ঘদিন তা স্থবির থাকে। পরবর্তীতে জাতীয় মানবাধিকার অধ্যাদেশ, ২০০৭ এর মাধ্যমে ২০০৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর প্রথম জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং সীমিত পরিসরে কাজ শুরু করে। ২০০৭ সালে প্রণীত এই অধ্যাদেশ বাতিল করে জাতিসংঘের সাধারণ সভায় ১৯৯৩ সালে গৃহীত 'প্যারিস নীতিমালা'য় উল্লেখ করা হয় যে, ''জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান গঠনের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা, কার্যকারিতা এবং সকলের প্রতিনিধিত্বের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।" প্যারিস নীতিমালা এবং ২০০৯-এর মানবাধিকার আইন অনুসারেই একটি স্বাধীন এবং সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশে মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। সংবিধান অনুযায়ী মানবাধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

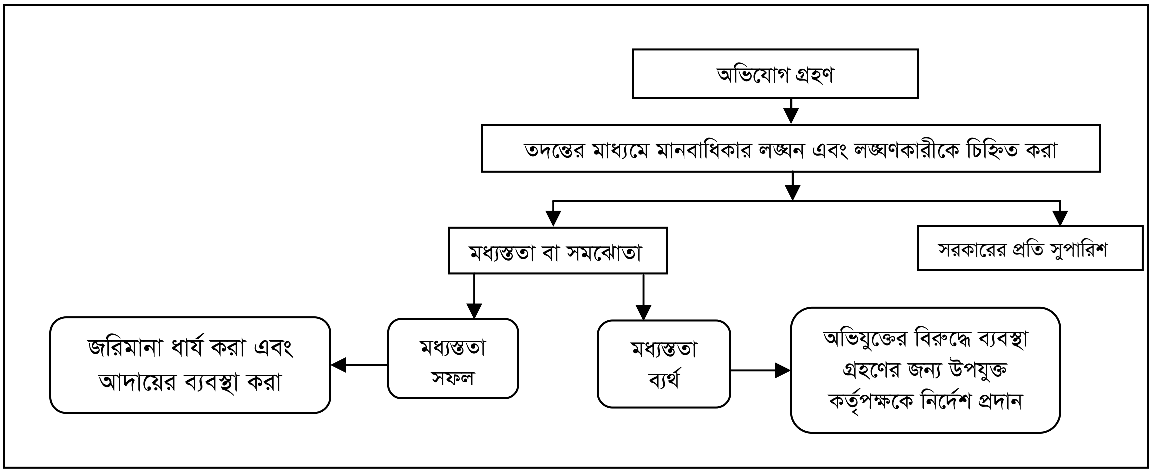
চিত্র ৬.১৩.১: জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, বাংলাদেশ

৬.১৩.২ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রধান কাজ হচ্ছে মানবাধিকার শিক্ষা ও প্রচারণা, সেমিনার ও ওয়ার্কসপ, পরিদর্শন এবং গবেষণা। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন নিম্নোক্ত কার্যক্রমসমূহ পরিচালনা করছে–

- কমিশন যেকোনো ধরনের মানবাধিকার লজ্ঘনজনিত অভিযোগের তদন্ত করা। কমিশনে অভিযোগ দায়ের না করা হলেও কমিশন স্বতঃপ্রণোদিত অভিযোগ গঠন করা;
- জেলখানা, থানা হেফাজত ইত্যাদি আটকের স্থান পরিদর্শন করে তার উন্নয়নের কাজ সরকারের কাছে সুপারিশ করা;
- হাসপাতাল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইত্যাদি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন করে সেসবের উন্নয়নে সরকারকে সুপারিশ প্রদান;
- সংবিধান অথবা দেশের প্রচলিত আইনের আওতায় গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ পর্যালোচনা করে এর কার্যকর বাস্তবায়নের জন্য সরকারকে সুপারিশ প্রদান;
- আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের সঙ্গে দেশীয় আইনের সমাঞ্জস্যবিধানে ভূমিকা রাখা;
- মানবাধিকার বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা;
- প্রচার ও প্রকাশনার মাধ্যমে মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে কাজ করা;
- আপোষের মাধ্যমে নিষ্পত্তিযোগ্য কোনো অভিযোগ মধ্যস্ততা ও সমঝোতার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা; এবং
- মানবাধিকার সংরক্ষণ বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যসহ অন্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি নিম্নে চিত্রের সাহায্যে উপস্থপন করা হলো:



চিত্র ৬.১৩.১: জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের অভিযোগ ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি

পুনর্গঠিত জাতীয় মানবাধিকার কমিশন দায়িত্ব নেয়ার পরপরই প্রথম যে কাজ হাতে নেয় তা হচ্ছে পাঁচবছর মেয়াদি একটি কৌশলপত্র প্রণয়ন করা। মানবাধিকার কমিশন বিষয়ে আন্তর্জাতিকভাবে খ্যাতিসম্পন্ন একজন বিশেষজ্ঞের সহায়তায় কৌশলপত্রটির খসড়া তৈরি করা হয়। খসড়া কৌশলপত্রে ১৬ টি বিষয়কে গুরুত্বপূর্ণ মানবাধিকার ইস্যু হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বাংলাদেশের মানবাধিকার রক্ষায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন অগ্রণী ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। অভিযোগের ভিত্তিতে কমিশন অভিযোগকারীর দাবি আদায়ে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ২০০৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘের প্যারিস নীতিমালা, ১৯৯৩ এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন, ২০০৯ অনুসারে প্রতিষ্ঠিত একটি স্বাধীন এবং সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন সংবিধান অনুযায়ী মানবাধিকার সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। বাংলাদেশে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন গঠনের প্রথম উদ্যোগ কোন সংস্থা সহায়তা করেছিলো?

ক) UNDP খ) UN
গ) UNEP ঘ) HRC

২। জাতিসংঘ সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র গ্রহণ করে কবে?

ক) ১৯৪৮ সালের ১০ ডিসেম্বর খ) ১৯৪৭ সালের ১০ ডিসেম্বর
গ) ১৯৪৮ সালের ১০ অক্টোবর ঘ) ১৯৪৭ সালের ১০ অক্টোবর

পাঠ-৬.১৪ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ (Application of Social Work Methods in the Activities of National Human Rights Commission)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৬.১৪.১ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

৬.১৪.১ জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রমে সমাজকর্মীর ভূমিকা

সমাজকর্ম একটি মানবতাবাদী (humantarian) ও সক্ষমতাদানকারী (empowering) পেশা। মানবাধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচার (human rights and social justice) নিশ্চিতকরণের সাথে সমাজকর্মের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। মানবাধিকার উন্নয়ন ও সংরক্ষণ এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমাজকর্মীরা কাজ করে থাকে। সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজকর্মীরা জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রম পরিচালনা ও বাস্তবায়নে বহুমুখী ও গতিশীল ভূমিকা পালন করতে পারেন। মানবাধিকার বিষয়ক সচেতনতা ও শিক্ষামূলক কার্যক্রমে সমাজকর্মীরা সচেতনতা বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখতে পারে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন শিশু অধিকার, বাল্যবিবাহ, নারী-পুরুষ বৈষম্য, শিশুশ্রম, নারীর প্রতি সহিংসতা, মানবপাচার এবং কিশোর অপরাধ বিচারব্যবস্থাবিষয়ক জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এক্ষেত্রে নিয়মিত মতবিনিময় সভা, সেমিনার ও সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করে থাকে। এসব কার্যক্রমে সমাজকর্মীরা মৌলিক পদ্ধতি হিসেবে দল সমাজকর্ম এবং সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন এবং সহায়ক পদ্ধতি হিসেবে সামাজিক কার্যক্রম পদ্ধতির জ্ঞান, দক্ষতা, নীতি ও কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে সহায়তা করতে পারেন। মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ক অভিযোগ ও তদন্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজকর্মীরা তদন্তকারী দলের সদস্য হিসেবে সাহায্যকারীর সমস্যার প্রকৃতি, স্বরুপ, কারণ ও প্রভাব নিরুপণে ভূমিকা পালন করতে পারেন। মানবাধিকার বিষয়ক গবেষণা ও এ্যাডভোকেসী হচ্ছে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম। সমাজকর্মীরা সামাজিক গবেষণা পদ্ধতি প্রয়োগ করে কমিশনের কার্যক্রম ফলপ্রসূ করতে পারেন। সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণের ভয়ে অনেক নারী অন্যায় অবিচার সহ্য করেন। সামাজিক হস্তক্ষেপ কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে সামাজিক মর্যাদা অক্ষুন্ন রেখে সমাজকর্মী মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা হ্রাসে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারেন। সংশোধনমূলক কার্যক্রমে সমাজকর্মীরা সংশোধনকর্মী হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। প্রবেশন, প্যারোল ও অফটার কেয়ার সার্ভিসের ক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা প্রবেশন কর্মকর্তা ও প্যারোল কর্মকর্তা তথা সংশোধনকর্মী হিসেবে প্রয়োজনীয় তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনকে সহায়তা করতে পারেন। উদাহরণ স্বরুপ বলা যায় যে, শিশু-কিশোর অপরাধীদের কিশোর আদালতে বিচারকার্য সম্পন্ন করা অথবা জেল-হাজতে অবস্থান না করে কিশোর-কিশোরী উন্নয়ন কেন্দ্রে অবস্থান করার অধিকার রয়েছে। এক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা প্রবেশন কর্মকর্তা অথবা সংশোধনকর্মী হিসেবে তথ্য সংগ্রহকারী, মধ্যস্ততাকারী তথা অনুঘটকের ভূমিকা পালন করতে পারেন। পরিশেষে বলা যায়, সমাজের অন্যায়, অত্যাচার ও অবিচার রুখার ক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও সাহায্যার্থীর মধ্যে মধ্যস্ততাকারী ও সংযোগস্থাপনকারী হিসেবে গতিশীল ও কার্যকরী ভূমিকা পালন করতে পারেন।

সারসংক্ষেপ

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন ও সমাজকর্ম উভয়েরই লক্ষ্য হচ্ছে মানবাধিকার এবং সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমাজকর্মের জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ, পদ্ধতি ও কৌশল কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। সংশোধনমূলক কার্যক্রমের ক্ষেত্রে সমাজকর্মীরা কী হিসেবে ভূমিকা পালন করেন?

ক) প্রবেশন অফিসার
খ) সংশোধনকর্মী
গ) মধ্যস্ততাকারী
ঘ) অ্যাডভোকেট

অনুশীলনী (ইউনিট–০৬)

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। শিশু আইন,২০১৩ অনুসারে শিশু-কিশোরদের বয়সসীমা কত বছর?

ক) ০৮-১৪ বছর
খ) ০৮-১৫ বছর
গ) ০৮-১৬ বছর
ঘ) ০৮-১৮ বছর

২। জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কার্যক্রমে সমাজকর্মীর ভূমিকা কী ?

ক) মানবাধিকার উন্নয়ন, সংরক্ষণ এবং সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা
খ) মানবাধিকার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ
গ) মানবাধিকার বিষয়ক সচেতনতা ও এ্যাডভোকেসী
ঘ) উপরের সবগুলোই সঠিক

৩। বাংলাদেশের কোন জেলায় চতুর্থ কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র হবে?

ক) জয়পুরহাট
খ) ফেনিতে
গ) যশোরে
ঘ) সিলেটে

৪। গ্রামীণ সমাজসেবা কর্মসূচি হচ্ছে–

ক) একমুখী উন্নয়ন প্রক্রিয়া
খ) দ্বিমূখী উন্নয়ন প্রক্রিয়া
গ) ত্রিমূখী উন্নয়ন প্রক্রিয়া
ঘ) বহুমুখী উন্নয়ন প্রক্রিয়া

৫। রহমত আলীর পারিবারিক বার্ষিক গড় আয় ৪০০০০ টাকা। সে পল্লী সমাজসেবা কার্যক্রমে সুদমুক্ত ঋণদান কর্মসূচির আওতায় ঋণগ্রহণ করে। রহমত আলী কোন শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হবে?

ক) দরিদ্রতম
খ) দরিদ্র
গ) দারিদ্র্য সীমার উর্ধ্বে
ঘ) দারিদ্র্য সীমার নিচে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

প্রিয়াদের গ্রামে একটি উন্নয়নমূলক প্রকল্প বিদ্যমান রয়েছে। প্রকল্পটির মূল উদ্দেশ্য হলো জাতীয় জনসংখ্যা কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা। এছাড়া প্রকল্পটি বিভিন্ন ধরনের সেবা প্রদান করে থাকে। যেমন– পরিকল্পিত পরিবার তৈরিতে সহায়তা করা, পল্লী অঞ্চলে দরিদ্র নারীদের সংগঠিত করে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসা ইত্যাদি।

৬. নিচের কোনটি প্রিয়াদের গ্রামের অনুরূপ প্রকল্প?

ক) পল্লী মাতৃকেন্দ্র
খ) ঘূর্ণায়মান তহবিল
গ) শহর সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচি
ঘ) শিশুকল্যাণ কার্যক্রম

৭. উক্ত প্রকল্পের উল্লেখিত সেবা প্রদানের ফলাফলসমূহ হবে–

i) জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ
ii) সুখী পরিবার গঠন
iii) অর্থনীতিতে নারীদের ভূমিকা রাখার সুযোগ সৃষ্টি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) ii ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নারায়নগঞ্জের সোনারগাঁ উপজেলায় যৌতুকের জন্য নাসরিন আক্তার নামে এক গৃহবধূকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়। ঘটনার পর থেকে গৃহবধূর স্বামী, শ্বশুড়-শ্বাশুড়ি পলাতক রয়েছে। গ্রাম বাংলায় নাসরিনদের মতো অসংখ্য গৃহবধূ প্রতিদিন যৌতুকের জন্য নির্যাতন ও সহিংসতার শিকার হচ্ছে। মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘনের শিকার অজ্ঞ-অশিক্ষিত জনগণ বছরের পর বছর ধরে মানবেতর জীবনযাপন করে আসছে।

ক) সরকারি সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম কাকে বলে? ১

খ) কিশোর উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান গঠনের প্রধান উদ্দেশ্য কী? ২

গ) উদ্দীপকের উল্লেখিত ঘটনার প্রতিকারে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কী ভূমিকা পালন করতে পারেন? ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ) মানবাধিকার সংরক্ষণে সমাজকর্মীর ভূমিকা কী হতে পারে? উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

২। বাংলাদেশ সরকার বস্তিবাসী জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে একটি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এদেশে সমাজকর্ম পেশার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের সাথে কার্যক্রমটির যোগসূত্র রয়েছে। বর্তমানে এ কার্যক্রমটি দেশের ৬৪টি জেলার ৮০টি ইউনিটের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রম।

ক) SOD এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ) মানবাধিকার বলতে কী বোঝায়? ২

গ) উদ্দীপকে যে সমষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রমের ইঙ্গিত করা হয়েছে সেটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য চিহ্নিত করুন। ৩

ঘ) বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কার্যক্রমটি তাৎপর্যপূর্ণ”– উক্তটি উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১ : ১। গ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২ : ১। ঘ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩ : ১। ক ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৪ : ১। ক ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৫ : ১। খ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৬ : ১। ক ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৭ : ১। ক ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৮ : ১। ক ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৯ : ১। গ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১০ : ১। খ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১১ : ১। খ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১২ : ১। ক ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১৩ : ১। ক ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১৪ : ১। খ
চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ১ : ১। ঘ ২। ঘ ৩। ক ৪। ঘ ৫। ক ৬। ক ৭। ঘ

বাংলাদেশে বেসরকারি সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম (Non-government Social Development Activities in Bangladesh)

ইউনিট ৭

ভূমিকা

যে কোনো দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তথা সামগ্রিক উন্নয়নে বেসরকারি সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচিত হয়। বাংলাদেশের পিছিয়ে পড়া এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, সম্পদের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণ, মৌলক মানবিক চাহিদা পূরণে বিভিন্ন বেসরকারি সমাজ উন্নয়নমূলক সংস্থার ভূমিকা অনস্বীকার্য। বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন সংস্থা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অবদান রেখে চলছে বিভিন্ন নামে কোথাও বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা, কোথাও আবার সমষ্টিভিত্তিক সংগঠন, আবার অন্য কোথাও অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। শিশু অধিকার রক্ষা, জাতীয় আয় বৃদ্ধি, মূলধন গঠন, শিক্ষার হার বৃদ্ধি, বাল্যবিবাহ বন্ধ করা, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, নারীর ক্ষমতায়ন, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, স্বাক্ষরতার হার বৃদ্ধি, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলা, বিভিন্ন দুর্যোগ পরবর্তী পুনর্বাসন তথা সামগ্রিক উন্নয়নে বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন সংস্থার পরিধি বিস্তৃত। সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রমে তাই বেসরকারি সংস্থার তাৎপর্য অপরিসীম।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৭.১ বাংলাদেশে বেসরকারি সমাজউন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ইতিহাস
পাঠ-৭.২ ব্র্যাক'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম
পাঠ-৭.৩ ব্র্যাক'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির অনুশীলন
পাঠ-৭.৪ গ্রামীণ ব্যাংক'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম
পাঠ-৭.৫ গ্রামীণ ব্যাংক'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির অনুশীলন
পাঠ-৭.৬ প্রবীণহিতৈষী সংঘ'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম
পাঠ-৭.৭ প্রবীনহিতৈষী সংঘ'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির অনুশীলন
পাঠ-৭.৮ ইউসেপ বাংলাদেশ'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম
পাঠ-৭.৯ ইউসেপ বাংলাদেশ'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির অনুশীলন

পাঠ-৭.১ বাংলাদেশে বেসরকারি সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ইতিহাস (History of Non-government Social Development Activities in Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৭.১.১ উপনিবেশিক আমলের বেসরকারি সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে লিখতে পারবেন।
৭.১.২ পাকিস্তান আমলের বেসরকারি সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
৭.১.৩ স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে বেসরকারি সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

৭.১.১ উপনিবেশিক আমলে বেসরকারি সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

সুদূর অতীত থেকেই ভারতবর্ষে মানবহিতৈষী দর্শন ও স্বেচ্ছাসেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিভিন্ন বেসরকারি সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা গেছে। উপনিবেশিক আমলে নানারকম বড় প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মহামারি ও যুদ্ধ বিগ্রহে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের সহযোগিতা করার জন্য অনেক স্বেচ্ছাসেবী কর্মকান্ডের প্রসার ঘটেছিলো। এসব স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকান্ডের মূলে ছিলো জমিদার পরিবারের সদস্য, তরুণ ও অভিজাত পরিবারের সদস্যবৃন্দ। সাধারণত ধর্মভিত্তিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উপনিবেশিক আমলে স্বেচ্ছাসেবামূলক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতো।

তবে উপনিবেশিক আমলে বাংলাদেশের বেসরকারি উন্নয়ন কার্যক্রম সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা গেছে ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটি এর মাধ্যমে সংগঠিত ভাবে। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৯৪ সালে। এ সংস্থা দারিদ্র পীড়িত অঞ্চলে হাসপাতাল, স্কুল, এতিমখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করে। ১৮৮০ সালে রাজশাহীতে প্রতিষ্ঠিত হয় ক্রিস্টিয়ান মিশন হাসপাতাল। স্থানীয়ভাবে যেসব প্রতিষ্ঠান সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে অত্যন্ত ভালো ছিলো তার মধ্যে বিদেশী সাহায্যপুষ্ট কুমুদিনী ওয়েলফেয়ার টাস্ট সবচেয়ে পুরাতন যা ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। উপনিবেশিক আমলে বাংলাদেশের বেসরকারি সমাজউন্নয়নমূলক সংস্থাগুলো বিশেষ করে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দাতব্য সংস্থাগুলোর অন্যতম ছিলো মোহামেডান লিটারেরি সোসাইটি (১৮৫৯), ব্রাহ্মসমাজ (১৮২৮) রামকৃষ্ণ মিশন-১৮৯৬ প্রভৃতি।

৭.১.২ পাকিস্তান আমলে বেসরকারি সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভের পর তাৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে নানাবিধ বেসরকারি সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম লক্ষ্য করা যায়। পূর্ব পাকিস্তান তুলনামূলকভাবে প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর ছিলো। তারপরও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বৈষম্যমূলক শাষনের কারণে এ অঞ্চলে ক্ষুধা দুর্ভিক্ষ বিদ্যমান ছিলো। ১৯৬০-১৯৭০ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে প্রায় ১০ টি বড় ধরনের ঘূর্ণিঝড় হয়েছিল। বন্যায় আক্রান্ত হয়েছে এ অঞ্চলের বিশাল সংখ্যক জনগোষ্ঠী। মানুষের দুর্দশা লাঘবে করতে সমাজ উন্নয়নে এসময় বেশকিছু প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। বহুমুত্র সমিতি, পরিবার পরিকল্পনা সমিতি তার মধ্যে অন্যতম। গ্রামীণ উন্নয়নে সর্বপ্রথম প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো হিসেবে কুমিল্লায় Pakistan Academy for Rural Development (১৯৫৯) গঠন করা হয়,যার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন পল্লী উন্নয়ন গবেষক, দার্শনিক ও সমাজসেবক ড. আখতার হামিদ খান। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে এই একাডেমির নাম পরিবর্তিত হয়ে Bangladesh Academy for Rural Development হয়। এ একাডেমি Comilla Model নামেও পরিচিত। এর আগে ১৯৫৩ সালে V-AID কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। V-AID কর্মসূচীর ব্যর্থতাই এই একাডেমি প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ করে। পাকিস্তান আমলে বাংলাদেশে বেসরকারি সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বেসরকারি সংস্থা CARE দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের মাঝে খাদ্য বিতরণ করে। CARE পরবর্তীতে ১৯৭০ সালে ঢাকায় অফিস প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর যে প্রলংয়কর ঘূর্নিঝড় বাংলাদেশে হয়েছিল তখনও বিভিন্ন বেসরকারি কার্যক্রম সমাজ উন্নয়নে কাজ করেছে।

৭.১.৩ স্বাধীনতা পরবর্তী বেসরকারি সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম

১৯৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত পাকিস্তান বাহিনীর ধ্বংসলীলা বাংলাদেশের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। ১৯৭০ সালে প্রলয়কারী ঘূর্ণিঝড় এবং ১৯৭১ সালে পাকিস্তানি বর্বরতা ও ধ্বংসলীলার কারণে বাংলাদেশ অর্থনৈতিকভাবে দারুন চ্যালেঞ্জের মধ্যে পড়ে। এসময় যুদ্ধবিধ্বস্ত রাষ্ট্রকে সহযোগিতা করার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্র যেমন এগিয়ে আসে তেমনি ত্রাণ ও পুনবার্সন কার্যক্রমে বেসরকারিভাবে কর্মকান্ড চলতে থাকে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। ত্রাণ ও পুনর্বাসিন কার্যক্রম শক্তিশালী করার জন্য গঠিত হয় BRAC (1972)। শরণার্থী মানুষদের ত্রাণ ও পুনবার্সনে BRAC গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এরপর বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমাজ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ১৯৭৬ সালে প্রশিকা ও ১৯৭৬ সালে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এসব প্রতিষ্ঠান ত্রাণ পুনবার্সনের পাশাপাশি স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সমাজ উন্নয়নে গুরুত্বারোপ করে। আশির দশকের পরে বেসরকারি সংস্থাগুলোর কার্যক্রম ইস্যু পরিবর্তিত হয়। নতুন ইস্যু হিসেবে নারীর ক্ষমতায়ন, জেন্ডার সমতা, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষার প্রসার অন্যতম ইস্যু হয়ে ওঠে। বর্তমান বাংলাদেশে প্রায় ২০,০০০ এর আধিক বেসরকারি সমাজ উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান রয়েছে।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের বেসরকারি সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ইতিহাস বেশ সমৃদ্ধ। প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক দুই ভাবেই বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রমের দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা গেছে। ১৭৯৪ সালে ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটি থেকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে বেসরকারি সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রম চলছিলো তা আজও বিভিন্নভাবে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে চলমান। তবে সময় ও সমাজের অনুভূত চাহিদার প্রেক্ষিতে বেসরকারি সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের প্রকৃতি ও পরিধি পরিবর্তিত হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটি কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

(ক) ১৭৯৫ সালে (খ) ১৮০৫ সালে
(গ) ১৭৯০ সালে (ঘ) ১৭৯৪ সালে

২। BARD এর প্রতিষ্ঠাতা-

(ক) আখতার হামিদ খান (খ) আতাউর রহমান খান
(গ) নওজেশ আলী খান (ঘ) খাজা নাজিমুদ্দিন

৩। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৬ পর্যন্ত বিভিন্ন বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন সংস্থার মূল উদ্দেশ্য কী ছিলো-

(ক) ত্রাণ ও পুনবার্সন (খ) নারী উন্নয়ন
(গ) মানবাধিকার (ঘ) জেন্ডার সমতা

পাঠ-৭.২ ব্র্যাক'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম (Objectives and Activities of BRAC)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৭.২.১ ব্র্যাক'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।
৭.২.২ ব্র্যাক'র কার্যক্রম আলোচনা করতে পারবেন।

৭.২.১ ব্র্যাক'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ব্রাক (BRAC) বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠিত অন্যতম বৃহত্তম আন্তর্জাতিক বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা। তৃণমূল পর্যায়ের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংগঠিত করে বৃহত্তর অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়নের অঙ্গীকার নিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে বড় এ উন্নয়ন সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীদের মধ্যে ত্রাণকার্য পরিচালনায় যে সব সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তার মধ্যে জনাব ফজলে হাসান আবেদের প্রতিষ্ঠিত "Save Bangladesh (1971)" অন্যতম। এ সংস্থার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে শরণার্থীদের মধ্যে ত্রাণকার্য পরিচালনা করা হতো। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তদের ত্রাণ ও পুনর্বাসনের লক্ষ্যে ১৯৭২ সালে সিলেটের শাল্লা গ্রামে "Bangladesh Rehabilitation Assistance Committee (BRAC)" নামক সংস্থা গঠন করেন জনাব ফজলে হাসান আবেদ। পল্লীর দরিদ্র এবং শোষিত শ্রেণীর উন্নয়নের প্রয়োজন দীর্ঘ মেয়াদী বহুমুখী উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষে ১৯৭৩ সালে ব্র্যাকের নাম পরিবর্তন করে "Bangladesh Rural Advancement Committee (BRAC)" হয়। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন বিশেষত প্রান্তিক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নে ব্র্যাক অত্যন্ত কার্যকর ভূমিকা রেখে চলছে। জনগোষ্ঠীভিত্তিক ব্র্যাকের বিভিন্ন উদ্ভাবনা যথা- ক্ষুদ্রঋণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, কৃষি, আইন সহায়তা, সামাজিক উবুদ্ধকরণ, জীবিকা সংস্থান, অতি দরিদ্রদেরকে সম্পদ হস্তান্তর, উদ্যোক্তা প্রশিক্ষণ প্রভৃতির মাধ্যমে সমাজে অধিকার বঞ্চিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তাদের সুপ্ত সম্ভাবনা বিকাশের পথ খুঁজে পেয়েছে। ১৯৭২ সালে ব্র্যাক তার যাত্রা শুরু করে বর্তমানে এর ০১ লক্ষ্য ২০ হাজার কর্মী বিশ্বব্যাপী ১১ টি দেশে ১৩৫ মিলিয়ন মানুষের জীবন সংগ্রামে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। ব্র্যাক এমন এক নতুন ধারার প্রবর্তন করেছে যা উন্নয়ন কর্মসূচিকে সামাজিক উদ্যোগের সঙ্গে সমন্বিত করেছে এবং একই সঙ্গে প্রতিষ্ঠান ও সেবাগ্রহীতাদের স্বাবলম্বনের পথে এগিয়ে দিয়েছে। ব্র্যাকের ভিশন হলো এমন একটি পৃথিবী গড়ে তোলা যেখানে কোনো প্রকার শোষণ ও বৈষম্য থাকবে না এবং প্রতিটি মানুষের সম্ভাবনা বিকাশের সুযোগ থাকবে।

চিত্র ৭.২.১ : ব্র্যাক

ব্রাকের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, প্রযুক্তি ও অবকাঠামোগত দিক থেকে সুবিধাবঞ্চিত গ্রামীণ অসহায়, দুস্থ জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে নারীদের আয়বৃদ্ধিমূলক এবং সামাজিক উন্নয়নমূলক কাজে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক ও পারিবারিক উন্নয়নের পাশাপাশি জাতীয় উৎপাদন ও উন্নয়নকে তরান্বিত করা। ব্র্যাকের মৌলিক লক্ষ্য হচ্ছে–

ক. দারিদ্র্য, অশিক্ষা এবং সামাজিক অবিচার দূরীভূত করে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ক্ষমতায়নের পথকে প্রশস্ত করা; এবং
খ. বিভিন্ন সামাজিক ও অথনৈতিক কর্মসূচির মাধ্যমে বড় মাপের ইতিবাচক পরিবর্তন এনে সমাজের সকল নারী ও পুরুষের সম্ভাবনার বিকাশ সাধন।

এসব লক্ষ্যে ব্র্যাক'র মূল্যবোধ হলো– সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনী মনোভাব, সততা ও নিষ্ঠা, সর্বজনীনতা এবং কার্যকারিতা। ব্র্যাক'র সাধারণ উদ্দেশ্যসমূহ হলো:

১. দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে ক্ষমতায়িত করা;
২. গ্রামীণ মহিলাদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশে সহায়তা করা;
৩. বড় মাপের ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়ন করা;
৪. দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে চাহিদা সৃষ্টি এবং সম্পদ অর্জন প্রক্রিয়ায় প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করা; এবং
৫. দরিদ্রদের গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নযোগ্য করে তুলতে প্রতিষ্ঠানিক সহায়তা প্রদান।

৭.২.২ ব্র্যাক'র কার্যক্রম

ব্র্যাক মনে করে দারিদ্র্য একটি অভিশাপ এবং এর কারণগুলো একটি আরেকটির সাথে যুক্ত। বিভিন্ন দিক থেকে সামগ্রিকভাবে দারিদ্র্যকে মোকাবিলা করা জরুরি। সেজন্য ব্র্যাক'র কার্যক্রমকে মোটামুটি পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে; যথা- অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষামূলক কার্যক্রম, কল্যাণ ও প্রত্যাবর্তনমূলক কার্যক্রম; ক্ষমতায়ন কার্যক্রম; সেবা বিস্তৃতমূলক কার্যক্রম ও সমর্থনমূলক কার্যক্রম। নিচে কার্যক্রমগুলোর বর্ণনা দেওয়া হলোঃ

৭.২.২.১. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষামূলক কার্যক্রম

অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষামূলক কার্যক্রমের আওতায় ব্র্যাক নিম্নোক্ত কর্মসূচি পরিচালনা করে−

ক. অতিদরিদ্র কর্মসূচি

ব্র্যাক'র অতিদরিদ্র কর্মসূচি নামে একটি বিশেষ কর্মসূচি আছে। অর্থনৈতিক পিরামিডের ভিত্তিস্তরে বাস করে যারা, তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের ক্ষেত্রে অতিদরিদ্র কর্মসূচি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। অনেক সময় অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠী ক্ষুদঋণ ও মুলস্রোতের অন্যান্য দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতায় আসতে সক্ষম হয় না। এজন্য ২০০২ সাল থেকে ব্র্যাক এই জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের ধাপ অতিক্রমে সহায়তায় সম্পদ হস্তান্তর, কর্মদক্ষতার উন্নয়ন এবং বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা সুবিধার মতো নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করছে। গবেষণায় দেখা গেছে এ কর্মসূচির ৯৫ শতাংশ সদস্য অতিদরিদ্র্যের আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পেরেছে।

খ. কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা

খাদ্য ঘাটতির ফলে বিশ্বজুড়ে খাদ্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা এবং খাদ্য নিরাপত্তার উপর জলবায়ুর বিরুপ প্রভাবের প্রেক্ষাপটে ব্র্যাক কৃষিখাতে তার কর্মপ্রয়াসকে জোরদার করে তুলেছে। আটটি দেশে পরিচালিত এই কর্মসূচিতে নতুন কৃষি প্রযুক্তির উদ্ভব, আর্থিক সেবা এবং উৎপাদন ও বিপনন পদ্ধতিকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। এই কর্মসূচির লক্ষ্য দ্বিবিধ। প্রথমত: দরিদ্র কৃষকদের বসতাবাড়িভিত্তিক প্রান্তিক কৃষি কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা প্রদান করে বহুবিধ দারিদ্র্য দূরীকরণের উদ্যোগে সহায়তা করা। এসব কর্মকান্ডের মধ্যে রয়েছে স্বল্প পরিসরে দল ও সবজির চাষ এবং হাঁস মুরগি ও গবাদি পশু পালন। দ্বিতীয়ত: গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম।

গ. সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি

ব্র্যাক ২০১১ সালে কৌশলগত অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সর্বাধিক প্রান্তিক ও অবহেলিত জনগোষ্ঠীর বহুমাত্রিক দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ইনটিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (আইডিপি) অর্থাৎ সমন্বিত উন্নয়ন কর্মসূচি শুরু করেছে। দেশের প্রত্যন্ত এলাকায় যথা হাওর ও চরাঞ্চলে বসবাসকারী এবং আদিবাসী জনগোষ্ঠী যারা উন্নয়নের মূলধারা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছে তাদের দারিদ্র্য ও বিপন্নতা থাকলে আইডিপি কাজ করছে। ব্র্যাকের মৌলিক সেবা, উন্নত জীবিকার সুযোগ, সামাজিক উদ্বুদ্ধকরণ ও ক্ষমতায়ন, গবেষণা, জ্ঞান ও তথ্যভান্ডার ব্যবস্থাপনা প্রভৃতি ক্ষেত্রে একীভূত ও সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে আইডিপি কাজ করে।

ঘ. মাইক্রোফাইনান্স বা ক্ষুদ্রঋণ

সামাজিকভাবে বঞ্চিত ও বিভিন্ন ক্ষুদ্রগোষ্ঠি মানুষ এবং সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে অবসরপ্রাপ্ত বাছাইকৃত শ্রমিকদের জীবনমান উন্নয়নে ব্র্যাক ক্ষুদ্রঋণ সেবা প্রদান করে। বাংলাদেশে এই কর্মসূচির সদস্য সংখ্যা ৭.৭৮ মিলিয়ন এবং ৬৪ টি জেলায় বকেয়ার পরিমাণ ৬৯৩.৯২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার (ব্র্যাক বার্ষিক রিপোর্ট,২০১৬)। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দক্ষতা উন্নয়ন, পণ্যের বাজার দর নিশ্চিতকরণ এবং সামাজিক সেবা তথ্য সরবরাহের মাধ্যমে বাজারের সঙ্গে যোগসূত্র স্থাপন এর অন্যতম লক্ষ্য। উন্নয়ন এবং প্রযুক্তির সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশসহ সর্বমোট ৯ টি দেশে এ কর্মসূচি চালু আছে।

ঙ. ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজ এ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট

ব্র্যাকের উন্নয়ন কর্মসূচিকে টেকসই করা, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের উৎপাদন ও উৎপাদন পরবর্তী বিপণন কাজে সহায়তা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে দারিদ্র্য বিমোচন এবং বাণিজ্যিক উদ্যোক্তার লভ্যাংশ ব্র্যাকের উন্নয়ন কর্মসূচিতে স্থানান্তর করার লক্ষ্যে পরিচালিত হয় ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজ এ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট। আড়ং ব্র্যাক এন্টারপ্রাইজ অন্যতম উদাহরণ। ব্র্যাক ডেইরি, ব্র্যাক

কিচেন, ব্র্যাক ফিশারিজ, ব্র্যাক পোলট্রি ইত্যাদিও অন্যতম উদাহরণ। এসব প্রতিষ্ঠান থেকে যে মুনাফা হয় তার ৫০ শতাংশ উন্নয়ন কর্মসূচিতে বাকী ৫০ শতাংশ পুনর্বিনিয়োগ হয়।

৭.২.২.২. কল্যাণ ও প্রত্যাবর্তনমূলক কার্যক্রম

ব্র্যাক কল্যাণ ও প্রত্যাবর্তনমূলক কর্মসূচির আওতায় নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে:

ক. **দুর্যোগ, পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা:** প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় ব্র্যাক'র প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, আবহাওয়ার পূবার্ভাস প্রদান, জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে যোগসূত্রবিষয় জ্ঞান প্রদান করে দুর্যোগ মোকাবিলা ও ঝুঁকিহ্রাসকল্পে এলাকার জনগোষ্ঠীকে প্রস্তুত করে তোলা।

খ. **স্বাস্থ্য, পুষ্টি ও জনসংখ্যা কার্যক্রম:** ব্র্যাক স্বাস্থ্য কর্মসূচি দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত এবং সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে প্রতিরোধমূলক, প্রচারমূলক, প্রতিকারমূলক ও পুনর্বাসন সমন্বিত স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিচ্ছে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে ব্র্যাক প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্যসেবিকার মাধ্যমে সাশ্রয়ী জরুরী স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দিচ্ছে। এছাড়া গর্ভবতী মা ও নবজাতকের স্বাস্থ্যসেবা, পুষ্টিশিক্ষা, ছোঁয়াছে রোগ প্রতিরোধ ও সাধারণ জীবনমান উন্নয়নে এ কার্যক্রম কাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

গ. **ওয়াটার, স্যানিটেশন এ্যান্ড হাইজিন কার্যক্রম:** ব্রাকের এ কর্মসূচি ২৪৮ টি উপজেলায় গ্রাম ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের নিকট টেকসই ও সমন্বিত ওয়াটার স্যানিটেশন ও হাইজিনসেবা পৌঁছে দিচ্ছে। এ কর্মসূচির পাঁচটি ক্ষেত্র হলো পানি (পানির পুরানো উৎসের প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং অগ্রসর প্রযুক্তির ব্যবহার), স্যানিটেশন স্বাস্থ্যসেবা (ল্যাট্রিন স্থাপন, ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের বিকাশ এবং দরিদ্র জনগণের জন্য ভর্তুকি ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা), হাইজিন (স্বাস্থ্য বিষয়ে আচরণগত পরিবর্তনে সহায়তা) স্কুল স্যানিটেশন ও হাইজিন শিক্ষা, এবং সরকারি-বেসরকারি অংশদারিত্ব। এ কর্মসূচির আওতায় ১৫০ টি উপজেলায় ৩৮.৮ মিলিয়ন লোকের হাইজিন শিক্ষা, ২৫.৬ মিলিয়ন লোকের জন্য স্যানিটারি ল্যাট্রিন এবং ১৮ মিলিয়ন লোকের জন্য বিশুদ্ধ পানির ব্যবস্থা করেছে।

৭.২.২.৩ ক্ষমতায়ন কার্যক্রম: ব্রাকের ক্ষমতায়ন কর্মসূচির আওতায় নিম্নোক্ত কার্যবলী সম্পন্ন হয়–

ক) জেন্ডার, জাস্টিস এ্যান্ড ডাইভারসিটি: জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ নারীদের মানবাধিকার, জেন্ডার ভূমিকা, সংগঠন ও সমাজে সচেতনতা তৈরি, জনগণের মধ্যে জেন্ডার সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে ব্র্যাকের এ কর্মসূচি পরিচালিত হয়। এ কর্মসূচির আওতায় সভার আয়োজন, কর্মসূচি পালন, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মৈত্রীনেট তৈরি করা হয়।

খ) মানবাধিকার ও আইনি সহায়তা : দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে, ন্যায়বিচার প্রাপ্তির অধিকার নিশ্চিত করা, আইনের শাসন সুসংগত করা ও বিরোধ নিস্পত্তি করার লক্ষ্যে ১৯৮৬ সাল থেকে ব্র্যাকের এ কর্মসূচি নানা বিবর্তনের মাধ্যমে এগিয়ে গেছে। এই কর্মসূচির আওতায় ৬১ টি জেলায় মোট ৫৭৩ টি আইনি সহায়তা কেন্দ্র রয়েছে। আইনি সহায়তা প্রদানের জন্য ব্র্যাক'র চারশত প্যানেল আইনজীবী রয়েছে।

৪। সেবা বিস্তৃতমূলক কার্যক্রম

এ কর্মসূচির আওতায় শিক্ষা, অভিবাসন, দক্ষতা উন্নয়ন ও শহর উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এসব কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো-

ক) শিক্ষা: ব্র্যাক বিশ্বের ছয়টি দেশে শিক্ষা কর্মসূচি পরিচালনা করে। এ কর্মসূচির আওতায় বিশ্বব্যাপী সাত লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করে। ব্র্যাক নতুন ধরনের শিক্ষাদান পদ্ধতি ও উপকরণ নিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার সম্পূরক হিসেবে প্রত্যন্ত অঞ্চলের লক্ষ লক্ষ শিশুকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসছে যাদের বেশিরভাগই অতিদরিদ্র সংঘাত, বঞ্চনা ও উচ্ছেদের শিকার।

খ) অভিবাসন: প্রতারিত হওয়া থেকে রক্ষার জন্য ব্র্যাকের আরেকটি পদক্ষেপ হলো অভিবাসন কার্যক্রম। এ কর্মসূচি অভিবাসন-পূর্ব, অভিবাসনকালীন এবং প্রত্যাবর্তন পরবর্তী এই তিনটি পর্যায়ে সকল ক্ষেত্রে কাজ করে এবং অভিবাসী কর্মীদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষা করে নিরাপদ অভিবাসন নিশ্চিত করে।

গ) দক্ষতা উন্নয়ন: দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় ব্র্যাক তরুণদের প্রশিক্ষণ উদ্যোক্তা তৈরি এবং ছোট ও মাঝারি শিল্পের প্রসারে কাজ করে। ব্র্যাক এ পর্যন্ত ৫ লাখ তরুণকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিয়েছে। ৪ লাখ বেকার যুবকের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করছে।

ঘ) **শহর উন্নয়ন :** ব্র্যাক শহর উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। শহর গভর্নেন্স, শহরাঞ্চলে মৌলিক সেবা সকলের কাছে পৌঁছে দেয়া এবং নিম্ন আয়ের মানুষের অধিকার রক্ষায় কাজ করে। এছাড়া কমিউনিটি ভিত্তিক অগ্নিনির্বাপক প্রশিক্ষণ ও সচেতনায় ব্র্যাক কাজ করছে।

৭.২.২.৫ সমর্থনমূলক কর্মসূচি

ব্রাকের অনেকগুলো সমর্থনমূলক কর্মসূচি রয়েছে। যেমন– প্রশাসন, সামাজিক পরিবর্তনের জন্য এ্যাডভোকেসি, যোগাযোগ স্থাপন, প্রতিবন্ধি অন্তর্ভুক্তিকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন, নিরাপত্তা প্রভৃতি সমর্থন মূলক কর্মসূচি রয়েছে।

সারসংক্ষেপ

দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তায় বেসরকারি সমাজ উন্নয়নমূলক সংস্থা হিসেবে ব্র্যাক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে। শোষণ ও বৈষম্যহীন এবং সবার জন্য সম্ভাবনা বিকাশের সুযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে ব্র্যাক মুলত পাঁচ ধরনের কর্মসূচি পরিচালনা করে। সেগুলো হলো- ক. অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষামূলক, খ. কল্যাণ ও প্রত্যাবতর্নন মূলক কার্যক্রম, গ. ক্ষমতায়ন কার্যক্রম, ঘ. সেবা বিস্তৃতিমূলক কার্যক্রম ও ঙ. সমর্থনমূলক কার্যক্রম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। ব্র্যাক প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?

ক. ১৯৭৩ সালে　　খ. ১৯৭২ সালে
গ. ১৯৭৪ সালে　　ঘ. ১৯৭৬ সালে

২। ব্র্যাকের অন্যতম ভিশন কী?

ক. মানুষের লিখনী শক্তির বিকাশ　　খ. মানুষের মতামত প্রদানের মাধ্যমের বিকাশ
গ. মানুষের সম্ভাবনা বিকাশ　　ঘ. মানুষের ধর্মীয় স্বাধীনতা বিকাশ

পাঠ-৭.৩ ব্র্যাক'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির অনুশীলন (Application of Social Work Methods in BRAC Programme)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৭.৩.১ ব্র্যাক'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির অনুশীলন সম্পর্কে লিখতে পারবেন।

৭.৩.১ ব্র্যাক'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির অনুশীলন

সমাজকর্ম হলো একটি বহুমুখী সাহায্যকারী পেশা যা ব্যক্তি দল ও সমষ্টিকে এমনভাবে সহযোগিতা করে যেন নিজেরা সক্ষমতা অর্জন করে নিজের সমস্যার সামধান করতে পারে। সমাজকর্ম জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধ নির্ভর পেশা। যা কতগুলো সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কাজ করে। সমাজকর্ম পদ্ধতিকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়। ব্র্যাক বিশ্বের সবচেয়ে বড় বেসরকারি সংস্থা হিসেবে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। ব্রাকের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কীভাবে সমাজকর্মের পদ্ধতিগুলো স্বীকৃতিহীনভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। নিচে ব্র্যাক এর কাযক্রমে সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতিগুলোর অনুশীলন আলোচনা করা হলো–

ক. ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রয়োগ: ব্রাকের কার্যক্রমগুলোতে ব্যক্তি সমাজকর্মের স্পষ্ট অনুশীলন লক্ষ্য করা যায়। ব্র্যাক গ্রামীণ দুঃস্থ ও প্রান্তিক মহিলাদের জীবনমান উন্নয়নে গুরুত্ব দেয়। পারিবারিক নির্যাতনের স্বীকার নারীকে ব্র্যাক তার আইনগত সহায়তা কার্যক্রমের আওতায় আইনি সহায়তা ও কাউন্সেলিং সেবা দিয়ে থাকে যা ব্যক্তি সমাজকর্মের অন্যতম মৌলিক দৃষ্টান্ত। এছাড়া ব্র্যাক স্বাস্থ্য কর্মসূচির অধীনে প্রশিক্ষিত স্বাস্থ্য কর্মীর মাধ্যমে ছাত্রহ গভবর্তী মা ও শিশুদের বিশেষ সেবা প্রদান করে থাকে যা ব্যক্তি সামজকর্মের অনুশীলনের পর্যায়ে পড়ে। এছাড়াও অভিবাসন কর্মসূচির আওতায় অভিবাসন প্রত্যক্ষ ব্যক্তির ভিকটিমাইজেশন রোধে কাউন্সেলিং এবং প্রতারিত ব্যক্তিকে পুনরুদ্ধার ও পুনর্বাসন করে থাকে। এসবের মাধ্যমে ব্র্যাক মূলত ব্যক্তির মনো-সামাজিক সমস্যাসমূহের বিশ্লেষণ ও তা দূরীভূতকরণে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে যা ব্যক্তি সমাজকর্মের অনুশীলনের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

খ. দল সমাজকর্মের প্রয়োগ: ব্রাকের বিভিন্ন কার্যক্রমে দল সমাজকর্মের অনুশীলন লক্ষ্য করা যায়। অতিদরিদ্র কর্মসূচি, কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা, শিক্ষা ও ক্ষমতায়ন কার্যক্রমে দলের সমস্যার বিশ্লেষণ এবং দলীয় উন্নয়নকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। পরিকল্পিত দল গঠন, যুবকল্যাণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন, দলীয় গতিশীলতা, দলীয় সম্পদ প্রভৃতি ব্র্যাকের কার্যক্রমের অন্যতম মৌলিক শক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়। সুতরাং বলা যায় ব্রাকের বিভিন্ন কার্যক্রমে দল সমাজকর্মের উপাদান, নীতিমালা ও প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়।

গ. সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন: সাধারণত সমষ্টি সংগঠন তুলনামূলকভাবে উন্নত সমাজ ব্যবস্থা বা শহরে সমাজ ব্যবস্থার প্রয়োগ করা হয়। অন্যদিকে গ্রামীণ এলাকায় বা তুলনামূলক কম উন্নত এলাকায় সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির অনুশীলন করা হয়। ব্রাকের কার্যক্রম বিশ্লেষণ করলে এই দুটি পদ্ধতির অনুশীলন লক্ষণীয়। ব্র্যাকের একটি বিশেষ কার্যক্রম হচ্ছে শহর উন্নয়ন, যেখানে শহর পরিকল্পনা, শহরের বাসিন্দাদের সেবাসমূহ সহজলভ্য ও জীবনমান অধিকার উন্নয়নে গুরুত্ব দেয়া হয়। সুতরাং ব্রাকের কার্যক্রমে সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষণীয়। অন্যদিকে গ্রামীণ মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সচেতনতা বৃদ্ধি, সেবার প্রতুলতা, সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারে ব্র্যাক সর্বদা সক্রিয়। গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর দারিদ্র বিমোচন করে স্বাবলম্বী করতে ব্র্যাক বিভিন্ন সমষ্টি ভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। তাই বলা যায় ব্রাকের কার্যক্রমে যথার্থ উন্নয়নের অনুশীলন লক্ষ্যণীয়।

ব্র্যাক'র কার্যক্রমে সহায়ক পদ্ধতির অনুশীলন: শুধু মৌলিক পদ্ধতি নয় ব্র্যাক'র কার্যক্রমে সমাজকর্মের সহায়ক পদ্ধতির অনুশীলন দেখা যায়। যথা–

ক. সমাজকল্যাণ প্রশাসন: ব্র্যাক সমন্বিত সেবাদান ব্যবস্থার মাধ্যমে বঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিভিন্ন সময়ে যেসব কার্যক্রম গ্রহণ করে সেগুলো বিশ্লেষণ করলে সমাজকর্মের এ পদ্ধতির প্রয়োগ দেখা যায়। ব্রাকের মানবাধিকার ও আইনি সহায়তা, ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্যসেবা ইত্যাদি কর্মসূচিতে প্রশাসনিক ব্যবস্থার আওতায় কার্যকরভাবে সেবাদান করা হয়। স্থানীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাথে সমাজকল্যাণ মূলক প্রশাসনিক ব্যবস্থার সমন্বয় সাধনের মাধ্যমে ব্র্যাক কার্যকর ভাবে সেবা প্রদান করে। তাই বলা যায় ব্রাকের কার্ক্রমে সমাজকল্যাণ প্রশাসন পদ্ধতির অনুশীলন লক্ষ্য করা যায়।

খ. সামাজিক কার্যক্রম: ব্র্যাক লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর আত্মসচেতনতা সৃষ্টি বঞ্চিত, দুঃস্থ, প্রান্তিক ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে আত্মসচেতনতা আত্মবিশ্বাস ও উন্নয়ন চেতনা সৃষ্টি করার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। অপুষ্টি দূরীকরণ, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, মা ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, জেন্ডার সমতা, কুঠির শিল্পের উন্নয়ন প্রভৃতি কার্যক্রমে সামাজিক কার্যক্রম পদ্ধতির অনুশীলন লক্ষ্য করা যায়।

গ. সমাজকর্ম গবেষণা: মানসম্মত নীতি প্রণয়ন, সমস্যা বিশ্লেষণ ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিনির্ভর সেবার জন্য ব্র্যাক সুপরিচিত। এক্ষেত্রে কার্যকরী নীতি প্রণয়ন ও সমস্যা সমাধানের বাস্তবতা নির্ভর রূপকল্প নীতি বাস্তবায়নে সামাজিক গবেষণার অনুশীলন লক্ষ্য করা যায়।

সারসংক্ষেপ

ব্র্যাক বিশ্বের সবচেয়ে বড় বেসরকারি সংস্থা হিসেবে দরিদ্র ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। আর সমাজকর্ম হলো জ্ঞান, দক্ষতা ও মূল্যবোধনির্ভর পেশা। ব্র্যাকের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমাজকর্মের পদ্ধতিগুলো স্বীকৃতিহীনভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। ব্র্যাকের গ্রামীণ উন্নয়ন কার্যক্রমে সমাজকর্মের কোন পদ্ধতির অনুশীলন দেখা যায়?

ক. ব্যক্তি সমাজকর্ম খ. দল সমাজকর্ম

গ. সমষ্টি উন্নয়ন ঘ. সমষ্টি সংগঠন

২। দল সমাজকর্মের অনুশীলন ব্র্যাকের যে কার্যক্রম লক্ষ্য করা যায় তা হচ্ছে–

i. পরিকল্পিত দলগঠন ii. দলীয় গতিশীলতা iii. সমষ্টি উন্নয়ন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৭.৪ গ্রামীণ ব্যাংক'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম (Objectives and Activities of Grameen Bank)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৭.৪.১ গ্রামীণ ব্যাংক'র উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে পারবেন।

৭.৪.২ গ্রামীণ ব্যাংক'র কার্যক্রমের বর্ণনা দিতে পারবেন।

৭.৪.১ গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্দেশ্য

গ্রামীণ দরিদ্র মানুষের কাছে জামানত বিহীন ঋণসুবিধা পৌঁছানো, মহাজনের অত্যাচার থেকে দরিদ্র মানুষদের রক্ষা, ভূমিহীন মানুষের মধ্যে সঞ্চয়ের মনোভাব গড়ে তোলা এবং দুঃস্থ ও দরিদ্র পরিবারের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৭৬ সালে গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ শান্তিতে নোবেলজয়ী ড. মুহাম্মদ ইউনুস। গ্রামীণ ব্যাংক হচ্ছে পল্লীর ভূমিহীন দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদের ঋণদানের জন্য একটি বিশেষ অর্থলগ্নীকারী স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা লাভ করার পূর্বে ড. মোহাম্মদ ইউনুস সর্বপ্রথম চট্টগ্রাম জেলায় জোবরা গ্রামের জামানত হীনভাবে কৃষকদের ঋণ প্রদান করেন। ঋণ প্রদান করার এ প্রায়োগিক প্রকল্পের সফলতাই গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠায় উৎসাহ জোগায়। ১৯৭৬ সালে গ্রামীণ ব্যাংক নির্ধারিত কিছু জেলায় তার কার্যক্রম প্রসারিত করে। গ্রামীণ ব্যাংক অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ এর মাধ্যমে ১৯৮৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে গ্রামীণ ব্যাংক স্বায়ত্তশাসিত বিশেষ অর্থলগ্নকারী প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করে। ডিসেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত এ ব্যাংক থেকে ঋণগ্রহণকারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ৮০৮১ মিলিয়ন, যার ৯৭ শতাংশ নারী। গ্রামীণ ব্যাংকের ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমানে গ্রামীণ ব্যাংক তার ২৫৬৮ শাখার মাধ্যমে প্রায় ৮১.৩৯২টি গ্রামে ঋণসেবা পৌঁছে দিচ্ছে। গ্রামীণ ব্যাংকের নতুন উদ্ভাবনী চিন্তা, কর্মকাণ্ড এবং সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে ২০০৬ সালে এর প্রতিষ্ঠাতা ড. মোহাম্মদ ইউনুস এবং গ্রামীণ ব্যাংক যৌথভাবে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করে। গ্রামীণ ব্যাংকের কতিপয় উদ্দেশ্য রয়েছে সেগুলো হলো:

Grameen Bank

চিত্র ৭.৪.২ : গ্রামীণ ব্যাংক

১. দরিদ্র নারী-পুরুষদের জন্য ব্যাংকিং সুবিধা নিশ্চিত করা;
২. সুদখোর, মহাজনদের শোষণ ও বঞ্চনার বিলোপ সাধন;
৩. বাংলাদেশের বিশাল সংখ্যক বেকার জনগোষ্ঠীর জন্য স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ তৈরি করা;
৪. অবহেলিত গ্রামীণ দরিদ্র নারীদেরকে এমন এক প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় আনা, যা তাদের জন্য বোধগম্য হবে এবং তারা তা ব্যবস্থা করতে পারবে;
৫. মজুরভিত্তিক কর্মসংস্থানের সঙ্গে পার্শ্বজীবিকার সুযোগ সৃষ্টি করা;
৬. কম আয়, কম সঞ্চয় এবং কম বিনিয়োগের মাধ্যমে দারিদ্র্যের যে অতি পুরাতন দৃষ্টান্ত তৈরি হয়েছে তা ভেঙ্গে ফেলা;
৭. উৎপাদনশীল ও সঞ্চয়মূলক ব্যবস্থার সম্প্রসারণ করা; এবং
৮. বিনিয়োগ, সঞ্চয় ও আর্থিক উৎপার্জনের মাধ্যমে দারিদ্র্যের দৃষ্টান্ত দূরীভূত করা।

৭.৪.২ গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রম

গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিষ্ঠাকালীন সময় থেকেই প্রচলিত ব্যবস্থার বিপরীতে পারস্পরিক আস্থা, জবাবদিহিতা, অংশগ্রহণ ও সৃজনশীলতার উপর ভিত্তি করে জামানত ছাড়া ঋণদানের নতুন ব্যাংকিং ব্যবস্থা এগিয়ে নিয়ে চলছে। গ্রামীণ ব্যাংক বাংলাদেশের অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠীকে জামানতবিহীন ঋণদান করে। যেসব অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠী দারিদ্র্যের কারণে ব্যাংকিং সেবার বাইরে ছিলো গ্রামীণ ব্যাংক যেসব অতিদরিদ্র মানুষকে দরিদ্রতাকে দূরীকরণে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যাংকিং সেবার আওতায় নিয়ে আসে। গ্রামীণ ব্যাংকের জামানত বিহীন সাশ্রয়ী ঋণের কারণে অনেক দরিদ্রব্যক্তির আর্থ-সাামজিক উন্নয়ন নিশ্চিত হয়েছে বলে কিছু গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। গ্রামীণ ব্যাংক সারা বাংলাদেশের প্রায় ৯৭ শতাংশ গ্রামে

তাদের কার্যক্রমে পরিচালনা করছে। গ্রামীণ ব্যাংক মূলত ক্ষুদ্রঋণদান কেন্দ্রিক একটি ব্যাংক। এর কার্যক্রম আলোচনা করা হলো:

১। ক্ষুদ্রঋণ

গ্রামীণ ব্যাংকের মূল কার্যক্রম হলো ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা। দুঃস্থ, দরিদ্র, ভূমিহীন মানুষকে জামানতহীন ঋণদান করাই গ্রামীণ ব্যাংকের মূল কার্যক্রম। গ্রামীণ ব্যাংক বিভিন্ন মেয়াদে বিভিন্ন পরিমাণ ঋণ সুবিধা প্রদান করে থাকে। ২০১৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত গ্রামীণ ব্যাংক ১০৮০.৯৬ বিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করেছে এবং ব্যাংকের সদস্যদের সঞ্চয়ের পরিমাণ ১০৫.৭৯ বিলিয়ন টাকা। গ্রামীণ ব্যাংক সাধারণত চারটি শ্রেণিতে ঋণ প্রদান করে থাকে সেগুলো হচ্ছে:

ক) আয়বর্ধক কর্মকান্ডের জন্য ঋণ প্রদান

গ্রামীণ ব্যাংক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের উপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে মৎস্য চাষ, কৃষি যন্ত্রপাতি ক্রয়, সার-বীজ ক্রয়, হাঁস-মুরগী পালন, শাকসবজি চাষ, গরু-ছাগল পালন, নার্সারি ইত্যাদি প্রকল্পের জন্য ঋণদান করে থাকে। এ ঋণদান প্রদান করা হয় বাৎসরিক ২০ শতাংশ হার সুদে। আয়বর্ধনমূলক ঋণদান কার্যক্রমের আওতায় তারা মাইকো এন্টারপ্রাইজ লোন দিয়ে থাকে। এ ঋণ প্রদানের নির্ধারিত কোনো পরিমাণ থাকে না। এখন পর্যন্ত ৬,২১০,৫৭৪ জন সদস্য এই মাইক্রো এন্টারপ্রাইজ ঋণ গ্রহণ করেছে। এ যাবৎ ২০৯.৪৯ বিলিয়ন টাকা ঋণ প্রদান করা হয়েছে। মাছ চাষ, পোল্ট্রি খামার সবজির দোকান, ফার্মেসী, ডেইরি, অটোরিক্সা, পাথর ব্যবসা প্রভৃতি উদ্যোগ ঋণ দেয়া হয়েছে।

খ) গৃহঋণ

বাসস্থান, খাদ্য ও বস্ত্র মানুষের মৌলিক চাহিদার অন্যতম। বাসস্থানের গুরুত্ব অনুভব করে গ্রামীণ ব্যাংক অতি দরিদ্রদের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করে ১৯৯৪ সালে। 'দরিদ্রদের জন্য বাসস্থান' এই স্লোগানে কর্মসূচিটি চালু হয়েছে। সাধারণত টিনের চালা বাড়ি নির্মাণে ২৫,০০০ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়, যার সুদের পরিমান ৮ শতাংশ। ২০১৪ সালে ১২.৪০ মিলিয়ন টাকা ঋন প্রদান করা হয়েছে ১,৩৯১ টি গৃহ নির্মাণে।

গ) উচ্চশিক্ষাবৃত্তি

শিক্ষা মানুষের মৌলিক মানবাধিকার। বাংলাদেশে অনেক শিশুই দারিদ্র্যের কারণে ঝরে পড়ে। অনেকেই প্রাথামিক ও মাধ্যমিক পর্যায় শেষ করলেও অর্থাভাবে উচ্চশিক্ষা অর্জন করতে পারে না। এজন্য গ্রামীণ ব্যাংক মেডিসিন, প্রকৌশল, কৃষি এবং অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রোগ্রামের জন্য ঋণ দিয়ে থাকে। উচ্চশিক্ষাবৃত্তি শিক্ষাকালীন সময়ে গ্রহণ করলে তা বিনা সুদে দেওয়া হয় যার মেয়াদ ৩-৫ বছরের বেশি নয়। নির্দিষ্ট সময়ের বেশি হলে ৫ শতাংশ হারে লভ্যাংশ নেয়া হয়। ২০১৪ সাল পর্যন্ত ৫৩,১৭৬ জন সদস্যের সন্তানের জন্য ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

ঘ) সংগ্রামরত সদস্যদের ঋণদান

ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত ব্যক্তিরা সবসময়ই দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির আওতার বাইরে থেকে যায়। ২০১২ সাল থেকে গ্রামীণ ব্যাংক ভিক্ষাবৃত্তি দূরীভূতকরণ এবং তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য সংগ্রামরত সদস্যদের ঋণদান কর্মসূচি চালু করে। ১০৯০০০ জন্য ভিক্ষুক এখন পর্যন্ত এ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছে। বাংলাদেশি টাকায় ১৭৩.৬৮ মিলিয়ন অর্থ ভিক্ষকদের ঋণদান করা হয়েছে যার মধ্যে ৮৪ শতাংশ ঋণ গ্রহীতা ভিক্ষাবৃত্তি ছেড়ে দিয়েছে এবং তাদের মধ্যে ৯,০২৯ জন ভিক্ষুক এখন গ্রামীণ ব্যাংকের নিয়মিত ঋণগ্রহণকারী সদস্য।

২। পল্লীফোন কর্মসূচি

গ্রামীণ ব্যাংকের অত্যন্ত কার্যক্রম একটি কর্মসূচি হলো পল্লীফোন কর্মসূচি। তথ্যপ্রযুক্তির অবাধ বিস্তারের সাথে মানুষের বহুবিধ ব্যবসার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংক গ্রামাঞ্চলে নারীদের পল্লীফোন ক্রয় করার যাবতীয় অর্থ ও কারিগরি সহায়তা দিয়ে থাকে। ২০১৪ সালের শেষ নাগাদ ১.৪৩ মিলিয়ন গ্রাম ফোন ক্রয় বাবদ ২.১৭ বিলিয়ন টাকা গ্রামীণ মহিলাদের ঋণ প্রদান করা হয়েছে।

৩। গ্রামীণ ব্যাংক বৃত্তি

গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যদের সন্তানদের শিক্ষা নিশ্চিত করার জন্য গ্রামীণ ব্যাংক বৃত্তি চালু হয়েছে ১৯৯৯ সাল থেকে। নারীদের শিক্ষার উপর গুরুত্ব দিয়ে ৫০% শতাংশ বৃত্তি নারীদের জন্য সংরক্ষণ করা হয়। ২০১৪ সাল পর্যন্ত ৩৯৯.২৯ মিলিয়ন টাকা ২৪১,৩৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে বণ্টন করা হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত গ্রামীণ ব্যাংক অত্যন্ত কার্যকরভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে জামানত বিহীন ঋণ প্রদানের মাধ্যমে জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। এ ব্যাংকের প্রধান উদ্দেশ্য হলো সুদখোর ও মহাজনদের শোষণ দূরীভূত করা। দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র ভাঙ্গা, অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত মানুষকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় নিয়ে এসে জীবনমানের উন্নয়ন সাধন। এ লক্ষ্যে গ্রামীণ ব্যাংক ক্ষুদ্রঋণ প্রদান, উচ্চশিক্ষাবৃত্তি, গৃহঋণ কর্মসূচি, গ্রামফোন কর্মসূচি এবং গ্রামীণ ব্যাংক বৃত্তি কর্মসূচি পরিচালনা করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। গ্রামীণ ব্যাংক এর প্রতিষ্ঠাতা কে?

ক) ড. মোহাম্মদ ইউনুস
খ) ড. দরস উদ্দিন
গ) ড. ইব্রাহীম খলিল
ঘ) ড. কাজী এনাম

২। গ্রামীণ ব্যাংক কোন শ্রেণির শোষণের বিলোপ সাধনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল?

ক) ব্যবসায়িক
খ) মজুদার
গ) সুদখোর ও মহাজন
ঘ) দালাল

পাঠ-৭.৫ গ্রামীণ ব্যাংক'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ (Application of Social Work Methods in Grameen Bank Programme)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৭.৫.১ গ্রামীণ ব্যাংক'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ সর্ম্পকে বর্ণনা করতে পারবেন।

৭.৫.১ গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সমাজকর্মের সুনির্ধারিত পদ্ধতি রয়েছে। সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতির সাথে সহায়ক পদ্ধতির প্রয়োগ গ্রামীণ ব্যাংক'র বিভিন্ন কার্যক্রমে লক্ষণীয়। গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংক, মডেল ব্যাংক হিসেবে বিবেচনা করা হয়। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে আত্ম সচেতনাবোধ সম্পন্ন আত্মনির্ভরশীল করে তোলার জন্য গ্রামীণ ব্যাংক কার্যকর ভাবে কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছে। গ্রামীণ বঞ্চিত, নির্যাতিত, ভূমিহীন, দরিদ্র, বৈষম্যপীড়িত নারীদের উন্নয়নে গ্রামীণ ব্যাংক ঋণ প্রদান করে থাকে এবং প্রয়োজনীয় জীবনমুখী প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। এসব কর্মকাণ্ডে যেমন মা ও শিশুকল্যাণ নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি থাকে তেমনি পরিবার কল্যাণ ও শ্রমকল্যাণের নিশ্চয়তা থাকে যা সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতির অন্যতম ব্যক্তি সমাজকর্মের পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটে।

গ্রামীণ ব্যাংকে আয়বর্ধন কর্মকান্ডের জন্য ঋণ প্রদান করে আসছে। গ্রামীণ ব্যাংক'র আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে ঋণ প্রদানের লক্ষ্য হলো বিভিন্ন সমবায় কর্মকান্ড ও দলীয় কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র জনগণকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা। গ্রামীণ ব্যাংকের সদস্যদের ৯৭ শতাংশ হলো গ্রামীণ দরিদ্র ও ভূমিহীন নারী, যারা অঞ্চলভিত্তিক নিজেরা দল গঠন করে, দলের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করে এবং এর মাধ্যমে দলীয় গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। ঋণ গ্রহণকারী এসব নারী সদস্যরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন এবং উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে মতামত তুলে ধরতে পারেন। সুতরাং দল তৈরি করা, দলীয় পারস্পরিক তথ্য বিনিময়, মতামত প্রদান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদির মাধ্যমে গ্রামীণ ব্যাংকে দল সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ দেখা যায়।

অধিকাংশ রাষ্ট্রেই দারিদ্র্য বিশ্লেষণ ও পল্লী উন্নয়ন অনেকখানি নির্ভর করে লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর সক্রিয় মতামত প্রদান ও অংশগ্রহণের উপর। লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীকে একতাবদ্ধ করা, উৎসাহ ও উদ্দীপনা তৈরি করা, স্বীয় প্রতিভার বিকাশ, আত্মসচেতনা বোধ জাগ্রতকরণে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্টির জীবনমান উন্নয়ন নিশ্চিত করার অন্যতম প্রধান উপায় হলো সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির প্রয়োগ। গ্রামীণ ব্যাংক দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে উন্নতমানের কৃষিজাত পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য বীজ সরবরাহ, সমবায় সমিতি প্রতিষ্ঠা, কৃষি পণ্য উৎপাদনে উৎসাহ দান, মূলধন সরবরাহ এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।

সারসংক্ষেপ

ভূমিহীন দরিদ্র নারীদের ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন আনয়ন করার ক্ষেত্রে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সংঘবদ্ধ করে। সচেতনতা তৈরির মাধ্যমে দল গঠন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের অংশগ্রহণে গ্রামীণ ব্যাংকে সমাজ কর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ তাৎপর্যপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। আয়বর্ধন মূলক কর্মকান্ডে ঋণ সংগ্রহকারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও মতামত প্রদান কোন পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য?

(ক) দল সমাজকর্ম (খ) ব্যক্তি সমাজকর্ম
(গ) সমাজ উন্নয়ন (ঘ) সমাজকর্ম প্রশাসন

২। গ্রামীণ ব্যাংকের কোন কর্মসূচিতে ব্যক্তির সমাজকর্মের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়?

(ক) ক্ষুদ্রঋণে কর্মসূচিতে (খ) পরিবার ও শিশু কল্যাণ কর্মসূচি
(গ) মৎসচাষ কর্মসূচিতে (ঘ) কৃষি উন্নয়ন কর্মসূচিতে

পাঠ-৭.৬ বাংলাদেশ প্রবীণহিতৈষী সংঘ'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম (Objectives and Activities of Bangladesh Association for the Aged)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৭.৬.১ প্রবীণণহিতৈষী সংঘ'র উদ্দেশ্যসমূহ লিখতে পারবেন।

৭.৬.২ প্রবীণ হিতৈষী সংঘ'র কার্যক্রমসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

৭.৬.১ প্রবীণহিতৈষী সংঘ'র উদ্দেশ্য

প্রবীণদের কল্যাণে যেসব প্রতিষ্ঠান কাজ করছে প্রবীনহিতৈষী সংঘ তার মধ্যে সবচেয়ে উজ্জ্বলতম। ১৯৬০ সাল হতে দেশের এ প্রাচীনতম ও সর্ববৃহৎ প্রবীণ কল্যাণ সংঘটি সকল শ্রেণির প্রবীণদের শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক সেবাদানের পাশাপাশি সমাজের অন্যান্য প্রজন্মকে বার্ধক্য বিষয়ে সংবেদনশীল ও তাৎপর করার প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। প্রবীণহিতৈষী সংঘ ১৯৬১ সালের সমাজকল্যাণ সংস্থা নিবন্ধীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ আইনের অধীনে নিবন্ধনকৃত একটি অলাভজনক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। ঢাকার কেন্দ্রীয় অফিস ছাড়াও ৫৫ টি জেলা শাখা নিয়ে এ প্রতিষ্ঠানটি প্রবীনদের স্বল্প ও বিনামূল্যে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সেবা প্রদান, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ, প্রচার, প্রকাশনা ও পুনর্বাসন; চিত্তবিনোদন; ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যাচ্ছে। সাধারণত শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের মাপকাঠিতে জীবনচক্রের সবশেষ অবস্থাকে বার্ধক্য বলা হয়। জাতিসংঘের সাধারণ মাপকাঠি অনুযায়ী এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বসবাসরত ৬০ বছর বা তদ্বর্ধর বয়সি ব্যক্তি সাধারণকে প্রবীণ শ্রেণিভুক্ত করা হয়। পরিসংখ্যানুসারে ধারণা করা হয়, ১৯৯৫ সাল হতে ২০২৫ সালের মধ্যে জনসংখ্যা তিনগুণ বৃদ্ধি পাবে। এসময়ে ৬০ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সের জনসংখ্যা বেড়ে ছয়গুণ এবং ৮০ বছরের বেশি প্রবীণদের সংখ্যা দশগুণ বৃদ্ধি পাবে। বাংলাদেশ প্রবীণহিতৈষী সংঘ নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে–

১. প্রবীণ বয়সে সবার জন্য শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা ও চিন্তা-ভাবনাহীন শান্তিপূর্ণ আনন্দময় জীবন যাপনের দিকে নিদের্শনা দেয়া;
২. বার্ধক্যজনিত ব্যাধিসমূহের কারণ, ধরন, প্রতিরোধ, চিকিৎসা ও অন্যান্য সমস্যার অনুসন্ধানে গবেষণা পরিচালনা;
৩. সক্ষম প্রবীণদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা;
৪. বার্ধক্যে আর্থিক, সামাজিক, পারিবারিক ও অন্যান্য সমস্যা ও তার সমাধান বিষয়ে জ্ঞান লাভ ও তথ্য বিস্তার এবং পত্রপত্রিকায় প্রকাশ করা; এবং
৫. প্রবীনরা তাদের অভিজ্ঞতা কাজে লাগায় দেশ ও সমাজের কল্যাণে আবদান রাখতে পারেন সেজন্য তাদের কল্যাণ সাধন করা।

৭.৬.২ প্রবীনহিতৈষী সংঘ'র কার্যক্রম

বিশিষ্ট সমাজসেবী ড. এ কে এম আব্দুল ওয়াহেদ ১৯৬০ সালে তার ধানমন্ডির নিজস্ব বাসভবনে পূর্ব পাকিস্তান প্রবীণ সোসাইটি নামে যে সেবামূলক প্রতিষ্ঠান চালু করে ছিলেন তাই আজকের প্রবীণহিতেষী সংঘ। বাংলাদেশ প্রবীণহিতৈষী সংঘ মহৎ উদ্দেশ্যবলী অর্জনে নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করেঃ

ক. স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম : অত্যন্ত কম খরচে প্রবীণ ও অন্যান্য বয়সি রোগীদের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করার জন্য প্রবীণহিতৈষী সংঘ একটি অত্যাধুনিক ও বিশেষায়িত হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করেছে প্রতিষ্ঠানটির সদরদপ্তর ঢাকার আগারগাঁওয়ের প্রধান ভবনে। শুক্রবার ছুটির দিন ব্যতীত সপ্তাহে ছয়দিন সকাল ৮.০০ হতে দুপুর ২.০০ টা পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ঔষধসহ প্রবীণদের স্বল্পমূল্যে/বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা প্রদান করা হয়। মেডিসিন, হৃদরোগ, চক্ষু, গাইনি, ফিজিওথেরাপী, মনোরোগ, চর্ম ও যৌন, রেডিওলজি ইত্যাদি বিভাগের অধীনে পরিচালিত হয় চিকিৎসা কার্যক্রম। হাসপাতালে ৩০ শতাংশ দরিদ্র প্রবীণকে বিনামূল্যে চিকিৎসা ও ব্যবস্থাপত্র দেওয়া হয়। গরীব ও অসহায় রোগীদের ঔষধ ও বিভিন্ন প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা এবং ফিজিওথেরাপি চিকিৎসা বিনামূল্যে করা হয়। ২০০৭ সাল থেকে প্রবীণ হাসপাতালে বৈকালিক শিফটের জন্য মেডিসিন.

সার্জারী, গাইনী, চর্মরোগ বিভাগ খোলা হয়েছে। প্রতিষ্ঠানের আবাসিক হাসপাতাল কার্যক্রম নিয়মিত চলছে, যেখানে মাত্র ১০০ টাকা দৈনিক ফি দিয়ে সাধারণ বেডে এবং ৩০০ টাকা ফি দিয়ে কেবিনে রোগীরা থাকতে পারেন।

খ. সামাজিক সচেতনামূলক কার্যক্রম: বাংলাদেশ প্রবীণহিতৈষী সংঘ শুধুমাত্র প্রবীণদের বিভিন্ন কার্যকরী সেবা প্রদান করে তাই নয় বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে বাধর্ক্য সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে সদাতৎপর। তাই বার্ধক্য, বার্ধক্যকালীন নিরাপত্তা জটিলতা, মা বাবার অধিকার সম্পর্কে বিভিন্ন সচেতনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। তাছাড়া যৌতুকপ্রথা ও বাল্যবিবাহ নিরোধসহ সামাজিক সচেতনমূলক শীর্ষক সেমিনার ও প্রচারের আয়োজন করে। পাশাপাশি শাখাগুলি সংশ্লিষ্ট জেলায় যৌতুকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে।

গ. প্রবীণ নিবাস: বাংলাদেশে প্রবীণদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। শহরের ও গ্রামীণ প্রবীণদের সমস্যার প্রকৃতি ভিন্নরকম। একাকীত্ব ও পরিবারের সদস্যদের বিচ্ছিন্নতা ও তাদের উর্পাজনক্ষম প্রবীণদের জন্য সাময়িক বসবাসের জন্য কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ১টি আছে। প্রবীণ নিবাসগুলোতে প্রবীণদের জন্য সার্বক্ষণিক স্বাস্থ্যসেবা, লাইব্রেরি, নামাজ ঘর এবং ইনডোর গেমস এর ব্যবস্থা আছে।

ঘ. প্রবীণ বর্ষ ও প্রবীন দিবস উদ্‌যাপন: প্রবীনহিতৈষী সংঘ প্রতিবছর আন্তজার্তিক প্রবীণ দিবস নানা আয়োজনের মধ্যে দিয়ে পালন করে থাকে। প্রতিবছর ১লা অক্টোবর বিশ্ব প্রবীণ দিবসে সংঘ দিনব্যাপী নানা আয়োজন করে থাকে। বিভিন্ন সংস্থার সাথে যৌথভাবেও বিভিন্ন আয়োজন করা হয়। এ দিবসের গুরুত্ব ধরে আলোচনা সভা, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা, রচনা প্রতিযোগিতা, সমাবেশ এবং র‍্যালীর আয়োজন করে থাকে।

ঙ. প্রবীণসেবা পুরস্কার: পারিবারিক পর্যায়ে প্রবীণদের পরিচর্যাকে উৎসাহিত করার জন্য প্রবীণহিতৈষী সংঘ মমতাময় ও মমতাময়ী পুরুস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করেছে। এ পুরস্কারের উদ্দেশ্য হলে সেবাদানকারীদের অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করা, কেন্দ্রীয় অফিস ছাড়াও জেলা শাখাগুলো হতে এ পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা রয়েছে।

চ. আর্ন্তজাতিক কার্যক্রম : প্রবীণদের সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সংগঠনের অধিভুক্ত হওয়া এবং সংঘের স্বার্থের উন্নয়ন ঘটবে এমন আন্তর্জাতিক সংগঠনের সাতে নিবিড়ভাবে কাজ করে প্রবীনহিতৈষী সংঘ। প্রবীণহিতৈষী সংঘ International Federation of Ageing এর পূর্ণাঙ্গ সদস্য। International Association of Gerontology, Help Age International ও অনুরূপ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে সংঘের যোগাযোগ রয়েছে।

ছ. চিত্তবিনোদন: পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় প্রবীণরা অনেক সময় একাকীত্বে ভোগে এবং আনন্দহীন জীবনযাপন করেন। প্রবীণদের নির্মল আনন্দ দান ও একাকীত্ব, একঘেয়েমী দূর করবার জন্য সংঘের আয়োজনে প্রবীণদের জন্য বার্ষিক বনভোজন ছাড়াও মিলাদ মাহফিল, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, ধর্মীয় বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান যথাযথ ভাবগাম্ভীর্য ও উৎসাহ উদ্দীপনার মাধ্যমে পালন করা হয়। সকল জেলা শাখাতেও অনুরুপ কর্মসূচির ব্যবস্থা আছে। এছাড়া বিভিন্ন সময় আনন্দ মূলক আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

জ. পাঠাগার ও প্রকাশনা : প্রবীণহিতৈষী সংঘের প্রতিষ্ঠা কাল থেকে একটি পাঠাগার চালু আছে। এখানে ধর্মীয় বই, মনীষীদের জীবনী, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, কম্পিউটার বিজ্ঞান, বিখ্যাত লেখকের রচনাবলীসহ বিভিন্ন সাময়িকী ও দৈনিক পত্রিকা রয়েছে। প্রবীণহিতৈষী সংঘের নিজস্ব মুখপাত্র হলো, প্রবীন হিতৈষী সংঘের নিজস্ব মুখপাত্র হলো 'প্রবীণ হিতৈষী পত্রিকা', এ ষান্মাসিক পত্রিকায় প্রবীণদের অবস্থা, প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম, প্রবীন বিষয়ক আলোচনা, প্রবীণ বিষয়ক গবেষণা ইত্যাদি স্থান পায়।

সারসংক্ষেপ

প্রবীণরা যাতে শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নিয়ে চিন্তা-ভাবনাহীন শান্তিপূর্ণ, সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপন করতে পারেন এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই প্রবীণহিতৈষী সংঘের প্রতিষ্ঠা। প্রবীণদের কল্যাণে সংঘ বিভিন্ন কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো চিকিৎসাসেবা, বিনোদনমূলকসেবা, প্রশিক্ষণ, সচেতনতামূলক কর্মসূচি, প্রবীণ দিবস উদ্‌যাপন এবং প্রবীণ পুরস্কার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। প্রবীণহিতৈষী সংঘ প্রতিষ্ঠিত হয় কত সালে?

ক) ১৯৬০ সালে খ) ১৯৬৫ সালে
গ) ১৯৭৫ সাল ঘ) ১৯৮০ সালে

২। বিশ্বব্যাপী প্রবীণ দিবস পালিত হয় কত তারিখে?

ক) ০১লা নভেম্বর খ) ০১লা অক্টোবর
গ) ০১লা সেপ্টেম্বর ঘ) ০১লা ডিসেম্বর

৩। প্রবীণহিতৈষী সংঘ কোন দুটি পুরস্কার প্রদান করে থাকে?

ক) সাহসী ও সাহসিনী খ) কল্যাণ ও কল্যাণী
গ) মমতাময় ও মমতাময়ী ঘ) কন্যা ও জননী

পাঠ-৭.৭ বাংলাদেশ প্রবীণহিতৈষী সংঘের কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ (Application of Social Work Methods in the Bangladesh Association for the Aged Programme)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৭.৭.১ বাংলাদেশ প্রবীণহিতৈষী সংঘের কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

৭.৭.১ বাংলাদেশ প্রবীণহিতৈষী সংঘের কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

সামাজিক পরিবর্তন, নগরায়ণ, পাশ্চাত্যকরণ ও পারিবারিক মূল্যবোধ পরিবর্তনের কারণে প্রবীণরা আজ অনেকটা অবহেলিত, উপেক্ষিত, বিচ্ছিন্ন ও অসহায়। প্রবীণদের মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বিগত ছয় দশক ধরে প্রবীণহিতৈষী সংঘ অত্যন্ত কার্যকরভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। প্রবীণহিতৈষী সংঘের কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষণীয়। সমাজকর্মের মূল লক্ষ্য হচ্ছে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে এমনভাবে সহায়তা করা যাতে নিজেরা নিজেদের সমস্যা সমাধান এবং যথাযথভাবে সামাজিক ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রবীণহিতৈষী সংঘের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য হলো প্রবীণ ব্যক্তির সর্ব্বোচ্চ কল্যাণ নিশ্চিত করা।

প্রবীণহিতৈষী সংঘ প্রবীণদের কল্যাণে চিকিৎসা সেবা, মানসিক স্বাস্থ্য সেবা, বিনোদনের ব্যবস্থা ও অন্যান্য সেবাকর্ম কার্যক্রম পরিচালনা করছে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই এই সংঘ প্রবীণদের আত্মমর্যাদা, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ও উন্নয়নে সদা তৎপর। এক্ষেত্রে এই সংঘ অসুস্থ প্রবীণদের চিকিৎসা সেবার ব্যবস্থা করে, সক্ষম প্রবীণ ব্যক্তিদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে, এক্ষেত্রে ব্যক্তি সমাজকর্মের নীতি ও কৌশল প্রয়োগ লক্ষণীয়। প্রবীণহিতৈষী সংঘ প্রবীণদের কল্যাণের পাশাপাশি সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করে। যৌতুকপ্রথার বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা ও প্রবীণদের অধিকার নিয়ে বিভিন্ন রকমের সভা, সেমিনার ও অন্যান্য কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এসব সমাজ সচেতনতামূলক কর্মসূচিতে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ দেখা যায়।

প্রবীণদের চিত্তবিনোদনের জন্য দলভিত্তিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়ে থাকে। সংঘের পক্ষ থেকে ইনডোর গেমসের পাশাপাশি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তাছাড়া প্রতিষ্ঠানে রয়েছে উন্নত পরিবেশ। যা প্রবীণদের মানসিক স্বাস্থ্য ভালো রাখার পাশাপাশি উৎপাদনমুখী কাজে নিয়োজিত হওয়ার ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস জোগায়। এক্ষেত্রেও সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ রয়েছে।

স্বেচ্ছামূলক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন, গরিব অসহায় মানুষের বাসস্থান, চিকিৎসা ও পরিবেশ উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সমষ্টির অংশগ্রহণ ও ভূমিকা পালনে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি উপযোগী। প্রবীনদের ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা সম্প্রসারণে পাঠাগারে স্থাপন, যৌথ শিক্ষা কার্যক্রম, প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, প্রভৃতি ক্ষেত্রে সমষ্টি উন্নয়ন কার্যকর ভূমিকা পালন করছে।

সারসংক্ষেপ

প্রবীণহিতেষী সংঘ প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে প্রবীণদের কল্যাণে বিভিন্ন সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সংঘের বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন– চিকিৎসা সেবা, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, প্রবীণ নিবাস, চিত্তবিনোদ্ন, পাঠাগার স্থাপন ইত্যাদি কর্মসূচিতে সমাজকর্মের ব্যক্তি, দল এবং সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষণীয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে সমষ্টির অংশগ্রহণ ও ভূমিকা পালনে সমাজকর্মের কোন পদ্ধতি উপযোগী?

ক) সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি খ) ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতি
গ) দল সমাজকর্ম পদ্ধতি ঘ) সমাজকর্ম প্রশাসন

২। প্রবীণহিতৈষী সংঘের নিম্নের কোন কর্মসূচিতে ব্যক্তি সামজকর্মে পদ্ধতির প্রয়োগ দেখা যায়?

ক) সক্ষম প্রবীণদের কর্মসংস্থানে খ) আন্তর্জাতিক কল্যাণে
গ) প্রবীণ পুরস্কার কাযক্রমে ঘ) প্রকাশনা কার্যক্রমে

পাঠ-৭.৮ ইউসেপ বাংলাদেশ'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম (Objectives and Activities of UCEP, Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৭.৮.১ ইউসেপ বাংলাদেশ'র উদ্দেশ্যসমূহ লিখতে পারবেন।
৭.৮.১ ইউসেপ বাংলাদেশ'র কার্যক্রমসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

৭.৮.১ ইউসেপ বাংলাদেশ'র উদ্দেশ্য

বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে থাকা অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত শিশু-কিশোরদের মৌলিক শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে নিউজিল্যান্ডের মানবপ্রেমিক লিনডসে অ্যালন চেনি ১৯৭২ সালে প্রতিষ্ঠা করেন UCEP বা Under Privleged children's Educational Program। শিক্ষাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে অবহেলিত জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করছে ইউসেপ। ১৯৭০ সালে ঘূর্ণিঝড়ে দুর্দশাগ্রস্ত বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলীয় এলাকার মা ও শিশুদের স্বাস্থ্যসেবার জন্য নিউজিল্যান্ড থেকে লিন্ডসে অ্যালেন শেইন নামে একজন সেবাকর্মী ব্রিটিশ ত্রাণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে এদেশে আসেন। ত্রাণ কর্মতৎপরতার পাশাপাশি তিনি বঞ্চিত, গৃহহীন, দরিদ্র শিশুদের শিক্ষাদানের জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজে সমাজকল্যাণ অধিদপ্তরকে সহযোগিতা করেন। পরিকল্পনাটি তৈরি হলে তিনি তা বাস্তবায়নের জন্য অর্থ সংস্থানের সন্ধানে নেমে পড়েন। ডেনমার্ক সরকার তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে আর্থিক সহায়তাসহ একটি তিনবছর মেয়াদি প্রকল্প অনুমোদন করে। বাংলাদেশ সরকার ১৯৭২ সালে প্রকল্পের কার্যালয়ের জন্য বাড়ি বরাদ্দ দেয়। উল্লিখিত কর্মপরিকল্পনার ভিত্তিতে ইউসেপ নামের এনজিও প্রতিষ্ঠা করা হয়। সমাজকল্যাণ (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ, ১৯৬১-এর অধীনে ১৯৮৮ সালে ইউসেপ একটি জাতীয় এনজিও হিসেবে নিবন্ধিত হয়। ঝরে পড়া শিশুদের শিক্ষায় ফিরিয়ে নিয়ে আসা, প্রশিক্ষণ প্রদান, কারিগরী দক্ষতা অর্জন ও কাজের সুযোগ তৈরি করা এর অন্যতম কাজ। ইউসেপের অধীনে ৫৩ টি স্কুলে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষা উপকরণ ও শিক্ষা দেয়া হয় শিক্ষাবঞ্চিত শিশুদের মাত্র ৩.৫ বছরে। ইউসেপ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ইনষ্টিটিউটের আওতায় চার বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা করার সুযোগ আছে। বর্তমানে ইউসেপে ১২৭৭ জন চাকুরিজীবী (যাদের ৩২ শতাংশ নারী)। ইউসেপের বর্তমানে ৬৪ টি স্কুলের মধ্যে ১০ টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান,৪৪টা সাধারণ স্কুল। ইউসেপের এসকল প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশই নিজস্ব জমিতে অবস্থিত। সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইউসেপ বাংলাদেশ'র ভিশন হলো– সমাজে এমন একটা সুন্দর পরিবেশ ও পরিচালনা কাঠামো গড়ে তোলা যেখানে প্রত্যেক শিশু তাদের সম্ভাবনার বিকাশ এবং কোনোরকম বৈষম্য ছাড়া অনুকূল পরিবেশে নিজেদের তৈরি করতে পারবে।

চিত্র ৭.৮.১ : ইউসেপ

ইউসেপ বাংলাদেশ'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো:

ক. বাংলাদেশের শহরে এবং শহরের কাছকাছি এলাকায় কর্মরত সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা, সচেতনতা, এ্যাডভোকেসি এবং দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে জীবনমানের উন্নয়ন করা;
খ. দরিদ্র ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের কার্যকর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
গ. বর্ধিত সক্ষমতা এবং মর্যাদার মাধ্যমে মৌলিক প্রয়োজন পূরণের ব্যবস্থা করা;
ঘ. শহুরে দরিদ্রদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা;
ঙ. শহুরে দরিদ্রদের অধিকার আদায়ে সক্ষম করে তোলা;
চ. মানবসম্পদ উন্নয়নমূলক সংস্থাসমূহের নেতৃত্ব প্রদান করা; এবং
ছ. বাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা।

৭.৮.২ ইউসেপ বাংলাদেশ'র কার্যক্রম

ইউসেপ বাংলাদেশ অত্যন্ত দক্ষতার সাথে ১৯৭২ সাল থেকে সুবিধাবঞ্চিত, হতদরিদ্র, বস্তিবাসী, শ্রমজীবী ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ তথা উপার্জনের জন্য দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১৪ সালের বার্ষিক রিপোর্ট অনুযায়ী ইউসেপ বাংলাদেশ ১০ টি জেলায় তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে, যেখানে ৬৩ টি স্কুল রয়েছে (৫৩ টি সাধারণ, ১০ টি টেকনিক্যাল) এসব স্কুলে ৫৫,০০০ এর বেশি ছেলেমেয়েকে প্রতিবছর শিক্ষা লাভ করতে সহায়তা করা হয়। ইউসেপ বাংলাদেশ'র কার্যক্রমগুলো চারটি ভাগে নিচে সেগুলো আলোচনা করা হলো:

১। শিক্ষা কার্যক্রম: ইউসেপ এর সবচেয়ে বড় কার্যক্রম হলো শিক্ষা কার্যক্রম। অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষা কার্যক্রম দু'ভাবে পরিচালিত হয় যা নিম্নরুপ:

ক. সমন্বিত সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা: সমন্বিত সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষার কর্মসূচির আওতায় ইউসেপ বিনামূল্যে অবহেলিত শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে। ইউসেপের অধীনে পরিচালিত ৪৪ টি সাধারণ স্কুলে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে এই শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণ ইউসেপ স্কুলগুলো জাতীয় শিক্ষাদানের সিলেবাস অনুসরণ করে তবে তা দ্রুততম ও সহজ উপায়ে শিক্ষা দান করা হয়। ২০১৪ সালে এ কার্যক্রমের আওতায় ৪৩,৭১৮ জন সুবিধাবঞ্চিত শিশুর শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছে যার মধ্যে ৪৯ শতাংশ ছাত্রী। সমন্বিত সাধারণ ও কারিগরি কার্যক্রমের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো শিশু বাছাই প্রক্রিয়া মানসম্মত করা, একাডেমিক পরিকল্পনা, স্কুল মনিটরিং, সুন্দর ক্লাসরুম, সহশিক্ষা কার্যক্রম এবং শিক্ষদের দক্ষতা বৃদ্ধি। এ কর্মসূচির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নারী শিক্ষার জন্য সচেতনতা তৈরি করা। কন্যা সন্তানের মা-বাবা যেন তার সন্তানকে স্কুলে পাঠায় এ সংক্রান্ত সচেতনতা তৈরির ক্যাম্পেইন চলছে। এ কর্মসূচীর আওতায় ১০ হাজারের বেশী শিক্ষার্থী পঞ্চম শ্রেণিতে সমাপনী পরীক্ষায় অংশ নিয়ে ৯১.৮৮ শতাংশ কৃতকার্য হয়েছে। সাধারন স্কুলের ক্লাসগুলো প্রতিদিন ৩ শিফটে পরিচালিত হয় এবং প্রতিটি শিফটের জন্য ৩ ঘণ্টা সময় বরাদ্দ থাকে। শিফট এ ক্লাস পরিচালনার মূল উদ্দেশ্য হলো যতবেশী শ্রমজীবী শিশুদের সম্পৃক্ত করা যায়।

খ. কারিগরি শিক্ষা: ইউসেপ বাংলাদেশ অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের জন্য স্বল্পমেয়াদি কারিগরি প্রশিক্ষণ আনুষ্ঠানিক এবং ডিপ্লোমা কারিগরি শিক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে। স্বল্পমেয়াদি কারিগরী শিক্ষার আওতায় ইউসেপ ৩-১২ মাসের কোর্স পরিচালনা করে থাকে। আনুষ্ঠানিক কারিগরি শিক্ষা দেয়া হয় এস.এস.সি. পর্যন্ত। শুরু হয় ৮ম শ্রেণিতে শেষ হয় এস.এস.সিতে। এছাড়াও ইউসেপ ০৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা কোর্সের মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করে। ইউসেপের কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য ৩ টি টেকনিক্যাল স্কুল রয়েছে ঢাকা, খুলনা এবং চট্টগ্রামে। মোট ২৯ টি ট্রেড এ শিক্ষা দেয়া হয়। যারা এসব ট্রেড এ ভালো করে তাদের এস.এস.সি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা হয়। অটোমেকানিক, ওয়েল্ডিং এ্যান্ড ফেব্রিকেশন, ইলেকট্রনিক্স, টেক্সটাইল, গার্মেন্টস, কোয়ালিটি কন্ট্রোল ইত্যাদি ট্রেডগুলোর মধ্যে অন্যতম। এখন পর্যন্ত ৮ হাজার ছাত্র (এর মধ্যে ৬২৪ জন্য কারিগরি বিভাগ থেকে এস.এস.সি পাশ করেছে) কারিগরি শিক্ষা গ্রহণ করেছে যেখানে ছেলে মেয়ের অনুপাত হলো ৬২:৩৮। গবেষণায় দেখা গেছে ইউসেপ থেকে কারিগরি শিক্ষা গ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীর ৩৮ শতাংশের বেশি অর্থনৈতিক উর্পাজনে নিয়োজিত।

২. দক্ষতা প্রশিক্ষণ: টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের আওতায় বিভিন্ন মেয়াদে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। বর্তমানে ৩০ টি ট্রেডভিত্তিক এসব প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। এসব প্রশিক্ষণের মধ্যে অনেকগুলোতে সিবিটিএ (কম্পিটেন্সি বেইস ট্রেইনিং এ্যাসেসমেন্ট)। অর্থাৎ যোগ্যতাভিত্তিক প্রশিক্ষণ ও মূল্যায়ন পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। ২০১৫ সালের এস.এস.সি. ভোকেশনাল বিভাগে শীর্ষ পাঁচ প্রতিষ্ঠানের মধ্যে জায়গা করে নেয় ইউসেপ পরিচালিত প্রশিক্ষণ ভিত্তিক এ কর্মসূচি। ২০১৪ সালে ইউসেপ টেকনিক্যাল স্কুল সরকারি এ্যাক্রিডেটেশন পায়।

৩. এ্যাডভোকেসি: ২০০৭ সাল থেকে ইউসেপ বাংলাদেশ নারী ও শিশু অধিকার এ্যাডভোকেসি নামে কর্মসূচি চালু করে। এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্যে হলো নারী ও শিশু অধিকার সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা। ইউসেপ বাংলাদেশ অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থার সহয়তায় এ কর্মসূচি পরিচালনা করে। ২০১৫ সালে এ কর্মসূচির লক্ষ্যগুলো ছিলো:

ক. মেয়েদের শিক্ষায় ফিরিয়ে নিয়ে আসার কার্যক্রমকে আরো বেশি গতিশীল করা;

খ. অন্যান্য স্কুলের সাথে পার্টনারসিপ গড়ে তোলা যাতে অধিকসংখ্যক শিশু বিশেষ করে মেয়েশিশু টেকনিক্যাল স্কুল গুলোতে আসে; এবং

গ. শিশুশিক্ষা নিশ্চিতকরণে পরিবার, কমিউনিটি, কর্মজীবী এবং অন্যান্য সংস্থার আর্থিক/কারিগরি/কৌশলগত সমর্থন ও সহযোগিতা বৃদ্ধি।

৪. কর্মসংস্থান সহায়তা সেবা: ইউসেপ বাংলাদেশ’র অন্যতম উদ্দেশ্য হলো যেসব সুবিধাবঞ্চিত ছেলে মেয়ে ইউসেপ পরিচালিত স্কুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে তাদের কর্মসংস্থানের জন্য সহায়তা করা শুধুমাত্র চাকুরি খোঁজার ক্ষেত্রে নয়, কীভাবে আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টি করা যায় সে ব্যাপারে ইউসেপ সদা তৎপর। ২০১৪ সালে ৬ হাজার ইউসেপ গ্রাজুয়েট বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরি পেয়েছে। ইউসেপ থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের চাকুরি পাওয়ার হার ৯০.৮ শতাংশ যাদের ৯৯ শতাংশ চাকুরি শুরু করে ৬,০০০/- টাকা মাসিক বেতনে।

সারসংক্ষেপ

অবহেলিত ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থার মাধ্যমে তাদের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে ইউসেপ স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকে কাজ করে যাচ্ছে। সমন্বিত সাধারণ শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা, কার্যকরী দক্ষতা প্রশিক্ষণ, নারী ও শিশু অধিকার অ্যাডভোকেসি এবং কর্মসংস্থান সহায়তা সেবা ইউসেপ এর মৌলিক কার্যাবলী। এসব কার্যক্রমের মাধ্যমে ইউসেপ একটি বৈষম্যহীন শিশু ও তরুণদের অনুকূল পৃথিবী তৈরি করতে চায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। ইউসেপ বাংলাদেশ’র মূল লক্ষ্য দল কারা?

ক) দরিদ্র জনগোষ্ঠী খ) কৃষক শ্রেণি
গ) সুবিধাবঞ্চিত শিশু ঘ) সুবিধা বঞ্চিত ব্যবসায়ী

২। ইউসেপের ৫৩ টি সাধারণ স্কুলে কোন শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়?

ক) ৪র্থ খ) ৫ম
গ) ৮ম ঘ) ১০ম

পাঠ-৭.৯ ইউসেপ বাংলাদেশ'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ (Application of Social Work Methods in UCEP Programme)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৭.৯.১ ইউসেপ বাংলাদেশ'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

৭.৯.১ ইউসেপ বাংলাদেশ'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

জীবনমুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ইউসেপ বাংলাদেশ সুবিধাবঞ্চিত ও অবহেলিত শিশুদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। সাধারণ শিক্ষা ও টেকনিক্যাল শিক্ষার মাধ্যমে ইউসেপ বাংলাদেশ সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের উন্নয়নে যেসব কর্মকান্ড পরিচালনা করছে সেসব কর্মকান্ডে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষণীয়। ইউসেপ বাংলাদেশ দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও অবহেলিত শিশুর জন্য শিক্ষাকার্যক্রম গ্রহণ করে থাকে। ইউসেপ এর অধীনে পরিচালিত ৫৩ টি সাধারণ ও ১০টি টেকনিক্যাল স্কুলে এসব শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। ইউসেপ এর স্কুলগুলোতে অনেক ছাত্রছাত্রী রয়েছে যারা কর্মজীবী এবং একই সাথে অসেচতন দরিদ্র পরবারের সন্তান। যার ফলে স্কুল কার্যক্রমে সংযুক্ত হতে তাদের মধ্যে যেমন অনীহা থাকে তেমনি স্কুল থেকে ঝরে পড়ার হারও বেশি। এক্ষেত্রে ইউসেপ বাংলাদেশ এর শিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে কাউন্সেলিং করানো হয়। শিক্ষার্থীদের অভিভাবকের সাথে কথা বলা হয়। শিক্ষার্থীর প্রয়োজন জানার চেষ্টা করা হয়। এসকল কর্মকাণ্ড ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির বৈশিষ্ট্যকে প্রতিনিধিত্ব করে। তাই বলা যায় ইউসেপ বাংলাদেশ'র কার্যক্রমে ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রয়োগ দৃশ্যমান।

ইউসেপ বাংলাদেশ নারী ও শিশু অধিকার রক্ষায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। আমাদের দেশের নারীরা নানাভাবে বঞ্চনার শিকার। শিশুরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বিশেষত মেয়েশিশুরা দারুণভাবে বঞ্চিত। বাল্যবিবাহ ও নিরাপত্তার অভাবে অনেক সময় মেয়ে শিশুদের শিক্ষাজীবন ব্যাহত হয়। ইউসেপ বাংলাদেশ নারী ও শিশু অধিকার রক্ষা ও কন্যাশিশুর শিক্ষা নিশ্চিত করতে কমিউনিটির অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করে। সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দলীয় চেতনা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে দলবদ্ধ হয়ে এ্যাডভকেসি করা হয়। এসব কর্মকান্ডে দল সমাজকর্মের তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়।

শুধুমাত্র ব্যক্তি সমাজকর্ম ও দল সমাজকর্মের প্রয়োগ নয় বরং সমষ্টি উন্নয়ন ও সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতির প্রয়োগও লক্ষণীয়। ইউসেপ বাংলাদেশ শ্রমজীবী ও অবহেলিত শিশুদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পাশাপাশি তাদের কর্মস্থানে সহায়তা করে থাকে। এক্ষেত্রে তারা সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি প্রয়োগ করে বলে প্রতীয়মান হয়। ইউসেপ বাংলাদেশ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে শিশুশিক্ষা ও অধিকার রক্ষায় তৎপর। ইউসেপ বাংলাদেশ বিভিন্ন পেশাদারি ও নানা শ্রেণির মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি, কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং দীর্ঘমেয়াদি কৌশলপত্র প্রণয়ন করে। এসব থেকে স্পষ্ট যে ইউসেপ বাংলাদেশ'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষ্যণীয়।

সারসংক্ষেপ

ইউসেপ বাংলাদেশ একটি বেসরকারি সমাজউন্নয়ন সংস্থা হিসেবে বাংলাদেশের অবহেলিত, বঞ্চিত ও শ্রমজীবী শিশুদের জন্য যেসব কর্মকান্ড গ্রহণ করে থাকে তাতে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। স্কুলগুলোতে কাউন্সেলিং সেবা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড, সামাজিক সচেতনতা তৈরি, সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে ইউসেপ, বাংলাদেশ মূলত সমাজকর্মের বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। ঝরে পড়া ও অনিয়মিত শিশুদের জন্য কাউন্সেলিং প্রদানের সমাজকর্মের কোন পদ্ধতির সাথে সাদৃশ্য রয়েছে?

ক) ব্যক্তি সমাজকর্ম খ) দল সমাজকর্ম
গ) সমষ্টি সংগঠন ঘ) সমাজ উন্নয়ন

২। স্কুলগুলোতে সামাজিক সংস্কৃতিক কর্মকান্ডের উদ্দেশ্য কোনটি?

ক) রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত করা খ) দলীয় চেতনা জাগ্রত করা
গ) ব্যক্তিগত চেতনা জাগ্রত করা ঘ) প্রাতিষ্ঠানিক চেতনা জাগ্রত করা।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। উপনিবেশিক আমলে স্বেচ্ছাসেবী কর্মকান্ডের মূলে ছিলো–

i) জমিদার পরিবারের সদস্য
ii) তরুণ জনগোষ্ঠী
iii) অভিজাত পরিবারের সদস্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। ব্র্যাক'র লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠী কারা?

i. গ্রামীণ দরিদ্র
ii. দুস্থ ও অসহায় জনগোষ্ঠী
iii. প্রান্তিক জনগোষ্ঠী

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

টিপু নীলক্ষেতের একটি তেহারীর দোকানে কাজ করে। কাজের পাশাপাশি টিপু অবহেলিত শিশুদের বিনামূল্যে পড়াশোনা করায় এমন একটি স্কুলেও নিয়মিত যায়। টিপুর খুব সখ সে বড় হয়ে ইঞ্জিনিয়ার হবে। এজন্য সে ভালো করে মাধ্যমিক পাশ করে ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি হতে চায়। শিক্ষকরা তাকে আশ্বাস দিয়েছে যে ভালো করে পড়লে তাকে টেকনিক্যাল স্কুলে ডিপ্লোমা পড়ার সুযোগ দেওয়া হবে।

৩) উদ্দীপকটিতে কোন প্রতিষ্ঠানকে ইঙ্গিত করা হয়েছে?

ক) ইউসেপ খ) ব্র্যাক
গ) গ্রামীণ ব্যাংক ঘ) প্রশিকা

৪) উদ্দীপকে উল্লেখিত উক্ত প্রতিষ্ঠানের টেকনিক্যাল স্কুলে ট্রেড এর সংখ্যা কয়টি?

ক) ১৬ টি খ) ১৮ টি
গ) ২৭ টি ঘ) ২৯ টি

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১। জনাব আব্দুল মজিদের দুই ছেলে। পড়াশোনা শেষ করে দুই ছেলেই বিদেশে পাড়ি জমিয়েছেন। এদিকে মি. মজিদ সরকারি চাকরি থেকে অবসর গ্রহণের পর নিজ দেশেই থাকবেন মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বৃদ্ধ বয়সে মজিদ দম্পত্তির সেবাযত্ন ও দেখাশোনার কেউ না থাকায় তারা একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যা ১৯৬০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ক. UCEP এর পূর্ণরূপ কী?

খ. গ্রামীণ ব্যাংক বলতে কী বুঝায়?

গ. উদ্দীপকের ইঙ্গিত করা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানটির লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসমূহ কী তা আলোচনা করুন।

ঘ. প্রবীণদের সমস্যা সমাধানে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে– বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১ : ১। ঘ ২। ক ৩। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.২ : ১। খ ২। গ ৩। ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৩ : ১। ক ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৪ : ১। ক ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৫ : ১। ক ২। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৬ : ১। ক ২। খ ৩। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৭ : ১। ক ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৮ : ১। গ ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৯ : ১। ক ২। খ

চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ৭ : ১। ঘ ২। ঘ ৩। ক ৪। ঘ

বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক সংস্থার সমাজউন্নয়ন কার্যক্রম

(Social Development Activities of International Organization in Bangladesh)

ইউনিট ৮

ভূমিকা

বিশ্বব্যাপী অসহায়, দুর্দশাগ্রস্ত, বঞ্চিত, অবহেলিত, যুদ্ধবিধ্বস্ত মানুষের উন্নয়ন ও অগ্রগতিতে আন্তর্জাতিক সংস্থার সহযোগিতা অনস্বীকার্য। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম, শিশুঅধিকার রক্ষা, মানবাধিকার রক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন, ক্ষমতা কাঠামো নির্ধারণ, প্রবৃদ্ধি আনয়ন, সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করাসহ নানা বিষয়ে বিশ্বব্যাপী কাজ করে থাকে আন্তর্জাতিক সমাজ উন্নয়ন সংস্থা। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সমাজ উন্নয়ন সংস্থার ভূমিকা অসীম। ১৯৭০ সালের প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় পরবর্তী ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে এ অঞ্চলে অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা তাদের কার্যক্রম শুরু করে। পরবর্তীতে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী যে ধ্বংসযোগ্য চালায়, সম্পদের ক্ষতিসাধন করে তা থেকে উত্তরণে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা এগিয়ে আসে। যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনা এবং যুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের মানুষের পুনর্বাসন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে অনেক আন্তর্জাতিক সংস্থা বিভিন্নরকম কার্যক্রম পরিচালনা করে। বাংলাদেশের সমাজ উন্নয়নে এসব আন্তর্জাতিক সংস্থার অবদান অপরিসীম।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৮.১: আন্তর্জাতিক সংস্থার ধারণা
পাঠ-৮.২: সেভ দ্য চিলড্রেন'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম
পাঠ-৮.৩: সেভ দ্য চিলড্রেন'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ
পাঠ-৮.৪: ওয়াল্ড ভিশন'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম
পাঠ-৮.৫: ওয়াল্ড ভিশনে'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ
পাঠ-৮.৬: রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম
পাঠ-৮.৭: রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ
পাঠ-৮.৮: ইউনিসেফ'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম
পাঠ-৮.৯: ইউনিসেফ'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ
পাঠ-৮.১০: ইউএনডিপি'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম
পাঠ-৮.১১: ইউএনডিপি'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

পাঠ-৮.১ আন্তর্জাতিক সংস্থার ধারণা (Concept of International Organization)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৮.১.১ আন্তর্জাতিক সংস্থার সংজ্ঞা লিখতে পারবেন।
৮.১.২ বাংলাদেশের সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক সংস্থার বিবর্তন ও কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারবেন।

৮.২.১ আন্তর্জাতিক সংস্থার সংজ্ঞা

আন্তর্জাতিক সংস্থা বলতে সাধারণত এমন সংস্থাকে বোঝানো হয় যা দুইয়ের অধিক দেশে জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে কাজ করে, বিশ্বব্যাপী কাজের উপস্থিতি থাকে এবং কাজ করার পরিধি বিস্তৃত থাকে। আন্তর্জাতিক সংস্থা সাধারণত বৈশ্বিক ম্যান্ডেট নিয়ে গঠিত হয়।
যুদ্ধবিধ্বস্ত, দারিদ্র্য কবলিত, প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ও পুনবার্সন কার্যক্রম জোরদার; শিক্ষা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং দরিদ্র ও বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে আন্তর্জাতিক সংস্থা বিশ্বব্যাপী কাজ করে। সমাজ উন্নয়নমূলক কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক সংস্থার অবদান বিশ্বব্যাপী। বিশেষকরে প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিভিন্ন স্বল্পোন্নত দরিদ্র রাষ্ট্রগুলোতে সমাজ উন্নয়নমূলক কাজে আন্তর্জাতিক সংস্থার অবদান অনস্বীকার্য। অধ্যাপক কুইন্সি রাইট (Quincy wright) এর মতে, কতগুলো সাধারণ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়ন করার জন্য বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত আন্তর্জাতিক এবং আঞ্চলিক সমাজের গঠন ও পরিচালনা ব্যবস্থাই হলো আন্তর্জাতিক সংস্থা। বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগ, মহামারি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিপর্যয় প্রভৃতি থেকে মুক্ত করে শান্তিপূর্ণ ও ভারসাম্য সমাজ প্রতিষ্ঠা করাই আন্তর্জাতিক সংস্থার মূল লক্ষ্য। আন্তজার্তিক সংস্থাকে সাধারণত দু ভাগে ভাগ করা যায়। **প্রথমত:** আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা যেগুলো আন্তর্জাতিক পরিসরে অলাভজনকভাবে পরিচালিত হয় যেমন– স্কাউট মুভমেন্ট, ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অফ রেড ক্রস ইত্যাদি। **দ্বিতীয়ত:** আন্তঃসরকার সংস্থা (Intergovermental organization) যেগুলোকে অনেক সময় আন্তর্জাতিক সরকারি সংস্থা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। এসব সংস্থা মূলত বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত হয়। যেমন– বিশ্ববাণিজ্য সংস্থা, জাতিসংঘ, বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ইত্যাদি।

৮.১.২ বাংলাদেশের সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক সংস্থার বিবর্তন ও কার্যক্রম

বাংলাদেশের সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক সংস্থার কার্যক্রম বেশ পুরানো। ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্রের স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা পূর্ব পাকিস্তান অংশে কাজ করে আসছিলো। বাংলাদেশে তথা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে সংগঠিত উপরে সমাজ কল্যাণমূলক কর্মকান্ডের সূত্রপাত ঘটেছিলো আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে। ১৯৫২ সালের নভেম্বর মাসে জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ দল ঢাকায় আগমন করে বিভিন্ন অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ ও জরিপ পরিচালনা করে। এরই প্রেক্ষিতে জাতিসংঘের সহায়তায় ১৯৫৪ সালে প্রথম ঢাকা প্রজেক্ট নামে পরীক্ষামূলক প্রজেক্ট চালু হয়। ১৯৫৫ সালে ঢাকার কায়েতটুলীতে শহর সমষ্টি উন্নয়ন প্রকল্প চালু করা হয়। ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তান হানাদার বাহিনী বাংলাদেশে যে ধ্বংসযজ্ঞ চালায় তা ছিলো বর্বরোচিত। বাংলাদেশ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত রাষ্ট্রের পুনবার্সন ও উন্নয়নে অনেক আন্তার্জাতিক সংস্থা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্যপদ লাভ করে। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের আন্তর্জাতিক সংস্থা বাংলাদেশে কাজ করছে যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– WHO, UNICEF, World Vision, Red Cross, Save the Children ইত্যাদি।

সারসংক্ষেপ

সাধারণত বিশ্বমানবের কল্যাণে স্বাধীন রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত কোনো সংস্থাকে আন্তর্জাতিক সংস্থা বলা হয়। এসব সংস্থা বিশ্বব্যাপী দরিদ্র, অবহেলিত, বঞ্চিত ও দুর্যোগকলিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে কাজ করে থাকে। বাংলাদেশের সমাজ উন্নয়নেও আন্তর্জাতিক সংস্থা কার্যকরভাবে অবদান রেখে চলেছে। WHO, UNICEF, World Vision, Red Cross, Save the Children সহ বিভিন্ন সংস্থা স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই বাংলাদেশের মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। কিভাবে আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠিত হয়?

(ক) দুই সংস্থার সমন্বয়ে
(খ) স্বাধীন রাষ্ট্রের সমন্বয়ে
(গ) দুই ব্যক্তির সমন্বয়ে
(ঘ) একক ভাবে

২। কত সালে ঢাকা প্রজেক্ট চালু হয়?

(ক) ১৯৫২ সালে
(খ) ১৯৫৪ সালে
(গ) ১৯৫৫ সালে
(ঘ) ১৯৫৭ সালে

পাঠ-৮.২ সেভ দ্য চিলড্রেন'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম (Objectives and Programmes of Save the Children)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৮.২.১ সেভ দ্য চিলড্রেন'র উদ্দেশ্যসমূহ লিখতে পারবেন।
৮.২.২ সেভ দ্য চিলড্রেন'র এর কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারবেন।

৮.২.১ সেভ দ্য চিলড্রেন'র উদ্দেশ্য

একটি সুস্থ, নিরাপদ, পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে শিশুদের বেড়ে ওঠা, সকল প্রকার দুর্যোগ থেকে শিশুদের রক্ষা করা এবং শিশুর সার্বিক উন্নয়নে বিনিয়োগ করার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৯১৯ সাল থেকে সেভ দ্য চিলড্রেন কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে ১২০টির দেশে এর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। যুক্তরাজ্যে ১৯১৯ সালে সমাজসেবী ইগলেনটাইন জেব এবং তাঁর বোন সেভ দ্য চিলড্রেন প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব এবং রাশিয়া বিপ্লবের পর ইউরোপে অর্থনৈতিক মন্দাভাব চলছিল। বিশ্বব্যাপী সেভ দ্যা চিলড্রেন আন্দোলনের অংশ হিসেবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সেভ দ্যা চিলড্রেন সংস্থা গড়ে উঠে। বর্তমানে সেভ দ্যা চিলড্রেন এলায়েন্স বা জোট হিসেবে শিশুকল্যাণে নিয়োজিত। বিশ্বব্যাপী সেভ দ্যা চিলড্রেন এলায়েন্স এর সদস্য প্রায় ৩০টি। বংলাদেশে এ সংস্থার মূল রুপকল্প হচ্ছে প্রত্যেক শিশু যাতে সম্মানিত নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠার ক্ষেত্রে তাদের সম্ভাবনার পূর্ণ বিকাশ এবং অধিকারের ব্যাপারে সচেষ্ট হয় তা নিশ্চিত করা। এ রুপকল্পকে সামনে রেখে সেভ দ্য চিলড্রেন নিম্নোক্ত উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে কাজ করছে–

চিত্র ৮.২.১ : সেভ দ্য চিলড্রেন

ক. শিশুদের জন্য সর্বোচ্চ ইমপ্যাক্ট নিশ্চিত করনে প্রত্যেক সম্পদের কার্যকর ব্যবহার নিশ্চিত করা
খ. শিশুদের জন্য সুস্থ ও নিরাপদ পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশ তৈরি করা;
গ. আপৎকালীন সময়সহ অন্যান্য সময়েও উদ্ভাবনী জ্ঞান, এ্যাডভোকেসি এবং গুনগত কর্মসূচির মাধ্যমে অন্যান্য শিশু অধিকার রক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে কাজ করা এবং নেতৃত্ব দেয়া; এবং
ঘ. শিশুরা যাতে তাদের অধিকার সচেতন হয় এবং সম্ভাবনাময় নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারে তা নিশ্চিত করা।

৮.২.২ সেভ দ্য চিলড্রেন'র এর কার্যক্রম

শিশুদের উন্নয়ন ও বিকাশে সহযোগিতার লক্ষ্য সামনে রেখেই ১৯৭০ সাল থেকে বাংলাদেশে সেভ দ্য চিলড্রেন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। সাধারণত ছয়টি বিষয়ে তারা কার্যক্রম পরিচালনা করে। যথা: শিশু সুরক্ষা, শিশু দরিদ্রতা, স্বাস্থ্য,পুষ্টি এবং এইচআইভি/এইডস, শিক্ষা এবং শিশু অধিকার গর্ভনেন্স, এবং মানবতাবাদী কর্মকান্ড। প্রত্যেক বছর সেভ দ্যা চিলড্রেন ১৫ মিলিয়নের বেশি জনগণকে সেবা দিয়ে থাকে। ১০০ টি পার্টনার প্রতিষ্ঠানের সাথে সংযুক্ত হয়ে ৮০০ এর বেশি কাজ নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করছে সেভ দ্য চিলড্রেন। অক্টোবর ২০১১ সালে বাংলাদেশে কর্মরত সেভ দ্যা চিলড্রেন প্রতিষ্ঠানসমূহ একসাথে হয়ে সেভ দ্যা চিলড্রেন ইন্টারন্যাশন্যাল নামে কাজ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেভ দ্যা চিলড্রেন এর উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহ হলো:

ক. শিশু দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচি: বাংলাদেশের অনেক শিশুই দারিদ্র্যের কারণে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাদের বিকাশ ও বৃদ্ধি দারুনভাবে ব্যাহত হচ্ছে। দারিদ্রপীড়িত পরিবারের শিশুর শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য সেভ দ্য চিলড্রেন তিনটি কৌশল ব্যবহার করে থাকে। প্রথমত: চাইল্ড সেনসেটিভ লাইভলিহুডস কৌশল যেখানে কমিউনিটি ভিত্তিক স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কর্মসূচি চালু আছে। এক্ষেত্রে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এ প্রতিষ্ঠান অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে শক্তিশালীভাবে অংশীদারিত্ব তৈরি করে। দ্বিতীয়ত: শক্তিশালী চাইল্ড সেনসেটিভ সোশ্যাল প্রোটেকশন। এ কৌশলের মাধ্যমে সেভ দ্যা চিলড্রেন বাংলাদেশ সরকার এর অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে শক্ত অংশীদারিত্ব তৈরি করে কমিউনিটি ভিত্তিক জীবিকা নির্বাহের উপায়গুলোতে শিশু আছে এমন দারিদ্রপীড়িত পরিবারকে প্রাধান্য দেয়া হয়। ভিজিডি, ভিজিএফ

এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোতে মেয়েশিশুদের বৃত্তি এই কৌশলের অংশ। তত্বীয়তঃ কিশোরদের উন্নয়নে শিক্ষা ও কারিগরি প্রশিক্ষণ দেয়া যার নাম এ্যাডোলেসেন্ট স্কিল ফর সাকসেসফুল ট্রানজিশন। যেসব কিশোর-কিশোরী অথবা শিশু বিভিন্ন ক্ষেত্রে যেমন– কৃষি, ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম, গৃহকর্মী ইত্যাদি কর্মে নিয়োজিত তাদের ত্রিমুখী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। যাতে করে নিজেরা স্বাবলম্বী হতে পারে।

খ. চাইল্ড প্রোটেকশন কর্মসূচি: এ কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো শিশুদের সকল প্রকার নির্যাতন, হয়রানি ও অপব্যবহার থেকে রক্ষা করা। বাংলাদেশে শিশুরা নানা ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়। শিশুরা বাল্যবিবাহ, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ, যৌন নির্যাতন, অপহরণ ও পাচারের শিকার হচ্ছে। এসব নির্যাতন, হয়রানি ও অপব্যবহার থেকে শিশুদের রক্ষার জন্য সেভ দ্য চিলড্রেন অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে একত্রিত হয়ে অভিভাবকদের প্রশিক্ষণ দেয়, আইনী সহায়তা দেয়, পাচারের শিকার হলে যথাযথ ব্যবস্থার গ্রহণের মাধ্যমে ফিরিয়ে আনতে সহযোগিতা করে।

গ. শিক্ষামূলক কর্মসূচি: শিক্ষা শিশুর মৌলিক অধিকার। সেভ দ্য চিলড্রেন সকল শিশু যাতে মানসম্মত শিক্ষা লাভ করতে পারে সেজন্য কাজ করে যাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার সাথে সেভ দ্য চিলড্রেন অত্যন্ত নিবিড়ভাবে কাজ করে চলছে। দরিদ্র শিশুদের বৃত্তি প্রদান, লেখাপড়ার সামগ্রী প্রদান দুপুরে খাবারের ব্যবস্থা করা, মানসম্মত শিক্ষক নিয়োগ ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করে সেভ দ্য চিলড্রেন শিশুদের মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে কাজ করছে।

ঘ. স্বাস্থ্য, পুষ্টি এবং এইচআইভি/এইডস: নবজাতক, শিশু, কিশোর, তরুণ এবং মাদের স্বাস্থ্যগত ঝুঁকি চিহ্নিত করে তা দূরীকরণে কাজ করে সেভ দ্য চিলড্রেন। এক্ষেত্রে সংস্থাটি বাংলাদেশ সরকারকে মা ও শিশুস্বাস্থ্য পরিচর্যার সাথে সংশ্লিষ্টদের প্রশিক্ষণ দিতে সহায়তা করে। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও অধিদফতরে নিয়োজিত কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেয়। যেসব এলাকায় স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছানো দুরূহ সেসব এলাকায় সেভ দ্য চিলড্রেন আপৎকালীন সাময়িক স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার জন্য ভাসমান ক্লিনিকের ব্যবস্থা করে। যেমন– হাওড় অঞ্চল। এছাড়াও কমিউনিটি ভিত্তিক যেসব স্বাস্থ্যসেবক আছে তাদের প্রশিক্ষণ দেয় এবং নবজাতক শিশুর লালনপালন ও গর্ভবর্তী মায়ের সেবা নিয়ে প্রশিক্ষন দেওয়া হয়।

ঙ. মানবিক কর্মকান্ড: বাংলাদেশ একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ। সেভ দ্যা চিলড্রেন দুর্যোগকবলিত এলাকায় মানুষ ও প্রাণীর জীবনহানি হ্রাস, রোগের প্রাদুর্ভাব বন্ধ করা এবং দুর্যোগের ব্যাপারে সচেতন করার ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে। এজন্য দুর্যোগ কবিলত এলাকা ও উপকূল এলাকায় ক্যাপাসিটি ফিল্ডিং ও আশ্রয়স্থল নির্মাণে কাজ করে সেভ দ্যা চিলড্রেন। ত্রাণ ও পুনর্বাসনের পাশাপাশি দুর্যোগকবিলত এলাকায় শিশুস্বাস্থ্য রক্ষায় সেভ দ্য চিলড্রেন নানাভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করে।

চ. পলিসি রাইটস গভর্নেন্স: সেভ দ্য চিলড্রেন বাংলাদেশের নাগরিকসমাজ, সংসদ-সদস্য, তরুণসমাজ এবং জাতীয় প্রতিষ্ঠান (যেমন– জাতীয় মানবাধিকার কমিশন) এর সাথে শিশুদের অপব্যবহার বন্ধ। শিশুশ্রম দূরীভূত করার ক্ষেত্রে সেভ দ্যা চিলড্রেন তরুণ সমাবেশ, কিশোর কিশোরীদের সমাবেশ, বির্তকের আয়োজন ও আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে।

সারসংক্ষেপ

শিশুদের উন্নয়নে বিনিয়োগ ভবিষ্যত বিনির্মাণের শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ। তাই শিশুর বিকাশ ও উন্নয়নে সুস্থ ও নিরাপদ পরিবেশ গড়ে তোলা, শিশুর অধিকার রক্ষা ও সম্ভাবনাময় নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যেই সেভ দ্য চিলড্রেন কাজ করে যাচ্ছে। উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে এ সংস্থা স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিক্ষা, এ্যাডভোকেসি, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, চাইল্ড প্রোটেকশনসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। ভবিষ্যত বিনির্মাণের শ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ হলো–
(ক) রাস্তা-ঘাট নির্মাণে বিনিয়োগ (খ) শিশুদের উন্নয়নে বিনিয়োগ
(গ) কল কারখানায় বিনিয়োগ (ঘ) ব্যবসায় বিনিয়োগ

২। সেভ দ্য চিলড্রেন বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করে কত সালে?
(ক) ১৯৭২ সালে (খ) ১৯৭৩ সালে
(গ) ১৯৭১ সালে (ঘ) ১৯৭৪ সালে

পাঠ-৮.৩ সেভ দ্য চিলড্রেন'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ (Application of Social Work Methods in the Programmes of Save the Children)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৮.৩.১ সেভ দ্য চিলড্রেন'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

৮.৩.১ সেভ দ্য চিলড্রেন'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

বিশ্বব্যাপী শিশুদের জন্য সুস্থ, নিরাপদ, সামাজিক ও পারিবারিক পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে শিশুদের বিকাশ ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এবং নারীদের ক্ষমতায়নে কাজ করে যাচ্ছে সেভ দ্য চিলড্রেন। সংস্থাটি তার অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে ১২০ টি দেশে নিরলসভাবে বিভিন্ন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে বিশ্বের। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, এ্যাডভোকেসিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে সেভ দ্য চিলড্রেন। এসব কার্যক্রমের ধরন, পরিধি, বিস্তৃতি ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করলে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ। সমাজকর্মের মৌলিক পদ্ধতি যথা ব্যক্তি সমাজকর্ম, দল সমাজকর্ম ও সমষ্টি উন্নয়ন এবং সমষ্টি সংগঠনের তাৎপর্যপূর্ণ প্রয়োগ লক্ষণীয়।

দরিদ্র শিশুদের যথাযথ আত্মিক, মানসিক এবং শারীরিক উন্নয়নের জন্য সেভ দ্য চিলড্রেন, 'শিশু দারিদ্র্য' নামক কর্মসূচি পরিচালনা করে, যার মূল উদ্দেশ্য হলো দরিদ্রপীড়িত শিশুদের উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং শিশুঅধিকার রক্ষা করা। এ কর্মসূচির আওতায় সংস্থাটি কমিউনিটি ভিত্তিক প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা করে। কমিউনিটি ভিত্তিক সচেতন দল তৈরি করে, দলকে প্রশিক্ষণ দেয়, কর্মসংস্থানের উপকরণ সরবরাহ করে শিশুদের প্রতি ইতিবাচক মনোভাব তৈরিতে জীবনমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করে। এসব কার্যক্রমে সমষ্টি উন্নয়ন এবং দল সমাজকর্ম প্রয়োগ লক্ষণীয়। শিশুদের সকল প্রকার নির্যাতন, অপব্যবহার, হয়রানি, ঝুঁকিপূর্ণ কাজ থেকে রক্ষার জন্য সেভ দ্য চিলড্রেন কাজ করে। নির্যাতিত শিশুদের পাশে দাঁড়িয়ে আইনগত সহায়তার পাশাপাশি আশ্রয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা এবং কাউন্সেলিং সেবা দিয়ে থাকে । বিশেষত অপহরণ বা পাচারের শিকার শিশুদের ফিরিয়ে নিয়ে আসার ক্ষেত্রে সংস্থাটি কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে। সুতরাং বলা যায়, ব্যক্তি সমাজকর্মের নীতিমালার আলোকে মূল্যবোধ রক্ষা, ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদা স্বীকৃতি, শিশুকল্যাণ ও ক্ষমতার পুনরুদ্ধারে ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

এছাড়াও সেভ দ্য চিলড্রেন'র এর কার্যক্রমে সমাজকর্মের সমষ্টি উন্নয়ন ও সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতি বিশেষ ভূমিকা পালন করে। শিশু ও মহিলাদের শিক্ষা, পুষ্টি, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির প্রয়োগ ঘটানো যায়। সাধারণত অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশসমূহে সমষ্টির মানুষের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রসহ সার্বিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তনে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। নিরাপত্তা ও যথাযথ কর্মসংস্থানের অভাবে অনেকসময় নারীরা সমাজের মূলস্রোত থেকে হারিয়ে যায়। সেভ দ্য চিলড্রেন শিশুদের পাশাপাশি নারীদের উন্নয়নে বেশ কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করে। পরিকল্পিত দল গঠন, উৎপাদনমুখী কাজে উৎসাহী করা এবং কর্মসংস্থানে সহায়তা করার মাধ্যমে সেভ দ্য চিলড্রেন দল সমাজকর্মের নীতিমালাকে প্রয়োগ করে।

সারসংক্ষেপ

সেভ দ্য চিলড্রেন'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে সমাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাদৃশ্য রয়েছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শিশু সুরক্ষা সংগঠন, মানবিক কার্যক্রমসহ বেশ কিছু কার্যক্রমে সমাজকর্মের ব্যক্তি সমাজকর্ম, দল সমাজকর্ম এবং সমষ্টি উন্নয়ন ও সমষ্টি পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। ক্ষমতার পুনরুদ্ধারে সমাজকর্মের কোন পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয়?
ক) ব্যক্তি সমাজকর্ম
খ) দল সমাজকর্ম
গ) সমষ্টি উন্নয়ন
ঘ) সমষ্টি সংগঠন

২। শিশুদের প্রতি ইতিবাচক মনোভার তৈরিতে সেভ দ্য চিলড্রেন কী করে?
ক) কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করে
খ) আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে
গ) জীবনমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা করে
ঘ) অনানুষ্ঠানিক শিক্ষার ব্যবস্থা করে

পাঠ-৮.৪ ওয়ার্ল্ড ভিশন'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম (Objectives and Programmes of World Vision)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৮.৪.১ ওয়ার্ল্ড ভিশন'র উদ্দেশ্যসমূহ লিখতে পারবেন।
৮.৪.২ ওয়াল্ড ভিশন'র কার্যক্রমসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

৮.৪.১ ওয়ার্ল্ড ভিশন'র উদ্দেশ্য

ওয়ার্ল্ড ভিশন একটি খ্রীষ্টান মানবতাবাদী সংস্থা যা বিশ্বের বঞ্চিত, অরক্ষিত শিশু তার পরিবার এবং সমষ্টির কল্যাণে নিবেদিত। ধর্ম, বর্ণ ও জেন্ডারের ঊর্ধ্বে উঠে মানুষের কল্যাণ সাধনই এর প্রধান উদ্দেশ্য। ১৯৫০ সালে ডা. বব পিয়ারস (Dr. Bob Pierce) ওয়ার্ল্ড ভিশন প্রতিষ্ঠা করেন। ছয়টি মহাদেশের ১০০ টির বেশি দেশে ওয়ার্ল্ড ভিশন এখন কাজ করছে। ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশে কর্মকাণ্ড শুরু করে ১৯৭০ সালে। ১৯৭১ সালে আন্তর্জাতিক ওয়ার্ল্ড ভিশনের উদ্যোগে ভারতের ওয়ার্ল্ড ভিশনের সহায়তায় স্বাধীনতা সংগ্রামের কারণে আগত বাংলাদেশী উদ্বাস্তু ক্যাম্পে এ সংস্থা ত্রাণকার্য পরিচালনা করে। বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সালে সংস্থাটি দেশের বৃহৎ এলাকার উন্নয়ন কর্মসূচির সাথে জড়িত। বাংলাদেশের ছেলেমেয়েদের ভালো জীবন গঠনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই এ সংস্থার কার্যক্রম চলছে। বিশ্বব্যাপী ওয়ার্ল্ড ভিশনের রুপকল্প হলো– প্রত্যেকটা শিশু তার জীবনে পূর্ণতা পাক, আমাদের প্রত্যেকের প্রার্থনা শিশুরা যেন তা করতে পারে। ওয়ার্ল্ড ভিশনের ছয়টি core value আছে। সেগুলো হলো– ক. আমরা খ্রিষ্টান, খ. আমরা দরিদ্রের প্রতি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, গ. আমরা মানুষের মর্যাদা দেই, ঘ. আমরা সবাই সেবক, ঙ. আমরা একে অপরের সঙ্গী এবং চ. আমরা জরুরি অবস্থার প্রতি/আপদকালীন সময়ের প্রতি ক্রিয়াশীল। সর্বোপরি ওয়াল্ড ভিশন বাংলাদেশ'র কৌশলগত উদ্দেশ্য হলো:

চিত্র ৮.৪.১ : ওয়ার্ল্ড ভিশন

ক. নারী ও শিশু স্বাস্থ্যের এবং পুষ্টিমানের উন্নয়ন;
খ. মানসম্মত শিক্ষায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা;
গ. শিশুরা যাতে নিরাপদ এবং আদরে থাকে তা নিশ্চিত করা; এবং
ঘ. কমিউনিটি প্রানোচ্ছলতা/ স্থিতিস্থাপকতা বৃদ্ধি করা।

৮.৪.২ ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশর কার্যক্রম

১৯৭০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে প্রলয়ংকারী ঘূর্ণিঝড় হয়। ঘূর্ণিঝড়-আক্রান্ত মানুষকে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে সহযোগিতার জন্য ওয়াল্ড ভিশন বাংলাদেশ এ দেশে কার্যক্রম শুরু করে। এরপর ১৯৭১ সালে রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর বর্বরোচিত নির্যাতনে যেসব বাংলাদেশি ভারতে রিফিউজি হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ করে, ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ তাদের জন্য ত্রাণ ও পুণর্বাসনে সহায়তা করে। ওয়ার্ল্ড ভিশন বর্তমানে ৩১ টি জেলায় তার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ওয়ার্ল্ড ভিশনের কার্যক্রমগুলোকে ৫টি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা হলো:

১। শিশু নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রকল্প: নারী, পুরুষ ও শিশু পাচারের ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে অন্যতম উৎস এবং ট্রানজিট রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। দরিদ্রতা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নারীদের অসম্মান সচেতনতার অভাব আইনের যথাযথ অপ্রয়োগের অভাবকে পাচারের পেছনে দায়ী করা হয়। শিশুদের যে কোনো ধরনের নাজুকতা, অপব্যবহার ও পাচার রোধে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ শিশু নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রকল্প চালু করেছে। এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো পাচার প্রতিরোধ, পাচার হওয়া ও শিশুদের উদ্ধার করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা। বাংলাদেশের ৯টি জেলার ২৫ টি উপজেলায় এ প্রকল্প পরিচালিত হয়। এ প্রকল্পের মূল কর্মসূচি হলো তিনটি বিষয়ভিত্তিকযা নিম্নরূপ:

এক) প্রতিরোধ: মানব পাচার প্রতিরোধ প্রশিক্ষণ, সচেতনতা সৃষ্টি, শিশু বাস্তব পরিবেশ তৈরি, স্থানীয় পর্যায়ে কমিটি গঠন এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করা।

দুই) প্রতিকার: যারা ইতোমধ্যেই ট্রাজিক ভিকটিম হয়েছে তাদের উদ্ধারের জন্যর স্থানীয় পর্যায়ে কমিটি গঠন, সহযোগিতা, ওয়ার্কশপ, মিটিং এবং স্টেক হোল্ডারদের সাথে কাজ করা।

তিন) পুনর্বাসন: ট্রাজিক ভিকটিম শিশুদের সমাজের মূল স্রোতে পুনরায় ফিরিয়ে আনার জন্য কাউন্সিলিং, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের ব্যবস্থা আইনগত সহায়তা দেয়া।

২। ডাইরেক্ট পুষ্টি হস্তক্ষেপমূলক প্রকল্প : ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ জাতিসংঘের শিশু তহবিলের সাথে যৌথভাবে শিশুদের পুষ্টিসম্মত খাবার যোগানে বাংলাদেশ সরকারের সাথে কাজ করে যাচ্ছে। ২০১২ সালের নভেম্বর থেকে ডাইরেক্ট পুষ্টি হস্তক্ষেপমূলক প্রকল্প চালু হয়। এ প্রকল্পের আওতায় শিশু, বৃদ্ধ ও গর্ভবতি মহিলাদের পুষ্টিসমৃদ্ধ খাবার সরবরাহে কাজ করে থাকে।

৩। নতুন জীবনের আশা প্রকল্প : ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ শিশুশ্রম দূর করে শিশুদের যথাযথ বিকাশ ও উন্নয়নের সুযোগ তৈরি করার জন্য নতুন জীবনের আশা প্রকল্প পরিচালনা করছে। প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া শিশুদের পুনরায় স্কুলে ভর্তি করানো, শিশুদের জন্য আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা, কমিউনিটি ভিত্তিক শিশু নিরাপত্তা ও প্রটেকশন চালু করতে কাজ করছে। এ প্রকল্পের আওতায় ৩৩১০১৩ জন শিশুকে সেবা দেয়া হয়েছে যার মধ্যে ১২,৮৯৩ জন প্রাথমিক স্কুল থেকে ঝরে পড়েছিলো। নীলফামারী, কিশোরগঞ্জ এবং রংপুরে এ কর্মসূচির বিস্তৃতি রয়েছে।

৪। নরকলি প্রকল্প : ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ পাঁচ বছরের কম বয়সি শিশুদের এবং গর্ভবর্তী মহিলাদের অপুষ্টি দূরীকরণে প্রকল্প পরিচালনা করে। নীলফামারী, দিনাপজুর, রংপুর, জয়পুরহাট, নওগাঁ, শেরপুর এবং ময়মনসিংহ) ৭ টি জেলার ১৮টি উপজেলায় এ প্রকল্প চালু রয়েছে। কোরিয়া আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা ও আজিনেএমাষ্ট জাপানের সাথে যৌথভাবে এ প্রকল্প চালু রয়েছে। এর আওতায় স্বাস্থ্য খাতের বর্তমান কাঠামোর ক্যাপাসিটি শক্তিশালীকরণ, তত্ত্বাবধান বৃদ্ধি, গর্ভবতী মহিলা সমর্থন দল গঠন, পুষ্টিকর খাদ্যে সরবরাহ এবং কমিউনিটিভিত্তিক ওয়াশ কার্যক্রম পরিচালনা করে।

৫। নবযাত্রা প্রকল্প : ইউএসএআইডি এর সাথে যৌথভাবে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ পাঁচবছর মেয়াদি খাদ্য সহায়তা প্রকল্প (নবযাত্রা প্রকল্প) চালু করেছে। খাদ্য অনিরাপত্তা দূরীকরণ এবং খাদ্যসংকট মোকাবিলায় বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের উপকূলীয় এলাকায় এ প্রকল্প কাজ করে যাচ্ছে। এ প্রকল্প ছয়টি উপাদানের ভিত্তিতে কাজ করে। উপাদানগুলো হচ্ছে– এক) মাতৃত্বকালীন শিশু স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি, দুই) বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ, তিন) স্যানিটেশন এবং হাইজিন, চার) মার্কেট ভিত্তিক কৃষিপণ্য উৎপাদন, পাঁচ) আয় বৃদ্ধি এবং ছয়) লিঙ্গসমতা এবং কমিউনিটি ভিত্তিক দুর্যোগ মোকাবিলা কার্যক্রম।

সারসংক্ষেপ

ওয়ার্ল্ড ভিশন সমাজকল্যাণ ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে নানামুখী কর্মকান্ডে ব্যপৃত রয়েছে। ছয়টি কোর ভেল্যুর মাধ্যমে নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন; অবহেলিত ও বঞ্চিত শিশুদের মানসম্মত শিক্ষায় প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা এবং শিশুরা যাতে নিরাপদ এবং আদরে থাকে তা নিশ্চিত করতেই কাজ করে যাচ্ছে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ। এজন্য চালু রয়েছে শিশু সুরক্ষামূলক, শিক্ষামূলক, স্বাস্থ্য পরিচর্যামূলক, নিরাপত্তামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি। এসব কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো প্রত্যেকটা শিশুকে একটি সুস্থ ও নিরাপদ পারিবারিক ও সামাজিক নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। ওয়ার্ল্ড ভিশন এর প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

(ক) ড. বব পিয়ারস (খ) ড. বব দিয়ানি

(গ) রানী ওয়াজডা (ঘ) ড. থেরেসা পেরেসা

২। ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের বর্তমানে কতটি জেলায় কার্যক্রম চালাচ্ছে?

(ক) ৩৫ টি (খ) ৩০ টি

(গ) ৩১ টি (ঘ) ২৯ টি

পাঠ-৮.৫ ওয়ার্ল্ড ভিশন'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ (Application of Social Work Methods in the Programmes of World Vision)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৮.৫.১ ওয়ার্ল্ড ভিশন'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

৮.৫.১ ওয়ার্ল্ড ভিশন'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

বিশ্বব্যাপী যেসকল প্রতিষ্ঠান বঞ্চিত অরক্ষিত ও সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের কল্যাণে নিরলসভাবে কাজ করছে ওয়ার্ল্ড ভিশন তার মধ্যে অন্যতম। ১৯৭০ সাল থেকে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের নারী ও শিশুদের সার্বিক কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছে। ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ'র কৌশলগত উদ্দেশ্যের সাথে সমাজকর্মের উদ্দেশ্যের মিল রয়েছে। সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষণীয়।

ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশে নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধ, পাচার হওয়া শিশু পুনরুদ্ধার, পাচারকৃত শিশুকে পুনরুদ্ধার করে যথাযথ পুনর্বানের ব্যবস্থা করে। ওয়ার্ল্ড ভিশন শিশু পাচার রোধে প্রশিক্ষণ দান, গণসচেতনা সৃষ্টি স্থানীয় পর্যায়ে কমিটি গঠন এবং বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ দল গড়ে তোলে। যেসব শিশু ও নারী ইতোমধ্যেই পাচারের শিকার হয়েছে তাদের উদ্ধার করে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। এক্ষেত্রে পাচারের শিকার শিশুদের মূল স্রোতধারায় ফিরিয়ে আনার জন্য কাউন্সেলিং প্রদান উদ্দীপনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ এবং শিশুদের জন্য চিকিৎসার ব্যবস্থা করে থাকে যা সমাজকর্মের নীতিমালার বাস্তবিক প্রয়োগ। একই সাথে পাচার ও বাল্যবিবাহ নিরোধে দলভিত্তিক কার্যক্রমে দল সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির অন্যতম লক্ষ্য হলো সমষ্টির অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানুষের চাহিদা পূরণের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়নে সমষ্টিকে উৎসাহিত করা। ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ শিশুদের যথার্থ উৎসাহিত করে। ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ শিশুদের যথাথ বিকাশ ও বৃদ্ধি নিশ্চিত করার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে এবং কমিউনিটি ভিত্তিক শিশু নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সহায়তা করে ও কমিউনিটিতে সচেতনতা তৈরি করে। সুতরাং বলা যায় ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ'র কার্যক্রমে সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির প্রয়োগ রয়েছে। ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ'র শিক্ষা, দারিদ্র বিমোচন, সুস্থ উন্নয়ন, সংশোধন ও সামাজিক নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রয়োগ গুরুত্বপূর্ণ। ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ও আত্মনির্ভরশীলতার মাধ্যমে দেশকে উন্নতির দিকে অগ্রসর করার ক্ষেত্রে সমাজকর্মের অন্যান্য পদ্ধতির ন্যায় ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রয়োগ অনস্বীকার্য। ওয়ার্ল্ড ভিশন'র উপরিউক্ত কার্যক্রমে ব্যক্তি সমাজকর্মের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। সমষ্টির জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, দুর্যোগে নারী ও শিশুকে নিরাপদে রাখা, শিশুদের শিক্ষা বিস্তারে সহায়তা, শিশুদের উন্নয়ন এবং নারীদের কল্যাণে ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির প্রয়োগ করে থাকে।

সারসংক্ষেপ

ব্যক্তির উন্নয়নের পাশাপাশি দলীয় আন্তসম্পর্ক ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গঠনমূলক কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ শিশুদের উন্নয়নে শিশু সুরক্ষামূলক, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত প্রকল্প, পাচার রোধে প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক প্রকল্প গ্রহণ করে থাকে। এসব কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষণীয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। ওয়ার্ল্ড ভিশন কোন শিশুদের জন্য কাউন্সেলিং ও উদ্দীপনামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে কে?
- ক) প্রাথমিক শিক্ষার ভর্তিকৃত শিশু
- খ) ঝরে পড়া শিশু
- গ) পাচারের শিকার শিশু
- ঘ) অনানুষ্ঠানিক শিক্ষায় ভূর্তীকৃত শিশু

২। ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের কৌশলগত উদ্দেশ্যের সাথে সাদৃশ্য রয়েছে?
- ক) সমাজকর্মের উদ্দেশ্যের
- খ) ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদের
- গ) সমষ্টি উন্নয়নের
- ঘ) সমষ্টি সংগঠনের

পাঠ-৮.৬ বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম (Objectives and Programmes of Bangladesh Red Crecent Society)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৮.৬.১ বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি'র উদ্দেশ্যসমূহ লিখতে পারবেন।
৮.৬.২ বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি'র কার্যক্রম সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

৮.৬.১ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি'র উদ্দেশ্য

রেডক্রিসেন্ট হলো আন্তর্জাতিক রেডক্রস অনুমোদিত মুসলিম বিশ্বে ত্রাণ ও মানবিক সাহায্য পরিচালনাকারী একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান। বিশ্বমানবতার সেবায় নিয়োজিত রেডক্রসের ইতিহাসের মধ্যে রেডক্রিসেন্টের উৎস নিহিত। সরকারের সহযোগী সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবী মানবিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি দুস্থ, পীড়িত, অসহায় ও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর অবস্থার উন্নয়নে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। মূলত মুসলিম বিশ্বে ত্রাণ পুনর্বাসন ও মানবিক সাহায্য পরিচালনায় নিয়োজিত রেড ক্রিসেন্ট আন্তর্জাতিক রেডক্রসের ইতিহাসের সাথে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত। ১৮৫৯ সালের ২৪মে জুন সুইস তরুণ জীন হ্যানরী ডুন্যান্ট (Jean Henri Dunant) ইতালীর সলফ্যারিনো নামক গ্রামে ফ্রান্স ও অষ্ট্রিয়ার মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে আহত সৈনিকদের আর্তনাদ দেখে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন। সোলফারিনো যুদ্ধের ভয়াবহতা নিয়ে তিনি ১৮৬২ সালে 'অ্যা মেমোরি অফ সোলফারিনো' (A Memory of Solferino) নামক বইয়ে যুদ্ধের ভয়াবহতা এবং আহত সৈনিকদের দুর্দশা তুলে ধরেন।একই সাথে যুদ্ধাহত মানবতার সেবায় একটি সংস্থা গঠনের আহ্বান জানান। তাঁর আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৩ সালের ২৬ অক্টোবর ১৬টি দেশের প্রতিনিধিদের নিয়ে সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জেনেভা সম্মেলনে বিশ্বব্যাপী আর্তমানবতার সেবায় নিয়োজিত আন্তর্জাতিক রেডক্রস গঠিত হয়। এই মতবাদ রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট কর্মী ও সদস্যদের সহায়তায় মানবীয় কাজের ক্ষেত্র ও পরিধি নির্দিষ্ট করে দেয়। পাশাপাশি এই কার্যক্রমের আদর্শ ও মানবীয় মূল্যবোধ প্রচারের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি এনে দেয় এই মতবাদ। মূলনীতি গুলো হলো– মানবতা, সমদর্শিতা, নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা, স্বেচ্ছাসেবা, একতা এবং সর্বজনীনতা। বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির লক্ষ্য ও উদ্দেশগুলো নিম্নরূপ:

চিত্র ৮.৬.১ : রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি

ক) মূলনীতিমালা অনুযায়ী মানবতার শক্তিতে যে কোনো অসুস্থতা বা দুর্যোগ আক্রান্ত মানুষের দুঃসময়ে পাশে থাকা এবং তাদের উন্নয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধান করা;
খ) মূল নীতিমালার আলোকে রেডক্রিসেন্ট সোসাইটিকে একটি শক্তিশালী ও কর্মদক্ষ জাতীয় প্রকল্পে উন্নীত করা;
গ) সকল জাতির মধ্যে শান্তি স্থাপন ও তা বজায় রাখা; এবং
ঘ) দুঃস্থ মানুষের পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়া।

৮.৬.২ বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি'র কার্যক্রম

বিট্রিশ ভারতীয় রেডক্রস সোসাইটি এ্যাক্ট, ১৯২০ এর অধীনে এ অঞ্চলে রেডক্রস সোসাইটি গঠিত হয়। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর পাকিস্তান রেডক্রস সোসাইটি গঠিত হয়। ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর পাকিস্তান রেডক্রস সোসাইটির আবেদনের প্রেক্ষিতে ২০ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ সংস্থাটিকে কাজের অনুমতি দেয় এবং ৪ জানুয়ারি ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি গঠিত হয়। বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি ত্রাণ ও পুনর্বাসন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য ও প্রশিক্ষণসহ বহুবিধ কর্মসূচির মাধ্যমে দুর্যোগপ্রবণ বাংলাদেশের দুঃস্থ ও অসহায় মানুষের কল্যাণে বলিষ্ঠ ভূমিকা রেখে আসছে। নিম্নে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইট'র কার্যক্রম তুলে ধরা হলো:

১। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচি

বাংলাদেশ রেডসিক্রেন্ট সোসাইটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির আওতায় ৭ টি প্রকল্প পরিচালনা করে। যথা–

ক. জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন প্রকল্প: পরিবর্তনশীল আবহাওয়ার এলাকার মানুষের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি, এলাকা ভিত্তিক দ্রুত সর্তক ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করা, আবহাওয়া জনিত দুর্যোগের ফলাফল এবং বিপর্যয়ের করণীয় বিষয়ে সচেতনতা তৈরির লক্ষ্যে এ প্রকল্পটি চারটি জেলায় ৮ টি সম্ভাব্য দুর্যোগপ্রবণ অঞ্চলে কাজ করছে। প্রকল্পটির অধীনে ইতিমধ্যেই ৫৫,১৮০ জন মানুষ উপকার ভোগ করছে।

খ. সমাজ ভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস: বন্যা, ঘুর্ণিঝড় ও জলাবদ্ধতায় আক্রান্ত চারটি জেলা জামালপুর, ভোলা, সাতক্ষীরা ও যশোরের ১০ টি দুর্যোগপ্রবণ এলাকার মানুষদের দুর্যোগ বিপর্যয় হ্রাস করার জন্য এ প্রকল্প কাজ করছে। এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য হলো দুর্যোগপ্রবণ এলাকার মানুষ, স্থানীয় প্রশাসন জেলা প্রশাসন, সিভিল সার্জন, জেলার মৎস বিভাগ, যুব উন্নয়ন বিভাগের মধ্যে অংশীদারিত্ব তৈরি করা এবং স্থানীয়ভিত্তিক বিভিন্ন সংগঠন গঠন করা। যেমন– সিডিএমসি (প্রতিটি কমিউনিটিতে ১৬জন সদস্য– ৯৪জন পুরুষ ও ৬৬জন নারী) এবং সিডিআরটি (প্রতিটি কমিউনিটতে ২৫জন সদস্য- ১১৭জন পুরুষ ও ১০৩জন নারী) এর মধ্যে এলাকাভিত্তিক সংস্থাপন করা হয় যা এলাকাবাসীদের মাঝে প্রকল্পটিকে আপন করে নেয় এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে অংশ্রগ্রহণে অনুপ্রাণিত করে।

গ. সমাজ ভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প: সমষ্টি ভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্পটি দুর্যোগ মোকাবিলা, দারিদ্র্য দূরীকরণ, স্বাস্থ্য ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার উন্নয়ন এবং বিবিধ আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে উন্নয়নের মাধ্যমে বিভিন্ন নির্বাচিত এলাকায় স্থিতিশীলতা রক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ২০১৭ সালের মধ্যে ১৬টি দুঃস্থ অঞ্চলের ৪০,০০০ এর বেশি মানুষের দুর্যোগ মোকাবিলার শক্তি বৃদ্ধির মাধ্যমে তাদের জীবনযাপন ব্যবস্থার উন্নয়নে কাজ করছে। এ প্রকল্পের আওতায় শর্তবিহীন অনুদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ, সচেতনতা সৃষ্টি এবং অর্থের বিনিময়ে প্রাপ্তবয়স্ক ও কিশোরদের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

ঘ. ঝুঁকি হ্রাস: এ প্রকল্পের আওতায় ৫০টি প্রকল্প স্কুলের মাঝে ২০টি প্রধান এবং ৩০টি সাধারণ স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়ে থাকে। প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং প্রোগ্রামের মাধ্যমে মোট ২০,০০০ ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও এলাকাবাসী প্রত্যক্ষভাবে এবং আরো ৬০,০০০জন ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক ও এলাকাবাসী পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়েছে।

ঙ. বিপদাপন্নতা থেকে সক্ষমতা প্রকল্প: সবচেয়ে নাজুক জনগণের সামাজিক চাহিদা ও নিরাপত্তার দায়িত্বে প্রতিনিয়িত ভালনারেবিলিটি টু রেজিলিয়েন্স প্রকল্প 'ভিটুআর'। মূলত প্রাকৃতিক দুর্যোগে ঝুঁকির সম্মুখীন নারী, শিশু বৃদ্ধ, পঙ্গুরা এই বিশেষসেবা লাভ করে।

চ. দুর্যোগ সাড়া দল: সময় মত সেবার জন্য যাতায়াত পথ পরিষ্কার রাখা, জীবন, সম্পত্তি ইত্যাদি রক্ষার জন্য আগেই ঘূর্ণিঝড়ের পূর্বাভাস প্রদান, মানুষদের নিরাপদ আশ্রয় সরিয়ে নেওয়া ইত্যাদি কাজ করা হয় এ প্রকল্পে।

২। স্বাস্থ্য কার্যক্রম

বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি গ্রামীণ জনগণের পরিচালনাকে প্রাধান্য দিয়ে গ্রাম ও শহরভিত্তিক স্বাস্থ্য কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী জরুরি চিকিৎসা প্রদান স্বাস্থ্য কর্মসূচির একটি উল্লেখযোগ্য অংশ। মা ও শিশুস্বাস্থ্য সুরক্ষা ও সংক্রামক ব্যাধির নিরাময়ে গুরুত্ব দেয়া হয়। ঢাকা শহরের অবস্থিত ৫১৫ শয্যাবিশিষ্ট হলি ফ্যামিলি রেডক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালসহ দেশের ৫ টি হাসপাতাল, ৫টি মাতৃসদন, ৬০ টি গ্রামীণ মাতৃসদন কেন্দ্র, ২ টি চক্ষু ক্লিনিক, ৩টি বহিঃবিভাগ, ১টি মেডিকেল কলেজ ও ১টি নার্সিং কলেজর মাধ্যমে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি জনস্বাস্থ্য সেবা দিয়ে যাচ্ছে।

৩। পারিবারিক যোগাযোগ পুনঃস্থাপন

যুদ্ধ, সংঘাত, অভ্যন্তরীণ কোন্দল, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং দেশভাগের ফলাফল হিসেবে মানুষ ঘরছাড়া হয়, স্বজনদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং কখনো হয়তো দেশ ছাড়াও হতে হয়। বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি'র ট্রেসিং সার্ভিসের মূল উদ্দেশ্য হলো পরিবারের মানুষদের একত্রিত করে দুশ্চিন্তা কমানো এবং পরিবার থেকে নিখোঁজ সদস্যদের খুঁজে বের করা। হারিয়ে যাওয়া পরিবারের সদস্যদের একত্রিত করার ক্ষেত্রেও কাজ করে থাকে।

৪। যুব ও স্বেচ্ছাসেবক কর্মসূচি

দীর্ঘদিন ধরে বিশ্বজুড়ে তরুণ ও স্বেচ্ছাসেবীদের সেবা দেওয়ার উৎসাহ আগ্রহকে মূল্যায়ন করেছে রেড ক্রিসেন্ট। বাংলাদেশে ১৯৭৬ সালে জে আরসি (জুনিয়র রেড ক্রস) তাদের কার্যক্রম শুরু করে এবং ১৯৮০ সালে রেড ক্রিসেন্ট ইয়ুথ গঠিত হয়। বর্তমানে এটি ৬৮টি ইউনিটে প্রায় ১ লাখ ৬০ হাজার দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইউনিট ও স্বেচ্ছাসেবক রয়েছে।

৫। প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

১৯৯৭ সালের সূচনার পর থেকেই প্রশিক্ষণ বিভাগ কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীদের দক্ষতা বাড়ানোর মাধ্যমে বিডিআরসি এর ক্ষমতা বৃদ্ধি করে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করে আসছে। প্রশিক্ষণের মূল সেগুলো হচ্ছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন, কমিউনিটি ভিত্তিক ফাস্ট এইড, জরুরী উদ্ধারকাজ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং দুর্যোগ সম্ভাবনা হ্রাস ইত্যাদি।

সারসংক্ষেপ

রেডক্রিসেন্ট বাংলাদেশ সম্মিলিত ও সংগঠিত সশ্রস্ত্র অত্যাচারে নিপীড়িত মানুষদের নিরাপত্তা ও সহযোগিতা প্রদান করে। বিভিন্ন প্রশাসন শিক্ষাকেন্দ্র, আইনরক্ষাকারী সংস্থা, সশস্ত্র বাহিনীর নামে আন্তর্জাতিক মানবিকতা আইন সম্পর্কে জানানোর ও তা প্রণয়নে সহযোগিতা করে। মানবতা, সমদর্শিতা, নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা, স্বেচ্ছাসেবা, একতা ও সর্বজনীনতা মূলনীতিকে সামনে রেখে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, স্বাস্থ্য কর্মসূচি, পারিবারিক যোগাযোগ পুনঃস্থাপন, প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কর্মসূচি পরিচালনা করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। নিচের কোনটি রেডক্রিসেন্ট এর মূলনীতি নয়?

ক) একতা খ) সর্বজনীনতা
গ) স্বেচ্ছাসেবা ঘ) জবাবদিহিতা

২। নিচের কোনটি রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির উদ্দেশ্য নয়?

ক) অসুস্থতা ও দুর্যোগ আক্রান্তের পাশে দাড়াঁনো
খ) সোসাইটিকে কর্মদক্ষ জাতীয় প্রকল্পে উন্নীত করা
গ) দুঃস্থদের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ বিতরণ করে ক্ষমতায়ন করা
ঘ) সকল জাতির মধ্যে শান্তি স্থাপন করা

পাঠ-৮.৭ বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ (Application of Social Work Methods in the Programmes of Bangladesh Red Crecent Society)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৮.৭.১ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

৮.৭.১ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

মানবতা, নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা, স্বেচ্ছাসেবা, একতা ও সর্বজনীনতা মূলনীতিকে আশ্রয় করে রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি দুঃস্থ, পীড়িত, অসহায়, ক্ষতিগ্রস্ত ও বিপদাপন্ন জনগণের অবস্থার উন্নয়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রতিকার ও প্রতিরোধমূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি দুর্যোগগ্রস্ত জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি পরিচালনা করে আসছে বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি। এ সংস্থার বিভিন্ন কর্মকান্ডে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষণীয়।

বাংলাদেশ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। যেমন– জলবায়ু পরিবর্তন ও অভিযোজন প্রকল্প, সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস, সামজভিত্তিক উন্নয়ন প্রকল্প, বিপদাপন্নতা থেকে সক্ষমতা প্রকল্প অন্যতম। এসকল প্রকল্পে আবহাওয়া পরিবর্তনশীল এলাকার মানুষের দুর্যোগ সম্পর্কে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি, এলাকাভিত্তিক দ্রুত সর্তক ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সমাজভিত্তিক দুর্যোগ হ্রাস কৌশলের অংশ হিসেবে এলাকাবাসীর সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের জন্য সমাজভিত্তিক উন্নয়নের অংশ হিসেবে শর্তহীনভাবে প্রশিক্ষণ দান করা হয়। এসব প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য দুর্যোগ কবলিত অসহায় মানুষের উন্নয়ন সাধন, তার সক্ষমতা বৃদ্ধি ও পুনরুদ্ধার। এসব কর্মসূচিতে দল সমাজকর্ম ও সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতির বিশেষ প্রয়োগ অনস্বীকার্য। ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতির ভিত্তিতে সমাজকর্ম বিজ্ঞান ভিত্তিক জ্ঞান ও দক্ষতার মাধ্যমে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টিকে এমনভাবে সহায়তা করে যাতে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টি নিজেই নিজের সমস্যার সমাধান করতে পারে। মা ও শিশুর সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করার জন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত গ্রাম ও শহর অঞ্চলে স্বাস্থ্য কর্মসূচি চালু আছে। এক্ষেত্রে সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগ লক্ষণীয়।

অন্যদিকে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, খাদ্য সরবরাহ স্বাস্থ্য ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে দল সমাজকর্ম এবং সমষ্টি উন্নয়ন ও সংগঠনের পাশাপাশি সামাজিক কার্যক্রম বিশেষ জরুরি। সম্মিলিত প্রচেষ্টা, অংশগ্রহণ ও স্বাবলম্বন নীতির উপর ভিত্তি করে জনগণকে সংগঠিত করে আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজ থেকে ক্ষতিকর প্রথা ও সামাজিক সমস্যা মোকাবিলা করা সম্ভব। ছোট ছোট দলীয় অভিজ্ঞতা ও সমষ্টির অংশগ্রহণ পারে একটি দেশ ও জাতিকে তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে।

উপরিউক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমাজকর্মের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

সারসংক্ষেপ

রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি অত্যন্ত কার্যকরভাবে বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজ উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। সোসাইটি বিভিন্ন কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। অসহায়, দুঃস্থ, অবহেলিত ও দুর্যোগ কবলিত ব্যক্তির ক্ষমতার পুনরুদ্ধার করে আত্মনির্ভরশীল ও ব্যক্তির আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটির কার্যক্রমকে আরো ফলপ্রসূ করে তুলেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন :

১। মনো-সামাজিক অনুধ্যান সমাজকর্মের কোন পদ্ধতিতে ব্যবহার করা হয়?

ক) দল সমাজকর্মে খ) সমষ্টি উন্নয়নে
গ) সমষ্টি সংগঠনে ঘ) ব্যক্তি সমাজকর্মে

২। দেশ ও জাতিকে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে সাহায্য করে–

ক) নীতিমালা ও পরিকল্পনা খ) দলীয় অভিজ্ঞতা ও জনসমষ্টির অংশগ্রহণ
গ) কর্মসূচি ও কার্যক্রম ঘ) পুনর্বাসন ও পুনর্গঠন

পাঠ-৮.৮ ইউনিসেফ'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম (Objectives and Programmes of UNICEF)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৮.৮.১ ইউনিসেফ'র উদ্দেশ্যসমূহ বলতে পারবেন।
৮.৮.২ ইউনিসেফ'র কার্যক্রম বর্ণনা করতে পারবেন।

৮.৮.১ ইউনিসেফ'র উদ্দেশ্য

আজকের শিশুরাই আগামী দিনের বিশ্ব কর্ণধার। এই শিশুদের উপযোগী করে বিশ্বকে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে সরকার, সমষ্টি ও পরিবারকে সাহায্যে করার লক্ষেই ১৯৪৬ সালের ১১ ডিসেম্বর United Nation International Childrens Energency Fund (UNICEF) প্রতিষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘের যে সব বিশেষায়িত সংস্থা আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে শিশুকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে, সেসব সংস্থার মধ্যে জাতিসংঘ শিশু তহবিল (United Nations International Children's Emergency Fund-UNICEF) অন্যতম। কার্যত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে ইউরোপ এবং এশিয়ার বিভিন্ন যুদ্ধাক্রান্ত দেশের শিশুদের জরুরি ভিত্তিতে খাদ্য, বস্ত্র এবং ঔষধ সরবরাহের জন্য UNICEF প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে ১৯৫২ সালের দিকে বিশ্বের অনুন্নত, স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর শিশুদের স্বাস্থ্য, শিক্ষা, পুষ্টিসহ সার্বিক কল্যাণে দীর্ঘমেয়াদি সহায়তা দানের লক্ষ্যে emergency কথাটি বাদ দিয়ে UN Children's Fund (জাতিসংঘ শিশু তহবিল) রাখা হয়। মূল নামে পরিবর্তন আনা হলেও সংক্ষিপ্ত নামটি অপরিবর্তিত থাকে। বর্তমানে ১৯০টিরও বেশি দেশে ইউনিসেফ কাজ করছে। যুদ্ধত্তোর পৃথিবীতে শিশুদেরকে জরুরি সাহায্য-সহযোগিতা প্রদানের উদ্দেশ্য প্রতিষ্ঠিত হলেও এর কার্যক্রম অনেক বিস্তৃতি লাভ করেছে। ফলে পরবর্তীতে এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যেও কিছু পরিবর্তন এসেছে। ইউনিসেফ'র উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ:

চিত্র ৮.৮.১ : ইউনিসেফ

ক) ইউনিসেফ'র অন্যতম মৌলিক উদ্দেশ্য হলো শিশু অধিকার রক্ষা, এ্যাডভোকেসি করা, শিশুদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণে সাহায্যে করা এবং শিশুরা যাতে তাদের সক্ষমতার পূর্ণ বিকাশ করতে পারে সেজন্য সুযোগ নিশ্চিত করা;

খ) শিশু অধিকার কনভেনশন দ্বারা উদ্ধুদ্ধ হয়ে শিশু অধিকার রক্ষায় শিশুদের প্রতি আচরণের আন্তার্জাতিক মানদন্ড তৈরি করা;

গ) ইউনিসেফ জোর দিয়ে বিশ্বাস করে যে, শিশুদের সুরক্ষা ও উন্নয়নই মানুষের উন্নতির সর্বজনীন অবিচ্ছেদ্য ব্যবস্থা;

ঘ) অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিশুদের জন্য প্রথম কল নিশ্চিত করার জন্য রাজনৈতিক এবং বস্তুগত সম্পদ মোবালাইজ করা এবং শিশু ও তার পরিবারকে যথাযথ সেবা দেওয়ার জন্য সক্ষমতা তৈরি ও উন্নয়নে সাহায্যে করা;

ঙ) সকল যুদ্ধ, দুর্যোগ, চরম দারিদ্র্যের শিকার, সহিংসতা ও শোষণের শিকার এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের বিশেষ সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

চ) শিশু ও নারীদের তাদের নিজ নিজ সম্প্রাদায়ের রাজনৈতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অংশীদারিত্ব নিশ্চিত করা;

ছ. শিশুদের রোগ ও মৃত্যু প্রতিরোধ করা; এবং

চ) সকল প্রকার বৈষম্য যা শিশুর উন্নয়নে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তা দূরীভূত করা।

৮.৮.২ ইউনিসেফ'র কার্যক্রম

১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ গঠিত হওয়ার পর থেকেই ইউনিসেফ বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলেছে। বাংলাদেশে ইউনিসেফ'র কার্যক্রম বিশ্বের মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম অবস্থানে রয়েছে। বাংলাদেশ ইউনিসেফ'র কার্যক্রমের প্রধান ক্ষেত্রগুলো হলো শিশু শিক্ষা, মেয়ে শিশু ও নারীর ক্ষমতায়ন, গুণগত প্রাথমিক শিক্ষা

নিশ্চিতকরণ, স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি, পানি এবং পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থা ইত্যাদি। নিচে কার্যক্রমগুলো সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো-

১। শিক্ষামূলক কার্যক্রম: শিক্ষামূলক কার্যক্রমের আওতায় রয়েছে−

ক) প্রাক-শিক্ষণ: চার থেকে ছয় বছর বয়সি সুবিধাবঞ্চিত ও দুর্যোগকবলিত শিশুদের জন্য প্রাক-শিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ইউনিসেফ প্রাক শিক্ষণের ব্যবস্থা করে থাকে। ২০০৬ সাল থেকে বাংলাদেশ সরকারের নারী ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় পার্বত্য চট্টগ্রাম, নগরবস্তি এবং অন্যান্য অবহেলিত এলাকায় এ কর্মসূচি চালু আছে। এখন পর্যন্ত প্রায় **১.১** মিলিয়ন শিশুকে এ কর্মসূচির আওতায় শিক্ষাদান করা হয়েছে। এসব কেন্দ্রে মূলত শিক্ষার্থীদের ভাষাগত, সামাজিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেয়া হয়।

খ) প্রাথমিক শিক্ষা: প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধি কার্যকর করার লক্ষ্যে ইউনিসেফ প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন কর্মসূচি (DPED-II) গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে শিক্ষক প্রশিক্ষণ, সমষ্টিভিত্তিক প্রণোদনা, স্থানীয় লোকজন ও বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির ক্ষমতায়নসহ বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে ইউনিসেফ কাজ করছে।

গ) স্কুলের বাইরে শিশুদের জন্য শিক্ষা: বাংলাদেশে দারিদ্র্যের কারণে অনেক বাবা-মা তাদের সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে চান না। অনেক পিতামাতা সন্তানদের অল্প বয়সে বিভিন্ন প্রকার ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়েজিত করেন। এজন্য ইউনিসেফ এসব কাজে নিয়োজিত শ্রমজীবী শিশুদের শিক্ষার ব্যবস্থা করে। বিশেষ করে যেসব এলাকায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্বল্পতা আছে সেসব এলাকায় এ প্রোগ্রামের কার্যকারিতা বেশি।

ঘ) কিশোরদের জীবন দক্ষতামূলক শিক্ষা: বাংলাদেশে কিশোররা বিভিন্নভাবে বঞ্চিত ও সামাজিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এর মূল কারণ দারিদ্র্য মাদকাসক্ত, সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিসেস, শারিরীক ও যৌন নির্যাতন, পাচার, অব্যবহার এবং বৈষম্য। এসব কিশোরদের জীবন দক্ষতামূলক শিক্ষার ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্ষমতায়িত করার জন্য ইউনিসেফ এ প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বিশটি জেলার ২.৫ মিলিয়ন কিশোরকে সেবা দানের লক্ষ্যে এ প্রকল্প চলছে।

২। স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম

বাংলাদেশের নারী ও শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, শিশু মৃত্যুহার হ্রাস ও মাতৃ স্বাস্থ্যের উন্নয়নে নিম্নোক্ত কার্যক্রসমূহ পরিচালিত হচ্ছে তা হলো−

ক) মাতৃত্বকালীন ও নবজাতক স্বাস্থ্যসেবা: মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা ও নবজাতকের স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ইউনিসেফ হাসাতালগুলোর সেবা বৃদ্ধি, নতুন সরঞ্জাম সরবরাহ কর্মী প্রশিক্ষণ সচেতনমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ হাসপাতালগুলোর সাথে স্থানীয় স্বাস্থ্য সেবকদের যোগাযোগ স্থাপন এবং মায়েদের ক্ষমতায়নে ইউনিসেফ কাজ করে।

খ) শিশু সুরক্ষা: শিশুদের সকল প্রকার অসুস্থতা ও দুর্ঘটনা থেকে সুরক্ষার জন্য ইউনিসেফ সদা তৎপর। এজন্য ইউনিসেফ সারা বাংলাদেশে শিশুদের বিভিন্ন রোগের প্রতিরোধ মূলক টিকাদান কর্মসূচিতে সহায়তা করে। ২০০৪ সালে যেখানে ৭৭ শতাংশ শিশু মৌলিক টিকা বাবস্থার আওতায় ছিলো। এখন তা বেড়ে ৯২ শতাংশ হয়েছে। নিউমোনিয়া, ম্যালেরিয়া, পোলিও ইত্যাদি রোগের টিকাদান কর্মসূচিতে সরকারের সাথে কাজ করছে ইউনিসেফ।

গ. শিশু পুষ্টি: শিশুদেরকে অপুষ্টির হাত থেকে বাচাঁনোর জন্য সারা বাংলাদেশে Vitamin A খাওয়ানোর ক্ষেত্রে কাজ করে যাচ্ছে। এ্যানোমিয়া প্রতিরোধ এবং শিশুদের ব্রেস্টফিডিং এর ব্যাপারে মায়েদের সচেতন করে ইউনিসেফ। এছাড়াও HIV/AIDS প্রতিরোধ ও এ সম্পর্কে সচেতন করে ইউনিসেফ।

৩। পানি, স্যানিটেশন এবং হাইজিন কর্মসূচি: শিশু স্বাস্থ্যসহ সার্বিক জনস্বাস্থ্য রক্ষার জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ এবং স্বাস্থ্যসম্মত পয়ঃনিষ্কাশন অপরিহার্য। ইউনিসেফ এক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে। বাংলাদেশ সরকার, স্থানীয় কমিউনিটি ও অন্যান্য অংশীদারের সাথে নেটওয়ার্কিং এর মাধ্যমে ইউসিফে এক্ষেত্রেও বিভিন্নমুখি কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। এছাড়াও বিভিন্ন সংস্থার সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে প্রকল্প ভিত্তিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

৪। নগর এলাকায় মৌলিক সেবা: নগরের বস্তি অঞ্চল হলো নগর দারিদ্র্যের বসতি। যেখানে মৌলিক সেবার অনুপস্থিতি আছে। বস্তিবাসীদের মৌলিক সেবা নিশ্চিতের লক্ষ্যে ইউনিসেফ সহযোগী অন্যান্য সংস্থাকে অনুদান দিয়ে থাকে।

৫। কমিউনিটি এ্যাভোকেসি ও অংশীদারিত্ব: জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নারী ও শিশু অধিকার রক্ষায় জনগণের অংশীদারিত্ব নিশ্চিতকরণে কাজ করে যাচ্ছে ইউনিসেফ। এক্ষেত্রে তারা শিশু অধিকার নিয়ে সংবাদ ও নাটক প্রচার স্থানীয় পর্যায়ে সচেতনতা মূলক কর্মসূচির আয়োজন করে থাকে।

সারসংক্ষেপ

জাতিসংঘের বিশেষায়িত সংস্থা হিসেবে ইউনিসেফ শিশু অধিকার রক্ষা, শিশুদের মৌলিক প্রয়োজন পূরণ, শিশুদের প্রতি আচরণের আন্তার্জাতিক মানদন্ড তৈরি করা, সহিংসতা ও শোষণের শিকার এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের বিশেষ সুরক্ষা ব্যবস্থা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে অত্যন্ত কার্যকরভাবে কাজ করে যাচ্ছে। শিশুদের সুরক্ষা ও উন্নয়নই মানুষের উন্নতির সর্বজনীন অবিচ্ছেদ্য ব্যবস্থা বিবেচনা করে শিশুদের জন্য শিক্ষা, পুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং কমিউনিটি ভিত্তিক এ্যাডভোকেসি সহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে ইউনিসেফ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। ইউনিসেফ'র প্রাক-শিক্ষণ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্যদল কারা?

(ক) ৩-৪ বছরের শিশু (খ) ৫-৭ বছরের শিশু
(গ) ৪-৬ বচরের শিশু (ঘ) ৬-৮ বছরের শিশু

২। ইউনিসেফ বর্তমানে কয়টি দেশে কার্যক্রম চালাচ্ছে?

(ক) ১৮৯টি (খ) ১৯২টি
(গ) ১৯১টি (ঘ) ১৯০টি

পাঠ-৮.৯ ইউনিসেফ'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ (Application of Social Work Methods in the Programme of UNICEF)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৮.৯.১ ইউনিসেফ'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

৮.৯.১ ইউনিসেফ'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

শিশুদের সক্ষমতার পূর্ণ বিকাশের মাধ্যমে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে বিশ্বব্যাপী কাজ করে যাচ্ছে ইউনিসেফ। দুর্যোগকবলিত, সুবিধাবঞ্চিত, অসুবিধাগ্রস্ত, যুদ্ধকবলিত, প্রতিবন্ধী ও সহিংসতার শিকার শিশুদের উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখে চলেছে ইউনিসেফ। ইউনিসেফ শিশুদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, নিরাপদ পানি সরবরাহ, শিশু অধিকারের জন্য এ্যাডভোকেসিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। ইউনিসেফ'র বিভিন্ন কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।

২০০৬ সাল থেকে ইউনিসেফ বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায় পার্বত্য চট্রগ্রাম, নগর বস্তি এবং অন্যান্য অবহেলিত এলাকায় প্রাক-শিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করছে। এ কর্মসূচির মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর শিশুদের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে চলছে। শিশুদের অশিক্ষার মূল কারণগুলো চিহ্নিত করে ভাষাগত, সামাজিক এবং বুদ্ধিবৃত্তিক উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দেয় ইউনিসেফ যা সমাজকর্মের ব্যক্তি সমাজকর্ম পদ্ধতির মূল দর্শনের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

দারিদ্র্যের কারণে বাংলাদেশের অনেক শিশু স্কুল থেকে ঝরে পরে। আবার অনেক সময় বাবা-মা দারিদ্র্যের কারণে ছেলে মেয়েদের স্কুলে পাঠাতে চান না এবং অনেক দরিদ্র পিতামাতা তাদের সন্তানদের বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত করেন। ইউনিসেফ বাংলাদেশ এসব ঝরে পড়া শ্রমজীবী শিশুদের বাস্তবমুখী ও জীবনমুখী শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। এসব কার্যক্রমে অভিভাবকদের সচেতনতা তৈরির পাশাপাশি কমিউনিটি ভিত্তিক সচেতনতা সৃষ্টিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে যা সমাজকর্মের সমষ্টি উন্নয়ন পদ্ধতিরও অন্যতম কার্যক্রম।

নগরের বস্তি অঞ্চলে দারিদ্র্য বিমোচন, মৌলিক সেবার উপস্থিতি বৃদ্ধি, মাদকাসক্ততা নির্মূল করা এবং সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইউনিসেফ কাজ করে। এ কার্যক্রমে অনেকটাই সমাজকর্মের সমষ্টি সংগঠন ও সমষ্টি উন্নয়ন নীতিমালা গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া কমিউনিটি এ্যাডভোকেসি এবং অংশীদারিত্ব কমিউনিটি উন্নয়নের অন্যতম উপাদান বলে মনে করা হয়। ইউনিসেফ ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্নমুখী গঠনমূলক তৎপরতাকে উৎসাহিত করে থাকে। তাই বলা যায় ইউনিসেফ'র বিভিন্ন কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষণীয়।

সারসংক্ষেপ

ইউনিসেফ'র বিভিন্ন কার্যক্রম যেমন– শিশু সুরক্ষা, শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা, জীবনমুখী শিক্ষা, কিশোরদের জীবন দক্ষতা মূলক শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি কার্যক্রম, পানি এবং স্যানিটেশন সেবা ইত্যাদিতে ব্যক্তি সমাজকর্ম, দল সমাজকর্ম এবং সমষ্টি উন্নয়ন ও সমষ্টি সংগঠন পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষণীয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। সমষ্টি উন্নয়নের অন্যতম উপাদান কোনটি?

ক) শিশু সুরক্ষা খ) স্বাস্থ্য সচেতনতা

গ) জীবনমুখী শিক্ষা ঘ) কমিউনিটি অংশীদারিত্ব

২। ইউনিসেফ পার্বত্য অঞ্চলে প্রাক-শিক্ষণ কার্যক্রম চালু কও্তে কত সালে?

ক) ২০০5 সালে খ) ২০০৮ সালে

গ) ২০০৬ সালে ঘ) ২০১০ সালে

পাঠ-৮.১০ ইউএনডিপি'র উদ্দেশ্য ও কার্যক্রম (Objectives and Programmes of UNDP)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৮.১০.১ ইউএনডিপি'র উদ্দেশ্যসমূহ লিখতে পারবেন।

৮.১০.২ ইউএনডিপি'র কার্যক্রমসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

৮.১০.১ ইউএনডিপি'র উদ্দেশ্য

বিশ্বব্যাপী জনগণের দারিদ্র্য বিমোচন করে মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইউএনডিপি বিভিন্ন দেশকে নীতির উন্নয়ন, নেতৃত্বের দক্ষতা, প্রাতিষ্ঠানিক, সক্ষমতা রিজিলেন্স তৈরি করতে কাজ করছে। বিশ্বের ১৭০ টি দেশে ইউএনডিপি তার কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বিভিন্ন দেশকে সহযোগিতা করছে ইউএনডিপি। টেকসই উন্নয়ন ও মানবসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিটি দেশের সামর্থ গড়ে তোলাই ইউএনডিপি'র মূল উদ্দেশ্য। এছাড়াও ইউএনডিপি উন্নয়নশীল দেশের কার্যকর উপদেশ, নির্দেশনা প্রদান, প্রশিক্ষণ এবং অনুদান সহায়তা দিয়ে থাকে। ইউএনডিপি'র উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ:

ক) ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সহায়তা করা;

খ) অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা, অর্থনৈতিক সুযোগে সহায়তা করা বিশেষত নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান;

গ) কাঠামোগত অসাম্য দূর করে সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য সামাজিক নীতি ও কর্মসূচির উন্নয়নে সহায়তা প্রদান;

ঘ) স্বাভাবিক অবস্থায় প্রত্যাবর্তন এবং পরিবেশ উন্নয়নে সহায়তা করা; এবং

ঙ) মানবাধিকার সংরক্ষণ করা এবং নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করা।

চিত্র ৮.১০.১ : ইউএনডিপি

৮.১০.২ ইউএনডিপি'র কার্যক্রম

১৯৭২ সাল থেকে বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নয়নে ইউএনডিপি একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। দারিদ্র্য বিমোচন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, জলবায়ু পবির্তনের হুমকি মোকাবিলা, পরিবেশের উন্নয়ন, প্রতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ইত্যাদি নানা বিষয়ে অত্যন্ত কার্যকর ভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ইউএনডিপি'র কার্যক্রমগুলো নিম্নরুপ:

১। দারিদ্র্য বিমোচন প্রকল্প

ক) উৎপাদনমুখী নতুন সুযোগে নারীর সক্ষমতা বৃদ্ধি : ইউএনডিপি অতি দরিদ্র নারীদের দারিদ্র্য দূর করার জন্য 'স্বপ্ন' নামে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ কার্যক্রমের আওতায় অতি দরিদ্র নারীদের কারিগরি প্রশিক্ষণ, চাকুরি ও বাজারের সাথে সংযোগ স্থাপনে নারীদের সহায়তা করে থাকে। যাতে করে নারীদের সামাজিক এবং অথনৈতিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ে।

খ) টেকসই ও অন্তর্ভক্তিমূলক পরিকল্পনায় সহায়তা : সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি করে আরো কার্যকরভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে এ প্রকল্প নীতি ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাজ করে। এর মূল ফোকাস হলো অন্তর্ভুক্তি, দরিদ্র বান্ধব অর্থনীতি, টেকসই উন্নয়ন এবং সমতায় ভবিষ্যত নির্ধারণ।

গ) জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা দূরীকরণ প্রজেক্ট : এর আওতায় ইউএনডিপি মানবাধিকার রক্ষা এবং জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা দূরীকরণে অন্যান্য বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এবং সরকারের সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

২। সুশাসন ও গণতান্ত্রিক শাসন উন্নয়ন প্রকল্প

ক) পুলিশ সংস্কার কর্মসূচি স্তর-দুই : বাংলাদেশে মানুষের নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত করা এবং সেবামূলক পুলিশ ব্যবস্থা গঠনে ইউএনডিপি কাজ করে যাচ্ছে।

খ) উপজেলা এবং ইউনিয়ন পরিষদ শাসন প্রকল্প : ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদকে কার্যকর করার জন্য স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য ইউএনডিপি বাংলাদেশ সরকারের সাথে কাজ করে যাচ্ছে।

গ) এ্যাকসেস টু ইনফরমেশন প্রকল্প : এই সেবার মাধ্যমে সরকারি সেবা জনগণের দৌড়গড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য ইউএনডিপি বাংলাদেশ সরকারকে সহযোগিতা করে যাচ্ছে।

ঘ) গ্রাম আদালত : দরিদ্র ও গ্রামীণ মানুষের সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা এবং বিচার ব্যবস্থায় মানুষের প্রবেশাধিকার দ্রুত মামলা নিষ্পত্তি করার জন্য কাজ করছে ইউএনডিপি।

৩। সংকট প্রতিরোধ এবং পুনরুদ্ধার : দুর্যোগকবলিত মানুষের সংকট প্রতিরোধ এবং তাদের দক্ষতা পুনরুদ্ধার কাজ করছে ইউএনডিপি। এর মূল উদ্দেশ্য হলো সংকটাপূর্ণ সময়ে যাতে করে দরিদ্র জনগোষ্ঠি ত্রান পায় এবং দীর্ঘমেয়াদী পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মাঝে জটিলতা কমানো যায়। এছাড়া ইউএনডিপি পার্বত্য এলাকায় বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এবং পার্বত্য চট্রগ্রাম উন্নয়ন সংস্থায় সাথে পার্বত্য অঞ্চলের মানুষের জীবনমান উন্নয়ন ও সংকট নিরসনে কাজ করছে।

৪। পরিবেশ ও শক্তি : দরিদ্ররা স্বভাবতই অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে বসবাস করে ও বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের অভাবে বিভিন্ন রোগব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয়। সেকারণে ইউএনডিপি উন্নয়নশীল দেশগুলোর পরিবেশগত উন্নয়নে কাজ করে। পরিবেশসম্মত ইটভাটা ও ইট তৈরি, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বৈদ্যুতিক বাতি ব্যবহার এবং নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যাবহারে উৎসাহিত করার জন্য সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থার সাথে কাজ করে। এছাড়া বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্যকর পায়খানা নির্মাণ, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নেও সহযোগিতা করে থাকে।

সারসংক্ষেপ

ইউএনডিপি ১৯৭২ সাল থেকে বাংলাদেশের জনগণের সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে দারিদ্র্য দূরীকরণ, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবিলা ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় কাজ করে যাচ্ছে। এসব কর্মসূচির মূল লক্ষ্য হলো দারিদ্র্য বিমোচন, জলবায়ু পরিবর্তন ও প্রকৃতিক দুর্যোগের মোকাবিলায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। কত সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের কথা বলা হয়েছে?

(ক) ২০৩০ সাল (খ) ২০২৫ সাল
(গ) ২০২০ সাল (ঘ) ২০২১ সাল

২। কত সালে ইউএনডিপি বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করেছিল?

(ক) ১৯৭২ সালে (খ) ১৯৭৩ সালে
(গ) ১৯৭২ সালে (ঘ) ১৯৭৪ সালে

পাঠ-৮.১১ ইউএনডিপি'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ (Application of Social Work Methods in the Programme of UNDP)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

৮.১১.১ ইউএনডিপি'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

৮.১১.১ ইউএনডিপি'র কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ

ইউএনডিপির বিভিন্ন কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষণীয়। দারিদ্র্য বিমোচন, সুশাসন প্রতিষ্ঠা, জলবায়ু পবির্তনের হুমকি মোকাবিলা, পরিবেশের উন্নয়ন, প্রতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ইত্যাদি নানা বিষয়ে অত্যন্ত কার্যকরভাবে কাজ করে যাচ্ছে ইউএনডিপি। ইউএনডিপি'র বিভিন্ন কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির লক্ষণীয়। যেমন– অতি দরিদ্র নারীদের দারিদ্র্য দূর করার জন্য স্বপ্ন নামে কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ কার্যক্রমের আওতায় অতি দরিদ্র নারীদের কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রদান, চাকুরি ও বাজারের সাথে সংযোগ স্থাপনে সহায়তা করা হয়। এর মাধ্যমে নারীদের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অন্তর্ভুক্তি বাড়ে। এ কার্যক্রমে ব্যক্তি সমাজকর্মের নীতিমালার ব্যবহার লক্ষণীয়। সমাজকর্মের অন্যতম লক্ষ্য হলো ব্যক্তির নিজস্ব সম্পদ ব্যবহার করে নিজেকেই নিজের সমস্যা সমাধানে সক্ষম করে তোলা। ইউএনডিপি ব্যক্তি পর্যায়ে সক্ষমতা বৃদ্ধি করে আরো কার্যকরভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে সরকারি এবং বেসরকারি বিভিন্ন প্রকল্পে নীতি ও কারিগরি সক্ষমতা বৃদ্ধিতে কাজ করে। এর মূল ফোকাস হলো অন্তর্ভুক্তি। জেন্ডারভিত্তিক সহিংসতা দূরীকরণে ইউএনডিপি সচেতনতামূলক কর্মসুচি গ্রহণ করে থাকে। সচেতনতামূলক কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন আলোচনাসভা ও সেমিনার আয়োজনের পাশাপাশি দলীয় আলোচনা, গবেষণায় আর্থিক সহযোগিতা করে থাকে। অর্থ্যাৎ ইউএনডিপির কার্যক্রমে সমাজকর্ম পদ্ধতির প্রয়োগ অনস্বীকার্য। সমষ্টি উন্নয়নের জন্য দরকার সমষ্টিভিত্তিক পরিকল্পনা ও কর্মসূচি। ইউএনডিপি তার পরিবেশ ও শক্তি কর্মসূচির অধীনে উন্নয়নশীল দেশগুলোর পরিবেশগত উন্নয়নে কাজ করে। কারণ মনে করা হয় দরিদ্ররা স্বভাবতই অস্বস্থিকর পরিবেশ ও বিশুদ্ধ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশনের অভাবে বিভিন্ন রোগব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয়। সে কারণে ইউএনডিপি পরিবেশ সম্মত ইটভাটা ও ইট তৈরি, বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী বৈদ্যতিক বাতি ব্যবহার এবং নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারে উৎসাহিত করার জন্য সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থার সাথে কাজ করে। বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্যকর পাায়খানা নির্মাণ, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থার উন্নয়নেও সহযোগিতা করে সংস্থাটি। এসব কর্মসূচিতে সমাজকর্মের নীতিমালা ও মূল্যবোধের প্রয়োগ লক্ষণীয়।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১। আন্তর্জাতিক সংস্থা বলতে বোঝায়–

i) যে সংস্থা দুইয়ের অধিক জেলায় কাজ করে
ii) যে সংস্থার বৈশ্বিক ম্যান্ডেট থাকে
iii) যে সংস্থা দুইয়ের অধিক দেশে সামাজিক উন্নয়নে কাজ করে

নিচের কোনটা সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii
গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

২। ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশ এর রুপকল্প হলো-

i) প্রত্যেকটা শিশু তার জীবনে পূর্ণতা পাক
ii) আমাদের প্রত্যেকের প্রার্থনা শিশুরা যেন তা করতে পারে
iii) প্রত্যেকটা শিশু তার জীবনে চাকুরি পাক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

৩। শিশুদেরকে অপুষ্টি ও এ্যানোমিয়া প্রতিরোধে ইউনিসেফ'র কোন কার্যক্রম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে–

i) Vitamin A প্রকল্প

ii) ব্রেস্ট ফিডিং

iii) মায়েদের সচেতনতা বৃদ্ধি প্রকল্প

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i,ii ও iii

৪। ওয়ার্ল্ড ভিশন বাংলাদেশের নরকলি প্রকল্প যে সংগঠনের যৌথ বাস্তবায়নে পরিচালিত হচ্ছে-

i) কোরিয়া আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা

ii) ইউএসআইডি

iii) জাইকা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) i ও iii

গ) ii ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৫-৭ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

সাফির বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন দিক নিয়ে পর্যালোচনা করে দেখতে পায় এখানে সংস্থাটির মূলনীতি গুলোকে কয়েকটা শব্দের মাধ্যমে নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে। সংস্থাটি দুস্থ, পীড়িত, অসহায় ও বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর অবস্থার উন্নয়নে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

৫। উদ্দীপকে ইঙ্গিত করা সংস্থাটির প্রতিষ্ঠার সাল হিসেবে সমর্থন যোগ্য কোনটি?

ক) ১৮০৫ সাল খ) ১৯০৫ সাল

গ) ১৮৬৩ সাল ঘ) ১৯১৯ সাল

৬। উক্ত সংস্থার কয়টি মূলনীতি রয়েছে?

ক) ৪ টি খ) ৫টি

গ) ৬ টি ঘ) ৭টি

৭। উদ্দীপকে ইঙ্গিত করা সংস্থাটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য কোনটি?

ক) সরকারের সহযোগী সংস্থা ও স্বেচ্ছাসেবী মানবিক প্রতিষ্ঠান

খ) দেশীয় সাহায্য সংস্থা

গ) অলাভজনক সংস্থা

ঘ) নিরাপত্তা মূলক সংস্থা

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১। জনাব শাহীন ক্লাশে ছাত্র-ছাত্রীদের শিশু অধিকার বিষয়ে পাঠদান করছেন। আজকের শিশুরা আগামী দিনের ভবিষ্যৎ - একথা উল্লেখ করে তিনি শিশুদের সঠিক লালনপালন, বৃদ্ধি ও বিকাশের উপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়াও তিনি শিশুর অধিকার রক্ষায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কাজ করে যাচ্ছে এমন প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করে সেসব প্রতিষ্ঠানে সুনির্দিষ্ট সমাজকর্ম পদ্ধতি প্রয়োগের উদাহরণ দেন।

ক) UNICEF কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

খ) সেভ দ্য চিলড্রেন এর উদ্দেশ্যসমূহ ব্যাখ্যা করুন।

গ) উদ্দীপকে উল্লেখিত শিশু অধিকার রক্ষায় সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলো সমাজকর্মের কোন পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকে? –ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) শিশুকল্যাণে সমাজকর্মের বিভিন্ন পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষণীয়- উক্তিটির যথার্থতা নিরুপণ করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১ : ১। খ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.২ : ১। খ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৩ : ১। ক ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৪ : ১। ক ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৫ : ১। গ ২। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৬ : ১। ঘ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৭ : ১। ঘ ২। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৮ : ১। গ ২। ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৯ : ১। ঘ ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১০ : ১। ক ২। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১১ : ১। ক ২। ক
চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ৮ : ১। গ ২। ক ৩। ঘ ৪। গ ৫। গ ৬। ঘ ৭। ক

সমাজকর্ম শিক্ষায় ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ
(Field Work Practice in Social Work Education)

ইউনিট ৯

ভূমিকা

সমাজকর্ম একটি প্রায়োগিক বিজ্ঞান। অন্যান্য বিজ্ঞানের ন্যায় সমাজকর্ম তাত্ত্বিক জ্ঞান সৃষ্টি করে থাকে, পাশাপাশি বাস্তব ক্ষেত্রে সেই জ্ঞান অনুশীলনের মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন সমস্যা মোকাবিলার মাধ্যমে মানুষের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ সাধন করে। সমাজকর্মের জ্ঞান ও দক্ষতাসম্পন্ন এবং মূল্যবোধ ও নীতিতে বিশ্বাসী পেশাদার কর্মীরা সমাজকর্মী নামে পরিচিত। একজন পেশাদার সমাজকর্মী তৈরীর প্রক্রিয়া একটা ধারাবাহিক পথ ধরে অগ্রসর হয়। এক্ষেত্রে প্রথমেই তাদের অর্জন করতে হয় সমাজকর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্থ্যাৎ সমাজকর্মের ধারণা, তত্ত্ব, পদ্ধতি, মডেল, কৌশল, মূল্যবোধ, নীতি, দক্ষতা ইত্যাদি সম্পর্কিত জ্ঞান। শিক্ষার্থীরা পরবর্তিতে এই জ্ঞানকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করে অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জনের সুযোগ লাভ করেন। এই ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়াকে ফিল্ড ওয়ার্ক বা ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ বলা হয়। সমাজকর্ম শিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ বা মাঠকর্ম। বাংলাদেশে শিক্ষানবিশ সমাজকর্মীরা বিভিন্ন সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান যেমন– এনজিও, হাসপাতাল সমাজসেবা, শিশুসদন, সংশোধনী কেন্দ্র প্রভৃতিতে সর্বমোট ৬০ কর্মদিবস ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ করার সুযোগ পেয়ে থাকেন।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ৩ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ-৯.১ : সমাজকর্ম শিক্ষায় ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের ধারণা ও উদ্দেশ্য
পাঠ-৯.২ : ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের নীতিমালা
পাঠ-৯.৩ : ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের গুরুত্ব
পাঠ-৯.৪ : কেস ম্যানেজমেন্টের ধারণা ও প্রক্রিয়া
পাঠ-৯.৫ : গ্রুপ ম্যানেজমেন্টের ধারণা ও প্রক্রিয়া
পাঠ-৯.৬ : ব্যবহারিক প্রশিক্ষণে সমাজকর্ম কৌশল
পাঠ-৯.৭ : ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন তৈরির ধারণা

পাঠ-৯.১ সমাজকর্ম শিক্ষায় ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের ধারণা ও উদ্দেশ্য (Concept and Objectives of Field Work in Social Work Education)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

৯.১.১ সমাজকর্ম শিক্ষায় ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

৯.১.২ ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

সমাজকর্ম শিক্ষায় ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের ধারণা

কোনো বিষয়ে অর্জিত জ্ঞানকে হাতে কলমে অনুশীলনের মধ্য দিয়ে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যার্জনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হচ্ছে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ। সহজ ভাষায়, ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ হলো কাজের মাধ্যমে শিক্ষা। অর্থ্যাৎ কোনো একটি বিষয়ে অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞান, শিক্ষা ও অভিজ্ঞতাকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে এর কার্যকারিতা, বাস্তবায়ন যোগ্যতা ও লক্ষ্যমুখীতা যাচাই-বাছাই করার যে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া তাকে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ বলা যায়।

সমাজকর্ম শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ, যা মাঠকর্ম (Field Work) নামেও পরিচিত। সমাজকর্ম শিক্ষায় মাঠকর্ম বা ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ বলতে, কোনো একটি সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানের অধীনে শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষে অর্জিত সমাজকর্মের নীতি, মূল্যবোধ, জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশলের বাস্তব প্রয়োগ ও অনুশীলনের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জনের প্রক্রিয়াকে বোঝায়।

Robert L. Barker (১৯৯৫) তাঁর "*The Dictionary of Social Work*" তে উল্লেখ করেন, "ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ হলো পেশাগত শিক্ষার এমন একটি অংশ, যেখানে প্রাথমিক পর্যায়ে শ্রেণিকক্ষে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা সরাসরি সেবাগ্রহীতাদের সাহায্যার্থে প্রয়োগ করা হয় (Practicum is a part of the professional education of students in which they apply the knowledge and skills acquired primarily through classroom assignments direct practice with clients.)।"

এম. এ মোমেন ও অন্যান্য (১৯৭০) তাঁদের "*Field Work Manual*" এ বলেন, "ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ হলো শিক্ষার্থীকে তার দক্ষতা ও সামর্থ বৃদ্ধির জন্য সহায়তা ও নির্দেশনা প্রদান করা, যাতে করে সে স্বাধীন ও যথাযথভাবে পেশাগত দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়ে উঠে (Field work program is designed to help and guide a student to develop his skill and competence for his independent professional functioning and carrying our appropriate responsibilities.)।"

Hollis and Taylor (১৯৫১) তাঁদের "*Social Work Education in the United States*" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "মাঠকর্ম অনুশীলন হলো সমাজকর্ম শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটা প্রাতিষ্ঠানিক অধ্যয়ন ও পেশাগত শিক্ষার মধ্যে স্পষ্ট পার্থক্য নির্দেশ করে (Field work is an integral part of social work education. It is in this area of that the difference between academic study and professional education emerges most clearly.)।"

সুতরাং বলা যায়, ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ সমাজকর্ম শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এটি শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে অর্জিত জ্ঞানকে বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সমন্বিত করার সুযোগ তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এবং শিক্ষার্থীদের দক্ষতা ও যোগ্যতা উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি করে থাকে। সমাজকর্মের শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষে যে তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন করে তার বাস্তব অনুশীলনের জন্য কোনো একটি সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানে দুইজন তত্ত্বাবধায়কের (একাডেমিক ও এজেন্সি) তত্ত্বাবধানে কাজ করে থাকে যা তাদের পেশাগত দক্ষতা ও যোগ্যতা সৃষ্টির মাধ্যমে ভবিষ্যত পেশাদার সমাজকর্মী হিসেবে গড়ে তোলে। এই ধারাবাহিক ও নিয়মতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ বলা হয়।

সমাজকর্ম শিক্ষায় ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য

ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগের মাধ্যমে মানবকল্যাণ সাধনের কলাকৌশল অর্জন। সমাজকর্ম শিক্ষার অপরিহার্য অংশ হিসেবে কতগুলো সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়। এ প্রসঙ্গে R. A. Skidmore এবং M.G. Thackery (১৯৯১) তাঁদের "*Introduction to Social Work*" গ্রন্থে বলেছেন,

"ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য হলো পেশাগত চিন্তশীল, আত্মমূল্যায়নশীল, জ্ঞানী এবং বিকাশমান সমাজকর্মী তৈরি করা (The objective of the practicum is to produce a professionally reflective, self-evaluating, knowledgeable and developing social worker.)।" সার্বিকভাবে সমাজকর্ম শিক্ষায় ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কতগুলো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সম্পাদিত হয়। এগুলো হলো–

ক) শ্রেণিকক্ষে অর্জিত সমাজকর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবক্ষেত্রে প্রয়োগ করা;
খ) বাস্তব প্রেক্ষাপটে সমাজকর্মের প্রত্যয়, নীতিমালা, কৌশল, মডেল ও পদ্ধতিগুলোর কার্যকারিতা পরীক্ষা করা;
গ) প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, প্রশাসনিক কাঠামো ও কর্মপ্রক্রিয়া সম্বন্ধে অবহিত হওয়া;
ঘ) শিক্ষার্থীর আত্মসচেতনতা, নিয়মানুবর্তিতা, কর্তব্যপরায়ণতা, পেশাগত যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন;
ঙ) সমাজকর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞান ও চলমান সমাজ থেকে আহরিত জ্ঞানের মধ্যে সমন্বয় সাধন করা;
চ) প্রশাসনিক কাঠামোর আওতায় কাজ করার অভিজ্ঞতা অর্জন;
ছ) এজেন্সীর আদর্শ ও মূল্যবোধ সম্পর্কে জানা এবং সমাজকর্মের মূল্যবোধের সাথে সুষ্ঠু সামঞ্জস্যবিধান করা; এবং
জ) শিক্ষার্থীদের মধ্যে পেশাদার মনোভাব, মূল্যবোধ ও পেশার প্রতি অঙ্গীকার সৃষ্টি করা।

পরিশেষে বলা যায়, সমাজকর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে একজন শিক্ষানবিশ সমাজকর্মীর মাঝে পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও আত্মবিশ্বাস সৃষ্টির লক্ষ্যে হাতে-কলমে শিক্ষা প্রদানই ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য।

সারসংক্ষেপ

সমাজকর্ম শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হলো ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ, যা মাঠকর্ম (Field Work) হিসেবেও পরিচিত। সমাজকর্ম শিক্ষায় মাঠকর্ম বা ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ বলতে শিক্ষার্থী কর্তৃক কোনো একটি সমাজসেবা প্রতিষ্ঠানে (দুইজন তত্ত্বাবধায়কের অধীনে) শ্রেণিকক্ষে অর্জিত সমাজকর্মের নীতি, মূল্যবোধ, জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশলের বাস্তব প্রয়োগ ও অনুশীলনের মাধ্যমে পেশাগত দক্ষতা ও যোগ্যতা অর্জনের প্রক্রিয়াকে বুঝায়।

ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ সমাজকর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুসঙ্গ। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীরা সমাজকর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞান সম্পর্কে ধারণা লাভ করে থাকে। সমাজকর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তব অনুশীলনের মাধ্যমে একজন শিক্ষানবিশ সমাজকর্মীর মাঝে পেশাগত জ্ঞান, দক্ষতা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও আত্মবিশ্বাস সৃষ্টির লক্ষ্যে হাতে-কলমে শিক্ষা প্রদানই ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ হচ্ছে–
ক) সমাজকর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞান শিক্ষা খ) শ্রেণী কক্ষের শিক্ষা
গ) সমাজকল্যাণ মূলক সেবা শিক্ষা ঘ) সমাজকর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞানের বাস্তব প্রয়োগ

২। সমাজকর্ম শিক্ষায় ব্যবহারিক প্রশিক্ষণে সাধারণত কয়জন তত্ত্বাবধায়ক থাকেন?
ক) একজন খ) দুইজন
গ) তিনজন ঘ) অনির্দিষ্ট

৩। সমাজকর্মে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য কোনটি?
ক) সমাজকর্মের তাত্ত্বিক বিষয় শেখানো খ) সমাজকর্মের মূল্যবোধ শেখানো
গ) সমাজকর্মের তাত্ত্বিক শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগ ঘ) সমাজকর্মের আধুনিকায়ন

পাঠ-৯.২ ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের নীতিমালা (Principles of Field Work)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

৯.২: ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের নীতিমালা বর্ণনা করতে পারবেন।

৯.২: ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের নীতিমালা

সমাজকর্মের প্রতিটি কাজ সুশৃঙ্খল ও সুনির্দিষ্ট নিয়ম-নীতি অনুসরণ করে করা হয়ে থাকে। ব্যবহারিক প্রশিক্ষণও এর ব্যতিক্রম নয়। নীতিমালা হলো বেশ কিছু দিক নির্দেশনা বা গাইড লাইন, যা অনুসরণ করে কোনো কাজ সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বেশ কিছু নীতিমালা অনুসরণ করা হয়। যদিও সমাজকর্মে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের জন্য পৃথক কোনো নীতিমালা প্রণীত হয়নি বরং সমাজকর্মের নীতিমালাসমূহ, যেমন– ক) গ্রহণ, খ) ব্যক্তি মূল্য ও মর্যদার স্বীকৃতি, গ) অনুভূতির উদ্দেশ্যমূলক বহিঃপ্রকাশ, ঘ) অবিচারকসুলভ মনোভাব প্রদর্শণ, ঙ) নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি, চ) আবেগের নিয়ন্ত্রণ, ছ) আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার, জ) গোপনীয়তা ইত্যাদি ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও প্রয়োজনে অনুসরণ করা হয়ে থাকে। যদিও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এই নীতিমালা সর্বজনীন বা চূড়ান্ত নয়, বরং বিভিন্ন দেশ ও সংস্কৃতি ভেদে পরিবর্তন করে ব্যবহার ও অনুসরণ করা হয়ে থাকে। নিম্নে সমাজকর্মের নীতিমালার আলোকে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের কিছু নীতিমালা আলোচনা করা হলো-

১। অংশগ্রহণ নীতি (Principle of particiaption): ব্যবহারিক প্রশিক্ষণে শিক্ষানবিশ সমাজকর্মীকে/শিক্ষার্থীকে ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় নিয়মতান্ত্রিকভাবে অংশগ্রহণ করতে হয়। অন্যদিকে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়ায় সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির জনগণের অংশগ্রহণের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। পাশাপাশি এজেন্সির বিভিন্ন কার্যক্রমেও স্বতস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করতে হয়। সঙ্গত কারণে অংশগ্রহণনীতি ব্যবহারিক প্রশিক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়।

২। যোগাযোগ নীতি (Principle of communication): ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের অন্যতম প্রধান অনুসঙ্গ হলো যোগাযোগ। সমাজকর্মী, এজেন্সির প্রতিনিধি ও সাহায্যার্থীর সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা ব্যতীত ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ সম্পাদন অসম্ভব। কেননা যোগাযোগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই সমাজকর্মী এজেন্সি ও সাহায্যার্থী সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারে। সঙ্গত কারণেই যোগাযোগের নীতি ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের অন্যতম নীতি হিসেবে বিবেচিত হয়।

৩। পেশাগত সম্পর্ক স্থাপন নীতি (Principle of rapport building): ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের সার্থকতা নির্ভর করে সমাজকর্মী ও সাহায্যার্থীর মধ্যে পেশাগত সম্পর্কের উপর। পেশাগত সম্পর্ক যত বেশি সুন্দর হবে সমস্যা সমাধান প্রক্রিয়া তত বেশি বেগবান হবে।

৪। গোপনীয়তার নীতি (Principle of confidentiality): গোপনীয়তার নীতি ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের অন্যতম একটি নীতি। শিক্ষার্থী বা শিক্ষানবিশ সমাজকর্মী সাহায্যার্থীর যাবতীয় তথ্য গোপন রাখবেন এবং সাহায্যার্থীকে এ বিষয়ে অভয় দিবেন। ফলশ্রুতিতে সাহায্যার্থী নির্ভয়ে সকল তথ্য সরবরাহ করবেন।

৫। আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার নীতি (Principle of self determination): একজন শিক্ষানবিশ সমাজকর্মীকে নিজের আচরণ, কাজ ও কথায় সচেতন হতে হবে। এজেনন্সিতে ভূমিকা রাখতে গিয়ে অথবা সাহায্যার্থীকে সেবা দিতে গিয়ে যেন একজন পেশাদার সমাজকর্মীর মতই অবদান রাখা যায়। ব্যক্তি সত্ত্বার কাছে যেন সমাজকর্মী সত্ত্বার পরাজয় না হয়।

৬। সমতার নীতি (Principle of equality): সকলকে সমান চোখে দেখা ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের একটি তাৎপর্যপূর্ণ নীতি। আত্মীয়-অনাত্মীয়, ধনী-গরীব, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে একজন সমাজকর্মী সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখবেন এবং যথাযথভাবে সেবা প্রদান করবেন।

৭। সাহায্যার্থীর মূল্য ও মর্যাদা স্বীকৃতি (Recognition of values and worth of the client): প্রত্যেক সাহায্যার্থীর নিজস্ব মর্যাদা ও মূল্য আছে। সমাজকর্মীকে সাহায্যার্থীর প্রাপ্য সম্মান দিতে হবে। এর ফলে পরস্পরের প্রতি আস্থা ও সম্মানের জায়গা সুদৃঢ় হবে।

৮। সম্পদের সদ্ব্যবহার নীতি (Principle of utilization of resources): কোনো এজেন্সির সম্পদ যতটুকুই থাকুক না কেন, একজন শিক্ষানবিশ সমাজকর্মীকে সেই সীমিত সম্পদের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

৯। নমনীয়তার নীতি (Principle of flexibility): একজন শিক্ষানবিশ সমাজকর্মীকে কোনো ভাবেই কঠোর হওয়া চলবে না। পরিস্থিতি অনুযায়ী নমনীয় হতে হবে এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রয়োজন হলে পরিকল্পনার পরিবর্তন করতে হবে।

১০। মূল্যায়ন নীতি (Principle of evaluation): ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ শেষে একজন শিক্ষার্থী বা শিক্ষানবিশ সমাজকর্মী তার সমগ্র কার্যক্রমের মূল্যায়ন (সফলতা-ব্যর্থতা, সক্ষমতা-দুর্বলতা) করবেন। কোনো ব্যর্থতা থাকলে তা চিহ্নিত করে সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।

সারসংক্ষেপ

নীতিমালা হলো বেশ কিছু দিকনির্দেশনা বা গাইড লাইন, যা অনুসরণ করে কোনো কাজ সম্পন্ন করা হয়ে থাকে। ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বেশ কিছু নীতিমালা অনুসরণ করা হয়। যদিও সমাজকর্মে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের জন্য পৃথক কোনো নীতিমালা প্রণীত হয়নি বরং সমাজকর্মের নীতিমালাসমূহ যেমন– ক) গ্রহণ, খ) ব্যক্তির মূল্য ও মর্যদার স্বীকৃতি, গ) অনুভূতির উদ্দেশ্যমূলক বহিঃপ্রকাশ, ঘ) অবিচারকসুলভ মনোভাব প্রদর্শন, ঙ) নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি, চ) আবেগের নিয়ন্ত্রণ, ছ) আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার, জ) গোপনীয়তা ইত্যাদি ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রেও প্রয়োজনে অনুসরণ করা হয়ে থাকে। যদিও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে এই নীতিমালা সর্বজনীন বা চূড়ান্ত নয়, বরং বিভিন্ন দেশ ও সংস্কৃতিভেদে পরিবর্তন করে ব্যবহার ও অনুসরণ করা হয়ে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। নীতিমালা কী?

ক) দিকনির্দেশনা খ) মূল্যবোধ
গ) আদর্শ ঘ) দায়িত্ববোধ

২। নিচের কোনটি ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের নীতিমালার আওতাভুক্ত?

ক) এজেন্সী নির্বাচন খ) তত্ত্বাবধায়ক নির্বাচন
গ) ব্যক্তির মূল্য ও মর্যাদার স্বীকৃতি ঘ) সমাজকর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞান অর্জন

পাঠ-৯.৩ ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের গুরুত্ব (Importance of Field Work)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

৯.৩: ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৯.৩: ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের গুরুত্ব

সমাজকর্ম শিক্ষায় ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ একটি অপরিহার্য অংশ। ব্যবহারিক প্রশিক্ষণই সমাজকর্মকে পেশার মর্যদায় অধিষ্ঠিত করেছে। সমাজ যেমন গতিশীল, সমাজিক সমস্যাও অনুরুপ। সুতরাং শুধুমাত্র তাত্ত্বিক জ্ঞান দিয়ে সামাজিক সমস্যার গতি-প্রকৃতি যথাযথভাবে জানা সম্ভবপর নয়। ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই একজন প্রশিক্ষণার্থী নিজেকে দক্ষ সমাজকর্মী হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। সুতরাং, সমাজকর্মে এর অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য।

ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে মো: ফখরুল ইসলাম (২০০৫) "*বাংলাদেশে সমাজকর্ম: শিক্ষা, অনুশীলন ও প্রয়োগ কৌশল*" গ্রন্থে বলেন, "সমাজকর্মে তাত্ত্বিক জ্ঞানার্জন সবিশেষ কথা নয়। তাত্ত্বিক জ্ঞানার্জন করে ব্যবহারিক শিক্ষার মাধ্যমে অনুশীলন করে একজন শিক্ষার্থীকে সমাজকর্মী হতে হয়। যিনি ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ নিতে অনীহা প্রকাশ করেন, তার সার্টিফিকেট লাভ হবে না"।

সমাজকর্ম শিক্ষায় ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের গুরুত্ব সম্পর্কে এম.এ মোমেন ও অন্যান্য তাঁদের ফিল্ড ওয়ার্ক ম্যানুয়েলে (১৯৭০) ৭টি গুরুত্বের কথা তুলে ধরেছেন তা নিম্নরূপ:

১. শিক্ষার্থীরা ব্যক্তি, দল ও সমষ্টির সমস্যা মোকাবিলায় কীভাবে সমাজকর্মের পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করতে হয় সে সম্পর্কে জানতে পারবে;
২. ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সমস্যার সমাধান প্রক্রিয়া, যেমন– অনুধ্যান, সমস্যা নির্ণয় ও সমাধান ইত্যাদি বিষয়গুলো প্রতিষ্ঠানের নিকট তুলে ধরবে;
৩. ব্যক্তি ও দলের অবস্থা পরিবর্তনে সহায়তাকারী ও অনুঘটক হিসেবে কাজ করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা নিজেদের সচেতন ও নিয়মানুবর্তী হিসেবে গড়ে তুলতে পারে;
৪. বাস্তব অনুশীলনের ক্ষেত্রে সমাজকর্মের বিভিন্ন তত্ত্ব ও নীতিমালা ব্যবহারে শিক্ষার্থীরা সচেষ্ট হয়;
৫. সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা অর্জিত জ্ঞানের আলোকে সমাজকর্মের বিভিন্নমুখী পদ্ধতি, দক্ষতা ও কৌশলসমূহ ব্যবহারে উদ্যোগী হয়;
৬. ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রশাসনিক কার্যাবলী ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারে; এবং
৭. শিক্ষার্থীরা সমষ্টির কাঠামো ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে। ফলে তারা সমষ্টি উন্নয়নে সমষ্টির সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারে সক্ষম হয়।

পরিশেষে বলা যায়, সমাজকর্ম শিক্ষায় ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য একটি সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়া হয় যাতে তারা তাদের অর্জিত জ্ঞান ও নীতি এবং পেশাগত পদ্ধতিসমূহ কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সৃজনশীলভাবে ব্যবহারের সুযোগ পায়। বাংলাদেশে স্নাতক ও মাস্টার্স উভয় স্তরেই দৈনিক ৮ ঘণ্টা করে মোট ৬০ কর্মদিবস অর্থাৎ ৪৮০ ঘন্টা ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

সারসংক্ষেপ

সমাজকর্ম শিক্ষায় ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অপরিসীম। ব্যবহারিক প্রশিক্ষণই সমাজকর্মকে পেশার মর্যদায় অধিষ্ঠিত করেছে। সমাজ যেমন গতিশিল, সমাজিক সমস্যাও অনুরুপ। সুতরাং, শুধুমাত্র তাত্ত্বিক জ্ঞান দিয়ে সামাজিক সমস্যার গতি-প্রকৃতি যথাযথভাবে জানা সম্ভবপর নয়। ব্যহারিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমেই একজন প্রশিক্ষণার্থী নিজেকে দক্ষ সমাজকর্মী হিসেবে গড়ে তুলতে পারে। সুতরাং সমাজকর্মে এর অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। সমাজকর্মে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ গুরুত্বপূর্ণ কারণ–

ক) অসহায় ও সুবিধা বঞ্চিতদের সেবা দেয়া যায় খ) সমাজকর্মের মৌলিক বিষয়াদি জানা যায়

গ) আবশ্যিক কোর্স সম্পাদন করা যায় ঘ) সমাজকর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করা যায়

২। জনাব এম. এ মোমেন ও অন্যান্য তাঁদের *“ফিল্ড ওয়ার্ক ম্যানুয়েল”* এ ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের কয়টি গুরুত্বের কথা উল্লেখ করেছেন?

ক) ৭টি খ) ৮টি

গ) ৯টি ঘ) ১০টি

পাঠ-৯.৪ কেস ম্যানেজমেন্টের ধারণা ও প্রক্রিয়া (Concept and Process of Case Management)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

৯.৪.১: কেস ম্যানেজমেন্ট ধারণাটি বর্ণনা করতে পারবেন।

৯.৪.২: কেস ম্যানেজমেন্টের প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৯.৪.১: কেস ম্যানেজমেন্টের ধারণা

কোন একজন সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তি তার সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে পেশাদার সমাজকর্মীর শরণাপন্ন হয়ে থাকেন। সমস্যার ধরন বিবেচনাপূর্বক সমাজকর্মী উক্ত ব্যক্তিকে সাহায্যার্থী হিসেবে গ্রহণ করেন এবং নথিভুক্ত করেন। সমাজকর্মের পরিভাষায় সমাজকর্মীর নিকট গ্রহণ ও নথিভুক্ত হওয়া প্রত্যেক সাহায্যার্থী এক একটি কেস হিসেবে বিবেচিত হয়ে থাকেন। সমাজকর্মে কেস ম্যানেজমেন্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া হিসেবে বিচেিত হয়। সমাজকর্মী এখানে কেস ম্যানেজার নামেও পরিচিত হন।

সাধারণভাবে কেস ম্যানেজমেন্ট হলো সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের জ্ঞান, মূল্যবোধ ও কৌশলের আলোকে এমন একটি সমন্বিত ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা, যার মাধ্যমে ব্যক্তির সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার ও সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা এবং সমস্যা মোকাবিলায় ব্যক্তিকে স্বাবলম্বী করে তোলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, কেস ম্যানেজমেন্ট বলতে কোনো সেবামূলক প্রতিষ্ঠান থেকে সেবাগ্রহণকারীকে সেবা প্রদানের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং প্রক্রিয়াকে বুঝায়।

Social Work Dictionary (1995) তে বলা হয়েছে, "কেস ম্যানেজমেন্ট হলো, এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে সাহায্যার্থীর পক্ষ থেকে বিভিন্ন সামাজিক সেবা প্রতিষ্ঠানের বা স্বাস্থ্যসেবা সংস্থার কর্মচারি-কর্মকর্তাদের গৃহীত সেবা পরিকল্পনা, চাহিদা বা প্রয়োজন অনুসন্ধান, যুক্তি উপস্থাপন এবং পরিবীক্ষণ বা মনিটর করা হয় (Case management is a process to plan, seek, advocate for and monitor services form different social services or healthcare organization and staff on behalf a client.)।"

সুতরাং, সমাজকর্মে কেস ম্যানেজমেন্ট এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে একজন পেশাদার সমাজকর্মী সাহায্যার্থীর সমস্যা নির্ণয় করে সমস্যা সমাধানের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন, সুযোগ ও সম্পদের সমন্বয় সাধন, সম্পদের সুষম বণ্টন, মনিটরিং ও পর্যালোচনার মাধ্যমে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং সমুদয় প্রক্রিয়ার মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সাহায্যার্থীর সমস্যা সমাধান করে থাকেন।

৯.৪.২: কেস ম্যানেজমেন্টের প্রক্রিয়া

প্রক্রিয়া (Process) বলতে কোনো কিছু বাস্তবায়নের কতগুলো ধারাবাহিক কার্যক্রমকে বুঝায়। কেস ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়া (Case Management Process) বলতে একজন কেস ম্যানেজার কর্তৃক সাহায্যার্থীকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে গৃহীত ধারাবাহিক পদক্ষেপ বা কার্যক্রমকে বুঝায়। Ballew and Mink তাঁদের "*Case Management in Social Work*" (১৯৯৬) গ্রন্থে কেস ম্যানেজমেন্ট এর কিছু প্রক্রিয়া বর্ণণা করেছেন। নিম্নে কেস ম্যানেজমেন্টের প্রক্রিয়াসমূহ আলোচনা করা হলো:

১। সমস্যা নির্ণয় (Assessment): যে কোনো সেবাদান প্রক্রিয়ার শুরু হয় সাহায্যার্থীর সমস্যা বিশ্লেষণ ও নির্ণয়ের মধ্য দিয়েই। এ প্রক্রিয়ার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হলো সাহায্যার্থী ও সেবা দানকারীর মধ্যে সুন্দর একটি পেশাগত সম্পর্ক সৃষ্টি ও পারস্পরিক আস্থার পরিবেশ তৈরি করা। কেস ম্যানেজারকে অবশ্যই সেবাগ্রহীতার বয়স, লিঙ্গ, পারিবারিক সম্পর্ক, সামাজিক ও আচরণগত বৈশিষ্ট্য, মানসিক ও দৈহিক স্বাস্থ্য, সমস্যার উৎপত্তি ও ব্যাপ্তি, কার্যকারণ সম্পর্ক ইত্যাদি সম্পর্কে সার্বিক তথ্য সংগ্রহ করতে হয়।

২। **পরিকল্পনা (Planning):** সমস্যা নির্ণয়ের পরবর্তী ধাপে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়ে থাকে। সাধারণত পরিকল্পনা প্রক্রিয়ায় চারটি ধাপ অনুসরণ করতে হয় তা হলো– ক) লক্ষ্য নির্ধারণ (Goal formulation), খ) অগ্রাধিকার ভিত্তিতে লক্ষ্য নির্ধারণ (Setting priorities among the goals), গ) লক্ষ্যার্জনের পদ্ধতি চিহ্নিতকরণ (Methods are chosen for achieving the goals), ঘ) অগ্রগতি মূল্যায়নের সময় ও প্রক্রিয়া চিহ্নিতকরণ (Identification of time and procedure for evaluation)।

৩। **পরিকল্পনা বাস্তবায়ন (Implementation):** এ পর্যায়ে সেবা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য কেস ম্যানেজার সাহায্যার্থীকে বিভিন্ন সেবা ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত করবেন। প্রয়োজনে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সেবা ব্যবস্থার সহায়তাও গ্রহণ করা হতে পারে। পাশাপাশি সেবাগ্রহীতাকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও উপদেশ প্রদান করতে হবে, যা তাকে লক্ষ্যার্জনে সহায়তা করবে।

৪। **মনিটরিং এবং পর্যালোচনা (Monitoring and review):** পরিকল্পনার নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের চলমান অগ্রগতি মনিটরিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মনিটরিং ও পর্যালোচনার মাধ্যমে একজন কেস ম্যানেজার বাস্তবায়িত পরিকল্পনার অগ্রগতি যাচাই করেন, পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতা চিহ্নিত করেন এবং প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

৫। **কেস সমাপ্তি (Case closure):** কেস ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়ার সর্বশেষ ধাপ কেস সমাপ্তি। সাধারণত কাঙ্খিত লক্ষ্য অর্জনের পর সেবাদাতা ও সেবাগ্রহীতা উভয়ের সম্মতিতে কেস সমাপ্তি করা হয়। এর মধ্য দিয়ে উভয়ের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী যে পেশাগত সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল তার পরিসমাপ্তি ঘটে।

সারসংক্ষেপ

কেস ম্যানেজমেন্ট হলো সমস্যাগ্রস্ত ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের জ্ঞান, মূল্যবোধ ও কৌশলের আলোকে এমন একটি সমন্বিত ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা, যার মাধ্যমে ব্যক্তির সম্পদ ও সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা এবং সমস্যা মোকাবিলায় ব্যক্তিকে স্বাবলম্বী করে তোলা হয়। অন্যভাবে বলতে গেলে, কেস ম্যানেজমেন্ট বলতে কোনো সেবামূলক প্রতিষ্ঠান থেকে সেবাগ্রহণকারীকে সেবা প্রদানের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন ও মনিটরিং প্রক্রিয়াকে বুঝায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। "কেস ম্যানেজমেন্ট হলো পরিকল্পনার প্রক্রিয়া" (Case management is a process to plan) –এটি কার উক্তি?

ক) Social Work Dictionary খ) Armando T. Morales
গ) Rex A. Skidmore ঘ) Encyclopedia of Social Work

২। Ballew and Mink তাঁদের "*Case Management in Social Work*" গ্রন্থে কেস ম্যানেজমেন্টের কয়টি প্রক্রিয়ার কথা বর্ণনা করেছেন?

ক) ৩টি খ) ৪টি
গ) ৫টি ঘ) ৬টি

পাঠ-৯.৫ গ্রুপ ম্যানেজমেন্টের ধারণা ও প্রক্রিয়া (Concept and Process of Group Management)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

৯.৫.১: গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট ধারণাটি বর্ণনা করতে পারবেন।
৯.৫.২: গ্রুপ ম্যানেজমেন্টের প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারবেন।

৯.৫.১: গ্রুপ ম্যানেজমেন্টের ধারণা

দুই বা ততোধিক ব্যক্তি যখন সংঘবদ্ধভাবে কাজ করার মাধ্যমে কোনো সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনে প্রয়াসী হন তখন তাকে একটি দল বলা হয়। সমাজকর্ম অনুশীলনের একটি মৌলিক পদ্ধতি হলো দল সমাজকর্ম। দল সমাজকর্মে দলীয় সদস্যদের মধ্যে সুসম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে দলীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে দলীয় সমস্যা সমাধানে কাজ করা হয়। এখানে সমাজকর্মী একজন দল সমাজকর্মী বা গ্রুপ ম্যানেজার নামে পরিচিত হন।

গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট হলো এমন একটি পেশাগত প্রক্রিয়া যা দলীয় সদস্যদের এমন ভাবে সহায়তা প্রদান করে, যার ফলশ্রুতিতে তারা নিজেদের ভূমিকা পুনরুদ্ধার ও দলীয় কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দলীয় আন্তক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়। গ্রুপ ম্যানেজমেন্টকে দলীয় সদস্যদের সক্ষমকারী প্রক্রিয়াও বলা হয়ে থাকে।

দল সমাজকর্মী দলের সদস্যদের মাঝে একটি কার্যকর উদ্দেশ্যপূর্ণ সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে দলে সদস্যদের ভূমিকা নিরুপণ, সদস্যদের মাঝে সমতা ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা, নেতৃত্ব সৃষ্টি, দলীয় লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ণয় এবং দলীয় গতিশীলতা সৃষ্টি ও দ্বন্দ নিরসনে বাস্তবভিত্তিক প্রয়োজনীয় দিক নির্দেশনা দান করার মাধ্যমে ঈপ্সিত লক্ষ্য অর্জনে কাজ করেন।

৯.৫.২: গ্রুপ ম্যানেজমেন্টের প্রক্রিয়া

গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়া (group management process) বলতে একজন দল সমাজকর্মী বা গ্রুপ ম্যানেজার কর্তৃক দলীয় সদস্যদের সক্ষম করে তোলার মাধ্যমে দলীয় লক্ষ্যার্জনে গৃহীত ধারাবাহিক পদক্ষেপ বা কার্যক্রমকে বুঝায়। গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়া বা ধাপসমূহ নিম্নরুপঃ

১. **দল গঠন (Group composition):** গ্রুপ ম্যানেজমেন্টের প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ হলো একটি দল গঠন। দল গঠনের সময় দলের পরিধি এবং সদস্যদের অভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলির প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। একটি সুন্দর বা সুষম দল গঠন দলীয় লক্ষ্যার্জনের অন্যতম প্রধান নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

২. **দলীয় অনুধ্যান ও সমস্যা নির্ণয় (Group study and assessment):** গ্রুপ ম্যানেজার দল ও দলীয় সদস্যদের সম্পর্কে গভীর অনুধ্যান করে থাকেন। সদস্যদের মনোভাব, বৈশিষ্ট্য, দলীয় চেতনা, সবল ও দুর্বল দিক, দলীয় সম্পদ ও সামর্থ্য ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। দল ও দলীয় সদস্যদের সম্পর্কে নিবিড় অনুধ্যানের ভিত্তিতে সমস্যা চিহ্নিত করা হয় এবং সেই অনুযায়ী পরিকল্পণা গৃহীত হয়।

৩. **লক্ষ্য নির্ধারণ (Goal setting):** দলীয় লক্ষ্য নির্ধারণ ও সেগুলো অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ গ্রুপ ম্যানেজমেন্টের অন্যতম ধাপ। এক্ষেত্রে গ্রুপ ম্যানেজারকে অবশ্যই দলীয় সম্পদ ও সামর্থ্যকে বিবেচনায় রাখতে হয়।

৪. **কর্মসূচি বাস্তবায়ন (Program implementation):** দলীয় লক্ষ্যার্জনে গৃহীত পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে দলীয় সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক্ষেত্রে গ্রুপ ম্যানেজার সার্বিক দিক নির্দেশনা প্রদান, মনিটরিং ও তত্ত্বাবধায় করে থাকেন। দল সমাজকর্মী দলীয় সমস্যা সমাধানে গৃহীত কর্মসূচি বাস্তবায়নে সমাজকর্মের হস্তক্ষেপ কৌশলের প্রোভাইডিং পদ্ধতি, সক্ষমকারী পদ্ধতি, প্রভাবকারী পদ্ধতি, সৃষ্টিশীল পদ্ধতি ইত্যাদি পদ্ধতিগুলো ব্যবহার করে থাকেন।

৫. **মূল্যায়ন (Evaluation):** এ পর্যায়ে দলীয় কার্যাবলী এবং অর্জিত সাফল্য ও ব্যর্থতা মূল্যায়ন করা হয়। মূল্যায়ন প্রক্রিয়া দলের ভবিষ্যত কর্মপন্থা নিরুপণে সহায়ক হয়। মূল্যায়ন ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, দল গঠন থেকে শুরু করে কাজ সমাপ্তি পর্যন্ত করা হয়ে থাকে।

সারসংক্ষেপ

গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট হলো এমন একটি পেশাগত প্রক্রিয়া যা দলীয় সদস্যদের এমনভাবে সহায়তা প্রদান করে, যার ফলশ্রুতিতে তারা নিজেদের ভূমিকা পুনরুদ্ধার ও দলীয় কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দলীয় আন্তক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট সমস্যার সমাধান করতে সক্ষম হয়। গ্রুপ ম্যানেজমেন্টকে দলীয় সদস্যদের সক্ষমকারী প্রক্রিয়াও বলা হয়ে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট সমাজকর্মের কোন মৌলিক পদ্ধতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ?

ক) ব্যক্তি সমাজকর্ম
খ) দল সমাজকর্ম
গ) সমষ্টি সমাজকর্ম
ঘ) সমাজকর্ম প্রশাসন

পাঠ-৯.৬ ব্যবহারিক প্রশিক্ষণে সমাজকর্ম কৌশল (Social Work Techniques in Field Work)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

৯.৬: ব্যবহারিক প্রশিক্ষণে সমাজকর্ম কৌশল সম্পর্কে বলতে পারবেন।

৯.৬: ব্যবহারিক প্রশিক্ষণে সমাজকর্ম কৌশল

সমাজকর্ম শিক্ষায় ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ব্যবহারিক প্রশিক্ষণে একজন শিক্ষানবিশ সমাজকর্মী সমাজকর্মের মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতিসমূহ যেমন– ব্যক্তি সমাজকর্ম, দল সমাজকর্ম, সমষ্টি উন্নয়ন ও সমষ্টি সংগঠন, সমাজকল্যাণ প্রশাসন, সামাজিক কার্যক্রম, সমাজকর্ম গবেষণা ইত্যাদি প্রয়োজন অনুসারে প্রয়োগ করে থাকে। সমাজকর্মের মৌলিক ও সহায়ক পদ্ধতিসমূহের যথাযথ প্রয়োগ এবং ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে বেশ কিছু কৌশলও প্রয়োগ করতে হয়। ফখরুল ইসলাম এবং রেজাউল ইসলাম *(২০১১)* তাঁদের "*সমাজকর্ম কৌশল*" গ্রন্থে বলেছেন, "কোনো একটি ইস্যুতে বিভিন্ন অনুশীলন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পদ্ধতিগতভাবে কাজ করতে গিয়ে যে সকল প্রযুক্তি বা খুঁটিনাটি বিষয়ের অবতারণা করা হয়, সেগুলোকে সাধারণভাবে কৌশল বলা যেতে পারে।" সমাজকর্ম কৌশলগুলো সাধারণত তথ্য সংগ্রহ, সমস্যা নির্ণয়, সমস্যা বিশ্লেষণ ও সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

ব্যবহারিক প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত সমাজকর্মের কৌশলগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ, কেস স্টাডি, গৃহপরিদর্শন, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন ইত্যাদি। কেস স্টাডি কৌশল প্রয়োগ করে শিক্ষার্থীরা ব্যক্তি পর্যায়ে সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের জ্ঞান অনুশীলন করে থাকে। ব্যবহারিক প্রশিক্ষণে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সমাজকর্মের কতিপয় বিশেষ কৌশল ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যেমন সামাজিক হস্তক্ষেপ কৌশল, সামাজিক অভিযোজন কৌশল, উদ্ভাবন ও পরিবর্তন কৌশল, সামাজিক পরিবর্তন কৌশল ও পরিকল্পিত পরিবর্তন কৌশল ইত্যাদি। এছাড়াও এক্ষেত্রে যোগাযোগ কৌশল ও চুক্তি সম্পাদন কৌশল সমাজকর্মের অন্যতম কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে কোন কোন কৌশল উপযোগী বা প্রয়োগ করা হবে তা অনেকাংশেই নির্ভর করে সামাজিক এজেন্সির প্রকৃতি ও সমস্যার ধরনের উপর। ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ চলাকালীন সময়ে শিক্ষানবিশ সমাজকর্মীকে প্রতিনিয়তই নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন ও প্রয়োগ করতে হয়।

সারসংক্ষেপ

ব্যবহারিক প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত সমাজকর্মের কৌশলগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো– সাক্ষাৎকার, পর্যবেক্ষণ, কেস স্টাডি, গৃহপরিদর্শন, ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশন ইত্যাদি। ব্যবহারিক প্রশিক্ষণে বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে সমাজকর্মের কতিপয় বিশেষ কৌশল ব্যবহার করা হয়ে থাকে, যেমন– সামাজিক হস্তক্ষেপ কৌশল, সামাজিক অভিযোজন কৌশল, উদ্ভাবন ও পরিবর্তন কৌশল, সামাজিক পরিবর্তন কৌশল ও পরিকল্পিত পরিবর্তন কৌশল ইত্যাদি। এছাড়াও এক্ষেত্রে যোগাযোগ কৌশল ও চুক্তি সম্পাদনের কৌশল সমাজকর্মের অন্যতম কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। নিচের কোনটি ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের কৌশল?

ক) তথ্য সংগ্রহ খ) প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান নির্বাচন

গ) কেস স্টাডি ঘ) সমস্যা সমাধান

পাঠ-৯.৭ ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন প্রস্তুত (Preparing Field Work Report)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি-

৯.৭.১ : ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন তৈরির ধারণাটি বর্ণনা করতে পারবেন।

৯.৭.১ : ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন তৈরির ধারণা

ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন হলো শিক্ষানবিশ সমাজকর্মীর কর্মসম্পাদনের চূড়ান্ত লিখিত প্রতিবেদন। অর্থাৎ ৬০ কর্মদিবস বা ৪৫০ ঘণ্টা কোনো একটি প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার পর প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি করতে হয়, যা ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন নামে পরিচিত। ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ চলাকালীন এজেন্সিতে একজন শিক্ষার্থী যেসব কর্ম সম্পাদন করেছে এই প্রতিবেদনে সে বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয়। পাশাপাশি এজেন্সির ধরন, নীতি ও কর্মসূচির একটি বাস্তব চিত্র প্রতিবেদনে প্রতিফলিত হয়ে থাকে। অন্যদিকে শিক্ষার্থী ব্যবহারিক প্রশিক্ষণে সমাজকর্মের তাত্ত্বিক জ্ঞানের কতটুকু প্রতিফলন ঘটাতে পেরেছে তারও একটি ধারণা পাওয়া যায়। ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রতিবেদনকে মূল্যায়ন রিপোর্টও (evaluation report) বলা হয়ে থাকে। একটি ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রতিবেদনে সাধারণত যে বিষয়গুলো থাকে এবং যেভাবে বিন্যস্ত করা হয় তার একটি নির্দেশনা নিম্নে বর্ণণা করা হলো:

ক. কভার পৃষ্ঠা: প্রতিবেদনের কভার পৃষ্ঠায় থাকবে প্রতিবেদনের শিরোনাম, এজেন্সির নাম, ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের সময়কাল ও স্থান, শিক্ষার্থীর নাম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম ইত্যাদি।

খ. ভিতরের পৃষ্ঠা: প্রতিবেদনের মলাট বা কভার পৃষ্ঠার পরবর্তী পৃষ্ঠাতে প্রতিবেদনের শিরোনাম, এজেন্সির নাম, ঠিকানা, প্রশিক্ষণকাল, প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধায়ক ও কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়কের নাম ও পরিচিতি, শিক্ষার্থীর নাম ও পরিচয়, সর্বনিচে কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম এবং প্রতিবেদন জমাদানের সময়কাল থাকবে।

গ. মুখবন্ধ/প্রতিবেদনের সংক্ষিপ্ত ভূমিকা: এই অংশে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের যৌক্তিকতা, কোথায়, কীভাবে সম্পাদন করা হলো অর্থাৎ সম্পূর্ণ প্রতিবেদনের মূল বিষয়াদির সংক্ষিপ্ত একটি বর্ণনা দেয়া হয়।

ঘ. কৃতজ্ঞতা স্বীকার: বিভিন্ন পর্যায়ে যাদের সহায়তায় সম্পূর্ণ ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা হয়।

ঙ. সূচিপত্র: ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রতিবেদনের ধারাবাহিক সূচিপত্র এখানে উপস্থাপন করা হয়।

চ. মূল প্রতিবেদন: মূল প্রতিবেদনে যে সকল বিষয়সমূহ ধারাবারিকভাবে থাকবে তা হলো:

১. ভূমিকা
২. সমাজকর্ম ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ বিষয়ক সংক্ষিপ্ত বিবরণ
৩. প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান/এজেন্সি পরিচিতি ও এজেন্সির কর্মসূচিসমূহ
৪. শিক্ষার্থীদের দায়িত্ব ও সম্পাদিত কার্যাবলী:
   ক) ব্যক্তি সমাজকর্মকেন্দ্রিক এজেন্সী হলে– সমস্যার ধরন অনুযায়ী গৃহীত কেসের বিস্তারিত বিবরণ দিতে হবে।
   খ) সমষ্টি বা দল সমাজকর্ম কেন্দ্রিক এজেন্সি হলো– দল বা সমষ্টির বর্ণনা, দল বা সমষ্টির চাহিদা ও সমস্যা নিরুপন ও সমস্যার সমাধানে গৃহীত উদ্যোগ লিপিবদ্ধ করা হয়।
৫. সমাজকর্ম পদ্ধতির অনুশীলন
৬. শিক্ষার্থীর সফলতা ও ব্যর্থতার আলোচনা
৭. সুপারিশ ও উপসংহার
৮. সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

একটি সুন্দর ও কার্যকর ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন তৈরিতে উপরিউক্ত সাধারণ নির্দেশনাগুলো শিক্ষার্থীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত।

সারসংক্ষেপ

৬০ কর্মদিবস বা ৪৫০ ঘণ্টা কোনো একটি প্রতিষ্ঠানে ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করার পর প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে সর্বাত্মক একটি চূড়ান্ত প্রতিবেদন তৈরি করতে হয়, যা ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রতিবেদন নামে পরিচিত। এই প্রতিবেদনে শিক্ষার্থী যেসব কর্ম সম্পাদন করেছে মূলতঃ সে বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয়। ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রতিবেদনকে মূল্যায়ন রিপোর্টও (evaluation report) বলা হয়ে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ প্রতিবেদনের অপর নাম কী?

ক) Final Report
খ) Report Book
গ) Evaluation Report
ঘ) Report Statement

২। প্রতিবেদনের শিরোনাম, এজেন্সির নাম, শিক্ষার্থীর নাম ইত্যাদি রিপোর্টের কোথায় উল্লেখ করতে হয়?

ক) কভার পৃষ্ঠায়
খ) মুখবন্ধে
গ) সূচিপত্রে
ঘ) এজেন্সি পরিচিতিতে

অনুশীলনী (ইউনিট–০৯)

ক. বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন:

১। "মাঠকর্ম অনুশীলন হলো সমাজকর্ম শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ"–এটি কার উক্তি?

ক) Encyclopedia of Social Work
খ) A. T. Morales & B. W. Sheafor
গ) Hollis and Taylor
ঘ) NASW

২। কোনটি ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য?

ক) অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞানের বাস্তব অনুশীলন
খ) মানুষকে সামাজিক ভূমিকা পালনে সক্ষম করা
গ) সাম্য, গণতন্ত্র ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা
ঘ) সম্পদের সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করা

৩। মাঠকর্ম একজন সমাজকর্মের শিক্ষার্থীর জন্য অত্যাবশ্যকীয়, কারণ–

i. সমাজকর্ম শিক্ষার পূর্ণাঙ্গ কোর্স
ii. দক্ষ ও পেশাদার সমাজকর্মী গড়ে তোলার জন্য অপরিহার্য
iii. সমাজকর্মের নীতি, মূল্যবোধ, পদ্ধতির বাস্তব প্রয়োগ করা যায়

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) i ও iii
গ) ii ও iii
ঘ) i, ii ও iii

৪। কেস ম্যানেজমেন্টের প্রক্রিয়াগুলো হলো–

i. ব্যক্তির সমস্যা নির্ণয়
ii. ব্যক্তির সমস্যা সমাধানে পরিকল্পনা গ্রহণ
iii. সমষ্টিগত সমস্যা সমাধান

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii
খ) ii ও iii
গ) i ও iii
ঘ) i, ii ও iii

৫। ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো–

i. সামাজিক এজেন্সী

ii. এজেন্সী তত্ত্বাবধায়ক

iii. একাডেমিক তত্ত্বাবধায়ক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii খ) ii ও iii

গ) i ও iii ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৬ ও ৭ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

লাবণ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের একটি বিভাগে লেখাপড়া করে, তার পঠিত বিষয়ের বাধ্যতামূলক কোর্স হিসেবে অনার্স পর্যায়ে ৬০ কর্মদিবসের জন্য তাকে একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে কাজ করার মাধ্যমে হাতেকলমে জ্ঞান অর্জন করতে হয়।

৬। উদ্দীপকে লাবণ্যের পঠিত বিষয় কোনটি?

ক) সমাজকল্যাণ খ) সমাজকর্ম

গ) মনোবিজ্ঞান ঘ) অর্থনীতি

৭। উদ্দীপকে ৬০ কর্মদিবসের জন্য তাকে বিভিন্ন সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে কাজ করার মাধ্যমে হাতেকলমে জ্ঞান অর্জন করা বলতে কী বুঝানো হয়েছে ?

ক) গবেষণা খ) ভ্রমণ

গ) ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ ঘ) শ্রেণিকক্ষে জ্ঞানার্জন

খ. সৃজনশীল প্রশ্ন

১। জনাব রাশেদ একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের একটি বিভাগের প্রধান। তাঁর প্রতিষ্ঠানে সেবাগ্রহীতাদের প্রচন্ড ভিড় লেগেই থাকে। পর্যাপ্ত স্থায়ী জনবল নেই। দুই বছর ধরে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও সরকারি কলেজের নির্দিষ্ট সংখ্যক ছাত্রছাত্রীদের ৬০ কর্মদিবসের জন্য প্লেসমেন্ট দেয়া হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীরা রাশেদ সাহেবের প্রতিষ্ঠানে সাহায্যার্থীদের সেবাদানে সহায়তা করেন, পাশাপাশি নিজেদের শ্রেণিকক্ষে অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞানকে বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার সুযোগ পেয়ে থাকেন। ৬০ কর্মদিবস কাজ শেষে ছাত্র-ছাত্রীরা একটি প্রতিবেদন তৈরী করে জমা দেন। রাশেদ সাহেব এই প্রতিবেদন মূল্যায়ন করেন ও ছাত্রছাত্রীদের নম্বর প্রদান করে থাকেন।

ক) NASW এর পূর্ণরূপ কি? ১

খ) কেস ম্যানেজমেন্ট বলতে কি বোঝায়? ২

গ) উদ্দীপকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের নিযুক্ত করার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে কোন বিষয়ের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাদৃশ্য রয়েছে তা ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ) উদ্দীপকে উল্লেখিত প্রতিবেদটি মূলত কোন ধরনের প্রতিবেদন? বর্ণিত প্রতিবেদনের আলোকে একটি নমুনা প্রতিবেদন কাঠামো তৈরি করুন । ৪

২। জামাল সাহেব পেশায় একজন ক্লিনিক্যাল সমাজকর্মী। তিনি একটি হাসপাতালে কর্মরত আছেন। প্রতিদিন নিত্যনতুন সমস্যা নিয়ে সাহায্যার্থীরা তার কাছে আসেন। তিনি একজন সমাজকর্মের ছাত্র হওয়ায় সেবাদান প্রক্রিয়ায় সমাজকর্মের পদ্ধতি, মূল্যবোধ, জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশলসমূহ প্রয়োগ করে থাকেন। ব্যক্তিদের সেবাদানের পাশাপাশি তিনি দলীয় পর্যায়েও সাহায্যার্থীদের সেবা দিয়ে থাকেন। এর পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে আগত ছাত্রছাত্রীদের তত্ত্বাবধায়ক হিসেবেও কাজ করে থাকেন, তিনি এই কাজটি পছন্দ করেন। তিনি জানান, তত্ত্বাবধান একটি প্রশাসনিক ও শিক্ষাগত প্রক্রিয়া।

ক) সমাজকর্ম কোন ধরনের বিজ্ঞান? ১

খ) গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট কী? ২

গ) উদ্দীপকের আলোকে সমাজকর্মের কৌশলসমূহ উপস্থাপন করুন। ৩

ঘ) "তত্ত্বাবধান একটি প্রশাসনিক ও শিক্ষাগত প্রক্রিয়া"– উক্তটি উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১ : ১। ঘ ২। খ ৩। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.২ : ১। ক ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৩ : ১। ঘ ২। ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৪ : ১। ক ২। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৫ : ১। খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৬ : ১। গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৭ : ১। গ ২। ক

চূড়ান্ত মূল্যায়ন- ৯ : ১। গ ২। ক ৩। ঘ ৪। ক ৫। ঘ ৬। খ ৭। গ

মানবণ্টন : পূর্ণমান ১০০

- সৃজনশীল প্রশ্নের জন্য ৬০ নম্বর এবং বহুনির্বাচনি প্রশ্নের জন্য ৪০ নম্বর বরাদ্দ থাকবে।
- প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের নম্বর ১০ এবং প্রতিটি বহুনির্বাচনি প্রশ্নের নম্বর ১।

- **সৃজনশীল প্রশ্ন:**
  সৃজনশীল অংশে মোট ৯টি প্রশ্ন থাকবে এবং উত্তর দিতে হবে মোট ৬টি প্রশ্নের।

- **বহুনির্বাচনি প্রশ্ন :**
  ৪০টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন থাকবে, সব কয়টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

সৃজনশীল প্রশ্নপত্রের সাধারণ কাঠামো

এতে প্রতিটি প্রশ্নের শুরুতে একটি দৃশ্যকল্প বা উদ্দীপক (stem) থাকবে যা হতে পারে একটি সাধারণ সূচনা বক্তব্য, চার্ট, চিত্র, গ্রাফ ইত্যাদি। দৃশ্যকল্প বা উদ্দীপকের শেষে ৪টি প্রশ্ন থাকবে।
প্রশ্ন ৪টির নম্বর বন্টন হবে নিম্নরূপ:

(ক) প্রশ্নের মান থাকবে ১

(খ) প্রশ্নের মান থাকবে ২

(গ) প্রশ্নের মান থাকবে ৩

(ঘ) প্রশ্নের মান থাকবে ৪

প্রতিটি প্রশ্নের এই ৪টি অংশের মোট নম্বর হবে ১০।

নমুনা প্রশ্ন

সমাজকর্ম

কোর্স কোডঃ HSC-2811

সৃজনশীল প্রশ্ন

সময়: ২ ঘন্টা ১০ মিনিট

পূর্ণমান−৬০

[দ্রষ্টব্য: প্রদত্ত উদ্দীপকগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়ুন এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন। যে কোনো **ছয়টি** প্রশ্নের উত্তর দিন। ডান পাশের সংখ্যা প্রশ্নের পূর্ণমান জ্ঞাপক।]

১. অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ তাঁর "বস্তিবাসী শিশু-কিশোরদের মাদকাসক্তির কারণ ও প্রভাব: ঢাকা শহরভিত্তিক একটি সমীক্ষা" শীর্ষক গবেষণায় উদ্ঘাটন করেন যে বস্তিবাসী শিশু-কিশোররা তাদের ন্যূনতম প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণ করতে পারে না। তাদের সুষ্ঠু সামাজিকীকরণ না হওয়ার ফলে তারা বিপথগামী হচ্ছে। তাদের অনেকেই সিগারেট, গাজা, ড্যান্ডিসহ বিভিন্ন ধরনের মাদক গ্রহণ, সেবন, ক্রয় ও বিক্রয়ের সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে। ফলে সমাজে অপরাধমূলক কর্মকান্ড বৃদ্ধি পাচ্ছে। তিনি তাঁর গবেষণা প্রতিবেদনে শিশু-কিশোরদের মাদকের মরণছোবল থেকে রক্ষার জন্য তাদের প্রয়োজন ও চাহিদা যথাযথভাবে পূরণের উপর গুরুত্বারোপ করেন।

ক. খাদ্য কী? ১

খ. সামাজিক সমস্যা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে শিশু-কিশোরদের কোন কোন চাহিদা ও প্রয়োজন পূরণ হয়নি তা চিহ্নিত করে ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ. "শিশু-কিশোরদের প্রয়োজন ও চাহিদা যথাযথভাবে পূরণ না হলে তারা বিপথগামী হয়ে যায়" – বিশ্লেষণ করুন। ৪

২. নিরক্ষরতা বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল রাষ্ট্রের একটি অন্যতম সামাজিক সমস্যা। শিশু-কিশোরদের শিক্ষাজীবন থেকে ঝরে পড়া নিরক্ষরতার অন্যতম কারণ গুলোর মধ্যে একটি। এ সমস্যা নিরসনে বর্তমান সরকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে সমাজকর্মের একটি বিশেষ শাখার জ্ঞান প্রয়োগের উদ্যোগ নিয়েছে। ফলে শিশু-কিশোরদের পরামর্শ প্রদান, মানসিক সহায়তা প্রদানসহ কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম করে তোলা হচ্ছে।

ক. কত সালে আমেরিকায় চিকিৎসা সমাজকর্মী সমিতি গঠিত হয়? ১

খ. সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্মের লক্ষ্যসমূহ বর্ণনা করুন। ২

গ. শিশু-কিশোরদের শিক্ষাজীবন থেকে ঝরে পড়া নিরসনে সমাজকর্মের যে শাখার জ্ঞান প্রয়োগ করা হয়েছে তার গুরুত্ব উপস্থাপন করুন। ৩

ঘ. 'বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে শাখাটির গুরুত্ব অত্যাধিক" – কথাটির তাৎপর্য উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করুন। ৪

৩. লক্ষ্মীরাণীর পরিবার দারিদ্র্যে জর্জরিত। তার স্বামী কোনো কাজ করে না। সে তার ১৩ বছরের মেয়ে স্বপ্নাকে পড়াশোনা না করিয়ে বিয়ে দিয়ে দেয়। বিয়েতে মেয়ের জামাইকে নগদ অর্থ, স্বার্ণালংকার ও আসবাবপত্র দেয়। বিয়ের মাস কয়েক পরই মেয়ের জামাই তার কাছে আরো অর্থ দাবি করে। সে তা দিতে অপারগ জানালে স্বপ্নার উপর তার স্বামী পাশবিক নির্যাতন চালায়। এক পর্যায়ে স্বপ্না সংসার ছেড়ে শহরে পাড়ি জমায়। বর্তমানে স্বপ্না একটি অপরাধী চক্রের সাথে জড়িয়ে পড়েছে।

ক. অটিজম কী? ১

খ. জনসংখ্যাস্ফীতি বলতে কী বোঝায়? ২

গ. সামাজিক সমস্যার ক্রমাগত প্রতিক্রিয়া ও পারস্পরিক নির্ভরশীলতার আলোকে স্বপ্নার জীবনের সমস্যাসমূহ উপস্থাপন করুন। ৩

ঘ. স্বপ্না তার জীবনে যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে তা কিভাবে পরিমাপযোগ্য ও সমাধানযোগ্য? –বিশ্লেষণ করুন। ৪

৪. অধ্যাপক ড. কে এম রবিউল করিম স্নাতক (সম্মান) শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে পাঠদান করেন। তিনি মৌলিক ও সর্বজনীন একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, সমাজ সৃষ্টির আদিলগ্ন থেকে প্রতিষ্ঠানটির অস্তিত্ব বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে তিনি প্রখ্যাত নৃবিজ্ঞানী ই. বি. টেইলরের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করেন। সমাজস্থ মানুষের নীতিবোধ ও নৈতিক শিক্ষার উৎস হিসেবে সামাজিক প্রতিষ্ঠানটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য অত্যাধিক বলে যুক্তি উপস্থাপন করেন।

ক. 'UNICEF' এর পূর্ণরূপ লিখুন। ১
খ. সামাজিক প্রতিষ্ঠান বলতে কী বোঝায়?। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত সামাজিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. "উক্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানটি সামাজিক সমস্যা নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি" –উক্তিটির পক্ষে যুক্তি দিন। ৪

৫. ডলির শিশু বয়সেই বিয়ে হয়ে যায়। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ীতে সে সামঞ্জস্য বিধানে সক্ষম হচ্ছিল না। তার স্বামী তাকে মৌখিকভাবে তিন তালাক উচ্চারণ করে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেয়। তার স্বামী তাকে না জানিয়ে পুনরায় বিয়ে করেছে। বর্তমানে ডলির পরিবার আইনের আশ্রয় নিয়েছে।

ক. শিশু আইন, ১৯৭৪ কবে থেকে সারা দেশে কার্যকর হয়েছে? ১
খ. কিশোর আদালত বলতে কী বোঝায়? ২
গ. ডলির স্বামীর বিচার হবে বাংলাদেশে প্রচলিত কোন আইনের কোন ধারাসমূহের আওতায়? ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. বাংলাদেশে নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আইনটি যথেষ্ট কি না? –উত্তররের সপক্ষে যুক্তি দিন। ৪

৬. বাংলাদেশ সরকার বস্তিবাসী জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে একটি কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এদেশে সমাজকর্ম পেশার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটের সাথে কার্যক্রমটির যোগসূত্র রয়েছে। বর্তমানে এ কার্যক্রমটি দেশের ৬৪টি জেলার ৮০টি ইউনিটের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ সমষ্টি উন্নয়নমূলক কার্যক্রম।

ক. প্রবীণ কারা? ১
খ. বেসরকারি সমাজ উন্নয়ন কার্যক্রম বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে যে সমষ্টি উন্নয়ন কার্যক্রমের ইঙ্গিত করা হয়েছে সেটির লক্ষ্য-উদ্দেশ্য চিহ্নিত করুন। ৩
ঘ. কার্যক্রমটির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করুন। ৪

৭. জনাব মোঃ আলাউদ্দিন একটি বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত আছেন। শহরাঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত বস্তিবাসী ও শ্রমজীবী শিশুদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে সংস্থাটি সদা তৎপর। এ লক্ষ্যে সংস্থাটি শিক্ষা, কর্মসংস্থান, প্রশিক্ষণ, চিত্তবিনোদনসহ বহুমুখী কর্মসূচি পরিচালনা করছে। সংস্থাটি তাদের কার্যক্রম বাস্তবায়নে সমাজকর্মের নীতি, কৌশল ও পদ্ধতি প্রয়োগ করে থাকে।

ক. কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র সর্বপ্রথম কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়? ১
খ. সমাজসেবা অধিদপ্তরের ভিশন বর্ণনা করুন। ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত সংস্থার সাথে পাঠ্যবইয়ের কোন সংস্থার কার্যক্রমের সাদৃশ্য রয়েছে তা চিহ্নিত করুন। ৩
ঘ. সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে প্রতিষ্ঠানটি কতটুকু ভূমিকা রাখতে পারছে তা মূল্যায়ন করুন। ৪

৮. অধ্যাপক ড. আব্দুল হাকিম সরকার আন্তর্জাতিক এক সেমিনারে তাঁর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। তাঁর প্রবন্ধে তিনি সেসব সংস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করেন যেগুলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর মানব জীবনের চরম ক্ষতিপূরণ, সার্বিক নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা প্রদানের লক্ষ্যে সৃষ্টি হয়। বিশ্বব্যাপী সংস্থাসমূহ মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক তথা সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশে যে সংগতি কার্যক্রম পরিচালনা করছে তা বিশ্লেষণ করে তুলে ধরেন।

ক. WHO কী? ১
খ. গ্রামীণ ব্যাংক বলতে কী বোঝেন? ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে ইঙ্গিত করা সংস্থাসমূহের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করুন। ৩
ঘ. বিশ্বশান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নয়নে এসব সংস্থার বিকল্প আছে কি-না? আপনার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি উপস্থাপন করুন। ৪

৯. বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকর্মের শিক্ষার্থীরা কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র, টঙ্গী, গাজীপুর ৬০ কর্মদিবস ব্যবহারিক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন। ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ শেষে প্রত্যেকে একটি করে প্রতিবেদন বিশ্ববিদ্যালয় তত্ত্বাবধায়কের নিকট জমা দেন। প্রত্যেকেই তাদের প্রতিবেদনে সমাজকর্ম শিক্ষায় ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন। সেই সাথে তারা ব্যবহারিক অনুশীলনের সীমাবদ্ধতা তুলে ধরেন। তারা প্রত্যেকেই তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন যে, প্রতিষ্ঠান তত্ত্বাবধায়ক সমাজকর্মে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী না হওয়ায় তারা সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। তবে তারা তাদের তাত্ত্বিকজ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় তত্ত্বাবধায়কের নিকট হতে গুরুত্বপূর্ণ দিকনির্দেশনা পেয়েছিলেন।

ক. সমাজকর্ম কৌশল কী? ১

খ. কেস ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়া সম্পর্কে ব্যাখ্যা করুন। ২

গ. শিক্ষার্থীরা তাত্ত্বিকজ্ঞানকে কিভাবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে সমস্যা মোকাবিলা করেছিল? ব্যাখ্যা করুন। ৩

ঘ. "সমাজকর্ম অনুশীলনে তাত্ত্বিকজ্ঞানের পাশাপাশি ব্যবহারিক প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অনস্বীকার্য"– আপনার মতামত দিন। ৪

সমাজকর্ম

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

সময়: ৪০ মিনিট

পূর্ণমান– ৪০

[দ্রষ্টব্য: সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার প্রতিটি ক্রমিক নম্বরের প্রশ্নের সঠিক/সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরটি উত্তরপত্রে লিখুন। প্রতিটি প্রশ্নের মান ১।]

১। মৌলিক মানবিক চাহিদা মূরত কয় ধরনের চাহিদার সমন্বয়ে গঠিত হয়?
ক. দুই খ. তিন
গ. পাঁচ ঘ. ছয়

২। কোন মৌলিক চাহিদাটি মানব সভ্যতার ধারক ও বাহক?
ক. খাদ্য খ. বস্ত্র
গ. শিক্ষা ঘ. চিত্তবিনোদন

৩। নিচের কোনটি জৈবিক চাহিদা?
ক. খাদ্য খ. বাসস্থান
গ. চিকিৎসা ঘ. বস্ত্র

৪। বাংলাদেশের মোট জাতীয় উৎপাদনের কত ভাগ কৃষিখাত থেকে আসে?
ক. ২০ ভাগ খ. ৩০ ভাগ
গ. ৪০ ভাগ ঘ. ৫০ ভাগ

৫। বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হচ্ছে–
i. vulnerable group feeding
ii. vulnerable group development
iii. school feeding
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৬। কত সালে বাংলাদেশে চিকিৎসা সমাজকর্মের নামকরণ করা হয় হাসপাতাল সমাজসেবা?
ক. ১৯৮২ সালে খ. ১৯৮৩ সালে
গ. ১৯৮৪ সালে ঘ. ১৯৮৫ সালে

৭। "What is Social Case Work" –গ্রন্থটির রচয়িতা কে?
ক. উইলিয়াম বিভারিজ খ. ম্যারী অ্যালেন রিচমন্ড
গ. ডব্লিউ. এ. ফ্রিডল্যান্ডার ঘ. জ্যান এ্যাডামস

৮। সমাজবিজ্ঞানী এফ.ই. মেরিল এর মতে সামাজিক সমস্যার উপাদান হচ্ছে–
i. পরিমাপযোগ্য অবস্থা
ii. মূল্যবোধের প্রতি হুমকি স্বরুপ
iii. দলীয় কার্যক্রমের প্রয়োজন অনুভূত হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৯। খাদ্যো উপাদান কয়টি?
ক. চারটি খ. পাঁচটি
গ. ছয়টি ঘ. সাতটি

১০। প্রিয়াংকার বিয়েতে তার বাবা পাত্রপক্ষকে স্বার্ণালংকার, নগদ টাকা ও উপঢৌকন দিলেন। তার বন্ধুরা তাকে কিছু বই দিল। তার মা পাত্রকে বিদেশে পড়াশোনার খরচ দেয়ার সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

ক. স্বর্ণালংকার ও বই
খ. স্বর্ণালংকার ও বিদেশে পড়ার খরচ
গ. বিদেশ পড়ার খরচ ও বই
ঘ. স্বর্ণালংকার, নগদ টাকা, উপঢৌকন ও বিদেশে পড়ার খরচ

১১। পরিবেশ বিজ্ঞানীগণ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণকে মূলত কয় ভাগে ভাগ করেছেন?

ক. দুই ভাগে
খ. তিন ভাগে
গ. চার ভাগে
ঘ. পাঁচ ভাগে

১২। HIV এর পূর্ণরূপ কোনটি?

ক. Human Immue Deficiency Virus
খ. Humans Immuno Deficiency vicus
গ. Human Immuno Deficiency virus
ঘ. Human Immuno Virus

১৩। সামাজিক ব্যাধি হচ্ছে−

i. জনসংখ্যাস্ফীতি
ii. মাসদকাসক্তি
iii. যৌন হয়রানি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১৫ ও ১৫নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

তনুশ্রীর পরিবার কোনো একটি সামাজিক সমস্যায় জর্জরিত যা স্থান-কাল-সমাজভেদে আপেক্ষিক হিসেবে পরিগনিত হয়। সমস্যাটিতে মূলত জর্জরিত তার বাবা ও ভাই। তনুশ্রীর ধারণা হতাশা, ব্যর্থতা ও সঙ্গদোষের কারণে তার বাবা ও ভাই সমস্যায় জর্জরিত হয়েছে। সে তার বাবা ও ভাইকে সমাজকর্মীর নিকট নিয়ে যায়। সমাজকর্মী এ সমস্যা নিরসনে বিভিন্ন ধরনের থেরাপী দিচ্ছেন।

১৪। উদ্দীপকে কোন সামাজিক সমস্যার ইঙ্গিত করা হয়েছে?

ক. দারিদ্র্য
খ. বেকারত্ব
গ. মাদকাসক্তি
ঘ. অপুষ্টি

১৫। উদ্দীপকের ইঙ্গিত করা সমস্যার কারণ হচ্ছে−

i. দারিদ্র্য
ii. হতাশা
iii. সুষ্ঠু সামাজিকীকরণের অভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

১৬। বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস কবে থেকে পালিত হচ্ছে?

ক. ২০০৮ সাল
খ. ২০০৯ সাল
গ. ২০১০ সাল
ঘ. ২০১১ সাল

১৭। শিশু আইন, ১৯৭৪ অনুযায়ী শিশুকে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োজিত করলে−

i. ১ বছরের কারাদন্ড বা তিনশত টাকা অর্থদন্ড
ii. ১ বছরের কারাদন্ড বা পাঁচশত টাকা অর্থদন্ড
iii. ১ বছরের কারাদন্ড বা তিনশত টাকা অর্থদন্ড বা উভয়দন্ড

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii
খ. i ও iii
গ. ii ও iii
ঘ. i, ii ও iii

১৮। কিশোর অপরাধীদের আচরণ সংশোধনে কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রের কার্যক্রম হচ্ছে–
i. কিশোর আদালত
ii. কিশোর আবাস
iii. সংশোধনী কার্যক্রম
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৯। Comprehensive Disaster Management Programme-CDMP চালু হয় কবে?
ক. ২০০৪ সালে খ. ২০০৫ সালে
গ. ২০০৯ সালে ঘ. ২০১০ সালে

২০। গ্রামীণ ব্যাংক প্রকল্প শুরু হয় কত সালে?
ক. ১৯৭৩ সালে খ. ১৯৭৪ সালে
গ. ১৯৭৫ সালে ঘ. ১৯৭৬ সালে

২১। Save the Children -এর প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?
ক. ইগলেনটাইন জেব খ. জ্যান অ্যাডামস
গ. কুইন্সি রাইট ঘ. আখতার হামিদ খান

২২। UNICEF কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক. ১৯৫৬ সালের ১ ডিসেম্বর খ. ১৯৫৮ ১১ ডিসেম্বর
গ. ১৯৫৬ সালের ১১ ডিসেম্বর ঘ. ১৯৫৮ সালের ১ ডিসেম্বর

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ২৩ ও ২৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:
নারী ও শিশুর প্রতি নির্যাতন, বৈষম্য ও সহিংসতা রোধে ১৯৮৩ ও ১৯৮৫ সালে পৃথক দু'টি আইন প্রণয়ন হলেও তা কার্যকর ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়। পরবর্তীতে ২০০০ সালে নতুন রুপে আইনটি প্রকাশ পায় এবং এর কয়েক বছর পর আইনটি সংশোধিত আকারে প্রণীত হয়।

২৩। উদ্দীপকটিতে যে আইনটির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে সেটির শিরোনাম কী?
ক. নারী ও শিশু নির্যাতন আইন, ২০০৩ খ. নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ আনি, ২০০৩
গ. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০৩ ঘ. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন (সংশোধন) আইন, ২০০৩

২৪। উদ্দীপকটিতে যে আইনের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে সেটিতে যৌন নিপীড়নের জন্য কী ধরনের শাস্তির ব্যবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে?
ক. ন্যূনতম ৩ থেকে ৫ বছর কারাদন্ড খ. ন্যূনতম ৩ থেকে ৭ বছর কারাদন্ড
গ. ন্যূনতম ৩ থেকে ৮ বছর কারাদন্ড ঘ. ন্যূনতম ৩ তেকে ১০ বছর কারাদন্ড

২৫। হিন্দু বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন কবে প্রণীত হয়?
ক. ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১২ খ. ২৪ অক্টোবর, ২০১২
গ. ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১০ ঘ. ২৪ অক্টোবর, ২০১০

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ২৬ ও ২৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:
বাংলাদেশের একটি সংস্থা মানব সম্পদ উন্নয়ন, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়ন তথা সার্বিক কল্যাণে কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। সংস্থাটি ১৯৮৯ সালে প্রতিষ্ঠিত একটি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন রয়েছে।

২৬। উদ্দীপকটিতে কোন মন্ত্রণালয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে?
ক. ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় খ. শিক্ষা মন্ত্রণালয়
গ. সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ঘ. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

২৭। উদ্দীপকটিতে যে সংস্থাটির লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বর্ণনা রয়েছে সেটির নাম কী?
ক. সমাজকল্যাণ পরিদপ্তর খ. সমাজসেবা অধিদফতর
গ. প্রতিবন্ধী কল্যাণ পরিষদ ঘ. সমাজসেবা পরিদপ্তর

২৮। মন্ত্রণালয়টির আওতাধীন অন্য সংস্থা হচ্ছে–
i. জাতীয় প্রতিবন্ধী উন্নয়ন ফাউন্ডেশন
ii. শেখ জায়েদ বিন সুলতান আল নাহিয়ান ট্রাস্ট
iii. মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৯। সামাজিক আইনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে–
i. সামাজিক অনাচার ও বৈষম্য দূর করা
ii. সুবিধা বঞ্চিতদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা
iii. সামাজিক সমস্যা প্রতিরোধ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩০। "পরিবার হচ্ছে সন্তান উৎপাদন ও প্রতিপালনের একটি চুক্তি" –উক্তিটি কার?
ক. MacIver খ. Nimkoff
গ. Molinowski ঘ. Summer

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩১ ও ৩২নং প্রশ্নের উত্তর দিন:
জনাব জামিল আহমেদ একটি বেসরকারি সংস্থার সিইও। যুদ্ধ, বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়সহ অন্যান্য দুর্যোগময় মুহুর্তে সংস্থাটি তৎপর ভূমিকা রাখে। মানবতা, একতা ও সাম্য হচ্ছে সংস্থারি কার্যক্রম পরিচালনার ভিত্তি।

৩১। জনাব জামিল আহমেদের সংস্থাটির সাথে কোন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাদৃশ্য রয়েছে?
ক. ওয়ার্ল্ড ভিশন খ. রেড ক্রিসেন্ট
গ. ইউনিসেফ ঘ. সেভ দ্যা চিলড্রেন

৩২। উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ সংস্থাটি কে, কবে প্রতিষ্ঠা করেন?
ক. হেনরি ডুনান্ট, ১৮৬৩ সালে খ. হেনরি ডুরান্ট, ১৮৬৩ সালে
গ. ইগলেনটাইন, ১৮৬৬ সালে ঘ. ইগলেনটাইস, ১৮৬৬ সালে

৩৩। জমিলা প্রায়ই অহেতুক ভীতি, বিষণ্নতা ও হতাশায় ভোগে। তার মধ্যে ভ্রান্ত বিশ্বাস এবং অলীক প্রত্যক্ষণ সমস্যাও রয়েছে। তার সমস্যা সমাধানে সমাজকর্মের কোন শাখার জ্ঞান প্রয়োগ করতে হবে?
ক. সাইকিয়াট্রিক সমাজকর্ম খ. শিল্প সমাজকর্ম
গ. মিলিটারী সমাজকর্ম ঘ. চিকিৎসা সমাজকর্ম

৩৪। বাংলাদেশের মোট জনশক্তির কত ভাগ বেকার?
ক. ১০% খ. ২০%
গ. ৩০% ঘ. ৪০%

৩৫। UNDP এর সদরদপ্তর কোথায়?
ক. নিউইয়র্ক খ. প্যারিস
গ. জেদ্দা ঘ. কায়রো

৩৬। বাংলাদেশ ওয়ার্ল্ড ভিশনের কার্যক্রম হচ্ছে–
i. স্বাস্থ্য মান উন্নয়ন
ii. দারিদ্র্য বিমোচন
iii. খাদ্য নিরাপত্তা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩৭ ও ৩৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন:

বাচ্চু মিয়া একজন সহজ সরল লোক। তিনি এক খুনের ঘটনায় সম্পৃক্ত থাকার অভিযোগে অভিযুক্ত হয়ে পাঁচ বছরের কারাদন্ড প্রাপ্ত হন। তিনি দীর্ঘ তিন বছর যাবত কারাগারে আছেন। কারা কর্তৃপক্ষ তাকে দুই বছরের সাজা মওকুফ করে শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

৩৭। বাচ্চু মিয়ার মুক্তি কোন ধরনের সংশোধনমূলক সেবার আওতায় হবে?

ক. প্রবেশন খ. প্যারোল
গ. আফটার কেয়ার ঘ. হাফ ওয়ে

৩৮। বাচ্চু মিয়াকে যে সংশোধনমূলক সেবার আওতায় মুক্তি দেয়া হবে তা প্রযোজ্য হয়–

i. গুরু অপরাধীর ক্ষেত্রে
ii. বয়স্ক অপরাধীর ক্ষেত্রে
iii. সংশোধিত অপরাধীর ক্ষেত্রে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩৯। সাহায্যার্থীর সমস্যা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবগত থাকেন কে?

ক. সমাজকর্মী খ. পরিবার
গ. সাহায্যার্থী ঘ. বন্ধু-বান্ধব

৪০। গ্রুপ ম্যানেজমেন্ট প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপ কোনটি?

ক. অনুধ্যান খ. সমস্যা নির্ণয়
গ. সমাধান ঘ. মূল্যায়ন